পরিবর্তিত পৃথিবী : সময়ের ভাবনা-১

আল্লাহর হাকিমিয়্যাত ও পাকিস্তান-সংবিধান

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

পরিবর্তিত পৃথিবী
সময়ের ভাবনা

আল্লাহর হাকিমিয়্যাত
ও
পাকিস্তান-সংবিধান

পরিবর্তিত পৃথিবী : সময়ের ভাবনা-১

আল্লাহর হাকিমিয়্যাত ও পাকিস্তান-সংবিধান

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

প্রকাশক
মাকতাবাতুস সিদ্দীক
পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

পরিবর্তিত পৃথিবী সময়ের ভাবনা-১

আল্লাহর হাকিমিয়্যাত ও পাকিস্তান-সংবিধান

লেখক
মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

প্রথম প্রকাশ জিদক্বদ : ১৪৪০ হি. জুলাই: ২০১৯ খ্রি.

প্রকাশক
মাকতাবাতুস সিদ্দীক
প্যান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

নির্ধারিত মূল্য
২৮০ (দুইশো আশি) টাকা

এ বইয়ে আমাদের সাধ্য মোতাবেক সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য
অনুযায়ী আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমাদের দেয়া তথ্যের বিপরীতে আরো শক্তিশালী কোন
তথ্য যদি কারো কাছে থাকে তাহলে তা-ই অগ্রগণ্য হবে।
ইনশাআল্লাহ!

তুলনামূলক সঠিক ও শক্তিশালী তথ্যের সামনে আত্মসমর্পণ
করতে এ আঙ্গিনা সর্বদা উন্মুক্ত। আলহামদু-লিল্লাহ!

সহজ পথ ছেড়ে কঠিন পথ ধরার প্রতি আমাদের বিশেষ
কোন আগ্রহ নেই।

উম্মতের শুবুহাতের হল,
উম্মতের জিজ্ঞাসার জবাব,
উম্মতের সুনির্দিষ্ট করণীয়,
–জানতে চাওয়া উম্মতের অধিকার। উম্মতের দায়িত্ব।

দলিলনির্ভর সিদ্ধান্ত, দ্বীনী সমস্যার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উম্মত বাধ্য।

অন্যায়-অপরাধের প্রতিরোধই মুখ্য, প্রতিরোধের পদ্ধতিগত ভুল মুখ্য নয়।

ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও সালাফের প্রথম কাতারগুলো তথা কুরূনে উলা। ব্যক্তিগত রুচি এবং সালাফের শেষ কাতারগুলো তথা কুরূনে মুতাআখখিরা নয়।

তথ্য-উপাত্তের জবাব তথ্য-উপাত্ত, গাল-মন্দের জবাব গাল-মন্দ, নিরবতার জবাব নিরবতা। এর অতিরিক্তটুকু অপচয়।

সূচি

মুখবন্ধ

জরুরী টীকা : ১

হাকিমিয়্যাত

الحاكمية عند خلفاء الأمة من سالف الزمن

খুলাফাউল মুসলিমীনের দৃষ্টিতে আল্লাহর হাকেমিয়্যাহ

পাকিস্তান-সংবিধান : মূলভিত্তি

পাকিস্তান-সংবিধান : কিছু মৌলিক ধারা উপধারা

জরুরী টীকা : ৩

জরুরী টীকা : ৪

জরুরী টীকা : ৫

জরুরী টীকা : ৬

জরুরী টীকা : ৭

জরুরী টীকা : ৮

জরুরী টীকা : ৯

জরুরী টীকা : ১০

জরুরী টীকা : ১১

জরুরী টীকা : ১২

জরুরী টীকা : ১৩

জরুরী টীকা : ১৪

জরুরী টীকা : ১৫

জরুরী টীকা : ১৬

জরুরী টীকা : ১৭

জরুরী টীকা : ১৮

জরুরী টীকা : ১৯

জরুরী টীকা : ২০

জরুরী টীকা : ২১

জরুরী টীকা : ২২

জরুরী টীকা : ২৩

জরুরী টীকা : ২৪

জরুরী টীকা : ২৫

জরুরী টীকা : ২৬

জরুরী টীকা : ২৭

জরুরী টীকা : ২৮

জরুরী টীকা : ২৯

জরুরী টীকা : ৩০

জরুরী টীকা : ৩১

মুখবন্ধ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد؛

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾

القول في تأويل قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}

قال أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره:"أولئك"، هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرين، هم الذين هداهم الله لدينه الحق، وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه، والقيام بحدوده، واتباع حلاله وحرامه، والعمل بما فيه من أمر الله، والانتهاء عما فيه من نهيه، فوفقهم جل ثناؤه لذلك "فبهداهم اقتده".

আরো একটি ধাপ

বর্তমানটা আমাদের কেমন চলছে তার যথাযথ ছবি দেখতে পাবে ভবিষ্যৎ ও পেছন ফিরে তাকিয়ে থাকা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সে ভবিষ্যৎ ও সে প্রজন্ম আমাদেরকে কীভাবে দেখবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ আমরা তাদের জন্য কোন সঠিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করে গেলাম নাকি ভুল চিন্তাধারার প্রবর্তন করে গেলাম তার উপর নির্ভর করবে তাদের পথ চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এমনিভাবে আমরা তাদের পক্ষ থেকে লানত পাওয়ার সামান তৈরি করে গেলাম নাকি দোয়া ও জাযা পাওয়ার বন্দোবস্ত করে গেলাম সে বিচারের উপরও নির্ভর করছে আমাদের বর্তমান।

তবে যে বিষয়টি এর চাইতেও অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকে নিজের আবেগ ও বিবেচনার আলোকে যা যা করে চলেছি; দ্বীন ও শরীয়তের উসূলের আলোকে আমরা তা সঠিক করলাম নাকি ভুল করলাম -তার বিচার। কারণ এর উপর নির্ভর করছে আমাদের আমলনামা ভারি হওয়া বা হালকা হওয়া। এর উপর নির্ভর করছে আমাদের সত্যের অগ্রপথিক হওয়া বা মিথ্যার অগ্রপথিক হওয়া। ন্যায় ও সত্যের নির্দেশক হওয়া বা অন্যায় ও অসত্যের নির্দেশক হওয়া।

এমন কি নিরবতাও

আমাদের নিরব থাকাও। আমাদের নিরবতারও বিচার হবে। সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্বের কোলাহলে, ন্যায় ও অন্যায়ের খোল্লমখোলা বাজারে, হক ও বাতিলের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা যারা দর্শক; তাদের কপালের ভাঁজের সংখ্যা, কান্নার সুর ও স্বর, হাসির মাত্রা, অশ্রুর বিন্দু ও কণা, কাঁটা দেয়া লোমের সংখ্যা, খাদ্য গ্রহণে রুচি-অরুচির মাত্রা, অশান্ত হৃদয়ে পায়চারির ঢং, আরাম কেদারায় হেলানো অশান্ত মাথার কাইফিয়াত -প্রতিটিকে থার্মোমিটার বা তার চাইতেও জটিল কোন মাপযন্ত্র দিয়ে মাপার মত প্রজন্ম সামনে আসবে। সে মাপে আমরা ধরা পড়েই যাব। এবং সেটাই হবে তাদের দলিল। হয়ত অনুসরণের দলিল, নয়ত ধিক্কারের দলিল।

প্রজন্মের কোন সদস্যই প্রয়োজন বোধ করবে না যে, মৃত লোকটিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি, তাঁর সে নিরবতার সাবলিল তরজমা কী ছিল? তার ব্যাখ্যা কী ছিল? বা তার বাস্তব রূপ কী ছিল?

কারণ

আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের কোন নিরবতাকেই অর্থহীন বলে ছেড়ে দেইনি। আমাদেরকেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাড়বে না। আমরা আমাদের বড়দের প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন বা শুধু মৌনতাকে নিজের মত করে বুঝে নিয়েছি। তার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিতে হবে, বা বুঝে নিতে হবে এমন কোন প্রয়োজন আমাদের মনের বারান্দায়ও উঁকি মারেনি।

আমাদের পূর্বসূরি কোন বিষয়ে নিরব থেকে থাকলে কেন থেকেছেন তা বোঝার জন্য তাঁদের ষাট সত্তর বছরের কর্ম জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠা

উল্টানো ছাড়াই আমরা বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছি যে তিনি কোন পরিস্থিতিতে কেন নিরব ছিলেন।

অতএব

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও খুব সহজে বুঝে ফেলবে, আমরা কোন কাজটি কেন করেছি, কোন কাজটি কেন করিনি এবং কোন কাজটি করেছি কি করিনি তা কাউকে বুঝতে দেইনি। প্রজন্ম আমার শত্রু হলেও বের করবে, মিত্র হলেও বের করবে। প্রজন্ম আমার ভক্ত মুরীদ হলেও বের করবে, আবার অবাধ্য গোঁয়ার হলেও বের করবে। বুদ্ধিমান চালাক হলেও বের করবে, আবার বোকা অপদার্থ হলেও বের করবে। শিক্ষিত সচেতন হলেও বের করবে, আবার অর্ধশিক্ষিত অচেতন হলেও বের করবে। কারণ; আমরা তা করছি, করে চলেছি।

ইতিদাল, ইনসাফ ইত্যাদি

শব্দগুলো খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি। কুরআনে কারীমে দুই ধরনের 'আদ্ল'র উল্লেখ এসেছে। একটির প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর আরেকটির নিন্দা করা হয়েছে। মায়েদার 'আদ্ল' তো আমরা চাই, কিন্তু আনআমের 'আদ্ল' আমরা চাইতে পারি না। সেটাতো কাফেরদের কাজ। তাই আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন।

মায়েদার 'আদল'র চিত্র তো এই-

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

{سورة المائدة : ٨}

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্য ন্যায়সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (সূরা মায়েদা : ৮)

কিন্তু এরই বিপরীতে আনআমের 'আদল'র চিত্র হচ্ছে এই-

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ {سورة الأنعام: ١}

সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (সূরা আনআম : ১)

'আদল'র যে ব্যবহার কাফেররা করেছিল তাতে আল্লাহর মাখলূককে; বরং তারা নিজেদের হাতে বানানো জিনিসকে আল্লাহর সমমর্যাদা দান করেছিল। আজকের এই দিনে আমাদের 'আদল'-ইনসাফের প্রতীক একটি কাফেলা ঈমান-কুফরের সকল সীমারেখা মুছে দিয়ে সকল কাফেরকে, আল্লাহর সকল দুশমনকে, এমনকি ইমামু আইম্মাতিল কুফরকে মুসলমানের সমমর্যাদা দান করে 'আদ্‌ল'র রিহার্সাল করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তিনশত আইন প্রণেতাকেও তারা আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে ছেড়েছে।

আর আমরা যথাযথ মর্যাদার অধিকারীরা 'আদল'-ইনসাফ রক্ষা করার 'নিরব থাকা' পদ্ধতি ব্যবহার করে যথাযোগ্য মর্যাদা বহাল রেখে চলেছি। ক্রুসেডারদের প্রধান এবং রাহেবদের প্রধানের মাধ্যমে শান্তির বন্দোবস্ত চলছে, আল্লাহর দুশমনদের ইমামদের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে নিজেদের মনের আকুতিগুলো পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে, আল্লাহর দুশমনের হাতে হাত রেখে আল্লাহর দুশমনদের ইমামের মাধ্যমে প্রার্থনা করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রগতিশীল পদ্ধতির প্রবর্তন চলছে।

একই মজলিসে যিশু, শিব, গৌতম, গনেশ, দূর্গা, সরস্বতী নিজ নিজ উপাসকদেরকে নেয়ামত বণ্টন করে চলেছে, আর সে মোক্ষম (?) সময়ে আল্লাহর বান্দারা তাদের মাবূদ থেকে সর্বোচ্চ অংশটি আদায় করার চেষ্টা করে চলেছে। এ আকাশ এ যমীন না কখনো এ 'আদল' (?) দেখেছে, আর না কখনো এ 'ইনসাফ' (?) দেখেছে। আর না দেখেছে এসব কিছুর উপর এমন ধৈর্যের (?) পাহাড়।

করা যেতে পারে এমন আবহ তৈরি হয়েছে। যে দরবারে আল্লাহর দুশমনদের প্রধান 'মহামান্য', যে দরবারে ধর্ম নির্বিশেষে শান্তির আয়োজন চলছে, যে দরবারে কুরআন-হাদীসের সবক দিচ্ছেন বিশ্বের সেরা বাইবেল বিশারদ ও বাইবেলের অনুসারী -সে দরবারের তুলনা এ পৃথিবী না দেখেছে, আর না দেখবে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে

ইতিদাল ও ইনসাফের প্রতি দাওয়াত এবং বেয়াদবি ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার আহবান আমরা ফেরাউন, কারূন, আবু জাহালের মুখেও শুনেছি। কাদিয়ানী, বাহায়ী, শিয়ার মুখেও শুনেছি। বেরেলভী, মওদূদী, গায়রে মুকাল্লিদের মুখেও শুনেছি। হিটলার, ওবামা, ট্রাম্পের মুখেও শুনেছি। দালাইলামা, কফি আনান, পোপের মুখেও শুনেছি। শ্রী কৃষ্ণ, গৌতম, মহাত্মা গান্ধীর মুখেও শুনেছি। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের মুখেও শুনেছি। নাস্তিক, মুরতাদ, যিন্দিকদের মুখেও শুনেছি। শাহবাগ, শাপলা, শানে রেসালত থেকেও শুনেছি। পল্টন, খানকাহ, গবেষণাগার থেকেও শুনেছি।

ইতিদাল ও ইনসাফ নিয়ে তো কারো দ্বিমত নেই। ইতিদাল, ইনসাফ নিয়ে তো ইসলামের আগমন, কুরআনের অবতরণ, রাসূলের আগমন। এ নিয়ে তো দ্বিমতের কোন সুযোগ নেই। দ্বিমত দেখা দিয়েছে শব্দদু'টির সংজ্ঞা নিয়ে। বাস্তব রূপ নিয়ে। ইতিদালের সেকাল একাল মিলাতে গিয়ে। সালাফে খালাফে খাপ খাওয়াতে গিয়ে। প্রায়োগিক রূপ আমরা কারটা নেব, আর কারটা ছাড়ব? কোন শতাব্দীরটা নেব, আর কোন শতাব্দীরটা ছাড়ব? কোন দশকেরটা নেব, আর কোন দশকেরটা ছাড়ব?

এ এক মহাপরীক্ষা!!

মেরে দোস্তো!

আকীদা বিশ্বাসের এক ভয়ংকর জোয়ার চলছে। মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের আঙ্গিনায় একাধারে স্থান করে চলেছে; খোদার দাবিদার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মুয়াহহিদ বান্দা, ভেদ রহস্যের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরা ফেরাউনকে নিষ্পাপ মুসলমান বলে বিশ্বাস করে, যিন্দীক হিসাবে

হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে মানুষদেরকে বাঁচাতেও পারে মারতেও পারে, আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারীরা আল্লাহর উপর নারাজ হয়ে 'আল্লাহর আন্দায নেই' বলে জোর খাটিয়ে তাঁর দরবার থেকে মৃত ব্যক্তির রূহকে কেড়ে নিয়ে আসতে পারে, পোপের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মোনাজাতের জোড়া হাত উত্তোলিত হয়ে চলেছে, সকল ধর্মের ধর্মানুরাগীদের সম্মিলনে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অমুসলিমদেরকে কাফের বলা অন্যায়, ধর্মের শিরোনামে ধর্মে ধর্মে লড়াই করা অন্যায়, মুসলিম প্রধান ও কাফের প্রধানের সমন্বয়ে পৃথিবীব্যাপী শান্তির প্রচেষ্টা সফলতার দ্বারপ্রান্তে, মুসলিম প্রধান ও কাফের প্রধানের সমন্বয়ে পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর দরবারে উভয়ের জবাবদিহির বন্দোবস্ত প্রায় চূড়ান্ত।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এগুলো এখন প্রতিদিনের সত্য। শিক্ষা ও অশিক্ষার অঙ্গনে প্রতিদিন চর্চিত বাস্তবতা।

মেরে দোস্তো--! আমি কি আসলে একটু বেশিই বলে ফেলছি? আমি কি একটু বেশি ভয় পেয়ে গেছি? এমন ভয়ংকর কিছুর মুখোমুখী হবো বলে তো কখনো সন্দেহও হয়নি। আপনারা কিছু একটা বলুন। আমি সত্যিই বলা বন্ধ করে দেব।

মঙ্গলকামীগণের আশঙ্কা

আমার মুহসিন ও মঙ্গলকামীগণের আশঙ্কা -যা মূলত আমার জন্য তাঁদের আন্তরিক দোয়া-, আমি কারো খপ্পরে পড়ে গেছি কি না? বা পড়ে যাই কি না?

কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিবেদন হচ্ছে, কারো খপ্পরে পড়ার আগে কি এ বিষয়গুলো আমাদের দায়িত্বের আওতায় আসার কোন সুযোগ নেই? খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা কি উপস্থাপিত তথ্যগুলোকে একেবারে নিষ্প্রাণ করে দেবে? তথ্যগুলোর কি নিজস্ব কোন ভাষা ও আবেদন নেই? যা একজন দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্বের প্রতি ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে। সমস্যাগুলোর কি নিজস্ব কোন শক্তি নেই? যা একজন ওয়ারেসে নবীকে তার মীরাস রক্ষার প্রতি সতর্ক করে তুলতে পারে।

যাই হোক

আমার কথার কোন শুরু আর শেষ তালাশ করে পাঠক শুধু শুধুই পেরেশান হবেন। আমি আসলেই লেখা ও বলার খেই হারিয়ে ফেলেছি। না বলা বন্ধ করতে পারছি, আর না লেখার বিন্যস্ত কোন রূপ দিতে পারছি। কিন্তু বার বারই মনে হচ্ছে, যত ভুলই হোক কথা বলতেই হবে।

আমার পড়ার কালের কোন কোন বন্ধু তো বলেই ফেলেছেন, আমার লেখার প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভুল। এমন কি সে ভুল শুরু হয়েছে প্রচ্ছদ থেকে। এমন লেখার ভুল কত ধরা সম্ভব?! এ জন্য আর কোন ভুল ধরার পথে পা বাড়াননি। বাকি আমার মনে হয়, শুধু পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নয় প্রতি ছত্রে ছত্রেও যদি ভুল থাকে তবু তাতে অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় নেই। আমার অবস্থা এখন এমনই।

কিন্তু মঙ্গলকামীদের মনে রাখতে হবে, কুফরের ভুল, জরুরিয়াতে দ্বীনের অস্বীকার ও অবহেলার ভুল, কবীরা গুনাহের ভুল, খেয়ানতের ভুল, ধোঁকা দেয়ার ভুল, তাহরীফ ও অপব্যাখ্যার ভুল, ঈমানকে কুফর বলার ভুল, কুফরকে ঈমান বলার ভুল, হারামকে ফরয বলার ভুল, ফরযকে হারাম বলার ভুল এবং ভুল ধরার পদ্ধতিগত ভুল, ভাষা ও বানান ভুল এক কথা নয়।

আমার বিশ্বাস

বড়দের কথা বুঝে বুঝে তার অনুসরণ করার মাঝে যে তৃপ্তি আছে না বুঝে করার মধ্যে সে তৃপ্তি নেই। বুঝে অনুসরণ করার মাঝে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিহিত রয়েছে না বুঝে করার মধ্যে সে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিহিত নেই। বুঝে অনুসরণ করার মাঝে বিশ্বাস ও আস্থার যে স্থায়িত্ব আছে না বুঝে করার মধ্যে সে স্থায়িত্ব নেই। বুঝে অনুসরণ করার মাঝে যে শক্তি ও রূহ আছে না বুঝে করার মাঝে সে শক্তি ও রূহ নেই।

এ বিষয়গুলোতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কারণ, কোন একটি প্রজন্ম যদি তার অগ্রজ থেকে না বুঝে মীরাসে নববীকে গ্রহণ করে তাহলে সে প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে লা-জবাব হয়ে থাকতে হবে। আর এর ধারাবাহিকতা যত দীর্ঘ হবে ততই উম্মতের জন্য তা

খারাপ খবর হবে। কারণ, 'কাযালিকা ওয়াজাদনা' জবাবটি কতকাল চালানো যাবে? কত প্রজন্মকে এ জবাব দিয়ে বোঝানো যাবে? আর এর বৈধতাই বা কতটুকু?

তাই

বড়দের কিছু বক্তব্য, কিছু লেখা, কিছু মন্তব্য পর্যালোচনার জন্য আমাদের এবারের আয়োজন **'পরিবর্তিত পৃথিবীঃ সময়ের ভাবনা'**। এখানে বড়দের সে কথাগুলোই আমরা আলোচনায় আনতে চাচ্ছি যেগুলোর ব্যাপক প্রচার হয়েছে, চলমান পৃথিবীর সঙ্গে সেসব কথার সম্পর্ক রয়েছে, সেসব কথার উপর চলমান পৃথিবীর অসংখ্য মৌলিক মাসআলা নির্ভর করছে এবং সেসব কথার সঙ্গে বড়দের বড় ও বড়দের সমপর্যায়ের ওলামায়ে কেরামের দ্বিমত রয়েছে।

বড়দের কথাগুলো আমরা বড়দের হুবহু ভাষায় উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ। অনুবাদের প্রয়োজন থাকলে অনুবাদ করে দেব। এরপর তাঁদের কথাগুলো আমরা দলিলের আলোকে বোঝার চেষ্টা করব। তাঁদের কথার যে অংশগুলো আমাদের বুঝে আসেনি সেগুলো উল্লেখ করব, এরপর তা কেন বুঝে আসেনি তাও আমরা বলার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

সচল অনুভূতি

আমি এখন যাদের এবারাত ও বক্তব্য নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করব, তাঁরা হয়ত আমার সরাসরি উস্তায, নয়ত উস্তাযুল উস্তায, নয়ত উস্তাযের সমপর্যায়ের সম্মানিত কেউ। এবারের কথাগুলো আমি তাঁদের উল্লেখসহ করতে চাই। কোন রকম রাখঢাক করতে চাই না। কারণ ইলমী পর্যালোচনায় রাখঢাক বা ইঙ্গিত সঠিক বিষয় উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন প্রকার অস্পষ্টতার আশা করি প্রয়োজন হবে না।

আমার পাঠকবর্গ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক; আলহামদু লিল্লাহ উস্তাযের স্নেহ, শাসন, দিকনির্দেশনা, ভুল শুধরে দেয়া, মেনে চলতে বাধ্য করা এসব আমার কাছে বরাবরের মত এখনো অমৃত, আমার ভরসা, আমার কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত।

আমার উস্তায বা উস্তায পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের 'তুই' ও 'তুমি' সম্বোধন আমার জন্য যতটা আরামদায়ক 'আপনি' সম্বোধন ততটা আরামদায়ক নয়। তাঁদের চেয়ারের পাশে মেঝের উপর বসে কথা বলতে যতটা স্বস্তি বোধ করি সামনা সামনি বা আগে পিছে চেয়ারে বসে কথা বলতে সে স্বস্তি বোধ হয় না। অগ্রজদের কথা মেনে চলতে যতটা ভরসা পাই, নিজের কথা মত চলতে ততটা ভরসা পাই না। রাহবারের বাতলানো পথে চলতে যতটা নিশ্চয়তা বোধ করি নিজের মত করে পথ চলতে সে নিশ্চয়তা বোধ করি না।

কিন্তু এ বিষয়গুলোর কোনটিই এমন নয় যা আমাদেরকে আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখার মত শক্তি রাখে। বিষয়গুলো দূর অতীত ও নিকট অতীত কোন অতীতেই খালাফকে তার দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে পারেনি এবং রাখেনি।

এখনো প্রায়ই মনে আশা জাগে, যদি বড়দের কেউ, উস্তাযগণের কেউ আমাকে ও আমাদেরকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, বলতেন, তোমাদের সমস্যা কী বল! আমাদের সমস্যাগুলো শুনে যদি দলিলের আলোকে বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন, আমাদের সন্দেহের জায়গাগুলো, সংশয়ের জায়গাগুলোর সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দিতেন! আমাদের ভুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে সঠিক তথ্যগুলো সরবরাহ করতেন! আমাদের জন্য সেটাই ভালো হত। এগুলো অ্যামদের মনের কথা।

আমরা দরজায় দরজায় বহু করাঘাত করেছি। অনেককে অনেক বিরক্ত করেছি। অনেকের অনেক সময় নষ্ট করেছি। অনেকের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। নথিপত্র আমাদের কাছে আছে। প্রয়োজন হলে প্রজন্মকে আমরা সেগুলো দিয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ। লিখিত কার্যক্রম এবং ব্যাপক পদ্ধতির প্রচার প্রসার যাকে বলা হচ্ছে -এটা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নয়। এর আগের পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে যদি সবাই জানত তাহলে তো সেগুলোও ব্যাপক প্রচারিতই হত। তখন এখানকার আপত্তি সেখানে গিয়ে হাজির হত।

যাইহোক, যখন মনে হয়েছে নিজের দায়িত্ব আদায়ের জন্য এতটুকু (ব্যক্তিগত মতবিনিময়) যথেষ্ট নয় তখনই এ পথে (সীমিত পরিসরের

প্রকাশ্য পথে) পা বাড়িয়েছি। সালাফ ও খালাফের কাছ থেকে নমুনা গ্রহণ করে তার অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। এখনও এটাই মনে করি যে, সালাফ ও খালাফের পদ্ধতি এখনো উপেক্ষা করিনি। বাকি ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিন।

আমাদের এ সিরিজের প্রথম বিষয়বস্তু হচ্ছে, শায়খে মুহতারাম মুফতী তকী ওসমানী -হাফিযাহুল্লাহ- এর একটি বক্তব্য।

-যুবায়ের

মুফতী তকী ওসমানী -হাফিযাহুল্লাহ- এর

মূল বয়ান

پاکستان سے باہر الحمد للہ اسلامی ممالک بہت ہیں، لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف پاکستان کو حاصل ہے جو اس کی بنیاد میں اس کا جو بنیادی دستور ہے اس میں اللہ جل جلالہ کی حاکمیت کو اپنے دستور کا سب سے بنیادی پتھر قرار دیا، یہ بات آپ کو تمام مسلمان ممالک میں سے کسی ملک میں نہیں ملیگی، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی چوں کہ وہ دستور نہیں ہے لہذا اس کی اندر بھی یہ اس تصریح کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے، کہ حاکمیت اعلی اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے اور اس ملک میں حکومت جو قائم ہو گی وہ اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کے اقرار کے ماتحت ہے، اللہ تعالی کی حاکمیت کے اعتراف کے ماتحت ہے، اور اس کے اس کے احکام کے ماتحت قائم ہو گی، یہ اعزاز اور کسی ملک کو حاصل نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو عطا فرمایا۔

یہ اعزاز کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے کہ جس میں یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات طئی کی گئی ہو کہ پاکستان کے کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائیگا اور موجودہ قانون کو قرآن و سنت کے ڈھانچے میں تبدیل کیا جائیگا، اور اس صراحت کے ساتھ کوئی کسی ملک میں یہ دفعہ موجود نہیں ہے۔

اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس دستور کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے، کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف دیکھے تو عدالت کے ذریعہ اس کو ختم کرائے اور اس کی جگہ اسلامی قانون کو لانے کا دعوی کرے اور عدالت اگر

اس کے دعوی کو قبول کرے تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون کو فسخ کر دے اور منسوخ کر کے اس کی جگہ اسلامی قانون نافذ کرنے کا حکم جاری کرے۔

افسوس ہے کہ اس عظیم دفعہ کو جو پاکستان کے دستور میں موجود ہے حکومت، عوام اور میں کہونگا کہ افسوس ہے کہ دینی حلقوں کی بے حسی کی وجہ سے یہ دفعہ معطل پڑی ہوئی ہے، اور اس سے فائدہ نہیں اٹھارہے ہیں، لیکن الحمد للہ یہ موجود ہے، آج بھی اگر ہم اس بات کا تہیہ کرلے کہ اس دفعہ کو بر سر کار لائینگے تو الحمد للہ اس کا راستہ کھلا ہوا موجود ہے۔

لہذا جو لوگ یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو لانے کے لئے ہتھیار اٹھائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے یہ پروپاگنڈا بالکل غلط ہے اور جھوٹا ہے، اور پر امن طریقے پر اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کا الحمد للہ راستہ موجود ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے بے حسی ختم کرے اور شعور پیدا کرے اور شعور پیدا کر کے اس دفعہ کو بروے کار لانے کا اہتمام کرے۔

میں سترہ سال اس وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شرعی ڈبلیمنٹ بینچ میں کام کرتا رہا، اور اس میں الحمد للہ ہم نے دو سو سے زیادہ قوانین عدالت کے ذریعے اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا حقوق جاري کیا اور حقوق اور وہ قوانین بدلے گئے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے دینی حلقوں کی طرف سے اس دفعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی۔

میں نے ہاتھ جوڑے میں نے منتیں کی کہ آپ خدا کے لئے اس دفعہ سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ درخواست دائر کرے، مگر افسوس ہے کہ کوئی درخواست دائر ہماری طرف سے نہیں ہوئی، بے دینوں کی طرف سے آئے ملحدین کی طرف سے آئے اور اس پر فیصلے دئے گئے، اور دو سو کے قریب قوانین اس زمانہ میں ہم نے بدلے۔

تو یہ بات صرف پاکستان کو پوري دنیا میں صرف پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن وسنت کی بنیاد پر کسی قانون کو چیلنج کر کے تبدیل کرا سکے۔

মুফতী তকী ওসমানী -হাফিযাহুল্লাহ- এর বয়ান

অনুবাদ

“আলহামদু লিল্লাহ পাকিস্তানের বাইরে বহু ইসলামী রাষ্ট্র আছে। কিন্তু এ মর্যাদা শুধুমাত্র পাকিস্তানই অর্জন করেছে যে, তার ভিত্তিমূলে তার মৌলিক যে সংবিধান রয়েছে তার মাঝে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর হাকিমিয়্যাতকে তার সংবিধানের সবচাইতে মূল ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।[১] এ বিষয়টি আপনি সকল ইসলামী রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রেই পাবেন না। এমন কি সাউদী আরবেও নয়। কেননা সেখানে এমন সংবিধান নেই। যার দরুণ তার মাঝেও এমন স্পষ্টভাবে এ কথা নেই যে, হাকিমিয়্যাত আল্লাহ তাআলার জন্য।[২]

আর এ দেশে যে হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে তা আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করার অধীনেই হবে।[৩] আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাত মেনে নেয়ার মাধ্যমে হবে এবং তাঁর বিধানের অধীনে হবে।[৪] এ মর্যাদা[৫] আর কোন দেশের অর্জিত নেই। যে মর্যাদা আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা এ দেশকে দান করেছেন।

এই মর্যাদা আর কোন দেশের অর্জিত নেই যেখানে এত স্পষ্টভাবে এ কথার ফায়সালা করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের কোন আইন কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ বানানো হবে না [৬] এবং বর্তমান কানূনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিবর্তন করা হবে।[৭] আর এত স্পষ্টভাবে কোন দেশে এ ধারাটি নেই।[৮]

আর শুধু এতটুকুই নয়; বরং এ সংবিধানের মাঝে এ কথা স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের এ অধিকার আছে, যদি সে কোন কানূনকে কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ মনে করে তা হলে সে তা আদালতের মাধ্যমে বিলুপ্ত করাবে[৯] এবং তার পরিবর্তে ইসলামী আইন আনার দাবি উত্থাপন করবে।[১০] আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে[১১]

তাহলে আদালতের এ অধিকার আছে যে, সে ঐ কানূন বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ইসলামী কানূন বাস্তবায়ন করার হুকুম জারি করবে।[১২]

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এ গুরুত্বপূর্ণ ধারা যা পাকিস্তানের সংবিধানে রয়েছে হুকুমত[১৩] ও সাধারণ মানুষ; বরং আমি বলব, আফসোস হচ্ছে দ্বীনী মহলগুলোর বেখবরী[১৪] ও অনুভূতিহীনতার[১৫] উপর যে, তাদের এ অনুভূতিহীনতার কারণে এ ধারাটি অকার্যকর হয়ে আছে[১৬] এবং তারা একে কাজে লাগাচ্ছে না।[১৭] কিন্তু এ ধারা আলহামদু লিল্লাহ রয়েছে। আজও যদি আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই যে, এ ধারাটিকে কাজে লাগাবো তাহলে এর জন্য আলহামদু লিল্লাহ রাস্তা খোলা রয়েছে।[১৮]

অতএব যেসব লোক এ প্রোপাগাণ্ডা[১৯] ছড়াচ্ছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই[২০] -এই প্রোপাগাণ্ডা একেবারেই ভুল[২১] এবং মিথ্যা।[২২] ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য আলহামদু লিল্লাহ প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে।[২৩] শর্ত হচ্ছে আমরা আমাদের অনুভূতিহীনতা এবং বেখবরী অবস্থা থেকে উঠে আসতে হবে এবং এ ধারাটিকে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।[২৪]

আমি সতের বছর শরয়ী আদালতের[২৫] যৌথ বেঞ্চ এবং সুপ্রিম কোর্টের শরয়ী ডেবলপমেন্ট বেঞ্চে[২৬] কাজ করেছি। এ সময়ের মধ্যে আলহামদু লিল্লাহ আদালতের মাধ্যমে দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।[২৭] কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের দ্বীনী মহলগুলোর পক্ষ থেকে এ ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য কোন আবেদন পেশ করা হয়নি।[২৮]

আমি হাত জোড় করে বলেছি, অনুরোধ করেছি যে, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে এ ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য আবেদন করুন।[২৯] কিন্তু আফসোস! আমাদের পক্ষ থেকে কোন আবেদন পেশ করা হয়নি। বেদ্বীনদের পক্ষ থেকে এসেছে, মুলহিদদের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার সে অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়েছে[৩০] এবং প্রায় দুইশত কানূন আমরা তখন পরিবর্তন করেছি।

সুতরাং সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু পাকিস্তানই এ মর্যাদা লাভ করেছে যে, প্রত্যেক নাগরিককে এ অধিকার দেয়া হয়েছে, সে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে কোন আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তা পরিবর্তন করাতে পারবে।"(৩১)

-সূত্র: বক্তব্যের ভিডিও কপি আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। মঞ্চ এবং শায়খে মুহতারাম যে ব্যাজ ধারণ করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন তা থেকে অনুমান করা যায়, অনুষ্ঠানটি কোন জাতীয় দিবসে জাতীয় পর্যায়ের প্রোগ্রাম ছিল। স্থানটি দারুল উলূম কারাচীর আঙ্গিনা বলে মনে হয়েছে। মাদরাসা ভবনে جشن آزادی مبارک ہو খচিত প্লেকার্ড শোভা পাচ্ছে। শ্রোতাদের হাতে ও মাথায় স্বাধীনতা দিবসের ফিতা শোভা পাচ্ছে। শায়খে মুহতারামের পাশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রহরী নিয়োজিত আছে। শায়খে মুহতারাম বক্তৃতার শুরুতে বলছিলেন, আজ থেকে উনসত্তর (৬৯) বছর আগে আল্লাহ তাবারাক ওয়াতালা ..... এ দেশটি দান করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, অনুষ্ঠানটি ছিল ২০১৭ এর ১৪ আগস্ট। তবে এর সুনির্দিষ্ট স্থান ও তারিখ আমরা এখনো পাইনি।

শায়খে মুতহারামের এ বয়ানটিকে আরো স্পষ্ট করে দেয় এমন আরেকটি বয়ানও এ গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। যাতে পাঠকদের জন্য বিষয়গুলো অনুধাবন করা আরো সহজ হয়ে যায়।

জরুরী টীকা : ১

“

আলহামদু লিল্লাহ পাকিস্তানের .... যে সংবিধান রয়েছে তার মাঝে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর হাকিমিয়্যাতকে তার সংবিধানের সবচাইতে মূল ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে ......।

জরুরী টীকা-১

আলহামদু লিল্লাহ পাকিস্তানের .... যে সংবিধান রয়েছে তার মাঝে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর হাকিমিয়্যাতকে তার সংবিধানের সবচাইতে মূল ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে ...... ।

***** শায়খে মুহতারাম কোন্ বিশেষ হালতের কথা এবং কোন্ বিশেষ সময়ের কথা এখানে তুলে ধরেছেন তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তবে পাকিস্তানের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার সংবিধান অধ্যয়ন করলে, পাকিস্তানের আইন ও বিচার ব্যবস্থার খবর নিয়ে পাকিস্তান প্রশাসনের বিস্তারিত প্রতিবেদন সামনে রাখলে শায়খে মুহতারামের এ দাবিটি মেনে নেয়া যায় না। মেনে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। শায়খে মুহতারামের এ দাবি সঠিক নয়।*

কারণ

১.পাকিস্তান-সংবিধান ও আইনের মূল ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে সাব্যস্ত করা হয়নি। সংবিধানের মূল ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে গণতন্ত্র**কে** সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২. পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান একজন ইসমাঈলী শিয়াপন্থী, যে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দৃষ্টিতে কাফের শিয়া পন্থীদের একজন, আর গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান ধারণার কারণে একজন মুরতাদ ছিল। ৩. একটি দারুল হারব থেকে পাকিস্তান

দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত। ৪. 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বীরপুরুষ ওলামায়ে কেরামের আজীবন প্রচেষ্টার পরও দেশটিতে শরয়ী বিধান ও শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। ৫. যে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করতে হয় সে রাষ্ট্রপ্রধান কখনো একটি দারুল ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। ৬. ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আবেদন করার পর যে শাসক ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা না করে গণতান্ত্রিক আইন প্রতিষ্ঠা করে সে কখনো মুসলমান হতে পারে না।

মোটকথা একটি দেশের সংবিধান ও আইনের মূল ভিত্তিপ্রস্তর আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর না হওয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য যা যা দরকার তার সব কিছুই পাকিস্তানের কিসমতে ঘটেছে।

যথাক্রমে

আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের সারমর্ম হচ্ছে, আল্লাহর বিধানকে জিজ্ঞেস করার আগে মুসলমানের ও মুসলিম দেশের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার হাকিমিয়্যাতের সারমর্ম হচ্ছে, জনগণ ও দেশের সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে জিজ্ঞেস না করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। এ দুয়ের সমন্বিত কোন রূপ নেই। যে রূপ রয়েছে তা আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের নয়। এ রূপও গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতারই রূপ। পাকিস্তানে এ দ্বিতীয়টিই আছে।

একজন কাফের বা মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের মাধ্যমে একটি দারুল ইসলামের সূচনা হতে পারে না। আল্লাহর হাকিমিয়্যাত সে দেশের মূল ভিত্তি হতে পারে না।

একটি দেশ দারুল হারব থেকে বের হয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ না করলে তার ভিত্তিমূল আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

একটি দেশের সব চাইতে প্রভাবশালী ও দেশ প্রতিষ্ঠার মূল স্তম্ভ মনীষীদের সর্বচূড়ান্ত আবেদন নিবেদনের পরও যে দেশ শরয়ী আইন ও শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়নি, সে দেশের ভিত্তিমূল আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

যে দেশের মালিকপক্ষ শরয়ী বিধান ও শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করাকে নিজের ফরয দায়িত্ব মনে করে না, সে দেশের ভিত্তিমূল আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইসলামী আইন ও আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য শতকরা ৯৫/৯৮ ভাগ মুসলমান জোর দাবি জানানোর পরও যে দেশের মালিকপক্ষ ইসলামী আইন ও আদালত প্রতিষ্ঠা না করে গণতান্ত্রিক আইন ও আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে, সে দেশের ভিত্তিমূল আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

অতএব

শায়খে মুহতারামের এ দাবিটি সঠিক নয়।

এ সংক্ষিপ্ত সারমর্মের বিস্তারিত বিবরণ এই-

হাকিমিয়্যাত

হাকিমিয়্যাত কী?

আভিধানিকভাবে এর অর্থ আমরা জানতে পারি المغرب في ترتيب المعرب এর নিম্নোক্ত এবারত وحكّمه فوّض الحكْم إليه থেকে। যার হাতে ন্যস্ত করা হবে তিনি 'মুহাক্কাম' বা 'হাকেম'। তা হলে حاكمية হচ্ছে حاكم এর حكم এর প্রয়োগ। সুতরাং হাকেমের হাকিমিয়্যাতকে আইন ও বিধানের মূল ভিত্তি বানানোর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র হাকেমের হুকুমকে প্রয়োগ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আল্লাহর হাকিমিয়্যাত কী?

আর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে বিধানের মূল ভিত্তি বানানোর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর হুকুমকে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অর্থাৎ একমাত্র কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কুরআন, হাদীস ও ফিকহ থেকে বিষয়টি দেখে নিলে এ বিষয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত হতে পারব।

আয়াত ও তাফসীর

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ {سورة النساء: ٦٥}

"(হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে।" -সূরা নিসা: ৬৫

কুরআন সুন্নাহকে সিদ্ধান্তদাতা বানাতে হবে

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়া মানে হচ্ছে, কুরআন সুন্নাহকে সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে গ্রহণ করা। আর তা সে তারতীব ও বিন্যাস অনুযায়ী যে বিন্যাস মুয়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। ঐ বিন্যাসেই আসতে হবে যে বিন্যাসের উপর সকল আইম্মায়ে মুজতাহিদীন চলে গেছেন। অর্থাৎ, মুসলমানের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে কোন পর্যায়ের যে কোন মাসআলাই আসবে, তার জন্য মুসলমান প্রথম দৃষ্টি ফেলবে কুরআনে, এরপর সুন্নাহতে, এরপর ইজমায়ে সাহাবায়, এরপর সাহাবীর একক আমল, এরপর পূর্বোক্ত দলিলগুলোর মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ।

একজন মুসলমানের জন্য এর বিকল্প আর কোন পথ খোলা নেই, যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে।

প্রথমে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের আলোকে ফায়সালা হবে, ইউরোপ-আমেরিকার নির্দেশিকা মেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, আল্লাহর দুশমন অমুসলিম কাফেরদের নীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, এরপর কুরআন সুন্নাহর আলোকে তার বিরুদ্ধে আপিল করে সত্তর বাহাত্তর বছর পর্যন্ত গণতন্ত্রের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকবে -কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের এ পদ্ধতি কুরআন সুন্নাহতে দেয়া হয়নি। আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে হাকেম বানানোর এ পদ্ধতি কুরআন সুন্নাহতে দেয়া হয়নি।

তাফসীরে আবুস সাউদ দেখুন

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আল্লামা আবুস সাউদ হানাফী রহ. তাফসীরে আবুস সাউদে এ কথাগুলোই বলেছেন। তিনি বলেন-

{فَلاَ وَرَبِّكَ} أي فوربِّك ولا مزيدةٌ لتأكيد معنى القَسَمِ لا لتأكيد النفي في جوابه أعني قولَه {لاَ يُؤْمِنُونَ} لأنها تزادُ في الإثبات أيضاً كما في قولِه تَعَالَى {فَلاَ أُقْسِمُ بِمواقعِ النجوم} ونظائرِه

{حتى يُحَكّمُوكَ} أي يتحاكموا إليك ويترافعوا إليك وإنما جئ بصيغة التحكيمِ مع أنه صلى الله عليه وسلم حاكمٌ بأمر الله سبحانه إيذاناً بأن حقَّهم أن يجعلوه حَكَماً فيما بينهم ويرْضَوا بحكمه وإن قُطع النظرُ عن كونه حاكماً على الإطلاق {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي فيما اختَلف بينهم من الأمور واختَلط ومنه الشجرُ لتداخُل أغصانه {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ} عطفٌ على مقدَّر ينساقُ إليهِ الكلامُ أي فتقضي بينهم ثم لا يجدوا

{فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً} ضِيقاً {مّمَّا قَضَيْتَ} أي مما قضيت به أو من قضائك وقيل شكاً من أجله إذا الشاكُّ في ضيق من أمره {وَيُسَلّمُواْ} أي ينقادوا لأمرك ويُذعِنوا له {تَسْلِيماً} تأكيدٌ للفعل بمنزلة تكريرِه أي تسليماً تاماً بظاهرهم وباطِنِهم يقال سَلَّم لأمرِ الله وأسلم له بمعنىً وحقيقتُه سلّم نفسَه له إذا جعلها سالمةً له خالصةً أي ينقادوا لحكمك انقياداً لا شُبهةَ فيه بظاهرهم وباطنهم﴾ {تفسير أبي السعود : ٢/١٩٧}

“فَلاَ وَرَبِّكَ” অর্থাৎ তোমার রবের কসম, لا অতিরিক্ত, কসমের অর্থকে শক্তিশালী করার জন্য, কসমের জবাব আল্লাহর বাণী لاَ يُؤْمِنُونَ কে বাতিল করার জন্য নয়; কেননা তা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি করা

হয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী فَلَاۤ أُقۡسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم ইত্যাদির মাঝে হয়ে থাকে।

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ অর্থাৎ তারা তোমার কাছে ফয়সালার জন্য আসে এবং তোমার কাছে মামলা দায়ের করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহুর আদেশে বিচারক হলেও এখানে التحكيم সীগা ব্যবহার করা হয়েছে এ কথা বোঝানোর জন্য যে, তাদের পরস্পরের বিষয়াদিতে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা যেন তাঁকে বিচারক মানে এবং তাঁর সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকে, যদিও তিনি মুতলাকভাবে হাকেম নন।

فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ অর্থাৎ যেসব বিষয়ে তাদের পরস্পরে দ্বন্দ্ব হয়। এ থেকেই الشجرُ শব্দটি নির্গত; তার ডালগুলো একে অপরের মাঝে ঢুকে পড়ার কারণে।

ثُمَّ لَا يَجِدُوا একটি উহ্য শব্দের উপর এটি আতফ হয়েছে যার দিকে বাক্যটি মানসূব হয়েছে, অর্থাৎ অতঃপর তুমি তাদের মাঝে ফয়সালা করলে তারা অনুভব করে না।

فِىٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجًا সংকীর্ণতা।

مِّمَّا قَضَيۡتَ অর্থাৎ তুমি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছ, অথবা তোমার সিদ্ধান্তের কারণে। কেউ বলেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণে। কেননা সন্দেহকারী তাঁর ফয়সালার বিষয়ে সংকীর্ণতায় ভোগে।

وَيُسَلِّمُوا অর্থাৎ তোমার ফয়সালার প্রতি অনুগত হয় এবং তার প্রতি বিশ্বাসী হয়।

تَسۡلِيمًا ক্রিয়াপদের তাকীদের জন্য, বার বার উল্লেখ করার পর্যায়ে। অর্থাৎ তাদের যাহের ও বাতেন দিয়ে পরিপূর্ণ গ্রহণ। বলা হয়, سَلَّم لأمرِ

الله ও أسلم له একই অর্থে। এর হাকীকত হচ্ছে, নিজেকে সে তাঁর কাছে অর্পণ করে দিয়েছে, যখন তাঁর জন্য নিরঙ্কুশ ও খালেসভাবে ন্যস্ত করবে। অর্থাৎ তারা তোমার ফয়সালার প্রতি এমনভাবে অনুগত হয় যে, তার মাঝে কোন সন্দেহ থাকে না, বাহ্যিকভাবেও নয় এবং অভ্যন্তরীণভাবেও নয়।" (ইরশাদুল আকলিস সালীম ইলা মাযায়াল কুরআনিল কারীম, আবুস সাঊদ আলহানাফী)

তাফসীরের أي يتحاكموا إليك ويترافعوا إليك,أن يجعلوه حَكَماً فيما بينهم এবং أي ينقادوا لأمرك ويُذعِنوا له ইত্যাদি শব্দাবলী এ দিকে খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীর দেখুন

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. একই কথা বলেছেন-

وَقَوْلُهُ: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} يُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ الْمُقَدَّسَةِ: **أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُحَكِّم الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ**، فَمَا حَكَمَ بِهِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ الِانْقِيَادُ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أَيْ: إِذَا حَكَّمُوكَ يُطِيعُونَكَ فِي بَوَاطِنِهِمْ فَلَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ، وَيَنْقَادُونَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ **فَيُسَلِّمُونَ لِذَلِكَ تَسْلِيمًا كُلِّيًّا مِنْ غَيْرِ مُمَانِعَةٍ وَلَا مُدَافِعَةٍ وَلَا مُنَازِعَةٍ**، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ". {تفسير ابن كثير: ٣٤٩/٢}

"আল্লাহর বাণী **فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم**" আল্লাহ তাআলা নিজ সম্মানিত পবিত্র নামের কসম করে বলছেন, কোন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল বিষয়ে বিচারক

মানার আগ পর্যন্ত মুমিন হবে না। অতএব তিনি যে ফয়সালা দেবেন সে ফয়সালাই হক-সত্য, যার আনুগত্য করা ওয়াজিব। বহ্যিকভাবেও আন্তরিকভাবেও। আর এ জন্যই তিনি বলেছেন ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا অর্থাৎ তারা যখন তোমাকে বিচারক বানায় তখন তারা আন্তরিকভাবে তোমার আনুগত্য করে এবং তারা তাদের মনে তোমার ফয়সালার বিষয়ে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করে না এবং তারা বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে সে ফয়সালা মেনে নেয়। ফলে তারা সে ফয়সালাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নেয়, কোন প্রকারে বাধা দেয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও কোন প্রকার বিতর্ক করা ছাড়া। যেমন হাদীসে এসেছে, 'ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি যে বিধান নিয়ে এসেছি তার আনুগত্য করার আগ পর্যন্ত তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর

তাফসীরের أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُحَكِّم الرَّسُولَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ ও فَيُسَلِّمُونَ لِذَلِكَ تَسْلِيمًا كُلِّيًّا مِنْ غَيْرِ مُمَانِعَةٍ وَلَا مُدَافِعَةٍ وَلَا مُنَازِعَةٍ শব্দাবলী এ কথাই সুস্পষ্ট করে বলে চলেছে।

আয়াত ও তাফসীর

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ {سورة النساء: ٥٩}

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকে উৎকৃষ্টতর।" -সূরা নিসা ৫৯

আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে অস্বীকার করল। এ প্রত্যাখ্যান সন্দেহের কারণে হোক বা গ্রহণ না করে হোক। এ প্রত্যাখ্যানের জন্য আমলী প্রত্যাখ্যানই যথেষ্ট। অর্থাৎ গ্রহণ না করাটাই প্রত্যাখ্যান হিসাবে বিবেচিত হবে। এর জন্য আলাদা করে অস্বীকারের ঘোষণা পাওয়া যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে গ্রহণ করে কখনো কখনো আমল না করা এবং গ্রহণ না করা দু'টির মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। গ্রহণ না করা হচ্ছে কুফর, আর গ্রহণ করে কখনো কখনো আমল না করা হচ্ছে গুনাহ।

তাফসীরে জাস্সাস দেখুন

জাস্সাস রহ. এর বিস্তারিত বিবরণ এই-

باب طَاعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللَّهُ تعالى: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ".

وَقَالَ تَعَالَى: "وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ". وَقَالَ تَعَالَى: "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ".

وَقَالَ تَعَالَى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً". فَأَكَّدَ جَلَّ وَعَلَا بِهَذِهِ الْآيَاتِ وُجُوبَ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَانَ أن طاعته إطاعة اللَّهِ وَأَفَادَ بِذَلِكَ أَنَّ مَعْصِيَتَهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ".

فَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِ الرَّسُولِ وَجَعَلَ مُخَالِفَ أَمْرِ الرَّسُولِ وَالْمُمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ مَا جَاءَ بِهِ وَالشَّاكَّ فِيهِ خَارِجًا مِنْ الْإِيمَانِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَلا

وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً". قيل في الحرج هاهنا: إِنَّهُ الشَّكُّ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَأَصْلُ الْحَرَجِ الضِّيقُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّسْلِيمَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ فِي وُجُوبِ تَسْلِيمِهِ وَلَا ضِيقِ صَدْرٍ بِهِ بَلْ بِانْشِرَاحِ صَدْرٍ وَبَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ.

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْإِسْلَامِ، سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ.

وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ **فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ**، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ. {أحكام القرآن للجصاص ٣/١٨٠}

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, আমি প্রত্যেক নবীকেই পাঠিয়েছি আল্লাহর আদেশে তার অনুসরণ করার জন্য। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, যে রাসূলের অনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, '(হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে'।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিকে জোরদার করেছেন এবং এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর অনুসরণই আল্লাহর অনুসরণ। আর এর দ্বারা এ কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর অবাধ্যতাও আল্লাহর অবাধ্যতা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের অবাধ্যতা করে তারা যেন তাদের উপর কোন মুসিবতে আক্রান্ত হওয়া বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পতিত হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকে'।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার উপর ধমকি দিয়েছেন। আর রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীকে এবং রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা যে গ্রহণ করেনি এবং যে সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তাদেরকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বাইরে গণনা করছেন এ আয়াত দ্বারা-

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ {سورة النساء: ٦٥}

কেউ বলেছেন এখানে الحرج দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সন্দেহ'। এ ব্যাখ্যা মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে। আর الْحَرَجُ এর আসল অর্থ হচ্ছে, অপ্রসন্ন। এবং এর উদ্দেশ্য হতে পারে, তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ ও সে বিষয়ে আন্তরিক অপ্রসন্নতা ছাড়া গ্রহণ করা; বরং প্রসন্নচিত্তে, বুঝেশুনে, বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা।

এ আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি আদেশ, অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশসমূহের কোন একটি আদেশকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে এ প্রত্যাখ্যান ঐ বিধানের প্রতি সন্দেহের কারণে করুক, অথবা গ্রহণ না করে ও গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে করুক।

আর সাহাবায়ে কেরাম যে যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদেরকে মুরতাদ বলে ফয়সালা দিয়েছেন, তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তাদের

সন্তানদের বন্দি করেছেন -এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের এ সিদ্ধান্তকে সহীহ হিসাবে প্রমাণ করে। কেননা যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত ও বিধানকে গ্রহণ করেনি তারা ঈমানদারদের দলভুক্ত নয় বলে আল্লাহ তাআলা ফায়সালা দিয়েছেন।" -আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস রহ. ৩/১৮০

জাস্‌সাস রহ. এর নিম্নোক্ত শব্দাবলী লক্ষ করুন- سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنَ التَّسْلِيمِ (চাই সে তা সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক বা কবুল করেনি বা মেনে নিতে বিরত থেকেছে) ও فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ (সাহাবায়ে কেরাম যে সেসব লোকদেরকে মুরতাদ বলেছেন, তাদেরকে হত্যা করেছেন, তাদের সন্তানদের বন্দি করেছেন যারা যাকাত আদায় করতে বিরত থেকেছে, তা সঠিক ছিল) বাক্যগুলো এ বিষয়টিকে খুব স্পষ্ট করে প্রমাণ করে। হাকিমিয়্যাত আল্লাহর হওয়ার অর্থই হচ্ছে, সকল মামলা আল্লাহর দরবারে দায়ের হবে। সকল বিচারিক সিদ্ধান্ত কুরআন সুন্নাহ থেকে নিতে হবে।

ইমাম জাস্‌সাস রহ. উদাহরণের মাধ্যমে এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে সুন্নাহের ফয়সালাকে যারা আমলীভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে সাহাবায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এ প্রত্যাখ্যান হচ্ছে, গ্রহণ না করা। আর সে কারণেই তাদের সঙ্গে সে আচরণই করেছেন যে আচরণ অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষেত্রে করা হয়। তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে হত্যা করেছেন। তাদের সন্তানদেরকে বন্দি করেছেন। জাস্‌সাস রহ. সাহাবায়ে কেরামের এ আচরণের ব্যাখ্যাও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

আয়াত ও তাফসীর

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ {سورة البقرة: ٣٠}

"আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।" -সূরা বাকারা ৩০

তাফসীরে জালালাইন দেখুন

এ আয়াতের আলোকে তাফসীরে জালালাইনের বক্তব্য হচ্ছে, আদম সন্তান পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার সুবাদে। অতএব আদম সন্তান যখন একমাত্র আল্লাহর বিধানকেই বাস্তবায়ন করবে তখনই বলা যাবে সে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকে মেনে নিয়েছে। কুরআন সুন্নাহর হাকিমিয়্যাতকে সে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন না করে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবি করা এবং তাঁর হাকিমিয়্যাতকে গ্রহণ করার দাবি করা সম্ভব নয়। আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন-

{و} اذكر يا مُحَمَّد {إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِل فِي الْأَرْض خَلِيفَة} يَخْلُفنِي فِي تَنْفِيذ أَحْكَامِي فِيهَا وَهُوَ آدَم. { تفسير الجلالين : ١/٧ }

" {و}স্মরণ কর হে মুহাম্মদ {إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِل فِي الْأَرْض خَلِيفَة} যে পৃথিবীতে আমার বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, আর সে হচ্ছে আদম।" -তাফসীরুল জালালাইন, ১/৮

আয়াত ও তাফসীর

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ {سورة النساء: ١٠٥}

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মাঝে ফায়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।" -সূরা নিসা: ১০৫

তাফসীরে তাবারী দেখুন

ইবনে জারীর তাবারী রহ. উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের যে পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে শিখিয়েছেন, মুফাসসির রহ. তা খুলে খুলে বলেছেন। রায় দিতে হবে কুরআনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। সিদ্ধান্ত দিতে হবে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। এর নাম হচ্ছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত।

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله"، "إنا أنزلنا إليك" يا محمد! "الكتاب"، يعني: القرآن، "لتحكم بين الناس"، **لتقضي بين الناس فتفصل بينهم،** "**بما أراك الله**"، يعني: **بما أنزل الله إليك من كتابه،** "ولا تكن للخائنين خصيمًا"، يقول: ولا تكن لمن خان مسلمًا أو معاهدًا في نفسه أو ماله، "خصيما" تخاصم عنه، وتدفع عنه من طالبه بحقِّه الذي خانه فيه. {**تفسير الطبري : ٩/١٧٥**}

"আবু জাফর বলেন, মহাপ্রশংসিত আল্লাহর এ বাণী إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে إنا أنزلنا إليك হে মুহাম্মদ! الكتاب অর্থাৎ কুরআন لتحكم بين الناس তুমি মানুষের মাঝে বিচার করার জন্য, অতঃপর তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা করবে। بما أراك الله অর্থাৎ তাঁর কিতাব থেকে তিনি তোমার কাছে যা নাযিল করেছেন। ولا تكن للخائنين خصيمًا তিনি বলছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সঙ্গে বা কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে তার জান-মালের বিষয়ে খেয়ানত করে তুমি তার خصيما হয়ো না যে, তুমি তার পক্ষ থেকে বিতর্ক করবে এবং যার সঙ্গে সে খেয়ানত করেছে সে তার হক দাবি করলে তুমি খেয়ানতকারীর পক্ষকে সমর্থন করবে। তুমি এমন করো না।।" তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী, ৯/১৭৫

আয়াত ও তাফসীরের এই শব্দাবলী "لتقضي بين الناس فتفصل بينهم، بما أراك الله" বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফয়সালা দানকারী, রায় প্রদানকারী, সিদ্ধান্ত দানকারী রায় ও সিদ্ধান্ত দেয়ার আগেই আল্লাহর নির্দেশিত রায় ও সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এর আগে কোন বিষয়ে কোন প্রকার ফয়সালা বা রায় দেয়ার কোন অধিকার নেই।

যে বিচারপতি তা করবে না এবং রায় ও সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে বৃটিশ আইন, গণতান্ত্রিক আইনের কিতাবের পাতা উল্টাবে, সে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়নি। যে আইন প্রণেতা তা করবে না এবং রায় ও সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে বৃটিশ আইন, গণতান্ত্রিক আইনের কিতাবের পাতা উল্টাবে, সে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়নি। যে সংবিধান বৃটিশ আইনের আলোকে তৈরি হয়েছে সে সংবিধান আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়নি।

আয়াত ও তাফসীর

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ {سورة المائدة: ١}

"হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার হালাল করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান করেন।" -সূরা মায়েদাহ ১

তাফসীরে তাবারী দেখুন

ইবনে জারীর তাবারী রহ. يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ অংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে উপস্থাপন করেছেন। যার মাঝে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কোন অংশীদারির সুযোগ নেই। কুরআন সুন্নাহকে জিজ্ঞেস করার আগে কোন বিষয়ে কোন হুকুম জারি করা যাবে না।

القول في تأويل قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: **إن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله، وتحريم ما أراد تحريمه، وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم، وغير ذلك من أحكامه وقضاياه،** "فأوفوا" أيها المؤمنون! له بما عقدَ عليكم من تحليل ما أحل لكم وتحريم ما حرّم عليكم، وغير ذلك من عقوده، فلا تنكثوها ولا تنقضوها. كما:-

حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"إن الله يحكم ما يريد"، **إن الله يحكم ما أراد في خلقه، وبيّن لعباده وفرض فرائضه، وحدَّ حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته.** {تفسير الطبري: ٩/٤٦٢}

"আল্লাহ তাআলার বাণী **إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ** এর ব্যাখ্যা–

আবু জাফর বলেন, এর দ্বারা মহাপ্রশংসিত আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে যা চান তাই ফয়সালা করেন। যা হালাল করতে চান তা হালাল করেন, যা হারাম করতে চান তা হারাম করেন, সৃষ্টির উপর যা ওয়াজিব করতে চান তা ওয়াজিব করেন। এভাবে আরো অন্যান্য বিধান ও ফয়সালাসমূহ। অতএব আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তোমরা তা হালাল হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়ে, আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন তা তোমরা হারাম হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়ে এবং আরো অন্যান্য যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন হে মুমিনরা! তোমরা সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তা ভঙ্গ করো না।

যেমন আমাদেরকে বর্ণনা করেছে .... কাতাদা, আল্লাহর বাণী **إن الله يحكم ما يريد** এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে যা চান তাই হুকুম করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সব বর্ণনা করে দিয়েছেন, তাঁর ফরযগুলোকে ফরয করে দিয়েছেন, তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাগুলো

চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তাঁর অনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।" তাফসীরে তাবারী, ৯/৩৬২

আয়াত ও তাফসীরের এই শব্দাবলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

﴿مَا يُرِيدُ، ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله، وتحريم ما أراد تحريمه، وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم، وفرض فرائضه، وحدَّ حدوده﴾

এর নাম হচ্ছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার লেজুড়বৃত্তির কোন সুযোগ নেই। বৈধ ও অবৈধের সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈধ বললে বৈধ হবে, আর অবৈধ বললে অবৈধ হবে মুসলমানদের জন্য এ সুযোগ রাখা হয়নি। এর নাম আল্লাহর হাকিমিয়্যাত নয়।

আয়াত ও তাফসীর

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ {سورة المائدة: ٢}

"হে মুমিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, হারাম মাসের, হারামে প্রেরিত কুরবানীর পশুর, গলায় চিহ্ন দেয়া পশুর এবং আপন রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে পবিত্র গৃহের অভিমুখীদের। যখন তোমরা হালাল হও, তখন শিকার কর। কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমলাঙ্ঘন করবে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।" -সূরা মায়েদা : ২

তাফসীরে তাবারী দেখুন

ইবনে জারীর রহ. شَعَائِرَ اللّٰهِ এর অনেকগুলো তাফসীর উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করার পর তিনি আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. এর তাফসীরটিকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। তার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাবারী রহ. এর বিস্তারিত আলোচনাটি নিম্নরূপ-

القول في تأويل قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}

﴿قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى قول الله: "لا تحلوا شعائر الله". فقال بعضهم معناه: لا تحلوا حُرُمات الله، ولا تتعدَّوا حدوده، كأنهم وجهوا "الشعائر" إلى المعالم، وتأولوا "لا تحلوا شعائر الله"، معالم حدود الله، وأمرَه ونهيَه وفرائضَه.

قال أبو جعفر: وأولى التأويلات بقوله: "لا تحلوا شعائر الله"، قول عطاء الذي ذكرناه من توجيهه معنى ذلك إلى: **لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا فرائضه.** لأن "الشعائر" جمع "شعيرة"، "والشعيرة" "فعيلة" من قول القائل: "قد شعر فلان بهذا الأمر"، إذا علم به. فـ"الشعائر"، المعالم من ذلك.

وإذا كان ذلك كذلك، كان معنى الكلام: لا تستحلوا أيها الذين آمنوا! معالم الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج: من تحريم ما حرَّم الله إصابته فيها على المحرم، وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حرَّم من استحلال حُرمات حَرَمه، وغير ذلك من حدوده وفرائضه، وحلاله وحرامه، لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أماراتٍ بين الحق والباطل، يُعْلَم بها حلالُه وحرامه، وأمره ونهيه. وإنما

قلنا ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى: "لا تحلوا شعائر الله"، **لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها نهيًا عامًّا، من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء**، فلم يَجُز لأحد أن يوجِّه معنى ذلك إلى الخصوص إلاَّ بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك كذلك﴾
{تفسير الطبري : ٩/٤٦٤}

"আল্লাহর বাণী يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ এর ব্যাখ্যা:

আবু জাফর বলেন, তাফসীরবিদগণ আল্লাহর বাণী **لا تحلوا شعائر الله** এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

তাদের কেউ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলোকে হালাল করো না এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো অতিক্রম করো না। যেন তাঁরা الشعائر শব্দটিকে المعالم এর অর্থে নিয়েছেন এবং **لا تحلوا شعائر الله** এর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর চিহ্নিত সীমারেখাগুলো, তাঁর আদেশ, তাঁর নিষেধ ও তাঁর ফরযগুলো দ্বারা।

আবু জাফর বলেন, আল্লাহর বাণী **لا تحلوا شعائر الله** এর ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে আতা রহ. এর ব্যাখ্যা। তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন, তোমরা আল্লাহর হারামগুলোকে হালাল করো না এবং তাঁর ফরযগুলোকে নষ্ট করো না।

কেননা الشعائر শব্দটি شعيرة এর বহুবচন। আর شعيرة শব্দটি فعيلة ওজনে। যেমন কেউ বলে قد شعر فلان بهذا الأمر যখন সে তা জানতে পারে। অতএব الشعائر হচ্ছে তার চিহ্নিত নিদর্শনাবলী।

বিষয়টি যখন এমনই, তখন বাক্যটির অর্থ হবে, হে মুমিনসকল! তোমরা আল্লাহর চিহ্নিত নিদর্শনগুলোকে উপেক্ষা করো না। তখন এর মধ্যে হজ্জের বিধানগুলোসহ আল্লাহর সকল নিদর্শনাবলী অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

যেমন আল্লাহ তাআলা মুহরিমের জন্য যা করাকে হারাম করেছেন এবং যা নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন তাকে হারাম মনে করা। এমনিভাবে তাঁর হারামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হালাল মনে করা থেকে বিরত থাকা। এমনিভাবে তাঁর বাতলানো সীমারেখাগুলো, তাঁর নির্দেশিত ফরয বিধানগুলো, তাঁর নির্দেশিত হালাল-হারামসমূহ। কেননা এগুলোর সবই তাঁর চিহ্নিত নিদর্শনাবলী যেগুলোকে তিনি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যরেখা হিসাবে বানিয়েছেন, যার দ্বারা তাঁর হালাল, হারাম, আদেশ ও নিষেধকে চেনা যায়।

এ ব্যাখ্যাটিকে আমি আল্লাহ তাআলার বাণী **لا تحلوا شعائر الله** এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বলেছি কারণ; আল্লাহ তাআলা তাঁর চিহ্নিত নিদর্শনাবলী ও সীমারেখাগুলোকে হালাল মনে করতে এবং হালাল বলে ঘোষণা করতে ব্যাপকভাবে নিষেধ করেছেন। এর মাঝে কিছুকে বাদ দিয়ে কিছুর জন্য বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়নি। অতএব কারো জন্য জায়েয হবে না যে, সে এ হুকুমটিকে বিশেষ কোন বিভাগের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে ফেলবে। করতে হলে এমন দলিল লাগবে যে দলিল মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়। তবে এর পক্ষে এমন দলিল নেই।" -তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী : ৯/৪৬৪।

তাফসীরের এই শব্দাবলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়–

﴿سئل عن "شعائر الله" فقال: حُرُمات الله، فذلك "شعائر الله"، لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا فرائضه﴾

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে হারামকে হালাল বলার সুযোগ নেই এবং সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ফরযকে অবহেলা করে ঐচ্ছিক বলার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়ার অর্থই হচ্ছে, হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব বিষয়ে কোন পরামর্শ হবে না। শুধু জেনে নিয়ে তার প্রয়োগ হবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত এবং আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের স্বীকৃতি।

আল্লাহকৃত হালাল-হারাম বিষয়ে পরামর্শ করতে বসে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে তার নতুন তালিকা তৈরি করা মানেই হচ্ছে আল্লাহর

হাকিমিয়্যাতকে অস্বীকার করা। এর জন্য বুক ফেঁড়ে দেখার কোন হুকুম শরীয়তের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। যাকাত দিতে যারা অস্বীকার করেছে সাহাবায়ে কেরাম তাদের বুক ফেঁড়ে দেখেননি। দেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তারা মনের খবর জানতে চাননি যে, তাদের মনে কী আছে। জানার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আয়াত ও তাফসীর

﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ {سورة الأنعام: ٦٢}

"তারপর তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাদের সত্য মাওলা আল্লাহর কাছে। সাবধান! হুকুম প্রদানের ক্ষমতা তাঁরই। আর তিনি হচ্ছেন খুব দ্রুত হিসাবকারী।" -সূরা আনআম ৬২

তাফসীরে তাবারী দেখুন

আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাবারী রহ. 'হুক্‌ম' ও 'হাকিমিয়্যাতে'র হাকীকত তুলে ধরেছেন।

القول في تأويل قوله: {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (٦٢)}

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ثم ردت الملائكة الذين توفَّوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى الله سيدهم الحق، "ألا له الحكم"، يقول: **ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه.** {تفسير الطبري: ١١/٤١٣}

"আল্লাহ তাআলার বাণী ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ" এর ব্যাখ্যা: আবু জাফর বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর যেসব ফেরশতা তাদেরকে মৃত্যু দিয়েছে এবং তাদের রূহ ও প্রাণ কবজ করেছে, তারা তাদের মহান মালিকের কাছে তা

পৌঁছে দিয়েছে। ألا له الحكم আল্লাহ বলছেন, জেনে রাখ! শাসন ও বিচার আল্লাহরই অধিকার, তাঁর সৃষ্টির কারো এ অধিকার নেই।" - তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী : ১১/৪১৩।

মুফাসসির রহ. এর এ বাক্যটির প্রতি একটু লক্ষ করুন ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه। এ আয়াতের الحكم শব্দটিই القضاء، حاكمية ও বিধানদাতার সমার্থবোধক শব্দ। এখানে কারো অংশীদারির কোন সুযোগ নেই। মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান ও মুসলমান বিচারপতি শুধুমাত্র হুকুম প্রয়োগ করবে। এর নাম হচ্ছে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে গ্রহণ করা, আল্লাহকে হাকেম হিসাবে মেনে নেয়া। এছাড়া আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে গ্রহণ করা বা এ ধরনের দাবি করার সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি নেই।

আয়াত ও হাদীসের আলোকে ফিকহের সিদ্ধান্ত

আদ্দুর্‌রুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার

কুরআন হাদীসের ন্যায় হাকিমিয়্যাতের হাকীকতের বর্ণনায় ফিকহের কিতাবাদির বক্তব্য একেবারে দ্বিধামুক্ত। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মূল স্তম্ভ বানানোর মানেই হচ্ছে, তাঁর বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীয়ত প্রয়োগ করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা। আর তাই এর সংজ্ঞা করা হয়েছে এভাবে-

হাকিমিয়্যাতে ইলাহীর পরিচয়

﴿وعرفها -أي الإمامة الكبرى- في المقاصد: بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم﴾ {رد المحتار: ٢٠٤/٤}

"মাকাসেদ কিতাবে এর -ইমামতে কুবরা বা রাষ্ট্র পরিচালনা- পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে যে, তা হাচ্ছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে ইহকালীন পরকালীন সর্ব বিষয়ে ব্যাপক নেতৃত্ব।" -আদ্দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : ৪/২০৪।

হাকিমিয়্যাতে ইলাহীর দায়িত্ব

এর দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তানো হয়েছে এভাবে-

﴿والمسلمون لا بد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم؛ وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم؛ وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق؛ وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم﴾ {رد المحتار : ٤/٢٠٥}

"মুসলমানদের এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধান ইমাম আবশ্যক যিনি তাদের মাঝে বিধানাবলি বাস্তবায়ন করবেন, দণ্ডবিধান করবেন, তাদের সীমান্ত রক্ষা করবেন, তাদের বাহিনী প্রস্তুত করবেন, তাদের থেকে যাকাত উসূল করবেন, জালেম, ছিনতাইকারী ও চোর ডাকাত দমন করবেন, জুমা ও ঈদের নামায কায়েম করবেন, মানুষদের হকের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, যে সকল শিশু ছেলে মেয়েদের অভিভাবক নেই তাদের বিবাহ শাদি দেয়া ও গনিমতের মাল বণ্টন।" -আদ্দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : ৪/২০৫

হাকিমিয়্যাতে ইলাহীর গুণাগুণ

হকিমিয়্যাতে ইলাহীর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

﴿وقوله قادرا: أي على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم، وسد الثغور؛ وحماية البيضة وحفظ حدود الإسلام؛ وجر العساكر﴾ {رد المحتار : ٤/٢٠٥}

"তাঁর কথা (قادرا) অর্থাৎ বিধান বাস্তবায়ন, যালেমের বিষয়ে মাযলুমের সাথে ইনসাফ, সীমান্ত রক্ষা, ইসলামের সঠিক পরিচয়ের সংরক্ষণ, ইসলামের সীমারেখাগুলো হেফাযত এবং সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।" -আদ্দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : ৪/২০৫

এবার বিস্তারিত

এবার আদদুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতারের বক্তব্য থেকে বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেখুন। রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে

কীভাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এবং কীভাবে পরিচালনা করলে তাকে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের প্রতিষ্ঠা বলা হবে তা বিস্তারিত দেখুন-

باب الإمامة :

﴿فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام، وتحقيقه في علم الكلام، ونصبه أهم الواجبات، فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات: ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا، قرشيا لا هاشميا علويا، معصوما﴾ {رد المحتار : ٢٠٣/٤}

{رد المحتار}

مطلب شروط الإمامة الكبرى

﴿قوله فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام) أي على الخلق، وهو متعلق بتصرف لا باستحقاق لأن المستحق عليهم طاعة الإمام لا تصرفه، ولا بعام إذ المتعارف أن يقال عام بكذا لا عليه. وعرفها في المقاصد بأنها **رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم** لتخرج النبوة، لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة لأنها بعثة بشرع كما يعلم من تعريف النبي، واستحقاق النبي التصرف العام إمامة مترتبة على النبوة، فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه أعني النبوة، وخرج بقيد العموم مثل القضاء والإمارة.

ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف، إذ معنى نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق عبر بالاستحقاق، كذا أفاده العلامة الكمال ابن أبي شريف في شرحه على كتاب المسايرة لشيخه المحقق الكمال ابن الهمام. (قوله ونصبه)

أي الإمام المفهوم من المقام. (قوله أهم الواجبات) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه، ولذا قال في العقائد النسفية: **والمسلمون لا بد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم؛ وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم؛ وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق؛ وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم** اهـ (قوله فلذا قدموه إلخ) فإنه -صلى الله عليه وسلم- توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب، وهذه السنة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى يولى غيره ط. (قوله ويشترط كونه مسلما إلخ) أي لأن الكافر لا يلي على المسلم؛ ولأن العبد لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له الولاية على غيره؟ والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة ومثله الصبي والمجنون ولأن النساء أمرن بالقرار في البيوت، فكان مبنى حالهن على الستر.

وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال «كيف يفلح قوم تملكهم امرأة» **وقوله قادرا: أي على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم، وسد الثغور؛ وحماية البيضة وحفظ حدود الإسلام؛ وجر العساكر﴾** {رد المحتار: ٢٠٤/٤}

এটা হচ্ছে হাকিমিয়্যাত। আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শরীয়াহ তথা কুরআন সুন্নাহকে মূল স্তম্ভ বানানো। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দরবারে ধর্ণা দেয়ার সঙ্গে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের কী সম্পর্ক? তাগুতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার সাথে আল্লাহ

জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাত মেনে নেয়ার কী সম্পর্ক? এ তো কাগজের ফুলও নয়, পানির উপর অঙ্কিত প্রাসাদও নয়।

তাগুতের আদালত ও আল্লাহর হাকিমিয়্যাত

তাগুতের আদালত ও আল্লাহর হাকিমিয়্যাত দুই মেরুতে অবস্থিত স্পষ্ট দু'টি বিষয়। এর মাঝে হ-য-ব-র-ল হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। এর পরও যুগে যুগে দু'টির মাঝে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনো চলছে। তবে কুরআনের সতর্ক সংকেত লঙ্ঘন করার কোন সুযোগ নেই-

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ {سورة النساء: ٦٠}

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।" -সূরা নিসা ৬০

শায়খে মুহতারাম কি দাবি করতে পারবেন যে, পাকিস্তানের সংবিধান ও আইন ইউরোপ আমেরিকার আইনের আলোকে তৈরিকৃত নয়? শায়খে মুহতারাম কি দাবি করতে পারবেন যে, পাকিস্তানের সংবিধান ও আইন বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম আইন থেকে গৃহীত নয়? শায়খে মুহাতারাম কি দাবি করতে পারবেন যে, পাকিস্তানের আদালতের বিচারকরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহের কিতাবাদি দেখে দেখে মামলার রায় ঘোষণা করেন? শায়খে মুহতারাম কি দাবি করতে পারবেন যে, পাকিস্তান-সংবিধান ও আইনের শত শত আইন যে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী তা আইনপ্রণেতারা জানে না? শায়খে মুহতারাম কি দাবি করতে পারবেন যে, সংসদ সদস্যরা না জানার কারণে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরির পক্ষে ভোট দিচ্ছে? প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকার না জেনে কুরআন সুন্নাহ বিরোধি আইন পাস করছে? শায়খে মুহতারাম কি

দাবি করতে পারবেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বীর পুরুষ ওলামায়ে কেরাম ইসলামী আইন বাস্তবায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন? শায়খে মুহতারাম কি দাবি করতে পারবেন যে, আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী রহ. সহ শত সহস্র ওলমায়ে কেরামের শরীয়া বাস্তবায়নের আন্দোলনে, দাবিতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা, দুর্বলতা, অবহেলা, অনুভূতিহীনতা ও গাফলত ছিল?

শায়খে মুহতারাম যদি এমন দাবি করতে না পারেন, তাহলে এ আদালত কি তাগুতের আদালত নয়? এ ক্ষমতা কি তাগুতের ক্ষমতা নয়? এ আদালতে মামলা দায়ের কি التحاكم إلى الطاغوت নয়? এ ক্ষমতা, এ সংবিধান ও এ আদালত আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে কীভাবে স্বীকার করেছে? শায়খে মুহতারাম তাঁর 'তাওযীহুল কুরআনে' এ আয়াতের অধীনে তাগুতের যে ব্যাখ্যা করেছেন সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাকিস্তানের আদালত তাগুতের আদালত হওয়ার বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। শায়খে মুহতারামের পক্ষ থেকে সন্দেহের কী কী কারণ থাকতে পারে?

এরপরও পাকিস্তানের সংবিধান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মূল স্তম্ভ বানিয়েছে বলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে?

তাওযীহুল কুরআনের উদ্ধৃতি দেখুন-

"'তাগুত' এর শাব্দিক অর্থ 'ঘোর অবাধ্য'। কিন্তু এ শব্দটি শয়তানের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং বাতিল ও মিথ্যার জন্যও। এ স্থলে শব্দটি দ্বারা এমন বিচারক ও শাসককে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলীর বিপরীতে নিজের খেয়াল-খুশী মত ফায়সালা দেয়। আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিধানাবলীর উপর অন্য কোনও বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে মুসলিম থাকতে পারে না।" -তাওযীহুল কুরআন ১/৩০২

ঈমান সবার আগে'র উদ্ধৃতি দেখুন-

'যারা শরীয়তের শুধু 'শান্তির বিধান গ্রহণ করেন আর জিহাদের বিধানকে সন্ত্রাস বা উগ্রবাদিতা বলেন; উপদেশের কথাগুলো গ্রহণ করেন আর হদ-তাযীর ও কিসাসের বিধান বর্জনীয় মনে করেন; ইবাদতের বিষয়গুলো

গ্রহণ করেন আর লেনদেন ও হালাল-হারামের বিধান মানতে অসম্মত থাকেন; ব্যক্তিগত জীবনের বিধিবিধান গ্রহণ করেন, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার বিধি-বিধান (প্রশাসন, নির্বাহী ও বিচার-বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কে বিরূপ থাকেন; অথবা ইবাদত ও লেনদেনের বিধান মানেন, কিন্তু বেশ-ভূষা, আনন্দ-বিষাদ, পর্ব-উৎসব ও জীবন যাপনের আদব কায়েদার ইসলামী নির্দেশ ও নির্দেশনার প্রতি বিরূপ থাকেন বা মানাকে জরুরী মনে করেন না, এরা সবাই ইসলামের কিছু অংশের অস্বীকার বা কিছু অংশের উপর বিরুদ্ধপ্রশ্নের কারণে নিজের ঈমান হারিয়ে বসেছেন।' -ঈমান সবার আগে পৃ: ৩১

'প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগূত ব্যক্তি বা দলের বানানো আইন-কানুন হচ্ছে সত্য দ্বীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন 'ধর্ম', যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর সাথে তাগূতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, তদ্রূপ আল্লাহর দ্বীনের মোকাবেলায় বা তার সাথে তাগূতের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা সরাসরি কুফর ও শিরক। তাগূত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফিকী।' -ঈমান সবার আগে ৭৩-৭৪

ঈমান ও কুফরের সমন্বয় পদ্ধতি

এমতাবস্থায় তাগুতের সংবিধানে ও তাগুতের আদালতে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়ার পদ্ধতি কী? এর পদ্ধতি হতে পারে কয়েকটি যা কুরআনে বিবৃত হয়েছে। যথা:

এক. ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে ঠাট্টা

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ {سورة البقرة: ١٤}

"আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।" -সূরা বাকারা ১৪

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

দুই. ঈমানের অভিনয়

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
{سورة البقرة: ٧٦}

"যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একে অপরের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি তাদের সঙ্গে সে কথা আলোচনা কর যা আল্লাহ তোমাদের কাছে উম্মুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে কি তোমরা বোঝ না?" -সূরা বাকারা ৭৬

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

তিন. কিছু ঈমান কিছু কুফর

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ {سورة البقرة: ٨٥}

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কেয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন।" -সূরা বাকারা ৮৫

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

চার. আল্লাহ ও মুমিনদের ধোঁকা দেয়া

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ {سورة البقرة: ٨-١٢}

"আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি; অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না। তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বোঝে না।" -সূরা বাকারা ৮-১২

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

পাঁচ. তাগূতের প্রতি আস্থাসহ ঈমান

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ {سورة النساء: ٦٠}

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।" -সূরা নিসা ৬০

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

ছয়. বরাদ্দ সমান, বণ্টনে সমস্যা

﴿فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ {سورة الأنعام: ١٣٤}

"অতঃপর তাদের ধারণা অনুসারে তারা বলে, এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের শরিকদের জন্য। অতঃপর যা তাদের শরীকদের জন্য তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, আর যা আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে যায়। তারা যে ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ!" -সূরা আনআম ১৩৪

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

সাত. ঈমানের স্বার্থে শিরক

﴿عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لاشريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد! فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت﴾ {مسلم : رقم الحديث: ١١٨٥}

"ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুশরিকরা বলতো, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ধ্বংস তোমাদের জন্য, থাম থাম। তখন তারা বলত, ইল্লা শারীকান হুয়া লাকা তামলিকুহু ওয়ামা মালাক। তারা এটা বলত আর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে থাকত।" -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৮৫

এটি একটি অপূর্ব সমন্বয় এবং সুস্পষ্ট কুফর। এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

আট. ঈমান কুফর খেলা

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ {سورة آل عمران: ٧٢-٧٣}

"আর কিতাবীদের এক দল বলে, মুমিনদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ঈমান আন, আর তার শেষ ভাগে কুফরী কর; যাতে তারা ফিরে আসে। আর তোমরা কেবল তাদেরকে

বিশ্বাস কর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে।" -সূরা আল ইমরান ৭২-৭৩

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

নয়. মধ্যমপন্থী ঈমানদার

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. {سورة النساء: ١٥٠-١٥١}

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি। আর তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়।" -সূরা নিসা ১৫০-১৫১

এ সমন্বয় আছে। চলমান অবস্থায় আছে।

দশ. সত্যের যতটুকু মনোবৃত্তি পূরণ করে

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ {سورة المؤمنون: ٦٩-٧١}

"নাকি তারা তাদের রাসূলকে চিনতে পারেনি, ফলে তারা তাকে অস্বীকার করছে? নাকি তারা বলছে যে, তার মধ্যে কোন পাগলামী রয়েছে? না, বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে, আর তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। আর সত্য যদি তাদের মনস্কামনার অনুগামী হত, তবে আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের

উপদেশবাণী। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।" -সূরা আল-মুমিনূন ৬৯

এ দলটিও এখন অনেক ভারি। কিন্তু অপরাপর কাফেরদের মত এদেরকেও আমরা চিনতে পারছি না। যারা তাদের মনষ্কামনার অনুগামী শরীয়তের বিধানগুলোর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে।

তবে এগুলোর একটিও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে গ্রহণ করা নয়। এগুলোর প্রত্যেকটিই কুফর।

ইমানের কুফরমুক্ত পদ্ধতি

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাত হচ্ছে-

এক. মনোবৃত্তি শতভাগ পদদলিত

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ {سورة الرعد: ٣٧}

"আর এভাবেই আমি কুরআনকে বিধানস্বরূপ আরবীতে নাযিল করেছি। তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর, আল্লাহ ছাড়া তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী নেই।" -সূরা রাদ ৩৭

গণতান্ত্রিক মানবিক খায়েশের অনুসরণ করার কোন সুযোগ নেই।

দুই. ঈমানের বিপরীতে কোন এখতিয়ার নেই

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ {سورة الأحزاب: ٣٦}

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" -সূরা আহযাব ৩৬

শরয়ী আইনের উপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ কোন আইনের কোন প্রকার অনুসরণের কোন বৈধতা নেই। এ ক্ষেত্রে কারো কোন এখতিয়ার নেই।

তিন. অমুসলিমের কাছে কোন কামনা নেই

﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ {سورة البقرة: ١٢٠}

"আর ইহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত। আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।" -সূরা বাকারা ১২০

একজন মুসলিম তার ঈমানের যতটুকু বিক্রয় করে দেবে অমুসলিম ততটুকু পরিমাণই তার উপর সন্তুষ্ট হবে।

চার. কুরআনের অনুসরণের কোন বিকল্প নেই

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ {سورة المائدة: ٤٨}

"আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা

এবং আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তোমাদেরকে এক উম্মত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।" -সূরা মায়েদাহ ৪৮

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যাই চাইবে তারই অনুসরণ করা যাবে না।

পাঁচ. কুরআনের একটি বিষয়েও সমঝোতার সুযোগ নেই

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ {سورة المائدة: ٤٩-٥٠}

"আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসেক। তারা কি তবে জাহেলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" -সূরা মায়েদাহ ৪৯-৫০

আল্লাহ প্রদত্ত আইনের সামান্য কিছু থেকেও বিমুখ হওয়ার সুযোগ নেই। তবে সামান্য কিছু থেকেও বিচ্যুত করার জন্যও শয়তান ও কাফেররা আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে।

ছয়. গায়রুল্লাহর অনুসরণ মানেই অন্ধকার

﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ {سورة البقرة: ١٤٥}

"আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তবে নিশ্চয় তুমি তখন যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।" -সূরা বাকারা ১৪৫

গণতান্ত্রিক মনস্কামনার অনুসরণ করলে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

সাত. জাহালাতের অনুসরণ বাঁচাতে পারবে না

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ {سورة الجاثية: ١٨-١٩}

"অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। তারা আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় যালিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।" -সূরা জাসিয়া ১৮-১৯

গণতান্ত্রিক মানব রচিত মনস্কামনার সমষ্টি হচ্ছে একটি মূর্খতাসমগ্র। এর কাছে মুসলমানের পাওয়ার মত কিছুই নেই। এক মূর্খ আরেক মূর্খের কাছে অনেক মূর্খতা পেতে পারে, কিন্তু মুসলমান তা গ্রহণ করলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

আট. দ্বিধামুক্ত ঈমান লাগবে

﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ {سورة الأعراف: ٢-٣}

"এটি কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মন যেন কোন সংকীর্ণতায় না থাকে। যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর

এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।" -সূরা আরাফ ২-৩

জীবন চলার পথে প্রতিটি পর্বে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানই মেনে চলতে হবে। তাঁকে ছেড়ে আর কোন বিন্দুতে কারো অনুসরণ করা যাবে না। হোক সে বিধানদাতা তিনশত/ছয়শত বা আরো বেশি।

নয়. ঈমানের ধারা অভিন্ন

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ {سورة النساء: ١٥٢}

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করেনি তাদেরকে অচিরেই তিনি তাদের প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -সূরা নিসা ১৫২

আল্লাহর সর্বকালের বিধানের কোথাও কোন বৈপরীত্য নেই। প্রত্যেক নবীর আহ্বান এক, দাওয়াত এক, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-গন্তব্য এক। যে মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে একমাত্র দ্বীন বলে গ্রহণ করেনি সে মূলত কোন নবীকেই মানেনি, সে সকল নবীকে অস্বীকার করেছে। তাই মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম অস্বীকার করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা মানে সকল সত্য ধর্মকে অস্বীকার করা।

দশ. পূর্ণাঙ্গ ঈমানই ঈমান

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ {سورة البقرة: ٢٠٨-٢٠٩}

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু। অতএব তোমরা যদি পদস্খলিত হও, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" -সূরা বাকারা ২০৮-২০৯

কুরআন সুন্নাহর অনুসরণের বাইরে জীবনের কোন অঙ্গন নেই। আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিবেচনায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন ভিন্নতা নেই। অতএব গণতন্ত্রের মনস্কামনার কাছে নিজের আকীদা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভক্তিকে জমা রেখে ইসলামে প্রবেশ করারও সুযোগ নেই।

বাদা-ইউস সানায়ে

আল্লাহর হাকিমিয়্যাত কাকে বলে এবং এর হাকীকত কী তা অনুধাবন করার জন্য ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'বাদাইউস সানায়ে' এর বক্তব্যের দৃঢ়তা দেখুন-

﴿والحديث محمول على القاضي الجاهل، أو العالم الفاسق، أو الطالب الذي لا يأمن على نفسه الرشوة، فيخاف أن يميل إليها، توفيقا بين الدلائل، هذا إذا كان في البلد عدد يصلحون للقضاء، فأما إذا كان لم يصلح له إلا رجل واحد؛ فإنه يفترض عليه القبول إذا عرض عليه، لأنه إذا لم يصلح له غيره، تعين هو **لإقامة هذه العبادة**، فصار فرض عين عليه، إلا أنه لا بد من التقليد، فإذا قلد افترض عليه القبول على وجه لو امتنع من القبول يأثم، كما في سائر فروض الأعيان. والله - سبحانه وتعالى- أعلم﴾ {بدائع الصنائع : ٤١٢/١٤}

"...... হাদীসটি মূর্খ বিচারপতি বা ফাসেক আলেমের ক্ষেত্রে। অথবা ঐ পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে যে ঘুষ গ্রহণের ব্যাপারে নিজের উপর আস্থাশীল নয়। ফলে সে ঐ দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। এর দ্বারা দলিলগুলোর পরস্পরে সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে। আর তা তখন প্রযোজ্য যখন শহরে একাধিক ব্যক্তি এমন থাকবে যাদের প্রত্যেকে বিচারপতি হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু যদি একজন ব্যতীত উপযুক্ত আর কোন লোক না থাকে তাহলে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করা তার জন্য ফরয হয়ে যাবে। কেননা যখন সে ব্যতীত উপযুক্ত আর কেউ থাকবে না তখন এ ইবাদতটি আদায় করার জন্য সেই নির্ধারিত হয়ে যাবে। তখন তার উপর এ দায়িত্ব গ্রহণ করা ফরযে আইন হয়ে যাবে। তবে তার জন্য তাকলীদ আবশ্যক।

সুতরাং সে যখন তাকলীদ করবে তার তা গ্রহণ করা এমনভাবে ফরয হয়ে যাবে যে, সে যদি গ্রহণ করতে বিরত থাকে তাহলে সে গুনাহগার হবে। যেমন হয়ে থাকে সব ধরনের ফরয়ে আইনের ক্ষেত্রে ...।" -বাদা-ইউস সানায়ে : ১৪/৪১২

তাই তা ইবাদত

সুতরাং আল্লাহর হাকিমিয়্যাত মানেই আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ-বিধিবিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ। শরীয়ার বাস্তবায়ন ছাড়া এখানে শাসক ও বিচারকের আর কোন কাজ নেই। আল্লাহর হাকিমিয়্যার আর কোন অর্থ নেই। এ জন্যই তা এক পর্যায়ে এসে ফরযে আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসান্নিফের ভাষায় এটা ইবাদত, এটা ফরযে আইন। এ দায়িত্ব গ্রহণ না করলে গুনাহগার হবে। আল্লাহু আকবার!!

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাত বাস্তবায়ন একটি ফরয দায়িত্ব। দায়িত্বটি এ পর্যায়ের ফরয দায়িত্ব যে, তা পালন করার মত কাউকে না পাওয়া গেলে যাকে পাওয়া যাবে তাকে এ দায়িত্ব পালন করার জন্য বাধ্য করা যাবে। তাঁর পক্ষ থেকে কাযার এ দায়িত্ব পালন কোন না কোন মুসলমানকে করতেই হবে। এখানে আবেগী শব্দের কোন স্থান নেই। সোনালী রূপালী কথার কোন বৈধতা নেই।

এ ফরয দায়িত্ব দারুল ইসলামে আলাদা শরীয়া বেঞ্চ তৈরি করে আদায় হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ হাকিমিয়্যাত কখনো গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রাসাদে প্রয়োগ করার বিষয় নয়। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঝাড়ুপেটা করার আগ পর্যন্ত এ হাকিমিয়্যাতের কল্পনাই করা যায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে পদদলিত করার আগ পর্যন্ত আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের কোন চিন্তাই করা যায় না।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রাসাদে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়া হয়েছে -এমন নির্জলা মিথ্যা কথা বিশ্বাস করার মত সময় আর রয়নি। এসব মিথ্যা ও ধোঁকার বয়স এখন অনেক। এর শুরু শেষ দেখার মত মুসলমানের সংখ্যাও এখন অনেক। তাই

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ {سورة البقرة: ٨٥}

আয়াতে যাদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণের কোন প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অনুসারী শাসকবর্গ তাদের স্বার্থের জন্য আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু আমরা ও আমাদের কর্ণধারগণ সে ধোঁকায় পড়তে পারেন না। যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তারা নির্জলা মিথ্যা বলতে পারে, দলিল ও বাস্তবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এ মিথ্যাকে আমরা ও আমাদের অগ্রপথিকগণ বিশ্বাস করতে পারেন না। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রাসাদের অধিপতিরা নির্জলা মিথ্যা বলতে পারে, ধোঁকা দিতে পারে, কারণ এটাই তাদের পুঁজি। কিন্তু তাই বলে আমরা সে মিথ্যা ধোঁকা খেতে পারি না, রাসূলে আরাবীর উম্মত সে ধোঁকা খেতে পারে না, উম্মতের অগ্রপথিক কর্ণধারগণ সে ধোঁকা খেতে পারেন না।

আততাশরীউল জিনাঈ

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক মানবরচিত আইন একটি কুফরী আইন। গণতান্ত্রিক সংবিধান একটি কুফরী সংবিধান। শরয়ী বিধানকে অপসারিত করে মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এ সকল আয়োজন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের কর্ণধার দাবি করছেন, মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনের মূল স্তম্ভ বানানো হয়েছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রজন্ম সে কথাগুলো বিশ্বাস করতে ও মানতে বাধ্য হচ্ছে।

অথচ 'আততাশরীউল জিনাঈ'র বক্তব্য দেখুন-

ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر بالامتناع فى عصرنا الحاضر الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلاً منها، والأصل فى الإسلام أن الحكم بما أنزل الله واجب وأن

الحكم بغير ما أنزل الله محرم، ونصوص القرآن صريحة وقاطعة في هذه المسألة. فالله جل شأنه يقول:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ} [يوسف:٤٠]، ويقول: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة:٤٧]، ويقول: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة:٤٥]، ويقول : {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:٤٤]، ويقول: {اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف:٣]، ويقول: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الجاثية:١٨]، ويقول: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص:٥٠]، ويقول: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة:٤٨]، وقوله: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران:٨٣]، وقوله: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران:٨٥]. {التشريع الجنائي في الاسلام: ٢٨٢/٤}

"কবুল না করে বিরত থাকার কুফরের স্পষ্ট উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে, আমাদের বর্তমান যামানায় ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করা থেকে বিরত থাকা এবং এর স্থলে মানবরচিত আইনের বাস্তবায়ন

করা। ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহকর্তৃক অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করা ওয়াজিব, আর আল্লাহ যা নাযিল করেননি তা অনুযায়ী বিচার করা হারাম। এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্যসমূহ স্পষ্ট ও অকাট্য। যেমন দেখুন আল্লাহ তাআলা বলেন-

"বিধান একমাত্র আল্লাহরই।" (ইউসুফ ৪০) এবং তিনি বলেন, "আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।" (মায়েদা ৪৭) এবং তিনি বলেন, "আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করে না তারাই যালিম।" (মায়েদা ৪৫) এবং তিনি বলেন, "আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।" (মায়েদা ৪৪) এবং তিনি বলেন, "তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।" (আরাফ ৩) এবং তিনি বলেন, "অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।" (জাসিয়াহ ১৮) এবং তিনি বলেন, "অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিক নির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না।" (কাসাস ৫০) এবং তিনি বলেন, "আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা।" (মায়েদা ৪৮) এবং তাঁর বাণী, "তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।" (আল ইমরান ৮৩) এবং তাঁর বাণী, "আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন

দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মায়েদা ৮৫)

-আততাশরীউল জিনাঈ ফিল ইসলাম : ৪/২৮২

মানবরচিত গণতান্ত্রিক কুফরী আইন কুফরী হওয়ার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই। এর অবস্থান এক মেরুতে। আর যে আইনের ভিত্তি আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর তার অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এরপরও দাবি করা হচ্ছে, মানবরচিত গণতান্ত্রিক কুফরী আইনের মূল ভিত্তি রাখা হয়েছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর।

ফিকহের সিদ্ধান্তের আলোকে সমকালীন ফাতওয়া

মানবরচিত গণতান্ত্রিক কুফরী আইন ও আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের সমন্বিত কোন রূপ নেই এ বিষয়টি সমকালীন ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে এবং সমকালীন বিভিন্ন ফাতাওয়ায় এ পার্থক্যরেখা বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে । যারা এখনও বিপরীত দু'টি বিষয়কে সমন্বয় করার চেষ্টা করছেন এবং যারা মনে করছেন, মানবরচিত গণতান্ত্রিক কুফরী আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করা সম্ভব, তারা এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সমকালীন সিদ্ধান্তের কয়েকটি উদাহরণ দেখুন-

আশশাইখ আহমাদ শাকের (মৃ: ১৩৭৭ হি:)

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه.

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.

سيقول عني عبيد هذ "الياسق العصري" وناصروه: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوماً ما

بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. (عمدة التفسير لأحمد شاكر ٦٩٧/١).

"এ সকল মানবরচিত আইনের বিষয়টি সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, আর তা হচ্ছে 'কুফরে বাওয়াহ'-প্রকাশ্য কুফর। যার ব্যাপারে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই, তার সঙ্গে চলার কোনো সুযোগ নেই এবং কোনো মুসলমান দাবিদারের জন্য -সে যেই হোক না কেনো- সেটি বাস্তবায়ন করা, তার সামনে আত্মসমর্পন করা ও তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের 'ওযর' গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রত্যেকে যেনো সতর্ক হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের রক্ষক।
উলামায়ে কেরাম যেনো নির্ভয়ে সত্যকে প্রকাশ করে। যে সকল বিষয় পৌঁছানোর ব্যাপারে তারা আদিষ্ট তা যেনো কোনো ধরনের ত্রুটি ও অবহেলাবিহীন পৌঁছিয়ে দেয়। বর্তমান যুগের 'ইয়াসাক'র অনুসারী ও সাহায্যকারীরা আমাকে গোঁড়া, পশ্চাদমুখী জাতীয় বহু কথা বলবে। তাদের যা ইচ্ছে তাই বলুক। আমার ব্যাপারে কী বলা হলো আমি সেটির তোয়াক্কা কোনোদিন করিনি। যা বলা আমার জন্য অপরিহার্য তা আমি বলেই দিয়েছি।" (উমদাতুত তাফসির ১/৬৯৭)।

আশশাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ (মৃ: ১৩৮৯ হি:)

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته "تحكيم القوانين" - وهو يعد الأحوال التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر-: "الخامس": وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع مستمدات.

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع،

هي: القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، **فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة.** (فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ١٢/٢٨٩).

"আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে বিচার করা যে সকল অবস্থায় 'কুফরে আকবর' হিসেবে সাব্যস্ত হয়, সেগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ তাঁর 'তাহকিমুল কাওয়ানিন' নামক রিসালায় বলেন-

পাঁচ. আর তা প্রস্তুতি, উপকরণ ও পরিকল্পনা, মূল ও শাখা, রূপায়ণ ও শ্রেণিবিন্যাস, কর্তৃত্ব ও বাধ্যকরণ এবং গৃহীত সূত্রের দিক থেকে শরিআতের অবাধ্যতা, ইসলামি বিধি-বিধানের সঙ্গে হটকারিতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা এবং শরয়ি আদালতের সমকক্ষতা স্থাপনের ক্ষেত্রে (কুফরে আকবরের) সবচেয়ে বৃহৎ, ব্যাপক ও স্পষ্ট প্রকার।

যেমনিভাবে শরয়ি আদালতের বিভিন্ন গৃহীত বিষয় ও উদ্ধৃতিসূত্র আছে, যার সবকটিই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে আহরিত, তেমনিভাবে এ সকল আদালতেরও উদ্ধৃতিসূত্র রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বিভিন্ন রহিত শরিআত, ফরাসি, মার্কিন ও বৃটিশ ইত্যাদি আইনসহ অন্যান্য বহু বিধি-বিধান এবং শরিআতের দিকে সম্বন্ধকরা বিভিন্ন বিদআতির মতবাদ ইত্যাদির সমন্বয়ে রচিত আইন। এ আদালতই বর্তমানে বহু মুসলিম রাষ্ট্রে দ্বার উন্মোচন করে পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত হয়ে আছে, আর মানুষ দলে দলে সেদিকে ছুটে

চলছে। এই আদালতের বিচারকরা মানুষদের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের বিপরীতে ওই আইনের নীতি অনুসারে বিচার করে, সে অনুযায়ী চলতে তাদেরকে বাধ্য করে, সেটির উপর তাদেরকে ধরে রাখে এবং তা তাদের জন্য আবশ্যকীয় করে দেয়। **তো এই কুফরের চেয়ে মারাত্মক কুফর আর কী হতে পারে এবং এই বৈপরিত্যের পর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের সঙ্গে আর কোন বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে!"** (ফাতাওয়া ওয়ারাসায়েল ১২/২৮৯)।

আশশাইখ মুহাম্মাদ আলআমিন আশশানকিতি (মৃ: ১৩৯৩ হি:)

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، **أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.** (أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي ٤/١٠٩).

"উপর্যুক্ত 'নুসুসে'র আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যারা শয়তান কর্তৃক তার চেলা-চামুণ্ডাদের মাধ্যমে প্রণীত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে প্রদত্ত শরিআতের সম্পূর্ন বিপরীত। **মানবরচিত আইনের অনুসারীদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে একমাত্র সে ব্যক্তিই সংশয় প্রকাশ করে, তাদের ন্যায় আল্লাহ তাআলা যার অন্তর্দৃষ্টি বিলুপ্ত করেছেন এবং নুরে ওহির ব্যাপারে দৃষ্টিহীন করে দিয়েছেন।"** (আযওয়াউল বায়ান ৪/১০৯)।

আদদুরারুস সানিয়্যাহ

﴿في تفسيره: أن من فعل ذلك فهو كافر بالله، زاد ابن كثير: يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله.

قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر؛ ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه

هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل؛ وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينْزلها الله، كسوالف البوادي، وكأوامر المطاعين في عشائرهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به، دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر.

فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية، التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار، انتهى﴾ {الدرر السنية في الكتب النجدية : ٤/١٤}

"... যে এমন কাজ করবে সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী। ইবনে কাসীর আরো বলেছেন, তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের দিকে ফিরে আসে।

শায়খুল ইসলাম বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তা অনুযায়ী বিচার করাকে যে ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করে না সে কাফের -এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর যে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ না করে নিজের মতামতনির্ভর ইনসাফের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে বিচার করাকে হালাল মনে করে সে কাফের। কেননা প্রত্যেক জাতিই ইনসাফভিত্তিক বিচারের আদেশ করে, কখনো কখনো তাদের ধর্মে ইনসাফ হিসেবে তাই বিবেচ্য হয় যাকে তাদের বড়রা ইনসাফ মনে করে। বরং ইসলামের বহু দাবিদাররা তাদের সেসব প্রথা অনুযায়ী ফায়সালা করে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। যেমন আদি গ্রাম্য সালিশ, সমাজপতিদের আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি। তারা মনে করে এর আলোকেই বিচার করা উচিত, কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে নয়। আর এটাই হচ্ছে কুফর।

কেননা বহু মানুষই ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু এরপরও তারা সমাজপতিদের আদেশে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ীই বিচার করে। এসব লোকেরা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা

ব্যতীত অন্যভাবে বিচার করা জায়েয নেই, কিন্তু এরপরও তারা আল্লাহর বিধানকে জরুরীভাবে গ্রহণ করেনি; বরং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের স্থলে অন্য বিধান দিয়ে বিচার করাকে হালাল মনে করে তাহলে তারা কাফের।" -আদদুরারুস সানিয়্যাহ ফিল কুতুবিন নাজদিয়্যাহ : ৪/১৪

ফাতাওয়াল ইসলাম

١١٣٠٩

كفر من يحكّم القوانين الوضعية

العقيدة > الشرك وأنواعه >

سؤال رقم ١١٣٠٩- كفر من يحكّم القوانين الوضعية

﴿تارك الحكم بما أنزل الله إذا جعل القضاء عامة بالقوانين الوضعية هل يكفر؟ وهل يفرق بينه وبين من يقضي بالشرع ثم يحكم في بعض القضايا بما يخالف الشرع لهوى أو رشوة ونحو ذلك ؟﴾

﴿الحمد لله أي نعم، التفرقة واجبة، فرق بين من نبذ حكم الله جل وعلا واطرحه واستعاض به حكم القوانين وحكم الرجال، فإن هذا يكون كفراً مخرجاً من الملة الإسلامية، وأما من كان ملتزماً بالدين الإسلامي إلا أنه عاص ظالم بحيث أنه يتبع هواه في بعض الأحكام ويتبع مصلحة دنيوية مع إقراره بأنه ظالم في هذا، فإن هذا لا يكون كفراً مخرجاً من الملة.

ومن يرى أن الحكم بالقوانين مثل الحكم في الشرع ويستحله فإنه يكفر أيضاً كفراً مخرجاً من الملة، ولو في قضية واحدة﴾

الشيخ عبد الله الغنيمان.

{فتاوى الإسلام : ٤٨٤/١}

"১১৩০৯

মানবরচিত আইনকে বিচারক হিসাবে গ্রহণকারীর কুফর

আলআকীদা > শিরক ও তার প্রকারসমূহ >

প্রশ্ন নম্বর ১১৩০৯- মানবরচিত আইনকে বিচারক হিসাবে গ্রহণকারীর কুফর

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিচার পরিহার করে সে যদি সাধারণ বিচার ব্যবস্থাই রাখে মানবরচিত আইন দ্বারা তাহলে সে কি কাফের হবে? যে মানবরচিত আইনকে বিচার ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে আর যে শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করে তবে কখনো কখনো মনস্কামনাবশত বা ঘুষের কারণে বা অন্য কোন কারণে শরীয়তবিরোধী ফায়সালা করে -এ দুয়ের হুকুমের মাঝে কি পার্থক্য করা হবে?

আলহামদু লিল্লাহ, হ্যাঁ, পার্থক্য করা ওয়াজিব। যে আল্লাহ জাল্লা ওয়াআলার বিধানকে বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং এর বিপরীতে কানূন ও মানবরচিত আইন গ্রহণ করেছে, তার এ কাজটি এমন কুফর যা তাকে মিল্লাতে ইসলামিয়্যাহ থেকে বের করে দেবে। আর যে ব্যক্তি বিচারের ক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে, তবে সে গুনাহগার, যালিম। যারফলে সে কোন কোন রায়ের ক্ষেত্রে তার মনস্কামনার অনুসরণ করে এবং দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে পড়ে যায়, পাশাপাশি সে স্বীকার করে যে, এ বিষয়ে সে যালিম তাহলে এ ক্ষেত্রে তা মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মত কুফর হবে না।

আর যে মনে করে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার করা শরীয়ত দিয়ে বিচার করার মতই এবং তাকে সে বৈধ মনে করে তাহলে এর দ্বারা সে কাফের হয়ে যাবে, মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, যদি তা একটি রায়ের ক্ষেত্রেও হয়।

আশশায়খ আব্দুল্লাহ আলগুনাইমান

ফাতাওয়াল ইসলাম : ১/৪৮৪

একটি পার্থক্যরেখা এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ আয়াতাংশটি খারেজী সম্প্রদায় তাদের সাময়িক স্বার্থে অপাত্রে ব্যবহার করার প্রেক্ষিতে আলী ইবনে আবী তালেব রাযি.

বলেছেন كلمة حق أريد بها الباطل। সে প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে ইবনে আব্বাস রাযি. সহ অনেকে وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কুফরকে كفر دون كفر বলেছেন। এ সুযোগে ইরজা'র আকীদা পোষণকারী কিছু মানুষ এমন প্রোপাগাণ্ডা করেছে যে, কুরআনের আয়াতের এ অংশটি দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেউ দলিল দেয়ার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। দলিল দিতে গেলেই আশঙ্কাবোধ করে, না জানি আবার খারেজী হওয়ার অপবাদে সমাজচ্যুত হতে হয়। প্রোপাগাণ্ডাটি এত বেশি বাজারজাত করা সম্ভব হয়েছে যে, বাহ্যত মনে হয়, বাতিল কোন নিয়ত ছাড়া আয়াতের অংশটিকে কাজে লাগানোর কোন সুযোগই নেই। ওয়ালইয়াযু বিল্লাহ!

অথচ খারেজীদের অপাত্রের ব্যবহার এবং এর সঠিক ব্যবহার ক্ষেত্রের মাঝে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীদের মনে রাখতে হবে, খারেজী আকীদা যেমন গোমরাহী তেমনি ইরজা'র আকীদাও গোমরাহী। এক গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য আরেক গোমরাহীতে গিয়ে পড়ার কোন সুযোগ নেই।

উদ্ধৃত ফাতওয়ার মাঝে এ পার্থক্যটি সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এ মুহকাম আয়াতাংশটিকে প্রয়োগ করার জন্য বিকল্প ক্ষেত্র আর কী হতে পারে?

খারেজী আকীদার দোহাই দিয়ে আমরা আজ এ পর্যায়ে পৌঁছেছি যে, শতভাগ কুফরী মূলনীতির উপর তৈরি কুফরী সংবিধান ও কুফরী আইনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সে আইনের মাঝে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে মূল স্তম্ভ হিসাবে রাখা হয়েছে। খারেজী আকিদা থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য শতভাগ কুফরী আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ও আইনকে আমরা ইসলামবান্ধব বলে চলেছি। এ আইনের প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়োগকারীদেরকে কাফের বলতে দ্বিধাবোধ করছি এবং কাফের আখ্যায়িত করাকে বাতিল রায় বলে চলছি। এ আইনের প্রতিরোধকে ইসলাম পরিপন্থী বলছি।

কর্ণধারগণ সময় শেষ হওয়ার আগে আগেই বিষয়টি একটু গভীরভাবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ

আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুয়েতিয়্যাহ কিতাব থেকে আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ তথা আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ বিষয়ক কিছু মূলনীতির উল্লেখসহ একটি বিস্তারিত অলোচনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। এ কিতাবে যেসব কথা বলা হয়েছে তার উদ্ধৃতি বিভিন্ন মাযহাবের কিতাবাদি থেকে দেয়া হয়েছে।

এ কিতাবের সঙ্গে বা এ কিতাবের সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকতে পারে। তাই বিস্তারিত উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। ফাতওয়াগুলো ও সিদ্ধান্তগুলো প্রতাখ্যান করার আগে নিচের উদ্ধৃতিগুলো একটু দেখে নেয়ার অনুরোধ করছি। বিন্যাসের খাতিরে উদ্ধৃতির নম্বরগুলো মূল কিতাবের বিন্যাস অনুযায়ী না দিয়ে নতুন করে দেয়া হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, কোন কিছু গ্রহণ ও বর্জনেরও মূলনীতি আছে। সেসব মূলনীতি আমরা কীভাবে প্রত্যাখ্যান করব? কত দিন করব? এবং কত দিন করতে পারব?

আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ তথা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের মূলনীতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ মূলনীতিগুলোর সঙ্গে কারো কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। দ্বিমত করলে বলতে হবে, আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ তথা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের মূলনীতি কী? বলতে হবে উদ্ধৃত নুসূসের ব্যাখ্যা কী?

আর আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ তথা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের এ মূলনীতিগুলো মেনে নেয়ার পর এর সঙ্গে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবরচিত আইনের সমন্বয় হতে পারে না। حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ। মানবরচিত আইনের ছিদ্রপথে শরীয়তে মুহাম্মদিয়াকে প্রবেশ করাতে গেলে শরীয়তে মুহাম্মদিয়ার অবস্থা তাই হবে সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট পার করাতে গেলে উটের যে অবস্থা হবে। এবং সে অবস্থাই হয়েছে। আমাদের যোগ্যতা (?) হচ্ছে, আমরা এগুলোকে সয়ে নিতে পেরেছি। সয়ে নিতে পারছি। সয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে চলেছি।

আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের মূল ভিত্তিগুলো

আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যার বক্তব্য দেখুন-

قَوَاعِدُ السِّيَاسَةِ:

﴿أُسُسُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ: هِيَ تِلْكَ الْقَوَاعِدُ الأَسَاسِيَّةُ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا دَوْلَةُ الإِسْلاَمِ، وَيُسْتَلْهَمُ مِنْهَا النَّهْجُ السِّيَاسِيُّ لِلْحُكْمِ﴾

"সিয়াসাতের মূলনীতি

আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যার সাধারণ মূলনীতিগুলো হচ্ছে, সেসব মৌলিক নীতিমালা যার উপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা থেকে শাসনের জন্য পরিচালনা নীতি গ্রহণ করা হবে।"

ইসলামী শরীয়ার পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ

الأَسَاسُ الأَوَّل: سِيَادَةُ الشَّرِيعَةِ:

﴿يُؤَكِّدُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذِهِ السِّيَادَةَ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ، مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا**} وقَوْله تَعَالَى: {**ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ**} قَال ابْنُ جَرِيرٍ: أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ دُونَ سِوَاهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَذَلِكَ حَقٌّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ لأَنَّ مَبْنَى الْحِسَابِ فِي الآخِرَةِ إِنَّمَا يَقُومُ عَلَى عَمَل النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَلاَ يُحَاسَبُ النَّاسُ عَلَى مَا اجْتَرَحُوا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ عَلَى أَسَاسِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَتْ أَحْكَامُهَا مُنَظِّمَةً لِلْحَيَاةِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَالاِقْتِصَادِيَّةِ وَأُمُورِ الْمُعَامَلاَتِ الأُخْرَى﴾

{الموسوعة الفقهية الكوييتية : ٢٩٩/٢٥}

প্রথম মূলনীতি : শরীয়তের আধিপত্য

৮). কুরআনে কারীম একাধিক জায়গায় এ আধিপত্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী 'আর আল্লাহ ও

তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' এমনিভাবে আল্লাহর বাণী 'অতঃপর তাদেরকে তাদের আসল মনিবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। জেনে রাখ, বিধান দেয়ার অধিকার তাঁরই এবং তিনি সবচাইতে দ্রুত হিসাব সম্পাদনকারী।'

ইবনে জারীর রহ. বলেন, জেনে রাখ শাসন ও বিচার তাঁরই অধিকারভুক্ত, সমগ্র সৃষ্টির কেউই এর অধিকারী নয়। আর এ অধিকার দুনিয়ায়ও আখেরাতেও। কেননা পরকালে হিসাব নিকাশের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের দুনিয়ার আমলের উপর। আর মানুষ দুনিয়াতে যা কামাই করবে তার হিসাব নিকাশ হবে এ শরীয়তের মূলনীতির উপরই যে শরীয়তের বিধানগুলো সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং অন্যান্য লেনদেন বিষয়ে সুবিন্যস্তভাবে এসেছে।" – আল মওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ : ২৫/২৯৯

প্রতিটি অঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ

﴿وَمَا دَامَتِ الْحَاكِمِيَّةُ فِي هَذَا الْعَالَمِ لِشَرِيعَةِ اللهِ تَعَالَى فِي كُل شُؤُونِ الْحَيَاةِ وَإِلَى آخِرِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الآيَاتِ جَاءَتْ آمِرَةً بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِهَا وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَتْ بِهِ وَتَرْكِ مَا نَهَتْ عَنْهُ. مِنْ ذَلِكَ قَوْل اللهِ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ}

قَال ابْنُ جَرِيرٍ: فَاتَّبِعْ تِلْكَ الشَّرِيعَةَ الَّتِي جَعَلْنَاهَا لَكَ، وَلاَ تَتَّبِعْ مَا دَعَاكَ إِلَيْهِ الْجَاهِلُونَ بِاللهِ الَّذِينَ لاَ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِل، فَتَعْمَل بِهِ فَتَهْلِكُ إِنْ عَمِلْتَ بِهِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ زَيْدٍ.

وَقَال الزَّمَخْشَرِيُّ: فَاتَّبِعْ شَرِيعَتَكَ الثَّابِتَةَ بِالدَّلاَئِل وَالْحُجَجِ، وَلاَ تَتَّبِعْ مَا لاَ حُجَّةَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْوَاءِ الْجُهَّال وَدِينِهِمُ الْمَبْنِيِّ عَلَى هَوًى وَبِدْعَةٍ. وَمِنْ

ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَاتَذَكَّرُونَ}

قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَوْله تَعَالَى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} يَعْنِي الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. قَال تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: هَذَا أَمْرٌ يَعُمُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمْرٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ دُونَهُ؛ أَيِ اتَّبِعُوا مِلَّةَ الإِسْلاَمِ وَالْقُرْآنِ، وَأَحِلُّوا حَلاَلَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَامْتَثِلُوا أَمْرَهُ وَاجْتَنِبُوا نَهْيَهُ. وَدَلَّتِ الآيَةُ عَلَى تَرْكِ اتِّبَاعِ الآرَاءِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ»

“৯). এ পৃথিবীতে জীবনের সকল অঙ্গনে এবং শেষ কাল পর্যন্ত শাসনব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার শরীয়তের হাতে থাকবে। যারফলে শরীয়তের বিধানাবলী বাস্তবায়নের আদেশ এবং শরীয়তের আদেশের অনুসরণ ও নিষেধের বর্জন সম্পর্কে বহু আয়াত এসেছে। সেসব আয়াতের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার বাণী ‘“অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।’

ইবনে জারীর রহ. বলেন, অতএব আপনি ঐ শরীয়তের অনুসরণ করুন যা আমি আপনার জন্য দিয়েছি এবং আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা আপনাকে যে দিকে ডাকে আপনি সে দিকে যাবেন না; যারা বাতিল থেকে হককে আলাদা করতে পারে না। এতে করে আপনি তাদের বাতলানো পথের উপর আমল করে ধ্বংস হয়ে যাবেন। এটি ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইবনে যায়দের কথা।

যামাখশারী বলেছেন, আপনি দলিল প্রমাণে প্রমাণিত আপনার শরীয়তের অনুসরণ করুন এবং যার পক্ষে কোন দলিল নেই তার অনুসরণ করবেন না, যা মূর্খদের মনষ্কামনামাত্র এবং যাদের ধর্ম মনষ্কামনা ও বিদআতের

উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলার বাণী, 'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য কর্তাদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।'

কুরতুবী রহ. বলেন, আল্লাহর বাণী 'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর' অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছে তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।' একটি দল বলেছে, এ আদেশটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের জন্য ব্যাপক। কিন্তু আয়াতের স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে, এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সকল মানুষের জন্য আদেশ। অর্থাৎ, তোমরা ইসলাম ধর্মের অনুসরণ কর, কুরআনের অনুসরণ কর, তার হালালকে হালাল হিসাবে গ্রহণ কর, তার হারামকে হারাম হিসাবে গ্রহণ কর, তার আদেশের অনুসরণ কর এবং তার নিষেধ থেকে বেঁচে থাক। আর আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, আয়াত হাদীস উপস্থিত থাকা অবস্থায় রায় ও কেয়াস থেকে বিরত থাকতে হবে।"

একমাত্র কুরআন হাদীস ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ

﴿وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ الأَمْرَ بِاتِّبَاعِ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لاَ يَخُصُّ الْقُرْآنَ فَحَسْبُ، بَلْ يَعُمُّ السُّنَّةَ أَيْضًا، مَا جَاءَ فِي عَدَدٍ مِنَ الآيَاتِ مِنَ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِهَا وَتَطْبِيقِهَا. مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ {الموسوعة الفقهية الكويتية : ٣٠٠/٢٥}

"আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণের বিষয়ে যে আদেশ রয়েছে তা শুধুমাত্র কুরআনের সাথেই খাস নয়; বরং তা সুন্নাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। -আর যা এ বিষয়টিকে আরো জোরদার করে তা হচ্ছে কুরআনের অনেকগুলো আয়াত, যেসব আয়াতে সুন্নাহের ইত্তিবা এবং তার বাস্তবায়নের আদেশ করা হয়েছে। সেসব আয়াতের মাঝে রয়েছে আল্লাহর বাণী 'হে মুমিন সকল! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং

রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমরা তোমাদের আমলগুলো নষ্ট করে দিও না।" -আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যাহ : ২৫/৩০০

মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের মৌলিক দায়িত্বগুলো

وَاجِبَاتُ الإِمَامِ:

﴿مِنْ تَعْرِيفِ الْفُقَهَاءِ لِلإِمَامَةِ الْكُبْرَى بِأَنَّهَا رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي سِيَاسَةِ الدُّنْيَا وَإِقَامَةِ الدِّينِ نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠) يَتَبَيَّنُ أَنَّ وَاجِبَاتِ الإِمَامِ إِجْمَالاً هِيَ كَمَا يَلِي:

أ - حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَإِقَامَةُ شَعَائِرِ الدِّينِ.

ب - رِعَايَةُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْوَاعِهَا.

كَمَا أَنَّهُمْ -فِي مَعْرِضِ الاِسْتِدْلاَلِ لِفَرْضِيَّةِ نَصْبِ الإِمَامِ بِالْحَاجَةِ إِلَيْهِ- يَذْكُرُونَ أُمُورًا لاَ بُدَّ لِلأُمَّةِ مِمَّنْ يَقُومُ بِهَا، وَهِيَ: **تَنْفِيذُ الأَحْكَامِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَسَدُّ الثُّغُورِ، وَتَجْهِيزُ الْجُيُوشِ، وَأَخْذُ الصَّدَقَاتِ، وَقَبُولُ الشَّهَادَاتِ، وَتَزْوِيجُ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لاَ أَوْلِيَاءَ لَهُمْ، وَقِسْمَةُ الْغَنَائِمِ.** وَعَدَّهَا أَصْحَابُ كُتُبِ الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ عَشَرَةً. وَلاَ تَخْرُجُ فِي عُمُومِهَا عَمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا مَرَّ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِحَسَبِ تَجَدُّدِ الْحَاجَاتِ الزَّمَنِيَّةِ وَمَا تَقْضِي الْمَصَالِحُ بِأَنْ لاَ يَتَوَلاَّهُ الأَفْرَادُ وَالْهَيْئَاتُ، بَل يَتَوَلاَّهُ الإِمَامُ﴾ {الموسوعة الفقهية الكويتية : ٢٢٩/٦}

"ইমামুল মুসলিমীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ফুকাহায়ে কেরাম যে ইমামতে কুবরার -রাষ্ট্র পরিচালনা- সংজ্ঞা করেছেন, ইমামতে কুবরা হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নায়েব হিসাবে দুনিয়া পরিচালনা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়া; এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমামুল মুসলিমীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নরূপ:

ক). কুরআন, হাদীস ও সালাফের ইজমার উপর ভিত্তিবহুল নীতিমালার উপর দ্বীনকে হেফাযত করা।

খ). মুসলমানদের সব ধরনের প্রয়োজন পুরা করা। যেমন -আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা ও ফরয হওয়া প্রসঙ্গে দলিল দিতে গিয়ে- তাঁরা উম্মতের এমন কিছু জরুরী বিষয় উল্লেখ করে থাকেন যা ইমামুল মুসলিমীনই সম্পাদন করবেন। সেগুলো হচ্ছে: বিধানসমূহ প্রয়োগ করা, দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা, সীমান্ত প্রহরা দেয়া, মুজাহিদ বাহিনী তৈরি করা, যাকাত উসুল করা, সাক্ষ্য গ্রহণ করা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক যেসব ছেলে মেয়েদের অভিভাবক নেই তাদেরকে বিয়ে দেয়া, গনিমতের মাল বণ্টন করা। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক রচনাবলির রচয়িতাগণ মোট দশটি উল্লেখ করেছেন। ফুকাহায়ে কেরাম যে দায়িত্বগুলোর উল্লেখ করেছেন সাধারণত এর বাইরে যায় না। তবে স্থান কালের প্রয়োজনের ব্যবধানে এর মাঝে কম বেশ হতে পারে। অর্থাৎ এমন সব বিষয় যদি হয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যেগুলোর দায়িত্ব নিতে পারে না; বরং ইমামুল মুসলিমীনই সে দায়িত্ব নিতে হয়।" -আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যাহ : ৬/২২৯

---

(١) سورة الأحزاب / ٣٦.

(٢) سورة الأنعام / ٦٢.

(٣) جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري) ٧ / ١٤٠ ط – ٤ – دار المعرفة – بيروت – ١٤٠٠ هـ – ١٩٨٠م).

(٤) سورة الجاثية / ١٨.

(٥) تفسير الطبري ٢٥ / ٨٨، والكشاف ٣ / ٥١١ (ط – دار المعرفة – بيروت).

(٦) سورة الأعراف / ٣.

(٧) سورة الحشر / ٧.

(٨) الجامع لأحكام القرآن ٧ / ١٦١ (ط - دار الكتب العربية - القاهرة - ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م) ، والكشاف ٢ / ٦٤.

(٩) نهاية المحتاج ٧ / ٤٠٩، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٨، وحاشية الجمل ٥ / ١١٩

(١٠) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٨، ٣ / ٣١٠، ومغني المحتاج ٤ / ١٢٩، وشرح روض الطالب ٤ / ١٠٨

গণতন্ত্রের কুফরের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?

আলমাউসাউতুল ফিকহিয়্যার এ অংশগুলোর প্রতি লক্ষ করুন। আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর হাকিমিয়্যাতের হাকীকত কীভাবে প্রতিভাত হয়! গণতান্ত্রিক মানবরচিত আইনের সঙ্গে এর সমন্বয়ের কল্পনা করা যায় কীভাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাত কীভাবে মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনের মূল ভিত্তি হতে পারে? পৃথিবী ধ্বংসের আগ পর্যন্ত পৃথিবীর উত্তর মেরু তার দক্ষিণ মেরুর সাক্ষাত পেতে পারে না। এটা কল্পনা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ফুকাহায়ে কেরামের কথাগুলো একটু ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

سِيَادَةُ الشَّرِيعَةِ

الْحَاكِمِيَّةُ فِي هَذَا الْعَالَمِ لِشَرِيعَةِ اللهِ تَعَالَى فِي كُل شُؤُونِ الْحَيَاةِ

وَاجِبَاتُ الإِمَامِ

أ- حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَإِقَامَةُ شَعَائِرِ الدِّينِ.

ب- رِعَايَةُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْوَاعِهَا.

وَهِيَ : تَنْفِيذُ الأَحْكَامِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَسَدُّ الثُّغُورِ، وَتَجْهِيزُ الْجُيُوشِ، وَأَخْذُ الصَّدَقَاتِ، وَقَبُول الشَّهَادَاتِ، وَتَزْوِيجُ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لاَ أَوْلِيَاءَ لَهُمْ، وَقِسْمَةُ الْغَنَائِمِ. {الموسوعة الفقهية الكويتية : ٢٣٠/٦}

গণতন্ত্র এসবের বিপরীতটাই চায়

কুরআন হাদীসের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে, কুরআন সুন্নাহকে শতভাগ প্রত্যাখ্যান করে মানবরচিত যে আইন তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে এ হাকীকতের কোন সমন্বয় সম্ভব কি না একটু বিবেচনা করুন। একটু বুঝে নিন; আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের হাকীকত হচ্ছে:

১. প্রথম স্তম্ভ سِيَادَةُ الشَّرِيعَةِ শরীয়ার আধিপত্য, ধূমপানের বিজ্ঞাপনের আকাশ ছোঁয়া বিলবোর্ডের এক কোণের ক্ষুদ্র 'সতর্কীকরণ বাণী' নয়।

২. ক্ষেত্র হচ্ছে الْحَاكِمِيَّةُ فِي هَذَا الْعَالَمِ لِشَرِيعَةِ اللهِ تَعَالَى فِي كُل شُؤُونِ الْحَيَاةِ সারা বিশ্বব্যাপী, জীবনের প্রতিটি অঙ্গন ও প্রতিটি পর্ব। কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখের মাথা নয়।

৩. দায়িত্বগুলো وَاجِبَاتُ الإِمَامِ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এবং তা ওয়াজিব দায়িত্ব। এ দায়িত্বগুলো নিরক্ষর প্রজাসাধারণের নয় এবং তা কোন ঐচ্ছিক দায়িত্ব নয়।

৪. দায়িত্ব حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَإِقَامَةُ شَعَائِرِ الدِّينِ ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ এবং শরয়ী দলিলের আলোকে শরীয়তের প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন। গণতন্ত্রের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের চাহিদার বাস্তবায়ন নয়।

৫. দায়িত্ব رِعَايَةُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْوَاعِهَا মুসলমানের প্রতিটি স্বার্থের শতভাগ সংরক্ষণ। আল্লাহর দুশমনদের স্বার্থ সংরক্ষণ নয়।

৬. দায়িত্ব হচ্ছে تَنْفِيذُ الأَحْكَامِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَسَدُّ الثُّغُورِ، وَتَجْهِيزُ الْجُيُوشِ، وَأَخْذُ الصَّدَقَاتِ، وَقَبُول الشَّهَادَاتِ، وَتَزْوِيجُ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لاَ أَوْلِيَاءَ لَهُمْ، وَقِسْمَةُ الْغَنَائِمِ সকল শরয়ী বিধানের বাস্তবায়ন, শরীয়ার দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন, মুসলমানদের সীমান্ত রক্ষা, আল্লাহর দুশমন অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদের কাফেলা তৈরি করা, যাকাত-উশর-খারাজ ইত্যাদি উসূল করা, সাক্ষ্য গ্রহণ করা, শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা, জিহাদলব্ধ মাল বণ্টন করা।

গণতান্ত্রিক সংবিধান বাস্তবায়ন নয়, শরীয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টাকারীদেরকে শাস্তি প্রদান নয়, মুসলমানে মুসলমানে সীমান্ত তৈরি নয়, কুফরী সংগঠনের জন্য শান্তি বাহিনী তৈরি করা নয়, কর আদায় করা নয়, জাতিসংঘের কর্মসূচি বাস্তবায়ন আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের প্রতিনিধির দায়িত্ব নয়।

দু'টি মেরুর পার্থক্যরেখাগুলো মুছে ফেলে আমরা আসলে কী করতে চাই? মনে রাখতে হবে, বড়ত্বের বড়াই করে এ পার্থক্যরেখাগুলো মুছে ফেলা যাবে না। একটি কাফেলা আখের থেকেই যাবে। কুরআন ও হাদীস এমনই বলছে।

আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের কিছু নমুনা

যুগে যুগে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের নমুনা এমনই ছিল। যার সঙ্গে বর্তমানে দাবিকৃত হাকিমিয়্যাতের বিন্দু-বিসর্গের মিলও নেই। বিপরীতমুখী শত ধারার মিল রয়েছে। কোন কোন যামানায় অসংখ্য দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের মূলরূপ কীভাবে সংরক্ষিত ছিল নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে তাই দেখে নেয়া যেতে পারে। ইসলামী খেলাফতের ইতিহাস থেকেই আমরা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের নমুনা গ্রহণ করব। এতে সঠিক ও ভুল নির্ণয় আমাদের জন্য সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ। উদাহরণ হিসাবে দু'চারটি এখানে তুলে ধরা হল। পাঠক কষ্ট করে ইসলামের ইতিহাসের পাতা থেকে আরো উদাহরণ সংগ্রহ করে নেবেন।

الحاكمية عند خلفاء الأمة من سالف الزمن

খুলাফাউল মুসলিমীনের দৃষ্টিতে আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ

খেলাফতের সূচনাপর্ব

خطبة أبي بكر

﴿ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس! فأني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، **لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل**، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، **أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم**، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله﴾ {البداية والنهاية : ٥/٢٦٩}

আবু বকরের খুতবা

"এরপর আবু বকর রাযি. কথা বললেন, আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও ছানা করলেন, এরপর বললেন, হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি, তবে আমি তোমাদের সব চাইতে ভালোজন নই। সুতরাং আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে, আর যদি আমি খারাপ করি তাহলে আমাকে শুধরে দেবে। সত্য আমানত, আর মিথ্যা খেয়ানত। তোমাদের মাঝে যে দুর্বল সে আমার কাছে শক্তিশালী, তার কাছে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্ত, ইনশাআল্লাহ। আর তোমাদের মাঝে যে শক্তিশালী সে আমার

কাছে দুর্বল, তার কাছ থেকে হক আদায় করে নেয়া পর্যন্ত, ইনশাআল্লাহ। যে জাতিই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দেবে তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছণার গ্লানিতে অপদস্ত করবেন। আর যে জাতির মাঝেই অশ্লীলতা ছড়াবে আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপকভাবে আপদে নিপতিত করবেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য কর। আর আমি যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করব তখন আমার আনুগত্য তোমাদের উপর জরুরী নয়। যাও সবাই নামাযে দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন।" -আলবিদায়া ওয়ান নিহায়াহ : ৫/২৬৯

ইমাম ত্ববারী রহ. এর 'তারীখে ত্ববারী' কিতাবে সিদ্দীকে আকবার রাযি. এর আরেকটি বক্তব্যের উল্লেখ এসেছে, যা বিস্তারিত নিম্নরূপ-

﴿إن الله بعث محمدا رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه، وهم يعبدون من دونه آلهة شتى، ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة، وإنما هي من حجر منحوت وخشب منجور. ثم قرأ: {ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله} يونس ١٨ {وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} الزمر ٣. فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم وكل الناس لهم مخالف. زأر عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم وإجماع قومهم عليهم، فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله والرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من عبده، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم، أنتم يا معشر الأنصار! من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام. رضيكم الله أنصارا لدينه ولرسوله

وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور. أبو بكر الصديق﴾ {تاريخ الطبري ٢/٤٥٧}

"আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির নিকট মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে এবং তাঁর উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সাক্ষীদাতা হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর তাওহীদের ঘোষণা দেয়। তখন তারা আল্লাহ ব্যতীত বিভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করত এবং সেগুলোকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী ও নিজেদের জন্য উপকারী মনে করত। অথচ সেগুলো ছিল খোঁদাইকৃত পাথর ও কাষ্ঠখড়ির তৈরি। অতঃপর তিনি পড়লেন, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারে না। এবং তারা বলে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। -সূরা ইউনুস ১৮)। وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى (এবং তারা বলে, আমারা তো সেগুলোর উপাসনা করি যেন সেগুলো আমাদেরকে আল্লাহর কিছুটা নিকটবর্তী করে দেয়। -সূরা যুমার ৩)। তাই আরবদের জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করা কঠিন হয়ে গেল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্প্রদায় থেকে প্রথমদিকের মুহাজিরগণকে নির্বাচন করলেন, যেন তারা তাঁকে সত্যায়ন করে, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে, তাঁকে সান্ত্বনা দেয় এবং তাদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কঠিন শাস্তি প্রদান, তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করণ ও সকল লোকের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে। আরব তাঁদের উপর রাগান্বিত হয়েছে। তবুও তাঁরা তাঁদের সংখ্যার স্বল্পতা, মানুষদের অপছন্দ করা ও তাঁদের বিরুদ্ধে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ভীত হননি। তাঁরাই সর্বপ্রথম জমিনে আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছেন। তাঁরা রাসূলের সহচর ও গোত্র এবং এই (খেলাফতের) বিষয়ে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তাঁরাই বেশী হকদার।

যালেম ব্যতীত কেউ এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে টানা-হেঁচড়া করবে না। তোমরা হে আনাসারের জামাত! দ্বীনের ক্ষেত্রে যাঁদের মর্যাদা ও ইসলামের ক্ষেত্রে যাঁদের মহান অগ্রগামিতা অনস্বীকার্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী হিসাবে তোমাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমাদের নিকট তাঁর হিজরতের বিধান দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে রয়েছে রাসূলের অধিকাংশ স্ত্রী ও সাহাবী। প্রথমদিকের মুহাজিরগণের পর আমাদের নিকট তোমাদের চেয়ে মর্যাদাবান আর কেউ নেই। সুতরাং আমাদের থেকে আমীর হবে এবং তোমাদের থেকে ওযীর হবে। কোন পরামর্শে তোমাদেরকে বাদ দেয়া হবে না এবং তোমরা ব্যতীত কোন বিষয়ে ফয়সালা করা হবে না। -তারীখে তবারী : ২/৪৫৭

খেলাফতের চ্যালেঞ্জিক পর্ব

خطبة علي بن أبي طالب

﴿وكان أول خطبة خطبها أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: **إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر،** إن الله حرم حرما مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجب، بادروا أمر العامة، وخاصة أحدكم الموت، فان الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدو بكم، فتخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بالناس أخراهم، اتقوا الله عباده في عباده وبلاده، فإنكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم، ثم أطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية﴾ {البداية والنهاية : ٢٥٤/٧}

আলি ইবনে আবি তালেব রা.-এর খুতবা

"আলি রাযি. প্রথম যে খুতবা দিয়েছিলেন তা এই, তিনি প্রথমে আল্লাহর হামদ-সানা করে পরে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হেদায়াতস্বরূপ একটি কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে ভলো মন্দ সব বর্ণনা করেছেন। অতএব তোমরা ভালোকে গ্রহণ কর এবং মন্দকে ত্যাগ কর। আল্লাহ তাআলা সংক্ষিপ্তাকারে কিছু হারাম করেছেন। আর সকল হারামের উপর মুসলমানের হুরমতকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। ইখলাস ও তাওহীদের মাধ্যমে মুসলমানদের অধিকারগুলোকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ, তবে কোন হক ব্যতীত। কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় অন্য মুসলমানকে কষ্ট দেয়া, তবে যদি কোন ওয়াজিব হক হয়। তোমরা সাধারণের বিষয়ে অগ্রগামী হও। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত হচ্ছে মৃত্যু। কেননা তোমাদের সামনে মানুষ, আর তোমাদের পেছনে থেকে কেয়ামত তোমাদেরকে ধাওয়া করছে। অতএব তোমরা সহজ করে দাও এবং গিয়ে মিলিত হও; কেননা মানুষ পরবর্তীদের জন্য অপেক্ষা করছে। আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর বান্দাদেরকে ভয় কর তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে এবং তাঁর শহরগুলোর ব্যাপারে। কেননা তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে এমনকি ভূখণ্ড ও প্রাণীর ব্যাপারেও। অতঃপর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তার অবাধ্যতা করো না। যখন কোন ভালো দেখবে তখন তা গ্রহণ কর। আর যখন কোন মন্দ দেখবে তখন তা পরিহার কর। আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক যমিনের বুকে দুর্বল অবস্থায় ...।" -আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৭/২৫৩

খেলাফতের অনালোচিত পর্ব

بيعة الحسن بن علي

﴿كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد بن عبادة، فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه، فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده﴾ {البداية والنهاية : ١٦/٨}

হাসান ইবনে আলি রাযি. এর বাইআত

"হাসান ইবনে আলি রাযি. এর দিকে সর্ব প্রথম যিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদাহ। তিনি বলেছেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে কিতাবুল্লাহ ও তাঁর নবীর সুন্নাহের উপর বাইআত করব। তখন তিনি চুপ থাকলেন, এরপর তার বাইআত নিলেন, এরপর মানুষ তাঁর হাতে বাইআত হয়েছে।" - আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৭/১৬

খেলাফতের সমালোচিত পর্ব

سليمان بن عبد الملك

وقال في «مروج الذهب»: ﴿لما أفضى الأمر إلى سليمان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على رسوله [صلى الله عليه وسلم] ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء صنع، وما شاء أعطى، وما شاء منع، ومن شاء رفع، ومن شاء وضع، أيّها الناس الدّنيا دار غرور وباطل، وزينة وتقلّب بأهلها، تضحك باكيها، وتبكي ضاحكها، وتخيف آمنها، وتؤمّن خائفها، وتثري فقيرها، وتفقر مثريها، **عباد الله**: **اتّخذوا كتاب الله إماما، وارضوا به حكما، واجعلوه لكم هاديا دليلا، فإنه ناسخ ما قبله، ولا ينسخه ما بعده**، واعلموا عباد الله أنه ينفي عنكم كيد الشيطان ومطامعه، كما يجلو ضوء الصّبح إذا أسفر إدبار الليل إذا عسعس، ثم نزل، وأذن للناس عليه، وأقرّ عمّال من كان قبله على أعمالهم﴾ {شذرات الذهب : ١٠٩/١}

সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক

"........ খেলাফতের দায়িত্ব যখন সুলায়মানের উপর আসল তখন তিনি মিম্বরে উঠলেন, আল্লাহর হামদ সানা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত সালাম পড়লেন, এরপর বললেন, সকল

প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি যা চান তাই করেন, যা চান দেন এবং যা চান আটকে রাখেন, যাকে চান সম্মানিত করেন, আর যাকে চান অসম্মানিত করেন। হে মানুষ সকল! দুনিয়া ধোঁকা ও অসারতার জায়গা। চাকচিক্য এবং দুনিয়াবাসীকে নিয়ে উত্থান পতনের জায়গা। সে ক্রন্দনরতকে হাসায়, আবার হাস্যরতকে কাঁদায়। নিরাপদকে ভীতির মধ্যে ফেলে দেয়, আবার ভীতসন্ত্রস্তকে নিরাপত্তা দেয়। দরিদ্রকে ধনাঢ্য বানিয়ে দেয়, আবার ধনাঢ্যকে ফকীর বানিয়ে দেয়। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর কিতাবকে নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ কর, তাকে বিচারক হিসাবে মেনে নাও এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও দলিল হিসাবে গ্রহণ কর। কেননা তা পূর্বের সকল কিছুকে রহিত করে দিয়েছে। তাকে পরবর্তী কোন কিছু রহিত করতে পারবে না। জেনে রাখ আল্লাহর বান্দারা! তিনি তোমাদের থেকে শয়তানের চক্রান্তকে এবং তার ফন্দিকে দূর করবেন, যেমনিভাবে রাত শেষে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হয়। এরপর তিনি নেমে পড়লেন এবং মানুষদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। পূর্ববর্তী কর্মকর্তাদেরকে আপন আপন অবস্থায় বহাল রাখলেন।" -শাযারাতুয যাহাব : ১/১০৯

আর গণতন্ত্রের মুল স্তম্ভ!

এতো ছিল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নেয়ার ঐ রূপ যা কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে অঙ্কিত হয়েছে।

এবার আমরা দেখব, পাকিস্তান প্রশাসনে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত মেনে নেয়ার রূপ ও অবয়ব। এরপর শায়খে মুহতারামের দাবির সঙ্গে বাস্তবতার মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

দেখার বিষয় হচ্ছে, একটি দারুল ইসলামে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকারীগণের শপথবাক্য কী ছিল? যে শপথের ভিত্তিতে বলা যেত, তারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে মেনেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। এরই বিপরীত আজ যাদের ব্যাপারে দাবি করা হচ্ছে, তারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করাকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ বানিয়েছে তারা কোন শপথ বাক্যের মাধ্যমে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে?

পাকিস্তান-সংবিধান : মূলভিত্তি

পাকিস্তান সংবিধানের যে ভূমিকা লেখা হয়েছে সে ভূমিকায় সব কথার হাকীকত সবিস্তারে রয়েছে। সংবিধানের মূল কপি থেকে যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কোন অনুচ্ছেদের বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ হলে নিজ দায়িত্বে মূল কপি দেখে নেবেন। আর সংবিধানের শুরুতে ও বাঁকে বাঁকে প্রতারণামূলক যে বাক্যগুলো রয়েছে এবং যেসব কথার ফাঁদে পড়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট আশঙ্কাও রয়েছে সেগুলো নিয়েও পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। ধীরস্থিরভাবে এবং পর্যায়ক্রমে সবগুলো কথাই আমাদেরকে দেখতে হবে।

সংবিধানের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং এর যথাযথ অনুধাবন ও বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাজ। সে বিষয়ে হাত দিতে গেলে আমাদের খুব ভুল হবে। আমরা আমাদের ভুলের পাহাড় আর উঁচু করতে চাই না। তাই পাকিস্তান-সংবিধান ও আইনের একেবারে মোটা মোটা কথাগুলোই আমরা এখানে তুলে ধরব। শুধু এমন কথাগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করব যা আমাদের সাধারণ পাঠকবৃন্দ সহজে বুঝে নিতে পারবেন।

শায়খে মুহতারাম বলেছেন, পাকিস্তান সংবিধানের মূল স্তম্ভ হচ্ছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের স্বীকৃতি। এ বিষয়ে সংবিধানের বক্তব্য আমরা এভাবে পেয়েছি-

چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے، جس میں مملکت اپنے اختیارات واقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعہ استعمال کرے گی۔

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص١)

....

جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکے اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکے۔ (اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص١)

جس میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور ان حقوق میں قانون اور اخلاق عامہ کے تابع حیثیت **اور مواقع میں مساوات قانون** کی نظر میں برابری، معاشرتی، معاشی اور سیاسی **انصاف** اور خیال، **اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہو گی**۔ (اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص ۲)

تا کہ اہل پاکستان فلاح و بہبودی حاصل کر سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور **بین الاقوامی امن** اور بنی نوع انسان کی ترقی اور خوش حالی میں اپنا پورا حصہ ادا کر سکیں:

لہذا اب ہم جمہور پاکستان:

....

اس **جمہوریت کے تحفظ** کے لئے وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ کہ جو ظلم وستم کے خلاف عوام کی انتھک جد جہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ (تمہید ص ۲)

اسلام پاکستان کی **مملکتی مذہب** ہو گا۔ (اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، ابتدائیہ ص ۳)

অনুবাদ

"যেহেতু পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত করা যার মাঝে দেশ **(সংখ্যাগরিষ্ঠ) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে** তার ক্ষমতা ও শক্তিকে ব্যবহার করবে।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃ: ১

....

"যার মাঝে এমন বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থাপনা থাকবে যে, সংখ্যালঘুরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর থাকতে পারে, তার উপর আমল করতে পারে এবং **নিজেদের সভ্যতার উন্নতি করতে পারে**।" - ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃ: ১

"যার মাঝে মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেয়া হবে, আর সেসব অধিকারের ক্ষেত্রে কানূন ও সাধারণ রীতি-নীতির বিবেচনায় মর্যাদা ও অবস্থান, কানূনের দৃষ্টিতে সমতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, **রাজনৈতিক সাম্য ও** মতামত, **মতামতের বহিঃপ্রকাশ**, আকীদা বিশ্বাস, ধর্ম, ইবাদত-উপাসনা ও সম্মিলনের **স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত হবে**।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃঃ ২

"যাতে পাকিস্তানের জনগণ সফলতা ও উন্নতি অর্জন করতে পারে এবং পৃথিবীর অপরাপর জাতি গোষ্ঠীর মাঝে নিজেদের বৈধ ও অনন্য অবস্থান অর্জন করতে পারে এবং **আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা** ও মানব জাতির উন্নতি ও সচ্ছলতার ক্ষেত্রে নিজেদের পূর্ণ দায়িত্ব আদায় করতে পারে।

তাই আমরা এখন পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃঃ ২

....

"এ **গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ব্যয়কৃত উদ্দীপনার সাথে** যে গণতন্ত্র জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত চেষ্টা প্রচেষ্টার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃঃ ২

ইসলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হবে।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, ইবতেদাইয়াহ পৃঃ ৩

এর মূল রূপ ইংরেজিতে এভাবে রয়েছে-

Whereas sovereignty over the entire Universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust;

....

Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed;

Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah;

....

Now, therefore, we, the people of Pakistan;

Conscious of our responsibility before Almighty Allah and men;

....

Faithful to the declaration made by the Founder of Pakistan, Quaid-i- Azam Mohammad Ali Jinnah, **that Pakistan would be a democratic State based on Islamic principles of social justice;**

Dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny. [THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN, 1973, Preamble].

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের উদ্ধৃত অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ–

এক. গণতন্ত্র

'পাকিস্তান জনগণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ...'।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মতামতের উপর ভিত্তি করে যে দেশ ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করে সে দেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন প্রতিনিধি নির্বাচনকারী ভোটার অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই, খোদ প্রতিনিধি নিজেও অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই, জনপ্রতিনিধিদের পরিচালক স্পিকার ও সিনেট

চেয়ারম্যান অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই, তখন এ ভোটার, এ প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিদের এ পরিচালক একটি দারুল ইসলামের মজলিসে শূরার সদস্য ও আমীরে ফায়সাল হতে পারে না। এমন একটি দেশে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের কল্পনা কীভাবে হতে পারে?

দুই. ধর্মনিরপেক্ষতা

'সংখ্যালঘুরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের .... নিজেদের সভ্যতার উন্নতি করতে পারে'।

এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চিত্র। এ চিত্র আঁকার জন্য পুরা পৃথিবী এখন প্রতিযোগিতা করে চলেছে। পাকিস্তানের সংবিধানের ভাষা বলছে, পাকিস্তানও এ বিষয়ে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। তবে এটি কোন দারুল ইসলামের চিত্র নয়। এমন কোন রাষ্ট্রের চিত্র নয় যে দেশের সংবিধানের মূল স্তম্ভ হিসাবে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকেমিয়্যাতকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

কারণ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাত অনুযায়ী একটি দারুল ইসলামে কোন অমুসলিমের স্থায়ী বসবাসের একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে, অমুসলিম যিম্মী হিসাবে বসবাস করবে। অমুসলিম মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট হারে কর দিয়ে হীনতার সঙ্গে জীবনযাপন করবে। অথবা অমুসলিম মুসলিমের গোলাম ও দাস হিসাবে থাকবে। অমুসলিম তার সভ্যতার উন্নতি করতে পারে এমন স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকার প্রশ্নই আসে না। বরং একটি দারুল ইসলামে একজন অমুসলিম যিম্মীকে যেভাবে থাকতে হবে তার চিত্র কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ফাতাওয়ায় এভাবে এসেছে-

কুরআন

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ {سورة التوبة: ٢٩}

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সেসব লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা

হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।" -সূরা তাওবা ২৯

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ {سورة محمد: ٤}

"অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত কর, অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধ; তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ।" -সূরা মুহাম্মদ ৪

হাদীস

﴿حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم– إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله فى خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت

أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم». قال سفيان بن عيينة: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم -قال أبو داود: هو ابن هيصم- عن النعمان بن مقرن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل حديث سليمان بن بريدة» {سنن أبي داود، رقم الحديث:٢٦١٢}

"…. সুলায়মান ইবনে বুরাইদা রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে কোন যুদ্ধবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে পাঠাতেন তখন তাকে তার নিজের ব্যাপারে এবং তার সকল মুসলমান সঙ্গীদের ব্যাপারে তাকওয়ার অসিয়ত করতেন এবং বলতেন-

যখন তুমি তোমাদের মুশরিক শত্রুর মুখোমুখী হবে তখন তাদের তিন কথার যে কোন এক কথা মেনে নিতে আহবান কর। তিনটির যেটিই তারা গ্রহণ করবে তা তোমরা মেনে নাও। যথা: তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাক।

যদি এ ডাকে তারা সাড়া দেয় তাহলে তাদের এ সাড়াকে তোমরা গ্রহণ কর এবং তাদের থেকে বিরত থাক। এরপর তাদেরকে তাদের এলাকা ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় চলে আসতে বল। আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যদি এটা গ্রহণ করে তাহলে তারা তাই পাবে যা মুহাজিররা পায় এবং তাদের উপর তাই বর্তাবে যা মুহাজিরদের উপর বর্তায়। আর যদি তারা দারুল মুহাজিরীনে আসতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নিজেদের এলাকাতেই থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাহলে তারা বেদুঈন মুসলমানদের হুকুমে হবে। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সেসব হুকুম প্রয়োগ হবে যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। কিন্তু তারা গনিমত ও ফায় এর কোন অংশ পাবে না। তবে যদি মুসলমানদের সঙ্গে জিহাদ করে তাহলে পাবে।

যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদেরকে জিযয়া-কর আদায় করতে বল। যদি তারা এতে সম্মত হয়ে যায় তাহলে তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ কর এবং তাদের উপর হামলা করা থেকে বিরত থাক।

যদি তারা কর দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

যখন তোমরা কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে ঘেরাও করবে তখন দুর্গবাসী যদি চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর নামিয়ে আনবে তাহলে তুমি তা করো না। কেননা তুমি জান না যে, তাদের বিষয়ে আল্লাহর হুকুম কী। তোমরা বরং তাদেরকে তোমাদের হুকুমের উপর নামিয়ে আন। এরপর তাদের বিষয়ে যা উপযুক্ত মনে কর তা কর। .....।" সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৬১২

ফিকহ

﴿ولأن أخذ الجزية منهم بطريق الصغار كما قال تعالى: {**وهم صاغرون**} [التوبة: ٢٩] ولهذا لا تقبل منه لو بعثها على يد نائبه بل يكلف بأن يأتي به بنفسه فيعطي قائما والقابض منه قاعد، وفي رواية: يأخذ بتلبيبه فيهزه هزا ويقول: أعط الجزية يا ذمي﴾ {**المبسوط للسرخسي** ١٣٨/١٠}

"কেননা তাদের কাছ থেকে জিযয়া গ্রহণ করা হবে তাদের হীনতার পদ্ধতিতে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {وهم صاغرون} [তাওবা ২৯]। আর এ কারণেই যদি যিম্মী ব্যক্তি তার প্রতিনিধির মাধ্যমে কর পাঠায় তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না; বরং বাধ্য করা হবে, সে যেন নিজে এসে দাঁড়ানো অবস্থায় কর আদায় করে এবং কর গ্রহণকারী বসা অবস্থায় তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে।

এক বর্ণনায় আছে, গ্রহণকারী যিম্মীর জামার বুক ধরে হেঁচকা টান দেবে এবং তাকে খুব ঝাঁকুনি দিয়ে বলবে, এই যিম্মী কর আদায় কর।" - আলমাবসূত, সারাখসী : ১০/১৩৮

(فصل)

﴿الْجِزْيَة إِذا وضعت بتراض أَو صلح لَا تغير .... وَتجب فِي أول الْحول، وَيُؤْخَذ قسط كل شهر فِيهِ، وَتسقط بِالْإِسْلَام أَو الْمَوْت، وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما، بِخِلَاف خراج الأَرْض، وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا، وتعاد المنهدمة من غير نقل، ويميز الذِّمِّيّ فِي زيه ومركبه وسرجه، وَلَا يركب خيلاً وَلَا يعْمل بسلاح، وَيظْهر الكُستيج ويركب سرجاً كالإكاف، والأحق أَن لَا يتْرك أَن يركب إلاّ لضَرُورَة، وحينئذٍ ينزل فِي المجامع، وَلَا يلبس مَا يخص أهل الْعلم والزهد والشرف، وتميز أنثاه فِي الطَّرِيق وَالْحمام، وَتجْعَل على دَاره عَلامَة كَيْلا يسْتَغْفر لَهُ وَلَا يبدؤ بِسَلام، ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق، وَيُؤَدِّي الْجِزْيَة قَائِما والآخذ قَاعِدا، وَيُؤْخَذ بتلبيبه ويهز وَيُقَال لَهُ أَدِّ الْجِزْيَة يَا ذِمِّي أَو يَا عَدو الله﴾ {ملتقى الأبحر: ١/٤٧٠}

"অনুচ্ছেদ:

"জিযয়া-কর যদি সন্ধি ও সম্মতির ভিত্তিতে ধার্য করা হয়ে থাকে তাহলে তা আর পারিবর্তন করা হবে না। .... । আর তা বছরের শুরুতে দেয়া আবশ্যক। আর প্রত্যেক মাসের কিস্তি সে মাসেই আদায় করা হবে।

কর মাফ হয়ে যাবে ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা অথবা মারা যাওয়ার দ্বারা। করের একাধিক কারণ জমা হলে তা একাকার হয়ে যাবে। তবে এ বিষয়ে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের দ্বিমত রয়েছে। এরই বিপরীত হচ্ছে যমিনের খারাজ।

দারুল ইসলামে তাদের নতুন কোন গীর্জা, মঠ, সন্ন্যাসী আশ্রম তৈরি করা বৈধ হবে না। ধ্বংস হয়ে যাওয়াটিকে স্থানান্তর ব্যতীত পুনর্নির্মাণ করতে পারবে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহন, জিনপোষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে

তাদেরকে আলাদা করা হবে। তারা ঘোড়ায় আরোহন করবে না। অস্ত্র ব্যবহার করবে না। 'কুসতীজ' (পশমের তৈরি আঙ্গুল পরিমাণ মোটা সুতা যা যিম্মীরা কাপড়ের উপর ব্যবহার করে) প্রদর্শন করবে এবং গাধার জিনপোষের ন্যায় (নিম্নমানের) জিনপোষ ব্যবহার করবে। বরং সবচাইতে ভালো হচ্ছে তাদেরকে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাহনে চড়তেই দেয়া হবে না। সে ক্ষেত্রেও কোন জমায়েত হলে সেখানে তারা নেমে যাবে।

আহলে ইলম, মুত্তাকী, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ পোষাক পরিধান করবে না।

তাদের মহিলাদের পথ ও গোসলখান আলাদা রকমের হবে।

তার ঘরে যিম্মী হওয়ার কোন নিশানা রাখা হবে, যাতে তার জন্য ইসতেগফারের দোয়া না করা হয়, তাকে আগে সালাম না দেয়া হয়।

তার রাস্তা সংকীর্ণ করে দেয়া হবে।

সে দাঁড়িয়ে কর আদায় করবে, আর কর গ্রহণকারী বসা থাকবে। কর গ্রহণকারী যিম্মী ব্যক্তির জামার বুক চেপে ধরবে, তাকে ঝাঁকুনি দেবে এবং বলবে, এই যিম্মী কর আদায় কর! আথবা বলবে, এই আল্লাহর দুশমন কর আদায় কর!" -মুলতাকাল আবহুর : ১/৪৭০

যে দেশের আইনের মূল ভিত্তি আল্লাহর হাকিমিয়্যাত সে দেশে কাফেরদের সঙ্গে সহাবস্থান ও আচরণের চিত্র হচ্ছে এই যা কুরআন, হাদীস ও ফিকহ থেকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে পাকিস্তান সংবিধানের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে।

তিন. কুফরের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগি

'রাজনৈতিক সাম্য ....'।

'রাজনীতি' শব্দটি যদি আরবী "السياسة" শব্দের বাংলারূপ হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে 'পরিচালনা'। শব্দটি যখন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে তখন এর অনিবার্য অর্থ হচ্ছে 'রাষ্ট্র পরিচালনা'। এ অর্থেই হাদীসের মধ্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইসলামী রাজনীতি' বলতে এটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শরয়ী বিধানের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

এ দায়িত্বটি ছিল নবীগণের। নবীগণের অবর্তমানে এ দায়িত্ব নবীগণের উম্মতের।

﴿عن فرات القزاز قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم﴾ {البخاري : رقم الحديث: ٣٤٥٥- ٣/١٢٧٣}

নবীগণ এ দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে। নবীর উম্মত আল্লাহর শত ভাগ বিধান বাস্তবায়নের জন্যই খলিফা হবে। একমাত্র আল্লাহর বিধানের আলোকে উম্মতকে পরিচালনা করবে।

এরই নাম হচ্ছে السياسة الإسلامية বা 'ইসলামী রাজনীতি'।

এ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমান এককভাবে তা পরিচালনা করবে। এ পরিচালনার মধ্যে অমুসলিমের অংশীদারির কোন সুযোগ নেই। একটি দারুল ইসলামে কোন অমুসলিমকে রাজনৈতিক সাম্যের উপর নিয়ে আসার কোন ধারণা ইসলামে নেই। ইসলামে আছে, মুসলিম দেশে অমুসলিম স্থায়ীভাবে থাকবে যিম্মী হিসাবে বা ক্রিতদাস হিসাবে। রাজনৈতিক সাম্য মানেই হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদারি। পাকিস্তান রাষ্ট্রে একজন অমুসলিমকে রাষ্ট্র পরিচালনায় এ অংশীদারি দেয়া হয়েছে। সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়নও হয়েছে। কারণ পাকিস্তান একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে সব ধর্মের মান সমান এবং সব ধর্মের দৃষ্টিতে সব ধর্ম সম্মানিত, সে রাষ্ট্রের নীতিতে সংবিধানের এ অনুচ্ছেদ খুবই উপযোগী। সে রাষ্ট্রে সকল ধর্মের মানুষ রাজনৈতিক সাম্য পাবে এটাই স্বাভাবিক।

বিপত্তি ঘটেছে, কর্ণধারগণ যখন এসব কিছুর উপস্থিতিতেও একটি দেশকে দারুল ইসলাম বলেন এবং একটি দারুল ইসলামের সব পরিভাষা সেখানে ব্যবহার করেন।

বলে রাখা ভালো হবে, কেউ যেন রাজনৈতিক সাম্যকে একজন যিম্মী ও ক্রিতাদাসের নিরাপত্তার সাম্যের সঙ্গে পেঁচিয়ে না ফেলেন। এ বিষয়ক নুসূস যেন এখানে ব্যবহার না করেন।

চার. কুফরের লাগামহীনতা

'মতামতের বহিঃপ্রকাশ ....'।

মতামতের বহিঃপ্রকাশ মানেই মতামতের স্বাধীনতা। একটি দারুল ইসলামে মতামত প্রকাশ করবে 'আহলে রায়'। মতামত প্রকাশ করা হবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে। শরয়ী বিষয়াদির প্রধান দু'টি অংশ। একটি 'মানসূস আলাইহি' আরেকটি 'মুজতাহাদ ফীহি'। দু'টি অংশের প্রথম অংশটি এমন যার ক্ষেত্রে মতামত পেশ করার কোন সুযোগ নেই। আর দ্বিতীয় অংশটি এমন যার জন্য মতামত প্রদানকারী মুসলমান হওয়া শর্ত।

এমতাবস্থায় সংখ্যালঘু তথা একজন অমুসলিমকে 'মতামত বহিঃপ্রকাশের স্বাধীনতা' দেয়া হলে সে এ স্বাধীনতা ও অধিকার কোথায় ব্যবহার করবে? সে কি ইসলামবান্ধব কোন ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা ও অধিকার ব্যবহার করবে? নাকি ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত কোন ক্ষেত্রে এ অধিকার ব্যবহার করবে?

যদি ইসলামবান্ধব কোন ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশ করার জন্য তাকে এ অধিকার দেয়া হয়ে থাকে তা হলে সংখ্যালঘু অমুসলিম শিরোনামে এ অধিকার দিতে হবে কেন? এ অধিকার তো সকল মুসলমানের জন্য এমনিতেই আছে। অমুসলিমকে তা আলাদা করে দিতে হবে কেন?

আর যদি এর দ্বারা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত মতামত প্রকাশ করার জন্য তাকে অধিকার দেয়া হয়ে থাকে তা হলে তাকে এ অধিকার দেয়ার অধিকার দারুল ইসলামের মালিকদেরকে কে দিয়েছে? একটি দারুল ইসলামে মুশরিক তার শিরকের মত প্রকাশ করবে? খ্রিস্টান ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান বলে মত প্রকাশ করবে? ইহুদী ওযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহর ছেলে বলে মত প্রকাশ করবে? নাস্তিক স্রষ্টার কোন অস্তিত্ব নেই (নাউযু বিল্লাহ) বলে মত প্রকাশ করার অধিকার ও স্বাধীনতা পাবে?

একটি দারুল ইসলামে কোন অমুসলিম তার দুনিয়াবি ও ইন্তেযামি কোন বিষয়ে মুসলমান শাসকের কাছে আবেদন করতে পারবে, কোন প্রকার

মত প্রকাশ করতে পারবে না। এ বিষয়ে তার সাংবিধানিক কোন অধিকার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ স্বাধীনতা ব্যবহারের কোন ক্ষেত্র নেই।

আর যদি ব্যবহার করার কোন ক্ষেত্র না থাকে তা হলে তাকে এ স্বাধীনতা কেন দেয়া হয়েছে?

বলাবাহুল্য, এটি কোন দারুল ইসলামের চিত্র নয়। এটি একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অধীনে পরিচালিত একটি রাষ্ট্রের চিত্র।

উল্লেখ্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এটি বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত সুপরিচিত একটি পরিভাষা। যার ব্যবহার ক্ষেত্রের বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই। যার সারমর্ম হচ্ছে, সালমান রুশদী ও তাসলিমা নাসরিনদের মত কুখ্যাত নাস্তিক থেকে শুরু করে রাজিব-ইমরানদের মত রাস্তা-ঘাটের নাস্তিক পর্যন্ত কারো মতকে প্রকাশ করতে বাধা দেয়া যাবে না। সবাইকে বলতে দিতে হবে। বলার স্বাধীনতা দিতে হবে। বলার পর তাকে নিরাপত্তা দিতে হবে।

এসবের কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই। কোন রাখঢাক নেই।

বিপত্তি ঘটেছে, কর্ণধারগণ যখন এসব কিছুর উপস্থিতিতেও একটি দেশকে দারুল ইসলাম বলেন এবং একটি দারুল ইসলামের সব পরিভাষা সেখানে ব্যবহার করেন। সমস্যা আরো বেড়ে যায় যখন 'উটপাখী' হওয়ার কারণে বোঝাও বহন করতে পারে না, আবার উড়তেও পারে না।

পাঁচ.আইম্মাতুল কুফরের সঙ্গে বন্ধুত্ব

'আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ....'।

আন্তর্জাতিক বলতে এখানে জাতিসংঘভুক্ত সবকটি দেশ অন্তর্ভুক্ত হবে? না কি কিছু হবে কিছু হবে না? না কি আরো অতিরিক্ত কিছু দেশও অন্তর্ভুক্ত হবে। দারুল ইসলাম পাকিস্তান (?) যেসব দেশের সঙ্গে নিরাপত্তা নিশ্চিতমূলক ঐক্যবদ্ধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে এবং সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অংশ নেবে সেসব দেশের তালিকায় আমেরিকা, বৃটেন, ইসরাঈল, ভারত, ভ্যাটিক্যান সিটি, চীন, জাপান, রাশিয়া ইত্যাদি আছে কি না?

শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমি আর প্রশ্ন করব না। অনেক সময় আমি প্রশ্নের পদ্ধতি গ্রহণ করেছি কারণ, আমি মনে করেছি বিষয়গুলো পাঠকের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পাঠকের প্রতি আমার এ ধারণা নষ্ট হয়ে গেছে।

পাঠকের একটি অংশ বা আমি বলব কানকথা প্রেমিকদের একটি অংশ একটি ইলমী বিষয়ে যেভাবে কথা বলছেন, যেভাবে মন্তব্য করে যাচ্ছেন এ থেকে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, 'চিলে কান নিয়ে গেছে' কথাটিকে বিশ্বাস করতে তারা যতটা আগ্রহী, 'ভাই! একটু নিজের কান পর্যন্ত হাতটা তুলে দেখুন' কথাটি শুনতে তারা ততটা আগ্রহী নন। কারণ, সে ক্ষেত্রে কান থাকলেও সমস্যা, কান না থাকলেও সমস্যা। এর তুলনায় চিলের পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকা তুলনামূলক নিরাপদ এবং সময় কাটানোর জন্য বেশি উপযোগী।

এ কারণে আর কোন প্রশ্ন নেই। কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে যে বিষয়গুলো আমার সামনে স্পষ্ট সে কথাগুলো আমি বলে যাব। পাঠক কিছু বলতে চাইলে দলিলের আলোকে বলবেন। বাস্তবতার আলোকে বলবেন। গালাগালির পথ এবার বন্ধ হওয়া দরকার। নিজের গালির জন্য নিজে লজ্জিত হওয়ার আগেই গালি বন্ধ করে দিন। ভালো হবে।

মুসলমানের শত্রু-মিত্র নির্ধারিত

আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, চীন, জাপান ও ভারতসহ যে দেশগুলোর নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এ ধরনের অসংখ্য দেশ পৃথিবীতে আছে; যেগুলো আইম্মাতুল কুফরের দেশ। যে দেশগুলোর বার্ষিক ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংক বরাদ্দ থাকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য। সে দেশগুলোর পরিচালকরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের সমর্থন নিয়েই কাজগুলো করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের অজান্তেও করে না এবং তাদের বিরোধিতার মুখেও করে না; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতেই করে।

কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের পরিভাষায় এ দেশগুলো দারুল হারবের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানের মত যে দেশগুলো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিযোগিতা করে চলেছে এবং পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে তারা জাতিসংঘের আইন অনুযায়ী এ

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে -এ বিষয়ে পাকিস্তানেরও কোন সন্দেহ নেই, পাকিস্তানের মত অন্যান্য দেশগুলোরও কোন সন্দেহ নেই। আমার পাঠকদের যারা এসব বিষয়ে সন্দেহ করেন বা অবিশ্বাস করতে পছন্দ করেন তাঁরা মূলত এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার কখনো সুযোগ পাননি।

জাতিসংঘের আইন আইম্মাতুল কুফরের তৈরি, কুফরের অনুকূলে তৈরি এবং কুফরী স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তৈরি। এ আইন তৈরিতে প্রস্তাব দেয়া ও ভেটো দেয়ার অধিকার আইম্মাতুল কুফরের। পরিবর্তন পরিবর্ধনে প্রস্তাব দেয়ার ও ভেটো দেয়ার অধিকারও আইম্মাতুল কুফরের।

ইসলামে নিরাপত্তাদানের মাপকাঠি নির্ধারিত

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সবটুকুই কাফের ও কুফরের নিরাপত্তা। অন্তত জাতিসংঘের সদস্য দেশ হিসাবে কোন দেশের জন্য নিরাপত্তার ভিন্ন কোন অর্থ নেই। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রচলিত অর্থের মাঝে ইসলামের স্বার্থ রক্ষা, ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন ও মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার কোন ধারণা নেই।

ইসলামের পরিভাষায় পৃথিবীর কুফর ও আইম্মাতুল কুফরের দেশগুলোর নাম হচ্ছে 'দারুল হারব'। ইসলামী বিধানে যা আগাগোড়া যুদ্ধক্ষেত্র। সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। কাফেরের বিরুদ্ধে মুসলমানের যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মেয়াদ দু'টি। এক হচ্ছে, কেয়ামত এসে গেলে কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ শেষ। এটা হচ্ছে হাদীসের হুবহু বক্তব্য।

আরেকটি হচ্ছে, কাফের যদি মুসলমান হয়ে যায় বা জিযয়া দিয়ে ও ক্রিতদাস হয়ে মুসলমানের অধীনস্ততা গ্রহণ করে। যিম্মী জীবন যাপন করে। এটা হচ্ছে কুরআনের হুবহু বক্তব্য। মুসলমানদের একটি বিশাল কাফেলা আজীবন এ কাজেই নিয়োজিত থাকবে। মূলত দু'টি মেয়াদই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া। হ্যাঁ! যুদ্ধ বিরতির সন্ধি হলেও তাতে যুদ্ধ বন্ধ থাকে, তবে তা একেবারেই সাময়িক একটি অবস্থা মাত্র।

শরীয়তের পরিভাষাই মাপকাঠি

মুসলমানদের প্রয়োজনে, মুসলমানদের স্বার্থে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে কখনো সাময়িক বিরতি হবে। ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হওয়ার পর আবার যুদ্ধ শুরু হবে।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দেয়া মেয়াদকে আমরা আমাদের মত করে রহিত করে দিয়েছি দু'টি দলিল দিয়ে। একটি হচ্ছে, জাতিসংঘের চুক্তি, আরেকটি হচ্ছে, উপনিবেশ পরবর্তী পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতি। আর এ সব হচ্ছে মূলত আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীগুলোর উদাহরণ-

﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ {سورة الأعراف: ٧١}

"তোমরা কি এমন নামসমূহের ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছ, যার নামকরণ করেছ তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।" -সূরা আরাফ ৭১

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ {سورة يوسف: ٤٠}

"তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।" -সূরা ইউসুফ ৪০

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ {سورة النجم: ٢٣}

"এগুলো কেবল কতিপয় নাম, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোন দলিল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেরা যা চায় তার অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত এসেছে।" -সূরা নাজম ২৩

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা তৈরি হবে মুসলমানে মুসলমানে। ইসলামের পরিচয়ে, ইসলামের সূত্রে। আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের। ঈমান ও কুফরের পার্থক্য জিইয়ে রাখার জন্য, ইসলাম ও কুফরের সীমারেখাকে স্পষ্ট করে রাখার জন্য। কুফরী শক্তিকে দমিত রাখার জন্য। কুফরী শক্তির সঙ্গে ঈমানী শক্তির শত্রুতা হবে প্রকাশ্য।

সুতরাং দারুল ইসলাম পাকিস্তান (?) আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তি ও আইম্মাতুল কুফরের সঙ্গে নিরাপত্তার যে জোট করেছে এবং সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের যে অঙ্গীকার করেছে তা একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্য খুবই উপযোগী, খুবই জরুরী।

পাকিস্তানের সংবিধান, আইন কানুন, মালিক পক্ষের মন-মানসিকতা, আচার ব্যবহার এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ -এগুলোর পরস্পরে কোন বৈপরীত্য নেই। যেমন রাষ্ট্রের পরিচালক তেমনই রাষ্ট্রের সংবিধান, তেমনই তার আইন এবং তেমনই তার প্রয়োগ।

সমস্যা দেখা দিয়েছে, আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে জোটবদ্ধ ও শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ একটি দেশকে যখন আল্লাহর বন্ধুদের রাহবারগণ দারুল ইসলাম বলে তৃপ্তি বোধ করেন। কুফরী শক্তির প্রহরীদের মাঝে যখন জিহাদ ও রিবাতের ফযীলত বিলি বণ্টন করতে থাকেন। কুফরী শক্তির স্বার্থ রক্ষাকারী একটি সংবিধানের ব্যাপারে যখন বলেন, এ সংবিধানের মূল স্তম্ভ হচ্ছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের স্বীকৃতির উপর।

আল্লাহর হাকিমিয়্যাত ও সংবিধানের এ ছত্রগুলো

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের একটি চিত্র আমরা দেখেছি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও ফাতওয়ার মাঝে। এর পাশাপাশি আমরা দেখলাম পাকিস্তান সংবিধানের নিম্নোক্ত কথাগুলো-

দেশ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তার ক্ষমতা ও শক্তিকে ব্যবহার করবে।? এমন বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থাপনা থাকবে যে, সংখ্যালঘুরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর থাকতে পারে, তার উপর আমল করতে পারে এবং নিজেদের সভ্যতার উন্নতি করতে পারে।? যার মাঝে মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেয়া হবে,

আর সেসব অধিকারের ক্ষেত্রে কানুন ও সাধারণ রীতি-নীতির বিবেচনায় মর্যাদা ও অবস্থান, কানূনের দৃষ্টিতে সমতা, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাজনৈতিক সাম্য ও মতামত, মতামতের বহিঃপ্রকাশ, আকীদা বিশ্বাস, ধর্ম, ইবাদত-উপাসনা ও সম্মিলনের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত হবে।? আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও মানব জাতির উন্নতি ও সচ্ছলতার ক্ষেত্রে নিজেদের পূর্ণ দায়িত্ব আদায় করতে পারে।? তাই আমরা এখন পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র।? এ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ব্যয়কৃত উদ্দীপনার সাথে যে গণতন্ত্র জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত চেষ্টা প্রচেষ্টার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে।

কী মিল? কী পার্থক্য?

এ পর্যায়ে এসে আমাদের সামনে দু'টি জটিল রকমের প্রশ্ন উদিত হয়। **এক.** আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের যে চিত্র আমরা কুরআন, হাদীস, ফিকহ-ফাতাওয়া ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দেখে এসেছি এর সঙ্গে পাকিস্তান সংবিধানের এ ছত্রগুলোর কী মিল? **দুই.** বিশ্বের অপরাপর কুফরী-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোর সংবিধান এবং পাকিস্তান সংবিধানের মাঝে কী পার্থক্য?

সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-কুফরী শক্তি যে নীতি ধারার উপর চলছে পাকিস্তান সে নীতিই গ্রহণ করেছে। ইসলামের জন্য ও মুসলমানদের জন্য অতিরিক্ত যে ছত্রগুলো বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য যতটুকু কালি ও কাগজ ব্যয় হয়েছে এতটুকু বাড়তি অধিকার পঁচানব্বই/আটানব্বই ভাগ জনগণ পেতেই পারে।

ছাড় আছে

সারা বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-কুফরী রাষ্ট্রেই মেজরিটি পার্সনের জন্য এমন অতিরিক্ত কিছু বরাদ্দ থাকে। এতে গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা-কুফরের গায়ে কোন আঁচড় লাগে না। এ কুফরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়োগকারীরা এতটুকু উদারতা সবার ক্ষেত্রে দেখিয়ে থাকেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি এতটুকু উদারতা না দেখালে সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নিরঙ্কুশ রাজত্ব করা যায় না।

গণতন্ত্র ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম যদি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের উপর রাজত্ব করে তাহলে তাদের সংবিধানের মাঝে হিন্দু ধর্মের জন্য কিছু

বাড়তি বরাদ্দ থাকবে। খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে রাজত্ব করলে খ্রিস্টানদের জন্য কিছু বাড়তি বরাদ্দ থাকবে। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে রাজত্ব করলে বৌদ্ধদের জন্য কিছু বাড়তি বরাদ্দ থাকবে। জেলে চাষাদের দেশে রাজত্ব করলে জেলে চাষাদের জন্য বাড়তি বরাদ্দ থাকবে। গণতন্ত্র ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নিয়ম অনেকটা এরকমই। সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য একটু বাড়তি বরাদ্দ না রাখলে সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নিজের শাসনের নীতি চালিয়ে দেয়া যায় না।

ছাড় নেই

কিন্তু ধর্মের কিতাব দিয়ে দেশ চলবে না। দেশ চলবে গণতন্ত্রের কিতাব দিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতার কিতাব দিয়ে। এ বিষয়ে এ ধর্মের লোকদের কোন অসতর্কতা নেই। কোন ছাড় নেই।

যে দেশে শাপলা ফুলের ঘ্রাণ বেশি সেখানে শাপলা ফুল জাতীয় ফুল। যেখানে ড্রাগনের গোশতে বেশি পুষ্টি সেখানে ড্রাগন জাতীয় জানোয়ার। যে দেশে শূকর বেশি সম্মানিত সেখানে শূকর জাতীয় পদক চিহ্ন। এ জাতীয় স্বীকৃতিতে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কোন কৃপণতা নেই।

শাপলা জাতীয় ফুল হওয়ার কারণে সর্বোচ্চ কোলাহলপূর্ণ এলাকায় স্থান পেয়ে হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে প্রতিদিন ঝর্ণার পানিতে গোসল করার সুযোগ পাচ্ছে। এর চাইতে বড় কোন চাওয়া পাওয়া শাপলার থাকতে পারে না। আসলে এতে শাপলা মনে কষ্ট নেয়ারও কিছু নেই, খুশি হওয়ারও কিছু নেই।

পাকিস্তানে এতগুলো ধর্মের অবাধ বিচরণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র ইসলামকে জাতীয় ধর্মের মান দেয়া হয়েছে -ইসলামের প্রতি এর চাইতে বড় করুণা আর হতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ পৃথিবীতে চলমান হাজারো ধর্মের মধ্যে একটি ধর্মের জন্য এর চাইতে আর বেশি কিছু করতে পারে না।

এসবই সত্য। শতবার সত্য।

কিন্তু এ সত্যের আরেকটি অনিবার্য সত্য হচ্ছে, এমন একটি দেশ ইসলামের হয় না। তাই পাকিস্তান ইসলামের নয়। কুরআনের নয়, হাদীসের নয়। এ দেশের হাকিমিয়্যাত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নয়।

পাকিস্তান-সংবিধান : কিছু মৌলিক ধারা উপধারা

পাকিস্তান-সংবিধান : কাফের ও মহিলার মজলিসে শূরা

اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور

قومی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لئے مخصوص نشستوں کے بشمول ارکان کی تین سو بیالس نشستیں ہو گی۔ مجلس شوری ۱/۲۶

شق (۳) میں محول نشستوں کی تعداد کے علاوہ قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کے لئے دس نشستیں مختص کی جائیں گی۔ مجلس شوری ۱/۲۷

غیر مسلموں کے لئے مخصوص تمام نشستوں کے لئے حلقو انتخاب پورا ملک ہو گا۔ مجلس شوری ۱/۲۸

"জাতীয় সংসদে মহিলা ও অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ মোট তিন শত বেয়াল্লিশ আসন হবে।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, মজলিসে শূরা পৃ: ১/২৬

"অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত আসন ছাড়াও জাতীয় সংসদে অমুসলিমদের জন্য দশটি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, মজলিসে শূরা পৃ: ১/২৭

"অমুসলিমদের জন্য তাদের সকল আসন নির্বাচনের ক্ষেত্র হবে সারা দেশ।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, মজলিসে শূরা পৃ: ১/২৮

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

এক. জাতীয় পরিষদে জনপ্রতিনিধি হিসাবে ও আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে মহিলা থাকবে।

দুই. জাতীয় পরিষদে জনপ্রতিনিধি ও আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে অমুসলিম থাকবে।

তিন. কোন অমুসলিম স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আইন পরিষদের সদস্য হতে পারার পাশাপাশি আলাদা করে দশটি আসনও তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণেই তারা এ সদস্যপদগুলোর অধিকারী হবে।

এ দফাগুলোর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে-

ক) মহিলা নেতৃত্বের পথ সুগম হবে যা হাদীসে রাসূলের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ।

খ) নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের ব্যবধান মুছে ফেলা। যে ব্যবধানের জন্য আল্লাহ তাআলার ওহির ধারা চালু ছিল। যে ব্যবধানের জন্য সকল নবীর সকল দাওয়াতের আয়োজন। যে ব্যবধানের জন্য ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ফরয বিধান। যে ব্যবধানের জন্য জিহাদ, জিযয়া, গোলামীসহ সকল বিধানের আয়োজন।

গ) রাষ্ট্র পরিচালনায় মুসলিম-অমুসলিম ভাগাভাগি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে পাকিস্তানের জন্ম সে পাকিস্তানে অমুসলিমকে ভাগ দেয়া হল শতকরা হারে অনেক বেশি। তাহলে মাদানী রহ. সহ ওলামায়ে কেরামের একাংশের সঙ্গে দ্বিমত করে খণ্ড ভারত কেন?

বলাবাহুল্য, মহিলার ক্ষমতায়ন, অমুসলিমদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশিদার করা, ধর্মে ধর্মে ব্যবধান মুছে সকল ধর্ম মিলে একসাথ হয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ও পরিচালনা করা এসবই আব্রাহাম লিংকন ও রুশো, ভোল্টায়ারের থিওরী। কুরআন, সুন্নাহ তথা শরীয়ার থিওরী এটা নয়।

অথচ শরীয়ত বলছে

শরীয়ার থিওরী হচ্ছে, আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দুশমন অমুসলিমদের তিন অবস্থা। তরবারীর নিচে (সাময়িক যুদ্ধবিরতির সময় ব্যতীত), গোলামীর জিঞ্জিরে, জিযয়ার কাঠগড়ায়। এ ছাড়া চতুর্থ অবস্থা থেকে যত অবস্থা রয়েছে তার সবই আমাদের দুর্বলতা, অবহেলা ও শরীয়ার প্রতি অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। যেগুলোকে আমরা আমাদের ফযীলত ও গুণ হিসাবে তুলে ধরতে পছন্দ করে থাকি। কুরআনের বার বার পঠিত এ আয়াতটি আবারো দেখুন-

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ {سورة التوبة: ٢٩}

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সেসব লোকদের সঙ্গে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়া পর্যন্ত।" -সূরা তাওবা ২৯

আরো দেখুন

সন্দেহ না কাটলে আয়াতের তাফসীর দেখুন, হাদীস দেখুন, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির নমুনা দেখুন-

﴿وَقَوْلُهُ: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} أَيْ: إِنْ لَمْ يُسْلِمُوا، {عَنْ يَدٍ} أَيْ: عَنْ قَهْرٍ لَهُمْ وَغَلَبَةٍ، {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أَيْ: ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ. فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِعْزَازُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا رَفْعُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُمْ أَذِلَّاءُ صَغَرة أَشْقِيَاءُ﴾ {تفسير ابن كثير: ١٣٣/٤}

"আল্লাহর বাণী حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ অর্থাৎ, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, عَنْ يَدٍ অর্থাৎ, তাদের প্রতি কঠোরতা ও বিজয়ের মাধ্যমে, وَهُمْ صَاغِرُونَ অর্থাৎ, অপদস্ত, নিকৃষ্ট ও হীন। এ কারণেই যিম্মীদেরকে সম্মান করা জায়েয নেই এবং তাদেরকে মুসলমানদের উপরে মান দেয়া জায়েয নেই। তারা বরং হীন, নিকৃষ্ট ও হতভাগা।" – ইবনে কাসীর : ৪/১৩৩

﴿كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ﴾ {مسلم: رقم الحديث ٢١٦٧- ١٧٠٧/٤}

"যেমন সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে আগে সালাম দিও না, আর যখন তাদের কারো সঙ্গে রাস্তায় তোমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর।" মুসলিম : ৪/১৭০৭

﴿وَلِهَذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تِلْكَ الشُّرُوطَ الْمَعْرُوفَةَ فِي إِذْلَالِهِمْ وَتَصْغِيرِهِمْ وَتَحْقِيرِهِمْ، وَذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْحُفَّاظُ، مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ صَالَحَ نَصَارَى مِنْ أَهْلِ الشَّامِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ لِعَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا، إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمُ الْأَمَانَ لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارِينَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا أَلَّا نُحْدِثَ فِي مَدِينَتِنَا وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَةً، وَلَا قِلَايَةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَلَا نُجَدِّدَ مَا خَرِبَ مِنْهَا، وَلَا نُحْيِيَ مِنْهَا مَا كَانَ خُطَطَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَلَّا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا أَنْ يَنْزِلَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، وَأَنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَأَنْ يَنْزِلَ مَنْ مَرَّ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نُطْعِمُهُمْ، وَلَا نأوي فِي كَنَائِسِنَا وَلَا مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا، وَلَا نَكْتُمَ غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا نُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا الْقُرْآنَ، وَلَا نُظْهِرَ شِرْكًا، وَلَا نَدْعُوَ إِلَيْهِ أَحَدًا؛ وَلَا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتِنَا الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ إِنْ أَرَادُوهُ، وَأَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ نَقُومَ لَهُمْ مِنْ مَجَالِسِنَا إِنْ أَرَادُوا الْجُلُوسَ.

وَلَا نَتَشَبَّهَ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ مَلَابِسِهِمْ، فِي قَلَنْسُوَةٍ، وَلَا عِمَامَةٍ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ، وَلَا نَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِمْ، وَلَا نَكْتَنِيَ بِكُنَاهم، وَلَا نَرْكَبَ السُّرُوجَ، وَلَا نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ، وَلَا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ السِّلَاحِ، وَلَا نَحْمِلَهُ مَعَنَا، وَلَا نَنْقُشَ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَا نَبِيعَ الْخُمُورَ، وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِيمَ رُءُوسِنَا، وَأَنْ نَلْزَمَ زِينا حَيْثُمَا كُنَّا، وَأَنْ نَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا، وَأَلَّا نُظْهِرَ الصَّلِيبَ عَلَى كَنَائِسِنَا، وَأَلَّا نُظْهِرَ صُلُبَنَا وَلَا كُتُبَنَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقِهِمْ، وَلَا نَضْرِبَ نَوَاقِيسَنَا فِي كَنَائِسِنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيًّا، وَأَلَّا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا فِي شَيْءٍ مِنْ حَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا نُخْرِجَ شَعَانِينَ وَلَا بَاعُوثًا، وَلَا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، وَلَا نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقِهِمْ، وَلَا نُجَاوِرَهُمْ بِمَوْتَانَا، وَلَا نَتَّخِذَ مِنَ الرَّقِيقِ مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ نُرْشِدَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي منازلهم.

قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بِالْكِتَابِ، زَادَ فِيهِ: وَلَا نَضْرِبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، شَرَطْنَا لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَانَ، فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا فِي شَيْءٍ مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ وَوَظَفْنا عَلَى أَنْفُسِنَا، فَلَا ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ﴾ {تفسير ابن كثير : ١٣٣/٤}

মুসলিম দেশে অমুসলিম কেমন থাকবে

"এ কারণেই আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের হীনতা ও নিকৃষ্টতার প্রকাশের জন্য সে প্রসিদ্ধ শর্তগুলো আরোপ করেছিলেন। সেসব শর্ত যা হাফেয ইমাম মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন-

আব্দুর রহমান ইবনে গান্‌ম আশআরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহ আনহুর জন্য লিখেছি যখন তিনি সিরিয়ার খ্রিস্টানদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি আল্লাহর বান্দা ওমর আমীরুল মুমিনীনের প্রতি অমুক অমুক শহরের খ্রিস্টানদের চিঠি। আপনি যখন আমাদের এখানে এসেছেন তখন আমরা আপনার কাছে আমাদের জন্য, আমাদের বাচ্চাদের জন্য, আমাদের সম্পদের জন্য এবং আমাদের ধর্মাবলম্বীদের জন্য আপনার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিলাম। তখন আপনার পক্ষ থেকে আমরা আমাদের উপর অত্যাবশ্যকীয় করে নিয়েছিলাম যে,

আমরা আমাদের শহরে এবং তার আশপাশে কোন মঠ, গির্জা, সন্যাসী আশ্রম বা বিশপের বাসস্থান নতুন করে তৈরি করব না। এমনিভাবে এসবের যা ধ্বংস হয়ে গেছে সেগুলোকেও নতুন করে সংস্কার করব না। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো মুসলমানদের প্রকল্পভুক্ত সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করব না।

কোন মুসলমানকে আমরা আমাদের গির্জাগুলোতে রাতে দিনে কখনো অবস্থান করতে বাধা দেব না। পথিক ও আগন্তুকদের জন্য সেগুলোর দরজা প্রশস্ত রাখব।

মুসলিম কোন মুসাফির আমাদের এখানে অবস্থান করলে আমরা তাদেরকে তিন দিন পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ করব।

আমরা আমাদের গির্জাগুলোতে এবং আমাদের বাড়িঘরে কোন গুপ্তচরকে আশ্রয় দেব না।

মুসলমানদের বিষয়ে আমরা আমাদের মনে কোন প্রকার প্রতারণার মনোভাব পোষণ করব না।

আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শেখাব না।

আমরা প্রকাশ্যে কোন শিরক করব না এবং সে দিকে কাউকে আহ্বান করব না।

আমাদের নিকটাত্মীয়দের কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে আমরা তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দেব না।

আমরা মুসলমানদেরকে সম্মান করব এবং আমরা তাদের সম্মানে আমাদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাব যদি তারা বসতে চায়।

আমরা মুসলমানদের পোষাক, টুপি, পাগড়ি, পাদুকা, মাথার সিঁথি কোন ক্ষেত্রেই তাদের সুরত ধরব না।

আমরা তাদের ভাষায় কথা বলব না। তাদের উপনামে উপনাম রাখব না।

আমরা জিনপোষের উপর আরোহন করব না। তরবারী ঝুলিয়ে রাখব না। কোন প্রকার অস্ত্র গ্রহণ করব না এবং আমাদের সঙ্গে বহন করব না।

আমরা আমাদের আংটিগুলোর মধ্যে আরবীতে নকশা করব না।

আমরা মদ বিক্রয় করব না।

আমরা আমাদের মাথার অগ্রভাগ ছেটে রাখব।

আমরা যেখানেই থাকব আমাদের বেশ-ভূষা অবশ্যই গ্রহণ করব।

আমরা পৈতা বাঁধব মাঝ বরাবর।

আমরা আমাদের গির্জাগুলোর উপরে ক্রুশ উত্তোলন করব না। এমনিভাবে আমাদের ক্রুশ, আমাদের কোন কিতাব মুসলমানদের কোন রাস্তায় বা তাদের বাজারে প্রদর্শন করব না।

আমরা আমাদের গির্জাগুলোতে ঘণ্টা বাজাব না। বাজালেও একেবারে ক্ষীণ আওয়াজে বাজাব।

আমরা আমাদের গির্জাগুলোতে কোন মুসলমানের উপস্থিতিতে পড়ার শব্দ উঁচু করব না

আমরা পাম সানডে ও স্টার উৎসব করব না।

আমরা আমাদের মৃতদেরকে নিয়ে আওয়াজ উঁচু করব না এবং মুসলমানদের কোন পথে বা বাজারে তাদের সঙ্গে আগুন প্রদর্শন করব না এবং মুসলমানদের পাশ দিয়ে আমাদের মৃতদেরকে নিয়ে যাব না।

আমরা সেসব গোলাম গ্রহণ করব না যার উপর মুসলমানদের অংশ আছে।

আমরা মুসলমানদেরকে পথ দেখিয়ে দেব এবং তাদের ঘরে উঁকি ঝুঁকি দেব না।

তিনি বলেন, এরপর আমি যখন লেখাটি নিয়ে ওমরের কাছে আসলাম তখন তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন-

আমরা কোন মুসলমানকে মারধর করব না।

আমরা আপনাদের পক্ষ থেকে এ শর্ত গ্রহণ করেছি আমাদের উপর, আমাদের ধর্মাবলম্বীদের উপর এবং এর উপর আমরা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছি। অতএব আমরা যদি এসকল শর্তের কোনটির বরখেলাফ করি যা আপনাদের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি এবং নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছি তাহলে আমাদের উপর আপনার যিম্মাদারী নেই। আমাদের ক্ষেত্রে সেসবই করা বৈধ হবে যা অবাধ্য হারবীদের ক্ষেত্রে বৈধ।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/১৩৩

পাকিস্তান-সংবিধান : স্পিকার মুসলমান হওয়া জরুরী নয়

بطور اسپیکر یاڈپٹی اسپیکر منتخب شدہ رکن اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل قومی اسمبلی کے سامنے جدول سوم میں مندرج عبارت میں حلف اٹھائے گا۔ مجلس شوری ۱/۲۹

قومی اسمبلی کا اسپیکر یا

یا سینٹ کا چیر مین

(آرٹیکل ۵۳ (۲) اور ۶۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے)

میں .... صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار ہونگا:

کہ، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر (یا سینٹ کے چیر مین) کی حیثیت سے اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لئے کہا جائے گا، میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی،

ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اسمبلی کے قواعد کے مطابق (یا سینٹ کے چیر مین کی حیثیت سے سینٹ کے قواعد کے مطابق) اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا۔

کہ میں اسلامی نظریہ کو بر قرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو بر قرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور وفاداری کرونگا:

اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلاخوف ورعایت اور بلا رغبت وعناد قانون کے مطابق انصاف کرونگا۔

اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۱۰)

অনুবাদ

"জাতীয় সংসদের স্পিকার অথবা

সিনেটের চেয়ারম্যান

[অনুচ্ছেদ ৫৩ (২), (৬১)]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

আমি জাতীয় সংসদের স্পিকার (অথবা সিনেটের চেয়ারম্যান) হিসাবে এবং কখনো যদি আমাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য বলা হয় তখন, আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন মোতাবেক এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসাবে সংসদের নিয়মানুযায়ী (অথবা সিনেটের চেয়ারম্যন হিসাবে সিনেটের নিয়মানুযায়ী) এবং সর্বদা পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যনধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহয্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২১০

গুরুত্বপূর্ণ হলফনামাসমূহ

পাকিস্তানের মালিক পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের হলফনামাগুলোর কিছু হুবহু শব্দে এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্টের হলফনামা

جدول سوم

عہدوں کے حلف

[آرٹیکل ۴۲]

صدر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿شروع کرتاہوں اللہ کے نام سے جو بڑامہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں،......................، صدق دل سے حلف اٹھاتاہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت وتوحید قادر مطلق اللہ تبارک وتعالیٰ، کتب الٰہیہ، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النّبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، روز قیامت اور قرآن پاک وسنت کی جملہ مقتضیات وتعلیمات پر ایمان رکھتاہوں:

کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت صدر پاکستان، میں اپنے فرائض وکار ہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کوبر قرارر کھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کوبر قرارر کھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلا رغبت وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلاواسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دونگا اور نہ اسے ظاہر کرونگا جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جب کہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کماحقہ انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو۔

[اللہ تعالٰی میری مدد اور رہنمائی فرمائے ﴿آمین﴾۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۱۳)

জাদওয়ালে সুয়াম

অনুচ্ছেদ- ৪২

প্রেসিডেন্ট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি মুসলমান, কাদেরে মুতলাক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার একক সত্তার স্বীকৃতি ও তাওহীদের বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবসমূহ যার মধ্যে সর্বশেষ কিতাব কুরআন পাক, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হিসাবে যাঁর পর আর কোন নবী আসতে পারেন না, কেয়ামতের দিন, কুরআন ও সুন্নাহের সকল দাবি ও সকল শিক্ষার উপর ঈমান রাখি।

আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে, আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন মোতাবেক এবং সর্বদা পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যনধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আর আমি কোন ব্যক্তিকে সরাসরি বা কোন মাধ্যমে এমন কোন বিষয়ে অবগত করব না এবং তা প্রকাশ করব না যা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার সামনে বিবেচনার জন্য দেয়া হবে, অথবা আমার অবগতিতে থাকবে। তবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য তা করা জরুরী হলে করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২১৩

প্রধানমন্ত্রীর হলফনামা

۲

وزیر اعظم

[آرٹیکل ۹۱] ﴿۵﴾ [[

بِسۡمِ اللہ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

﴿شروع کرتاہوں اللہ کے نام سے جو بڑامہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں، ....، صدق دل سے حلف اٹھاتاہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت وتوحید قادر مطلق اللہ تبارک وتعالی، کتب الٰہیہ، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبّیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، روز قیامت اور قرآن پاک وسنت کی جملہ مقتضیات وتعلیمات پر ایمان رکھتاہوں:

کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، میں اپنے فرائض وکار ہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کوبر قرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کوبر قرار رکھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلارغبت وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دونگا اور نہ اسے ظاہر کرونگا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جب کہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کماحقہ انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو۔

[اللہ تعالٰی میری مدد اور رہنمائی فرمائے ﴿آمین﴾۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۱۴)

প্রধানমন্ত্রী

অনুচ্ছেদ ৯১ (৫)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি মুসলমান, কাদেরে মুতলাক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার একক সত্তার স্বীকৃতি ও তাওহীদের বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবসমূহ যার মধ্যে সর্বশেষ কিতাব কুরআন পাক, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হিসাবে যাঁর পর আর কোন নবী আসতে পারেন না, কেয়ামতের দিন, কুরআন ও সুন্নাহের সকল দাবি ও সকল শিক্ষার উপর ঈমান রাখি।

আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন মোতাবেক এবং সর্বদা পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও সচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আর আমি কোন ব্যক্তিকে সরাসরি বা কোন মাধ্যমে এমন কোন বিষয়ে অবগত করব না এবং তা প্রকাশ করব না যা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

হিসাবে আমার সামনে বিবেচনার জন্য দেয়া হবে, অথবা আমার অবগতিতে থাকবে। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য তা করা জরুরী হলে করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২১৪

বেফাকী ওযীর বা ওযীরে মামলাকাতের (ফেডারেল মন্ত্রী) হলফনামা

۳

وفاقی وزیر یاوزیر مملکت

[آرٹیکل ۹۲﴿۲﴾]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

﴿شروع کرتاہوں اللہ کے نام سے جو بڑامہربان نہایت رحم کرنے والاہے۔﴾

میں، ....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں

خلوص نیت سے پاکستان کاحامی ووفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت وفاقی وزیر﴿یاوزیر مملکت﴾، میں اپنے فرائض وکار ہائے منصبی

ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان

کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری، سالمیت، استحکام،

یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو بر قرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو بر قرار رکھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلارغبت وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلاواسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دونگا اور نہ اسے ظاہر کرونگا جو بحیثیت وفاقی وزیر ﴿یاوزیر مملکت﴾ پاکستان میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جب کہ بحیثیت وفاقی وزیر ﴿یاوزیر مملکت﴾ اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے ﴿آمین﴾۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۱۶)

বেফাকী ওযীর বা ওযীরে মামলাকাত

অনুচ্ছেদ ৯২(২)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

আমি পাকিস্তানের বেফাকী ওযীর (বা ওযীরে মামলাকাত) হিসাবে, আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন মোতাবেক এবং সর্বদা পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আর আমি কোন ব্যক্তিকে সরাসরি বা কোন মাধ্যমে এমন কোন বিষয়ে অবগত করব না এবং তা প্রকাশ করব না যা পাকিস্তানের বেফাকী ওযীর (বা ওযীরে মামলাকাত) হিসাবে আমার সামনে বিবেচনার জন্য দেয়া হবে, অথবা আমার অবগতিতে থাকবে, তবে বেফাকী ওযীর (বা ওযীরে মামলাকাত) হিসাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য তা করা জরুরী হলে, অথবা প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে অনুমতি দিলে তা করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)”

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২১৬

সংসদের ডেপুটি স্পিকারের হলফনামা

۴

قومی اسمبلی کاڈپٹی اسپیکر یا

سینٹ کاڈپٹی چیئرمین

[آرٹیکل ۵۳﴿۲﴾اور ۲۱]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿شروع کرتاہوں اللہ کے نام سے جو بڑامہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں،.............................، صدق دل سے حلف اٹھاتاہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی ووفادار رہونگا:

کہ، جب کبھی مجھے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی﴿یا چیئرمین سینٹ﴾ کام کرنے کو کہاجائے گا، میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری،سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کوبرقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو برقرار رکھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے ﴿آمین﴾ ۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۱۷)

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অথবা সিনেটের ডেপুটি চেয়ারম্যান

অনুচ্ছেদ ৫৩(২) ও ৩১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

আমাকে যখনই জাতীয় সংসদের স্পিকার (অথবা সিনেটের চেয়ারম্যান) হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হবে, আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)”

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২১৭

সংসদ সদস্যের হলফনামা

۵

قومی اسمبلی کارُکن، یا

سینٹ کارُکن

[آرٹیکل ٦۵]

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں، ....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں

خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت رکن قومی اسمبلی (یا سینٹ)، میں اپنے فرائض وکار ہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی (یا سینٹ) کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو برقرار رکھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا۔

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۱۸)

জাতীয় সংসদের সদস্য অথবা

সিনেট সদস্য

অনুচ্ছেদ ৬৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

জাতীয় সংসদের সদস্য (অথবা সিনেটের সদস্য) হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার

সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, কানূন ও সংসদের (অথবা সিনেটের) নিয়ম কানূন অনুযায়ী সব সময় পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২১৮

প্রাদেশিক গভর্নরের হলফনামা

٦

صوبے کا گورنر

[آرٹیکل ۱۰۲]

بِسۡمِ اللّٰہ الرَّحمٰنِ الرَّحِیۡم

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں، ....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں

خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہو نگا:

کہ، بحیثیت گورنر صوبہ...................... میں اپنے فرائض وکار ہائے

منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت

پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو برقرار رکھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلا رغبت وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

اور یہ کہ کسی شخص کو بلاواسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دونگا اور نہ اس پر ظاہر کرونگا جو بحیثیت گورنر صوبہ............ میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جایگا یا میرے علم میں آیگا بجز جب کہ بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کماحقہ، انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو۔

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۱۹)

প্রাদেশিক গভর্নর

অনুচ্ছেদ ১০২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

প্রাদেশিক গভর্নর হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আর আমি কোন ব্যক্তিকে সরাসরি বা কোন মাধ্যমে এমন কোন বিষয়ে অবগত করব না এবং তা প্রকাশ করব না যা পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর হিসাবে আমার সামনে বিবেচনার জন্য দেয়া হবে, অথবা আমার অবগতিতে থাকবে, তবে গভর্নর হিসাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য তা করা জরুরী হলে করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃঃ ২১৯

মুখ্যমন্ত্রীর হলফনামা

ے

وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزیر

[آرٹیکل [۱۳۰(۵)] اور ۱۳۲(۲)]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں، ....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں

خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت وزیر اعلیٰ (یا وزیر) حکومت صوبہ.................... میں اپنے

فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ،

اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی

خودمختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی

بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں

ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو برقرار رکھونگا اور اس کا

تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلا رغبت وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

اور یہ کہ، میں کسی شخص کو بلاواسطہ یابالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دونگا نہ اس پر ظاہر کرونگا جو وزیر اعلیٰ (یاوزیر) کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائیگا یا میرے علم میں آئیگا بجز جب کہ وزیر اعلیٰ (یاوزیر) کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کماحقہ، انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری (یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو)۔

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۰)

মুখ্যমন্ত্রী বা প্রাদেশিক মন্ত্রী

অনুচ্ছেদ ১৩০ (৫) এবং ১৩২ (২)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

আমি মুখ্যমন্ত্রী (অথবা প্রাদেশিক মন্ত্রী) হিসাবে আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শক্রতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আর আমি কোন ব্যক্তিকে সরাসরি বা কোন মাধ্যমে এমন কোন বিষয়ে অবগত করব না এবং তা প্রকাশ করব না যা মূখ্যমন্ত্রী (অথবা প্রাদেশিক মন্ত্রী) হিসাবে আমার সামনে বিবেচনার জন্য দেয়া হবে, অথবা আমার অবগতিতে থাকবে, তবে মূখ্যমন্ত্রী (অথবা মন্ত্রী) হিসাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য তা করা জরুরী হলে (অথবা ওযীরে আলা বিশেষভাবে অনুমতি দিলে) করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২০

প্রাদেশিক সংসদের স্পিকারের হলফনামা

۸

کسی صوبائی اسمبلی کا اسپیکر

[آرٹیکل ۵۳(۲) اور ۱۲۷]

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں،.........................، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں

خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہو نگا:

کہ، بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی صوبہ......................[اور جب کبھی
بھی مجھے بحیثیت گورنر کام کرنے کے لیے کہا جائے گا تو] ....
میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری
کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد
مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی
خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی
بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں
ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو برقرار رکھونگا اور اس کا
تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلارغبت
وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۱)

প্রাদেশিক সংসদের স্পিকার

অনুচ্ছেদ ৫৩ (২) এবং ১২৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

প্রাদেশিক সংসদের স্পিকার হিসাবে এবং যখনই আমাকে গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হবে, আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২১

প্রাদেশিক সংসদের ডেপুটি স্পিকারের হলফনামা

৭

کسی صوبائی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر

[آرٹیکل ۵۳(۲) اور ۱۲۷]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں،..............................، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہونگا:

کہ، جب کبھی مجھے بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی صوبہ .... کام کرنے کے لئے کہا جائے گا میں اپنے فرائض و کار ہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو بر قرار رکھونگا اور اس کا
تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلارغبت
وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۲)

প্রাদেশিক সংসদের ডেপুটি স্পিকার

অনুচ্ছেদ ৫৩ (২) ১২৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

প্রাদেশিক সংসদের স্পিকার হিসাবে যখনই আমাকে দায়িত্ব দেয়া হবে আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি আমার ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২২

প্রাদেশিক সংসদ সদস্যের হলফনামা

১০

کسی صوبائی اسمبلی کا رکن

[آرٹیکل ۱۶۵ اور ۱۲۷]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں،..............................، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں

خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی میں اپنے فرائض و کار ہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دونگا:

کہ میں اسلامی نظریہ کوبر قرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کوبر قرار رکھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا۔

[اللہ تعالٰی میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۳)

প্রাদেশিক সংসদের সদস্য

অনুচ্ছেদ ১৬৫ এবং ১২৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

প্রাদেশিক সংসদ সদস্য হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২৩

প্রধান হিসাব রক্ষকের হলফনামা

১১

محاسبِ اعلیٰ پاکستان

[آرٹیکل۱۲۸(۲)]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں،..............................، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی ووفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت محاسبِ اعلیٰ پاکستان میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی، ایمان داری، اپنی انتہائی صلاحیت اور دفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور اپنے بہترین علم وواقفیت، صلاحیت اور قوتِ فیصلہ کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلارغبت وعناد انجام دونگا، اور یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا۔

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۴)

প্রধান হিসাব রক্ষক পাকিস্তান

অনুচ্ছেদ ১২৮ (২)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

পাকিস্তানের প্রধান হিসাব রক্ষক হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব ও দায়িত্বভিত্তিক কাজসমূহ ঈমানদারী এবং নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার, যোগ্যতা ও সিদ্ধান্তের পাওয়ারের সাথে, কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পাদন করব। আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২৭

প্রধান বিচারপতির হলফনামা

۱۲

چیف جسٹس پاکستان یا کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس

یا عدالت عظمٰی یا کسی عدالت عالیہ کا جج

[آرٹیکل ۱۷۸ اور ۱۹۴]

بسم اللہ الرّحمن الرّحیم

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں، ....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں
خلوص نیت سے پاکستان کا حامی ووفادار رہونگا:

کہ، بحیثیت چیف جسٹس پاکستان (یا جج عدالت عظمیٰ پاکستان، یا چیف جسٹس یا جج عدالتِ عالیہ صوبہ یا صوبہ جات ....) میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی ایمان داری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دونگا:

کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرونگا:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو بر قرار رکھونگا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا:

کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلاخوف ورعایت اور بلا رغبت وعناد، قانون کے مطابق انصاف کرونگا:

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۵)

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি অথবা

কোন উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি অথবা

সুপ্রিমকোর্ট অথবা কোন উচ্চ আদালতের জজ

অনুচ্ছেদ ১৭৮ এবং ১৯৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি (অথবা সুপ্রিমকোর্ট পাকিস্তানের জজ, অথবা প্রাদেশিক উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি) হিসাবে নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বাধিকার, নিরাপত্তা, মজবুতি, ঐক্য ও স্বচ্ছলতার জন্য সম্পাদন করব।

আমি উচ্চতর আদালতি কাউন্সিলের জারি করা নিয়ম-নীতিমালার পাবন্দী করব।

আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব এবং তার সংরক্ষণ ও ওফাদারী করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী ইনসাফ করব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)”

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২৫

প্রধান নির্বাচন কমিশনের হলফনামা

۱۳

چیف الیکشن کمشنر [یا الیکشن کمیشن پاکستان کا کوئی رکن]

[آرٹیکل ۲۱۴]

بِسمِ اللہ الرَّحمنِ الرَّحیم

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں ....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت

چیف الیکشن کمشنر [یا جیسی بھی صورت ہو، الیکشن کمیشن پاکستان کا کوئی رکن] میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی، ایمان داری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور بلا خوف ورعایت اور بلا رغبت وعناد انجام دونگا، اور یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا۔

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۶)

প্রধান নির্বাচন কমিশন (অথবা পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য)

অনুচ্ছেদ ২১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব।

প্রধান নির্বাচন কমিশন (অথবা পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য) হিসাবে নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও কানূন অনুযায়ী, আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া ও কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে এবং যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কানূন অনুযায়ী করব এবং আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সরকারী কাজ বা আমার সরকারী কোন ফয়সালাকে প্রভাবিত হতে দেব না।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২৬

সেনাবাহিনীর হলফনামা

۱۴

مسلح افواج کے ارکان

[آرٹیکل ۲۴۴]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔﴾

میں ....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں

خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہونگا اور اسلامی جمہوریت پاکستان کے

دستور کی حمایت کروںگا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروںگا اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی بری فوج (یا بحری یا فضائی فوج) میں پاکستان کی خدمت ایمان داری اور وفاداری کے ساتھ انجام دونگا۔

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

(اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، جدول سوم ص: ۲۲۷)

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য

অনুচ্ছেদ ১৪৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান ও অনেক দয়াবান)

আমি .... আন্তরিকভাবে হলফ করছি যে, আমি নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার থাকব এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানকে রক্ষা করব যা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। আমি আমাকে কোন প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত করব না। আর আমি কানূন অনুযায়ী এবং তার অধীনে পাকিস্তানের স্থলবাহিনী (অথবা নৌবাহিনী, অথবা বিমান বাহিনী) ঈমানদারী ও ওফাদারীর সাথে পাকিস্তানের সেবা করে যাব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)"

-ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, জাদওয়ালে সুয়াম পৃ: ২২৭

এভাবেই পাকিস্তান সংবিধানে হলফনামাগুলোর উল্লেখ এসেছে। হলফনামাগুলো উল্লেখ করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর হলফনামা ব্যতীত আর কারো

হলফনামাতেই হলফকারীরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি করার কোন সূত্র রাখা হয়নি।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীসহ কারো কোন হলফনামাতেই ইসলামী আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক কোন অঙ্গীকারের কোন উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক মানব রচিত আইন রক্ষা করার বিষয়ে সবার হলফনামাতেই উল্লেখ রয়েছে।

যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে, পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য যারা আইন প্রণয়ন করবে তারা মুসলমান হওয়া জরুরী নয়। এমনিভাবে পাকিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের কোন ফরয দায়িত্বও তাদের উপর নেই। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে একটি ঐচ্ছিক ও পার্শ্ব বিষয়। আর কোন মুসলমান মুরতাদ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করাকে ঐচ্ছিক বিষয় মনে করবে।

পাকিস্তান-সংবিধানঃ প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা মুসলমান হওয়া জরুরী নয়

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ–

এক. প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর হলফনামার শুরুতে উল্লিখিত এ অংশটি **'আমি মুসলমান এবং কাদেরে মুতলাক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার তাওহীদ, আল্লাহর কিতাবসমূহ যার মধ্যে কুরআন পাক সর্ব শেষ কিতাব, খাতামুন নাবিয়্যীন হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁর পর কোন নবী আসতে পারে না, কেয়ামত দিবস, কুরআন পাক ও সুন্নাহের সকল দাবি ও শিক্ষার উপর ঈমান রাখি.......'** খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত আর কারো হলফনামায় শপথকারী মুসলমান হওয়া বিষয়ে স্বীকৃতিমূলক এ কথাটি নেই। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর শপথনামায় কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ থাকার কারণে কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক.** নিজে মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতিমূলক বক্তব্যটি অর্থবহ। প্রেসিডন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া জরুরী। **দুই.** এটি অর্থবহ কোন কথা নয়। এমনি একটি

কথার কথা। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হবে এটাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে এর উল্লেখ এসেছে। এটি কোন শর্ত হিসাবে শপথবাক্যে আসেনি।

যদি কথাটি শর্ত হিসাবে হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সে হুকুম ও কথাগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যে হুকুম ও কথাগুলো অন্যান্য সকল শপথকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি কথাটি শর্ত হিসাবে না হয় তাহলে শপথকারী সকলের ক্ষেত্রে একই হুকুম ও কথা প্রযোজ্য হবে। যে হুকুম ও কথা এখন ইনশাআল্লাহ ব্যাখ্যা করা হবে।

সংবিধানের অপরাপর বক্তব্য অনুযায়ী এ কথাই বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। সুতরাং শপথবাক্যের এ অংশটি কাকতালীয় কোন বিষয় নয়; বরং একটি উদ্দেশ্যমূলক বিষয় এবং এটি একটি শর্ত।

অতএব যাদের শপথবাক্যে নিজে মুসলমান হওয়া বিষয়ে স্বীকৃতিমূলক এ বক্তব্যটি নেই সেখানে তা না থাকাটাও কাকতালীয়ভাবে নয়; বরং উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ এ দু'টি পদ ব্যতীত আর কোন পদের অধিকারী মুসলমান হওয়া শর্ত নয়।

দুই. আইন প্রণয়ন পরিষদের প্রধান ব্যক্তি স্পিকার বা সিনেট চেয়ারম্যান আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ তথা শরয়ী বিধানের কাছে দায়বদ্ধ -এমন কোন কথা তার অঙ্গীকারনামায় নেই। এরই বিপরীত তার দায়বদ্ধতা আছে সংবিধান, পাকিস্তানের আইন ও সংসদের নিয়ম কানূনের কাছে, যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়েছে। যে ভোটাররা মুসলমান হওয়া জরুরী নয়। যে আইন প্রণেতারা মুসলমান হতে হবে এমন কোন শর্ত পাকিস্তান সংবিধানে দেয়া হয়নি।

যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে, এ সংবিধানের বক্তব্য অনুযায়ী

ক) যে আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্য অমুসলিম হতে কোন বাধা নেই, সে আইন পরিষদের নামই হচ্ছে 'মজলিসে শূরা'। আর সে আইনকেই মুসলমানরা শ্রদ্ধা করে মেনে চলতে হবে।

খ) প্রধান বিচারপতি-কাযিউল কুযাত থেকে শুরু করে কোন বিচারপতিই মুসলমান হওয়া জরুরী নয়। অমুসলিম বিচারপতি মুসলমানদের বিচারপতি হতে কোন বাধা নেই।

গ) প্রাদেশিক গভর্নর, সেনাপ্রধান-আমীরুল মুজাহিদীন, মন্ত্রীপরিষদ থেকে শুরু করে সেনা সদস্য-মুজাহিদ, কর কর্মকর্তা-মুসাদ্দিক পর্যন্ত কেউ তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত নয়।

ঘ) অমুসলিম বিচারপতি, সেনাপ্রধান, প্রাদেশিক গভর্নর, আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্য, মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ও সেনাসদস্যরা অমুসলিম হয়েও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করে এবং তার হাকিমিয়্যাতকে মূল ভিত্তি মেনে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। যেমন আমরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখতে পাব যে, পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিল একজন হিন্দু, যার নাম যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতিকালে একজন হিন্দু নারীও বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ পেয়েছে। এর আগে হিন্দু বিচারপতি পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেছে।

বলাবাহুল্য, এটি কোন দারুল ইসলামের চিত্র নয়। এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চিত্র। এটি আব্রাহাম লিংকনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। এটা হচ্ছে গণতন্ত্র। অথবা বলা যেতে পারে এটা একটা তামাশা, মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করার সহজ ব্যবস্থা।

পাকিস্তান-সংবিধানঃ প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা ইসলাম বহাল রাখতে বাধ্য নয়

তিন. হলফনামার মাঝামাঝিতে আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে **'আমি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি'**। এ অংশটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ, প্রধান বিচারপতিসহ সকল বিচারপতি ও আরো অসংখ্য দায়িত্বশীলদের হলফনামায় এ বাক্যাংশটি নেই। এখন কথা হচ্ছে, শপথনামার এ অংশটি কাকতালীয় অর্থহীন কথা? না কি এটি গুরুত্ব বহন করে এমন অর্থবহ কোন কথা?

যদি এটি গুরুত্বহীন কোন কথা হয়ে থাকে তাহলে এ বাক্যাংশ বা এ ধরনের বাক্য দিয়ে অন্য কোথাও দলিল দেয়া যাবে না। যেমন, পাকিস্তান একটি দারুল ইসলাম এবং পাকিস্তানের শাসন ইসলামী শাসন বা পাকিস্তানের সংবিধানের মূল ভিত্তি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের উপর -এমন দাবি এ বাক্য বা এ ধরনের বাক্য দিয়ে করা যাবে না।

আর যদি এ বাক্যটি অর্থবহ বাক্য হয়ে থাকে এবং এর একটি গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে তাহলে যাদের শপথবাক্যে ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকার বিষয়ে স্বীকৃতিমূলক এ বক্তব্যটি নেই সেখানে তা না থাকাটাও কাকতালীয়ভাবে নয়; বরং উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ যাদের শপথ বাক্যে এ বাক্যটি নেই তারা ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকতে বাধ্য থাকবেন না। বিশেষত ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকার প্রায়োগিক ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের শপথনামায় যখন কথাটি অনুপস্থিত তখন বিষয়টিকে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে, এ সংবিধানের বক্তব্য অনুযায়ী

ক) পাকিস্তানের আইন প্রয়োগ বিভাগের প্রধান ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি ইসলামী ধ্যানধারণাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকতে বাধ্য নয়। ইতিপূর্বে আমরা আরেক হলফনামায় দেখে এসেছি, প্রধান বিচারপতি মুসলমান হওয়া শর্ত নয়।

অর্থাৎ একটি দারুল ইসলামের কাযিউল কুযাত মুসলামান হওয়াও জরুরী নয় এবং ইসলামী ধ্যানধারণা বহাল রাখার জন্য চেষ্টা করতেও বাধ্য নয়।

খ) পাকিস্তানের প্রধান হিসাব রক্ষক মুসলমান হওয়াও জরুরী নয় এবং ইসলামী ধ্যানধারণা বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকাও জরুরী নয়। অর্থাৎ দারুল ইসলামের বাইতুল মালের প্রধান হিসাব রক্ষক অমুসলিম হতে পারবে এবং তিনি তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধানকে রক্ষা করে চলতে বাধ্য নন।

গ) শরীয়া বেঞ্চের প্রধান বিচারপতির শপথনামায় বাক্যটি নেই। যার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী ধ্যানধারণা বহাল রাখার জন্য চেষ্টা করতে শরীয়া বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি বাধ্য নন।

ঘ) প্রধান নির্বাচন কমিশনের শপথনামায়ও বাক্যটি নেই। যারা অর্থ হচ্ছে, যার তত্ত্বাবধানে একটি ইসলামী দেশের পরিচালক নির্বাচিত হবে তার জন্য এটা জরুরী নয় যে, তিনি ইসলামী ধ্যানধারণা বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি, তিনি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়।

৬) সেনাবাহিনী প্রধানসহ সকল দায়িত্বশীলদের শপথবাক্যেও এ কথাটি নেই। যারা অর্থ হচ্ছে, যারা ইসলামী ধ্যানধারণার প্রহরী তারা ইসলামী ধ্যানধারণা বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকতে বাধ্য নয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি, তারা মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়।

বলাবাহুল্য, এটি কোন দারুল ইসলামের চিত্র নয়। এটি কুরআন হাদীসের নির্দেশনায় পরিচালিত কোন দেশের চিত্র নয়। এটি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের কোন দৃশ্য নয়। এগুলোর সবই বৃটিশ ভারতের দৃশ্য। জাতিসংঘ কল্পিত ও পরিচালিত বিশ্বের চিত্র, যে বিশ্বে ধর্মে ধর্মে কোন ভেদাভেদ থাকবে না।

পাকিস্তান-সংবিধান : আমেরিকা রাশিয়ার ফটোকপি

পাকিস্তান-সংবিধান : বিধানদাতা অমুসলিম

دستور کے تابع قومی اسمبلی کے تمام فیصلے حاضر اور ووٹ دینے والے ارکان کی اکثریت سے کئے جائیں گے، لیکن صدارت کرنے والا شخص ووٹ نہیں دیے گا سوائے اس صورت کے کہ ووٹ مساوی ہوں۔ مجلس شوری ۱/۳۱

کوئی شخص مجلس شوری (پارلیمنٹ) کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہو گا اگر۔۔۔

....

....

(د) وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور ہو۔

(ہ) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو۔۔۔

....

....

پیراجات(د) اور(ہ) میں صراحت کردہ نا اہلیوں کا کسی ایسے شخص پر اطلاق نہیں ہو گا جو غیر مسلم ہو، لیکن ایسا شخص اچھی شہرت کا حامل ہو گا۔ مجلس شوری ۱/۳۵ و۳۶

অনুবাদঃ

"সংবিধানের অধীনে জাতীয় সংসদের সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত ভোটারদের অধিকাংশের সম্মতিতে গ্রহণ করা হবে। তবে সভাপতি ভোট দেবে না। হ্যাঁ! ভোটদাতারা যদি উভয় পক্ষে সমান সমান হয় তাহলে। -মজলিসে শূরা ১/৩১

কোন ব্যক্তি মজলিসে শূরার (পার্লামেন্ট) সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবে না যদি-

....

....

(د) সে ভালো অবদান না রেখে থাকে এবং সাধারণভাবে ইসলামী বিধিবিধান থেকে বিমুখ হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়।

(ہ) সে ইসলামের শিক্ষা দীক্ষায় যথাযথ ইলমের অধিকারী নয় এবং ইসলামের নির্ধারিত ফরযসমূহের পাবন্দ নয় এবং কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে না।

....

....

পেরাগ্রাফ (د) ও (ہ) এর মাঝে উল্লেখিত অযোগ্যতাগুলো এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যারা অমুসলিম হবে। তবে এমন ব্যক্তিরা যেন ভালো খ্যাতির অধিকারী হয়।" -মজলিসে শুরা ১/৩৫-৩৬

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ-

সংবিধানের এ অংশের প্রত্যেকটি দফাকে অন্য দফার সঙ্গে একই সূত্রে গেঁথে দেয়া হয়েছে। যার কোন একটি দফাকে উপেক্ষা করে অপর দফা প্রয়োগ করা যাবে না। সুতরাং মুখরোচক দফাগুলো দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকাও দেয়া যাবে না।

সংবিধানের এ অংশের গাঁথুনি দেয়া হয়েছে যথাক্রমে এভাবে-

যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সংসদ সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে, সংসদ সদস্যরা মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, সংসদ প্রধান স্পিকার মুসলমান হওয়া শর্ত নয়।

খুব ভারি করে বলা হয়েছে দু'টি কথা।

এক. সংসদ সদস্য ইসলামের বিধিবিধান থেকে বিমুখ না হতে হবে।

দুই. সংসদ সদস্যের ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা যথাযথ থাকতে হবে এবং কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হব।

অর্থাৎ পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার জন্য সদস্যরা আল্লামা ও পরহেযগার হতে হবে।

কিন্তু এ বজ্র আঁটির গেরো যে পরবর্তী দফা দিয়ে ফসকা করে দেয়া হয়েছে তা বোঝার মত যোগ্যতা সব মুসলমানদের না থাকলেও সন্দেহ করার মত যোগ্যতা তো সবারই থাকার কথা। পরবর্তী দফায় সুস্পষ্ট ও সুন্দর করে বলে দেয়া হয়েছে যে,

'পেরাগ্রাফ (১) ও (৮) এর মাঝে উল্লিখিত অযোগ্যতাগুলো এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যারা অমুসলিম হবে। তবে এমন ব্যক্তিরা যেন ভালো খ্যাতির অধিকারী হয়।'

অর্থাৎ, একজন মুসলিম তার ইলম ও তাকওয়ার অভাবে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার অযোগ্য হয়ে যাবে। তবে এ ইলম ও তাকওয়ার অভাব হতে হতে যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তাকে আর মুসলমান বলা যায় না অথবা সে নিজেই নিজেকে অমুসলিম বলে

ঘোষণা দেয় তাহলে সে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে।

এ দফাগুলো এবং এর সম্পূরক দফাগুলোর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে-

ক) দারুল ইসলামের আইন প্রণেতারা অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই।

খ) দারুল ইসলামের আইন প্রণয়ন পরিষদের প্রধান অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই।

গ) দারুল ইসলামের আইন প্রণয়ন বিভাগের অমুসলিম সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি হবে সে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দারুল ইসলামের যে কোন আইন তৈরি হবে, সে আইন মুসলমানরা মেনে চলতে হবে।

ঘ) একজন অমুসলিম ভালো খ্যাতি অর্জন করতে পারলে সে মুসলমানদের আইন প্রণেতা হতে পারবে।

ঙ) কোন অমুসলিম দারুল ইসলামের মজলিসে শূরার সদস্য হতে কোন সমস্যা নেই।

চ) মুসলমান ও দারুল ইসলামের মজলিসে শূরার আমিরে ফয়সাল অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই।

ছ) অমুসলিমের ভোটে মজলিসে শূরার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়ে মুসলমানদের বিষয়াদির সিদ্ধান্ত নিতে কোন সমস্যা নেই।

বালাবহুল্য, এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশের ছবি। এটি এমন কোন দেশের ছবি নয় যার মূল ভিত্তি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতের স্বীকৃতির উপর। কোন অমুসলিমকে একটি দেশের আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া হবে, দেশে কোন আইন চলবে আর কোন আইন চলবে না সে বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করা হবে, এরপর সে দেশ দারুল ইসলাম হবে -এমন কথা ইসলাম ধর্মের কিতাবগুলোতে নেই। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ও গণতান্ত্রিক ধর্মের কিতাবাদিতে এমন কথা আছে।

পাকিস্তান-সংবিধান : শরয়ী আদালত: সংখ্যালঘুর সংখ্যালঘু বিচারক

باب ۳-الف-وفاقی شرعی عدالت

دستور میں شامل کسی امر کے باوجود اس باب کے احکام مؤثر ہوں گے۔

....

....

اس باب کی اغراض کے لئے ایک عدالت کی تشکیل کی جائے گی جو وفاقی شرعی عدالت کے نام سے موسوم ہوگی۔

عدالت چیف جسٹس سمیت زیادہ سے زیادہ آٹھ **مسلم ججوں** پر مشتمل ہوگی، جن کا تقرر صدر آرٹیکل ۱۷۵-الف کی مطابقت میں کرے گا۔

چیف جسٹس ایسا شخص ہوگا جو عدالت عظمی کا جج ہو، یا رہ چکا ہو، یا بننے کا اہل ہو یا جو کسی عدالت عالیہ کا مستقل جج رہ چکا ہو۔

ججوں میں زیادہ سے زیادہ چار ایسے اشخاص ھوں گے جن میں سے ہر ایک کسی عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہ چکا ہو، یا بننے کا اہل ہو اور زیادہ سے زیادہ تین علماء ہوں گے جو اسلامی قانون، تحقیق یا تعلیم میں کم از کم پندرہ سالوں کا تجربہ رکھتے ہوں۔

وفاقی شرعی عدالت ۱۲۰-۱۱۸/۱

অনুবাদ:

"অধ্যায় ৩ -আলিফ- বেফাকী (ফেডারেল) শরয়ী আদালত

সংবিধানে সন্নিবেশিত কোন বিষয় থাকা সত্ত্বেও এ অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রভাব বিস্তার করবে।

....

....

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি আদালত তৈরি করতে হবে যা বেফাকী (ফেডারেল) শরয়ী আদালত নামে পরিচিত হবে।

আদালতটি প্রধান বিচারপতিসহ সর্বোচ্চ আট জন মুসলিম জজ দ্বারা তৈরি হবে। প্রেসিডেন্ট ১৭৫ আলিফ অনুচ্ছেদের আলোকে তাদেরকে নিয়োগ দেবেন।

প্রধান বিচারপতি এমন ব্যক্তি হবেন যিনি সুপ্রিম কোর্টের জজ হবেন, অথবা আগে ছিলেন এমন হবেন, অথবা হওয়ার যোগ্য হবেন, অথবা উচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ জজ হিসাবে ছিলেন এমন হবেন।

জজদের মধ্যে সর্বোচ্চ চার জন এমন ব্যক্তি হবেন যাদের প্রত্যেকে কোন উচ্চ আদালতের জজ হবেন, বা জজ ছিলেন এমন হবেন, অথবা হওয়ার যোগ্য হবেন। সর্বোচ্চ তিন জন আলেম হবেন যারা ইসলামী আইন, গবেষণা ও শিক্ষায় কমপক্ষে পনের বছরের অভিজ্ঞ হবেন।" -বেফাকী শরয়ী আদালত পৃ: ১১৮-১২০

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

একটি দারুল ইসলামে ক্ষুদ্রাকৃতির শরয়ী আদালত নামে আলাদা বেঞ্চ প্রশ্নবিদ্ধ একটি বিষয়।

একটি দারুল ইসলামের বিচার বিভাগের বিশেষ একটি বেঞ্চের সদস্যরা মুসলিম হতে হবে, -এমন কথা একটি দারুল ইসলামের বেলায় গ্রহণ করার মত উপাদান ইসলাম ধর্মের কিতাবগুলোতে পাওয়া মুশকিল। তাই বিষয়টি নিয়ে ভাবার অনেক কিছু রয়েছে।

প্রধান বিচারপতি গায়রে শরয়ী আদালতের সুপ্রিম কোর্টের চলমান জজ বা সাবেক জজ বা জজ হওয়ার যোগ্য হতে হবে।

আট জনের চার জনই হতে হবে গায়রে শরয়ী আদালতের উচ্চ আদালতের চলমান জজ বা সাবেক জজ বা জজ হওয়ার যোগ্য।

শরীয়া আদালতের মোট আট জনের সর্বোচ্চ তিন জন শরীয়া বিশেষজ্ঞ হতে পারবে।

এ দফাগুলোর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে-

ক) দারুল ইসলামের অতি ক্ষুদ্রাকৃতির একটি আদালত বেঞ্চ ব্যতীত দেশের ছোট বড়, উঁচু নিচু সকল আদালত বেঞ্চ গায়রে শরয়ী, অনৈসলামিক, আলহুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ তথা গায়রুল্লাহর আইন দ্বারা পরিচালিত।

খ) একটি দারুল ইসলামের মূল আদালত ও মূল আইনী ব্যবস্থা গায়রে শরয়ী, আলহুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ তথা গায়রুল্লাহর আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গ) একটি দারুল ইসলামের অতি ক্ষুদ্রাকৃতির একটি আদালত বেঞ্চের বিচারপতিরা মুসলিম হবে। এছাড়া কোন পর্যায়ের কোন বেঞ্চের কোন বিচারপতি মুসলিম হওয়া জরুরী নয়।

ঘ) আলহুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ তথা গায়রে শরয়ী আদালতে শরীয়তবিরোধী রায় দেয়ার বিষয়ে যার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একজন বিচারপতির অধীনেই শরয়ী আদালত পরিচালিত হবে।

ঙ) শরীয়াহ বেঞ্চের মোট আট সদস্যের চার জনই এমন হবেন গায়রে শরয়ী আদালতে শরীয়ত বিরোধী রায় দেয়ার বিষয়ে এবং আলহুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ'র ক্ষেত্রে যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

চ) শরয়ী বেঞ্চে সর্বোচ্চ তিন জন সদস্য হবেন শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ। যাতে শরীয়াহ বেঞ্চেও বিভক্ত রায়ের ক্ষেত্রে গায়রে শরয়ী বিচারকদের তথা আলহুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ'র সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গৃহীত হওয়ার সুযোগ থাকে।

ছ) সুতরাং, শরয়ী আদালতের প্রথম দফায় অস্পষ্ট করে যে বলা হয়েছে, 'সংবিধানে সন্নিবেশিত কোন বিষয় থাকা সত্ত্বেও এ অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রভাব বিস্তার করবে।' এটি একটি কাগজের ফুল। যা বাস্তবের মুখ দেখার জন্য সংবিধানে কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যারফলে সত্তর/বাহাত্তর বছর পর্যন্ত এ অস্পষ্ট কথাটির কোন বাস্তবতা কেউ কখনো দেখেনি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

বালাবহুল্য, এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশের ছবি। বৃটিশ ভারতের ছবি। মানব রচিত তাগূতী আইন প্রয়োগে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি শরীয়াহ বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি। শুধু তাই নয়; বরং মানব রচিত তাগূতী আইন প্রয়োগের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণেই শরীয়াহ বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য হতে পেরেছে। এমনিভাবে শরীয়া বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি শরীয়াহ বেঞ্চের বিচারপতি হতে পেরেছে, কারণ তারা দীর্ঘ জীবন গায়রে শরয়ী, মানব রচিত তাগূতী আইনের সফল বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ।

সুতরাং এ আদালত বেঞ্চের নাম শরীয়া বেঞ্চ হলেও শরীয়তের কিতাবাদিতে এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এর অস্তিত্ব রয়েছে বৃটিশ ভারতের বৃটিশ আইনে। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের আইনে। গণতান্ত্রিক আইনে। আইম্মাতুল কুফর নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘের আইনে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধর্মের কিতাবে। সকল ধর্মের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনকারী ধর্মের কিতাবে এবং সকল ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টদের কিতাবে।

পাকিস্তান-সংবিধান: শরীয়াহ চূড়ান্ত হবে গায়রে শরয়ী আদালতে

عدالت یا تو خود اپنی تحریک پر یا پاکستان کے کسی شہری یا وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کی درخواست پر اس سوال کا جائزہ لے سکے گی اور فیصلہ کر سکے گی کہ آیا کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم ان اسلامی احکام کے منافی ہے یا نہیں جس طرح کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے جن کا حوالہ بعد ازیں اسلامی احکام کے طور پر دیا گیا ہے۔

جبکہ عدالت شق (ا) کے ماتحت کسی قانون یا قانون کے کسی حکم کا جائزہ لینا شروع کرے اور اسے ایسا قانون یا قانون کا حکم اسلامی احکام کے منافی معلوم ہو، تو عدالت ایسے قانون کی صورت میں جو وفاقی فہرست قانون سازی .... میں

شامل معاملہ سے متعلق ہو وفاقی حکومت کو یا کسی ایسے معاملے سے متعلق جو وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل نہ ہو، صوبائی حکومت کو ایک نوٹس دینے کا حکم دے گی جس میں ان خاص احکام کی صراحت کی جائے گی جو اسے بایں طور منافی معلوم ہوں اور مذکورہ حکومت کو اپنا نقطہ نظر عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لئے مناسب موقع دے گی۔

اگر عدالت فیصلہ کرے کہ کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم اسلامی احکام کے منافی ہے تو وہ اپنے فیصلہ میں بحسب ذیل بیان کرے گی:

اس کے مذکورہ رائے قائم کرنیکی وجوہ: اور

وہ حد جس تک وہ قانون یا حکم بایں طور منافی ہے: اور اس تاریخ کی صراحت کریگی جس پر وہ فیصلہ مؤثر ہو گا۔

مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ، اس میعاد کے گذرنے سے پہلے جس کے اندر عدالت عظمی میں اس کیخلاف اپیل داخل ہو سکتی ہو یا، جبکہ اپیل بایں طور پر داخل کر دی گئی ہو تو اس اپیل کے فیصلہ سے پہلے مؤثر نہیں ہو گا۔

....

....

.... ص:۱۲۳-۱۲۱

অনুবাদঃ

"আদালত হয়তো নিজেই উদ্যোগী হয়ে অথবা পাকিস্তানের কোন নাগরিক, বা কেন্দ্রীয় হুকুমত, বা প্রাদেশিক হুকুমতের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নের যাচাই করতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত দিতে পারবে যে, কোন কানূন বা কানূনের কোন হুকুম সেসব ইসলামী বিধিবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না যেভাবে কুরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে নির্ধারণ করা হয়েছে যার উদ্ধৃতি ইসলামী বিধান হিসাবে দেয়া হয়েছে।

আদালত যখন অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে কোন কানূন বা কানূনের কোন হুকুমের যাচাই বাছাই শুরু করবে এবং তার কাছে এমন কানূন বা কানূনের হুকুমকে ইসলামী বিধানের বিপরীত মনে হবে তখন আদালত এমন কানূনের ক্ষেত্রে যা বেফাকী (ফেডারেল) আইনের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর সংশ্লিষ্ট হবে তা কেন্দ্রীয় হুকুমতকে, আর যা এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো বেফাকী (ফেডারেল) আইনের তালিকাভুক্ত নয় তা প্রাদেশিক হুকুমতকে একটি নোটিশ দেয়ার আদেশ প্রদান করবে, যার মাঝে সেসব বিশেষ বিধানের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে যা তার কাছে এ হিসাবে বিপরীত মনে হবে এবং হুকুমত যেন আদালতের সামনে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারে সে জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সুযোগ দেবে।

যদি আদালত এ ফয়সালা করে যে, কোন কানূন বা কানূনের কোন হুকুম ইসলামী বিধানের বিপরীত তা হলে সে তার সিদ্ধান্তে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বয়ান দেবেঃ

তার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত দেয়ার কারণসমূহঃ এবং

ঐ সীমা যা পর্যন্ত ঐ কানূন অথবা হুকুম এ হিসাবে বিপরীত হয়ঃ এবং ঐ তারিখ স্পষ্ট উল্লেখ করবে যে তারিখে ঐ ফয়সালা কার্যকর হবে।

তবে শর্ত হচ্ছে, এমন কোন ফয়সালা ঐ সময় অতিক্রম করার আগে কার্যকর হবে না যে সময়ের মাঝে সুপ্রিম কোর্টে তার বিরুদ্ধে আপিল হতে পারে, অথবা যখন এ হিসাবে আপিল করা হয়ে গেছে তা হলে ঐ আপিলের রায়ের আগে তা কার্যকর হবে না।" বেফাকী (ফেডারেল) শরয়ী আদালত পৃঃ ১২১-১২৩

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ–

এক. শরীয়াহ কর্তৃক ফায়সালা হওয়ার পরও শরয়ী তরিকার পদ্ধতির উপর আমল করা যাবে না। বরং যত দিন পর্যন্ত আপিল করার মত সময় হাতে থাকবে তত দিন শরয়ী বিধান অকার্যকর থাকবে, আপিল করুক বা না করুক।

দুই. 'আদালতে উযমা' পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত। যে আদালতে শরীয়াহ বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সে আদালতে আপিল করার মেয়াদ বাকি থাকা পর্যন্ত, আপিল করার পর রায় হওয়া পর্যন্ত এবং আপিল বিভাগ শরীয়াহ বেঞ্চের বিপরীত রায় দিলে শরীয়াহ বেঞ্চের রায় অকার্যকর থাকবে।

উল্লেখ্য, এ আদালতের প্রধান বিচারপতিসহ কোন বিচারপতিই মুসলমান হওয়া শর্ত নয় এবং এ আদালতের নাম শরয়ী আদালত নয়।

এ দফাগুলোর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে-

ক) শরীয়তের সিদ্ধান্ত অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে শরয়ী সিদ্ধান্তের বিপরীতে অবস্থানকারী আপিল করতে পারে এ সম্ভাবনার কারণে।

খ) শরয়ী সিদ্ধান্ত অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে গায়রে শরয়ী আদালতে শরয়ী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার কারণে।

গ) গায়রে শরয়ী আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে যে, শরীয়তের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে না কি থাকবে না।

ঘ) মানব রচিত আইনের বিশেষজ্ঞ, প্রয়োগকারীরা যাচাই করে দেখবে, শরয়ী বিশেষজ্ঞদের শরয়ী সিদ্ধান্ত সঠিক না কি বেঠিক। এবং তাদের যাচাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

বলাবাহুল্য, এটি কোন দারুল ইসলামের চিত্র নয়। এটি একটি গণতান্ত্রিক ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালিত একটি দেশের চিত্র। যে দেশটি তার গণতান্ত্রিক উদারতার কারণে ধর্মের পক্ষের লোকদেরকে কথা বলার সুযোগ দেয়। ধর্মের নিবদেনগুলো পেশ করার মত সুযোগ রাখে। এরপর গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার গায়ে আঁচড় না লাগে মত

যতটুকু আবদার রক্ষা করা যায় ততটুকু গ্রহণ করে। যতটুকু গ্রহণ করা যায় না ততটুকু গ্রহণ না করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। এতে শান্ত না হলে গালে চড় বসিয়ে দেয়।

পাকিস্তান-সংবিধান: শরীয়ার তদারকী গায়রে শরীয়ার হাতে

عدالت حدود کے نفاذ سے متعلق کسی قانون کے تحت کسی فوج داری عدالت کی طرف سے فیصلہ شدہ کسی مقدمے کا رکارڈ اس غرض سے طلب کر سکے گی اور اس کا جائزہ لے سکے گی کہ مذکورہ عدالت کے قلمبند کردہ یا صادر کردہ کسی نتیجہ تفتیش، حکم، سزا یا حکم کی صحت قانونی جواز یا معقولیت کے بارے میں، اور اس کی کسی قانونی کارروائی کی باضابطگی کے بارے میں اپنا اطمینان کر سکے اور مذکورہ ریکارڈ طلب کرتے وقت ہی ہدایت دے سکے گی کہ جب تک اس ریکارڈ کا جائزہ نہ لے لیا جائے، کسی حکم سزا کی تعمیل روک دی جائے اور اگر ملزم زیر حراست ہو تو، اس کو ضمانت پر یا اس کے اپنے مچلکہ پر رہا کر دیا جائے۔

کسی ایسے مقدمے میں جس کا ریکارڈ عدالت نے طلب کیا ہو، عدالت ایسا حکم صادر کر سکے گی جو مناسب خیال کرے اور سزا میں اضافہ کر سکے گی۔ ص: ۱۲۳

অনুবাদ

"দণ্ড প্রয়োগ বিষয়ক কোন আইনের অধীনে কোন ফৌজদারি আদালতের পক্ষ থেকে রায় প্রদানকৃত কোন মুকাদ্দামার রেকর্ড এ উদ্দেশ্যে আদালত তলব করতে পারবে এবং তার যাচাই করতে পারবে যে, উল্লিখিত আদালতের লিখিত বা প্রদানকৃত কোন তদন্তের ফলাফল, বিধান, শাস্তি বা হুকুমের বিশুদ্ধতা আইনী বৈধতা অথবা যৌক্তিকতার বিষয়ে এবং তার কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার যথার্থতার বিষয়ে নিজের নিশ্চয়তা অর্জন করতে পারে। আর উল্লিখিত রেকর্ড তলব করার সময়েই নির্দেশনা দিতে পারবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ রেকর্ডের যাচাই না

করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন শাস্তির হুকুম যেন মুলতবি করে দেয়া হয়, আর অপরাধী যদি বন্দি থাকে তা হলে তাকে যেন যামানতের উপর, অথবা নিজস্ব মুচলেকার উপর মুক্ত করে দেয়া হয়।

এমন কোন মুকাদ্দামা যার রেকর্ড আদালত তলব করেছে আদালত এমন হুকুম জারি করতে পারবে যা আদালত উপযুক্ত মনে করবে এবং সাজা বাড়িয়ে দিতে পারবে।" -বেফাকী (ফেডারেল) শরয়ী আদালত পৃ: ১২৩

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ–

এক. শরয়ী সিদ্ধান্ত কোন ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত রেকর্ড গায়রে শরয়ী আদালত দেখার অধিকার রাখবে।

দুই. শরয়ী সিদ্ধান্ত গায়রে শরয়ী আইনে বৈধতা পায় কি না তা দেখার জন্য গায়রে শরয়ী আদালত শরয়ী সিদ্ধান্তের বিস্তারিত রেকর্ড তলব করবে।

তিন. গায়রে শরয়ী আদালত শরয়ী সিদ্ধান্তের রেকর্ড যাচাই করার আগেই শরয়ী সিদ্ধান্ত মুলতবির আদেশ দিতে পারবে।

চার. শরয়ী সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে গায়রে শরয়ী আদালত আসামীকে মুক্তি দেয়ার আদেশ জারি করতে পারবে।

পাঁচ. শরয়ী সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে গায়রে শরয়ী আদালত আসামীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে কম-বেশ করতে পারবে।

এ দফাগুলোর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে-

ক) শরীয়াহ বেঞ্চের সকল নিয়ন্ত্রণ গায়রে শরয়ী বেঞ্চের হাতে থাকবে।

খ) শরীয়াহ বেঞ্চের মাধ্যমে কিছু লোকের প্রথম শ্রেণীর চাকুরীর ব্যবস্থা হবে। এছাড়া আর কোন কিছু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ) শরীয়াহ বেঞ্চের মহাজ্ঞানীগণ শরীয়াহ মন্থন করে যা পাবেন তার সব কিছু গায়রী শরয়ী আদালতের দরবারে পেশ করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীয়াহ বেঞ্চের করুণ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকবেন। নিজেদের কৃত সিদ্ধান্ত থেকে তাওবা করার প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

ঘ) শরীয়াহ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের বিপরীতে গায়রে শরয়ী আদালত কোন আদেশ জারি করার ক্ষেত্রে শরয়ী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করতে বাধ্য থাকবেন না; বরং কোন বিবেচনা ছাড়াই নগদ মুলতবির আদেশ জারি করতে পারবেন, আসামীর মুক্তির আদেশ জারি করতে পারবেন।

বলাবাহুল্য, এ শরীয়াহ বেঞ্চ আসলে শরীয়ার নয়। এটাও গণতান্ত্রিক ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের উদারতার বেঞ্চ। কারণ, এ উদারতার সুবাদেই মুসলমানের রাহবাররা বিচারপতি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। দেশের এক নম্বর নাগরিকের কাতারে শামিল হচ্ছেন অসংখ্য দ্বীনদার শ্রেণী হিসাবে পরিচিতজনরা।

এমন কোন ফাঁকফোকর বের করার সুযোগ নেই যে, গায়রে শরয়ী আদালত যা কিছু করবে তা শরীয়ার আলোকেই করবে। কারণ এ ফাঁক গোড়ায় বন্ধ করা আছে। যে সিদ্ধান্তই শরীয়ার আলোকে হবে তাকেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পেছনে পেছনে গায়রে শরয়ী আদালত রয়েছে। কারণ শরয়ী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার দরজা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়নি। আপিল করার সকল ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

পাকিস্তান-সংবিধান: গণতন্ত্রই রব্বে আলা (?)

دستور کی ترمیم

اس حصے کے تابع، اس دستور میں مجلس شوری (پارلیمنٹ) کے ایکٹ کے ذریعے ترمیم کی جاسکے گی۔

دستور میں ترمیم کرنے کے بل کی ابتداء کسی بھی ایوان میں کی جاسکے گی اور جبکہ اس بل کو ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے منظور کر لیا جائے تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا۔

اگر بل کو اس ایوان کی کل رکنت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے بلاترمیم منظور کر لیا جائے جسے شق (۱) کے تحت اسے بھیجا گیا تھا، تو اسے شق (۴) کے احکام کے تابع، صدر کی منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔

اگر بل کو اس ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے ترمیم کے ساتھ منظور کیا جائے جسے شق (۱) کے تحت اسے بھیجا گیا تھا تو اس پر وہ ایوان دوبارہ غور کرے گا جس میں اس کی ابتداء ہوئی تھی، اور اگر بل کو جس طرح کے اول الذکر ایوان میں اس میں ترمیم کی گئی تھی آخر الذکر ایوان کی طرف سے اس کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے منظور کر لیا جائے تو اسے شق (۴) کے احکام کے تابع صدر کی منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔

دستور میں ترمیم کے کسی بل کو جو کسی صوبے کی حدود میں ردوبدل کا اثر رکھتا ہو صدر کی منظوری کے لئے پیش نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ اسے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی نے اپنی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے منظور نہ کر لیا ہو۔

دستور میں کسی ترمیم پر کسی عدالت میں کسی بناء پر چاہے جو کچھ ہو کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

ازالہ شک کے لئے بذریعہ ہذا اقرار دیا جاتا ہے کہ دستور کے احکام میں سے کسی میں ترمیم کرنے کے مجلس شوری (پارلیمنٹ) کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ص: ۱۵۸-۱۵۷

অনুবাদ

সংবিধান সংশোধনী

এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ সংবিধানের মাঝে মজলিসে শূরা (পার্লামেন্ট) এক্টের মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে।

সংবিধানে সংশোধনীর বিলের সূচনা যে কোন (ایوان) বৈঠকে করা যাবে। এ বিলকে এক (ایوان) বৈঠকের মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে পাস করিয়ে নেয়া হলে তাকে দ্বিতীয় (ایوان) বৈঠকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

যদি বিলটিকে ঐ (ایوان) বৈঠকের মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে কোন প্রকার সংশোধনী ব্যতীত পাস করে নেয়া হয় যাকে অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে পাঠানো হয়েছিল তাহলে তাকে অনুচ্ছেদ (৪) এর বিধির অধীনে প্রেসিডেন্টের মঞ্জুরীর জন্য পেশ করা হবে।

যদি বিলটিকে ঐ (ایوان) বৈঠকের মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে কোন প্রকার সংশোধনীসহ পাস করে নেয়া হয় যাকে অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে পাঠানো হয়েছিল তা হলে তার উপর ঐ (ایوان) বৈঠক আবার চিন্তা গবেষণা করবে যে (ایوان) বৈঠকে এর সূচনা হয়েছিল। আর যদি বিলকে যেমনিভাবে প্রথমোক্ত (ایوان) বৈঠকে তার মাঝে সংশোধন করা হয়েছিল দ্বিতীয়োক্ত (ایوان) বৈঠকের পক্ষ থেকে তার মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে পাস করে নেয়া হয় তা হলে তা অনুচ্ছেদ (৪) এর বিধির অধীনে প্রেসিডেন্টের মনজুরীর জন্য পেশ করা হবে।

সংবিধানে সংশোধনীর কোন বিলকে যা কোন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তনে প্রভাব ফেলতে পারে তা প্রেসিডেন্টের মঞ্জুরীর জন্য পেশ করা হবে না যতক্ষণ না তাকে ঐ প্রদেশের প্রাদেশিক এসেম্বেলী তার সকল সদস্যের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে মঞ্জুর করে নেবে।

সংবিধানের কোন প্রকার সংশোধনীর উপর কোন আদালতে কোন ভিত্তিতে কোন বিষয়ে কোন আপত্তি করা যাবে না।

সন্দেহ দূর করার জন্য এর দ্বারা সিদ্ধান্ত দেয়া হচ্ছে যে, সংবিধানের বিধানাবলীর মধ্য থেকে কোনটির মধ্যে রদবদল করার ক্ষেত্রে মজলিসে শূরা (পার্লামেন্ট) এর এখতিয়ারের উপর কোন প্রকারের কোন পাবন্দি নেই।" -সংবিধান সংশোধনী পৃ: ১৫৭-১৫৮

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপঃ

এক. সংবিধান সংশোধনীর সর্বশেষ কথা হচ্ছে, 'সংবিধানের বিধানাবলীর মধ্য থেকে কোনটির মধ্যে রদবদল করার ক্ষেত্রে মজলিসে শূরা (পার্লামেন্ট) এর এখতিয়ারের উপর কোন প্রকারের কোন পাবন্দি নেই।'

দুই. যেসব বৈঠক বা (ایوان) এ সংবিধান সংশোধন বিলের সূচনা ও পাস করার কথা বলা হয়েছে সেসকল বৈঠকের কোন সদস্য মুসলমান হওয়া সাংবিধানিকভাবে শর্ত নয়।

তিন. যে কোন ধারা পরিবর্তন ও বহাল রাখা না রাখার মূল মাপকাঠি হচ্ছে, দুই তৃতীয়াংশের ভোট। আর সর্বশেষ মনজুরী হচ্ছে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে হুদূদ-কিসাসসহ যেকোন বিধানের বিপরীত হুকুম দেয়ার অধিকার রয়েছে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের সম্মতির বিপরীতে এবং কুরআন হাদীসের হুকুমের বিপরীতে প্রেসিডেন্ট খুনের আসামীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তার জবাবদিহিও করতে হয় না। আর সংবিধানের ভাষা হচ্ছে, **'রদবদল করার ক্ষেত্রে মজলিসে শূরা (পার্লামেন্ট) এর এখতিয়ারের উপর কোন প্রকারের কোন পাবন্দি নেই'** যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ দফাগুলোর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে-

ক) শরীয়াহ বেঞ্চের অস্তিত্ব বিলুপ্তিসহ যে কোন সিদ্ধান্তই মজলিসে শূরা (পার্লামেন্ট) নিতে পারবে।

খ) শরীয়াহ নির্ভর যে কোন সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য দুই তৃতীয়াংশের ভোট ছাড়া আর কোন কিছুর কোন প্রয়োজন নেই।

গ) যে মজলিসের উপর কোন প্রকার কোন পাবন্দি নেই সে মজলিসের উপর শরীয়ারও কোন পাবন্দি নেই।

ঘ) সব ধরনের পাবন্দি থেকে মুক্ত মজলিসের উপর শরীয়ার কোন পাবন্দি আছে -এমন কোন কথা সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নেই।

ঙ) শরয়ী আদালত দেশের পুরো আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে -এমন কোন কথাও সংবিধানে নেই; বরং গায়রে শরয়ী আদালত শরয়ী আদালতসহ সকল স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করবে -এমন কথা সংবিধানে আছে।

সংবিধানের ভূমিকা ও ধারা

উল্লেখ্য, সংবিধানের ভূমিকায় উল্লেখিত 'পাওয়ারলেস' অস্পষ্ট কথাগুলো দিয়ে সংবিধানের মূল পাঠের স্পষ্ট ও শক্তিশালী ধারাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার মত কোন ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়নি। ভূমিকার মুখরোচক ও দৃষ্টিনন্দক অস্পষ্ট কথাগুলো দিয়ে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেয়া যাবে, তাদের ভোট আদায় করা যাবে এবং অযাচিত উৎপাত থেকে বিরত রাখা যাবে। এ কথাগুলোর সাংবিধানিক কোন শক্তি নেই। আর শক্তি যে নেই তাই বাস্তবায়িত হয়েছে বিগত সত্তর/বাহাত্তর বছর ধরে। শক্তি আছে এমন কোন প্রমাণ সত্তর/বাহাত্তর বছরে কখনো দেখা যায়নি।

এ কথাগুলো সবার আগে দ্বীনের রাহবার ওলামায়ে কেরামই বুঝতে হবে। বুঝেও না বোঝার ভান করা যাবে না এবং না বুঝেও বোঝার অহংকার করা যাবে না।

পাকিস্তান-সংবিধানঃ শরীয়ার বাস্তবায়ক শরীয়ার কাছে দায়বদ্ধ নয়

وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس یا جج

....

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں...................... صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہونگا:

کہ بحیثیت وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس (یا وفاقی شرعی عدالت کے جج)، اپنے فرائض وکارہائے منصبی، ایمانداری، بہترین صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، دستور اسلامی جمہوریت پاکستان اور قانون کے مطابق ادا کرونگا اور انجام دونگا۔

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دونگا:

کہ میں اعلی عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرونگا۔

کہ میں دستور پاکستان کو برقرار رکھونگا، اس کا تحفظ اور دفاع کرونگا۔

اور یہ کہ ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف ورعایت اور بلا رغبت وعناد انصاف کرونگا۔

اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔ عہدوں کے حلف: ص: ۲۲۰

অনুবাদ

বেফাকী (ফেডারেল) শরয়ী আদালতের চীফ জাস্টিস অথবা জজ

....

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি .... সত্য দিলে হলফ করছি যে, নিষ্ঠার সাথে পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হব:

যে, বেফাকী (ফেডারেল) শরয়ী আদালতের চীফ জাস্টিস হিসাবে (অথবা বেফাকী (ফেডারেল) শরয়ী আদালতের জজ) নিজের দায়িত্বসমূহ ঈমানদারী ও সর্বোচ্চ যোগ্যতা ব্যব্যহার করে ওফাদারীর সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও আইন মোতাবেক আদায় করব, সম্পাদন করব।

যে, আমি আমার ব্যক্তি স্বার্থকে সরকারী কাজ অথবা সরকারী সিদ্ধান্তগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেব না:

যে, আমি উচ্চ আদালত কাউন্সিলের জারিকৃত নীতিধারার পাবন্দি করব।

যে, আমি পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখব, তার সংরক্ষণ ও তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করব।

আর আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের লোকদের সঙ্গে কোন রকম ভয়ভীতি না করে কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে, কোন প্রকার প্রীতি বা বৈরিতা মুক্ত হয়ে ইনসাফ করব।

আল্লাহ তাআলা আমার সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করুন। (আমীন)।" - পদসমূহের হলফ পৃ: ২২০

দৃষ্টিপাত

সংবিধানের এ অংশের বিচার্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

এক. শরয়ী আদালতের চীফ জাস্টিসের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, পাকিস্তানের সহযোগী ও ওফাদার হওয়া।

দুই. শরয়ী আদালতের চীফ জাস্টিসের দ্বিতীয় প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ও আইন মোতাবেক দায়িত্বসমূহ আদায় করা।

তিন. শরয়ী আদালতের চীফ জাস্টিসের তৃতীয় প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, উচ্চ আদালত কাউন্সিলের জারিকৃত নীতিধারার পাবন্দি করা।

চার. শরয়ী আদালতের চীফ জাস্টিসের চতুর্থ প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, পাকিস্তানের সংবিধানকে বহাল রাখা, সংরক্ষণ করা এবং সর্বাবস্থায় তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা।

পাঁচ. শরীয়া বাস্তবায়নের প্রধান ব্যক্তির হলফনামার কোন নম্বরেই এ কথা স্থান পায়নি যে, 'সর্বাবস্থায় কুরআন সুন্নাহকে শতভাগ বাস্তবায়ন করব'।

উল্লেখ্য, শরীয়াহ বাস্তবায়নের প্রধান ব্যক্তি যত বিভাগের ও যত দরবারের আনুগত্য স্বীকার করে, মুচলেকা দিয়ে শরীয়া বাস্তবায়নের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন তার কোনটিই শরীয়াহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়। শরীয়াহ নিয়ন্ত্রিত কোন কিছুর কাছে তিনি বাধ্য -এমন কোন কথা তাঁর হলফনামায় নেই।

এ দফাগুলোর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে-

ক) সরকারী সিদ্ধান্ত, উচ্চ আদালত, সংবিধান এসবকটির শতভাগ সংরক্ষণ করে তিনি শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেন।

খ) শরীয়াহ'র কাছে কোন প্রকার দায়বদ্ধতা ছাড়াই তিনি শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেন।

গ) সরকারী সিদ্ধান্ত, উচ্চ আদালতের নীতি, সংবিধান এসবের উপর শরীয়াহকে প্রাধান্য না দিয়েই তিনি শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেন।

ঘ) মূলত শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেন -এমন কোন কথাই তাঁর হলফনামায় নেই। অর্থাৎ শরীয়াহ বাস্তবায়নের প্রতিজ্ঞা যার নেই তিনিই শরীয়াহ বাস্তবায়নের প্রধান ব্যক্তি।

বলাবাহুল্য, এ হচ্ছে শরীয়াহ ও শরীয়ার অনুসারীদের সঙ্গে ঠাট্টা। শরীয়াহ বাস্তবায়ন সম্পর্কে যত উদ্ধৃতি সবই হচ্ছে ভূমিকার সেই 'পাওয়ারলেস' অস্পষ্ট কিছু কথা যা গণতন্ত্র ধর্মের অনুসারী ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের লোকেরা তাদের বিশেষ প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করেছে। তার যথাযথ লভ্যাংশও তারা বিগত সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবৎ ভোগ করে আসছে।

একটি সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানের সংবিধান যার ব্যাপারে শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে, এর মূল স্তম্ভ রাখা হয়েছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের স্বীকৃতির উপর সে সংবিধানকে সামনে রেখে আমরা দু'টি দিক আলোচনা করেছি। একটি দিক হচ্ছে, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ইসলামের ইতিহাস, ফিকহ ও ফাতাওয়া থেকে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের প্রকৃত রূপ ও চিত্র। অপর দিক হচ্ছে, পাকিস্তান সংবিধানের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার চিত্র।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে চিত্র আমরা পাকিস্তান সংবিধানে পেয়েছি তা প্রকৃত পক্ষেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। শায়খে মুহতারাম দামাত বারাকাতুহুম তাঁর 'সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাবে আব্রাহাম লিংকন, রুশো, ভোল্টায়ারের আবিষ্কৃত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা হুবহু চিত্রিত হয়েছে পাকিস্তানের সংবিধানে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে হাকীকত ও রূপ পুরো বিশ্বব্যাপী সমাদৃত তার কোনটি থেকেই পাকিস্তান পিছিয়ে নেই।

ব্যবধান যতটুকু তা আমরা কোন এক প্রসঙ্গে এর আগে উল্লেখ করে এসেছি। আর তা হচ্ছে, পাকিস্তান সংবিধানের ভূমিকায় বার বার ইসলামের নাম ও কুরআন সুন্নাহর নাম নেয়া হয়েছে। ইসলামকে জাতীয় ধর্ম বলা হয়েছে। এর বাইরে সংবিধানের মৌলিক ধারা উপধারার মধ্যে ইসলামকে ও কুরআন সুন্নাহকে স্থান দেয়া হয়নি। কুরআন সুন্নাহর আলোকে চ্যালেঞ্জ করে চূড়ান্ত ফলাফলে পৌঁছার মত কোন ধারাও সংবিধানে রাখা হয়নি। যার বাস্তব চিত্র ইনশাআল্লাহ অন্য কোন টীকার অধীনে আসবে।

এ সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের একটি উদারতা এটাও যে, যে দেশে যে ধর্মের অনুসারী বেশি সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন রক্ষার জন্য তারা ধর্মীয় কিছু গদ ব্যবহার করে থাকে। যার সঙ্গে প্রায়োগিক কোন সম্পর্ক থাকে না। এটা হচ্ছে অনেকটা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা ফুলের মত। যেমনিভাবে হাজারো ফুলের মধ্য থেকে শাপলাকে এনে মতিঝিলের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থান দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে পাকিস্তানে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সাম্য বজায়ে রেখে ইসলামকে জাতীয় ধর্মের মান দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংবিধান থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো দেখানো হয়েছে এগুলোর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক. এগুলো শাখাগত কোন বিষয় নয়, ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় নয় এবং সাময়িক কোন বিষয় নয়; বরং যুগের পর যুগ এ বিধানগুলো এভাবেই চলে আসছে। দুই. সংবিধানের এ বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে কোন প্রকার মামলা ও আপিল করার কোন সুযোগ নেই। শায়খে মুহতারামও আশা করি এ কথা মনে করেন না যে, সংবিধানের এ বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে তাঁর বা তাঁর মত লক্ষ ওলামায়ে কেরামের কিছু করার আছে। যার দরুন শায়খে মুহতারাম যে দাবি করেছেন, তিনি বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সময় শরীয়ত বিরোধী দুই শত মাসআলার বিষয়ে সুপারিশ জারি করেছিলেন, তাঁর সে দুই শত মাসআলার তালিকায় সংবিধানের এ বিষয়গুলো স্থান পায়নি।

দু'টি হাকিমিয়্যাতের সমন্বয় অসম্ভব!

বলাবাহুল্য, যে সংবিধানের হাকিমিয়্যাত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে সে সংবিধানের হাকিমিয়্যাত আল্লাহর হতে পারে না। যে সংবিধানের বিধান

দাতা তিনশত বিধানদাতা সে সংবিধানের বিধানদাতা আল্লাহ জাল্লা শানুহু হতে পারেন না। যে সংবিধানের বিধানদাতা মুসলিম অমুসলিম সবাই হতে পারে সে সংবিধানে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত মেনে নেয়া হয়েছে এ অবাস্তব বিশ্বাস আমরা করতে পারি না। যে সংবিধানে প্রধান বিচারপতিসহ সকল বিচারপতি অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই সে সংবিধান আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এ অবাস্তব কথাটি বিশ্বাস করা অন্যায়।

যে সংবিধানে অমুসলিমের জন্য রাজনৈতিক সাম্য ঘোষিত সে সংবিধানে হাকিমিয়্যাত আল্লাহর হতে পারে না। যে সংবিধানে বান্দা বান্দার গুনাহ মাফ করে দিতে পারে সে সংবিধানে হাকিমিয়্যাত আল্লাহর হতে পারে না।

এমন দু'টি হাকিয়্যািতের সমন্বয় সম্ভব নয় যা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এটা আল্লাহর উপর ইফতিরা-অপবাদ। আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের তাহরীফ-অপব্যাখ্যা। ক্ষমতালোভী ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মালিকপক্ষ এমন দাবি করতে পারে, কিন্তু মুসলমান ও তাদের কর্ণধারগণ এমন দাবির ধোঁকায় পড়তে পারেন না।

যেমনিভাবে সম্ভব নয় আহলে কিতাবের এ প্রস্তাব গ্রহণ করা-

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾

"আহলে কিতাবের এক দল তাদের লোকদেরকে বলে মুসলমানদের উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তোমরা সকাল বেলা তার উপর ঈমান আন এবং বিকাল বেলায় তা অস্বীকার কর, তারা হয়ত ফিরে আসবে। আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাদের কথা ছাড়া তোমরা কারো কোন কথাই মেনে নিও না।" -সূরা আল ইমরান ৭২-৭৩

জরুরী টীকা : ২

“

এ বিষয়টি আপনি সকল ইসলামী রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রেই পাবেন না। এমন কি সাউদী আরবেও নয় .... যে, হাকিমিয়্যাত আল্লাহ তাআলার জন্য।

জরুরী টীকা-২

এ বিষয়টি আপনি সকল ইসলামী রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রেই পাবেন না। এমন কি সাউদী আরবেও নয় .... যে, হাকিমিয়্যাত আল্লাহ তাআলার জন্য।

** শায়খে মুহতারামের এ দাবিটি অনেক বেশি বাস্তববিবর্জিত হয়ে গেছে। তাঁর এ বক্তব্য যে সময়ের সে সময়ে পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর যথাযথ প্রতিবেদন সামনে আসলেই এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা সম্ভব। শুধু ধারণা, আবেগ ও ভূখণ্ডভিত্তিক সাম্প্রদায়িক মানসিকতা দিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গেলে এর সঠিক ফলাফলে পৌঁছা যাবে না। তালেবান শাসন, তানযীম শাসন ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে এমন সিদ্ধান্ত দিতে গেলে সিদ্ধান্তে ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতারণামূলক লিখিত সংবিধান ও বাস্তবায়নমুখী বাস্তব সংবিধানের ব্যবধান স্পষ্ট না থাকলেও সিদ্ধান্তে ভুল হবে। আর সাউদী আরবের লিখিত সংবিধানে নেই -এর অর্থ কি? সাউদী আরব তো একটি নীতিমালার উপরই চলে এবং সে নীতিমালার লিখিত রূপও আছে।*

যাইহোক, এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে থাকা জরুরী: ১. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডগুলোর হালাত। ২. সংবিধানের লিখিত রূপ ও বাস্তব রূপ। ৩. এমন দেশের পরিচয় ও মাপকাঠি।

{এক}

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডগুলোর হালাত

শায়খে মুহতারাম যখন এ বক্তব্য দিচ্ছেন তখন পৃথিবীর বুকে এমন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব বর্তমান আছে যেখানে মিনহাজুন নুবুয়্যাহ'র আদলে ইসলামী শাসন চলছে। যে ভূখণ্ডগুলোতে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কোন আধিপত্য নেই, কোন প্রভাব নেই। দারুল ইসলামে কোন মাসআলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। কুরআন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট। শরীয়ত বিশেষজ্ঞ মুফতীর ফাতওয়াই যথেষ্ট।

শায়খে মুহতারাম সাউদী আরবের উদাহরণ টেনে আনায় পাঠকের বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করছি। এ উদাহরণের আলোকে পাকিস্তানের অবস্থান এবং বিশ্বের অপরাপর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর অবস্থান আশা করি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সাউদী আরব

সাউদী আরবের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কয়েকটি ধাপ:

এক. তাওহীদের বিশ্বাস

সাউদী আরব মুতাসাল্লিব তাওহীদের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দেশ। তাওহীদের বিষয়ে কট্টর মনোভাব প্রকাশ করতে তারা পছন্দ করে। এটি সাউদী আরবের ঘোষিত রাষ্ট্রীয় নীতি।

তথ্য

﴿ليس في أعلام دول العالم كله من يحمل الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) إلا علم المملكة الذي يرتفع فوق إداراتها ووزاراتها وسفاراتها، وقنصلياتها المختلفة في أرجاء الدنيا. وهي الدولة التي تمنع أن ينكس علمها حين تنكس أعلام الدول، ديناً وتكريما لكلمة التوحيد واعتزازاً بما تحمله هذه الراية من مضامين﴾ {اتخاذ القرآن

الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية، د. صالح بن عبد الله بن حميد}

"সারা বিশ্বের কোন দেশের জাতীয় পতাকায় শাহাদাতাইন এর উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র মামলাকার (সাউদী আরব) পতাকায় তা রয়েছে যা তার অফিস আদালতগুলো, মন্ত্রণালয়, দূতাবাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন হাইকমিশনারদের অফিসে উড্ডীন হয়।" -সাউদী আরবের জীবন বিধানের ভিত্তি কুরআন, ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ

দুই. তাওহীদের প্রয়োগ

সাউদী আরবের তাসাল্লুব আলাত তাওহীদ তথা তাওহীদের বিষয়ে কট্টর মনোভাব প্রকাশ করা একটি প্রায়োগিক বাস্তবতা, যার সাক্ষী সারা বিশ্ব।

তথ্য:

﴿يقول الملك عبد العزيز رحمه الله (هذه عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي أظهر الله به الدين بعدما وهنت أركانه بين العالمين، في مراسلاته، ومناصحاته ودعوته الخلق إلى دين الله ورسوله). ويقول موضحاً شيئاً من مضمون هذا المنهج أمام الحجاج عام ١٣٦٣: أما العبادة فلا تصرف إلا لله وحده لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا تخفى عليكم الآية الكريمة : {**وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون**} (الذاريات: ٥٦).

ومعنى يعبدون يوحِّدون ، فالتوحيد خاص بالله تعالى، والعبادة لا تصرف إلا لله، والرجاء والخوف والأمل كله بالله، ولله، وما بعث محمد ولا أرسل الرسل، ولا جاهد المجاهدون إلا لتوحيد الله تعالى). ويقول أيضاً: "يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار أنه مذهب

خاص. وهذا خطأ فاحش، نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض.

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة. ولم يأت محمد بن عبد الوهاب بالجديد. فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه السلف الصالح.

هي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شائبة منزهة من كل بدعة فعقيدة التوحيد هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. إننا لا نبتغي التجديد الذي يفقدنا ديننا وعقيدتنا، إننا نبغي مرضاة الله عز وجل. ومن عمل ابتغاء مرضاة الله فهو حسبه وهو ناصره. فالمسلمون لا يعوزهم التجديد، وإنما يعوزهم العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، ولقد ابتعدوا عن العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فانغمسوا في حمأة الشرور والآثام فخذلهم الله جل شأنه ووصلوا إلى ما هم عليه من ذل وهوان، ولو كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله. لما أصابهم ما أصابهم من محن وآثام ولما أضاعوا عزهم وفخارهم» **{اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية، د. صالح بن عبد الله بن حميد}**

"বাদশাহ আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহর আকীদা যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে জগতের বুকে প্রকাশ করেছেন, যে দ্বীনের রুকনগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর চিঠিপত্র, ওয়ায নসীহত ও মানুষদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে করেছেন।

১৩৬৩ হিজরীতে তিনি হাজীদের সামনে এ বিষয়টিকে এভাবে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন-

ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যই করা হবে। কোন বড় ফেরেশতার জন্য নয়, কোন প্রেরিত রাসূলের জন্য নয়। আপনাদের সামনে এ পবিত্র আয়াতটি গোপন নয় যে আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য' (সূরা যারিয়াত ৫৬)।

আর এখানে يعبدون অর্থ হচ্ছে يوحّدون। অতএব তাওহীদ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। ইবাদত শুধু আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করা হবে। কামনা, ভয়, আশা সব কিছু আল্লাহর কাছেই করা হবে এবং আল্লার জন্যই করা হবে। মুহাম্মদকে পাঠানো হয়েছে, সকল রাসূলকে পাঠানো হয়েছে এবং সকল মুজাহিদ জিহাদ করেছেন একমাত্র আল্লাহর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

তিনি আরো বলেন-

তারা আমাদেরকে ওহাবী নামে ডাকে এবং আমাদের মাযহাবের নাম দেয় ওহাবী মাযহাব, যেন এটি একটি বিশেষ মাযহাব। অথচ এটা স্পষ্ট ভুল। এগুলো কিছু মিথ্যা দাবির উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে যা মতলববাজরা প্রচার করত।

আমরা নতুন কোন মাযহাবের অনুসারী নই, বা নতুন কোন বিশ্বাসেরও অনুসারী নই। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নতুন কিছু নিয়ে আসেননি। আমাদের আকীদা সালাফে সালেহীনের আকীদাই যা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের হাদীসে এসেছে এবং যে আকীদার উপর সালাফে সালেহীন ছিলেন।

আর সে আকীদা হচ্ছে যা সকল প্রকার সন্দেহ মুক্ত খালেস আল্লাহর তাওহীদের উপর ভিত্তিবহুল আকীদা এবং যা সকল প্রকার বিদআত থেকে পবিত্র। তাই আমরা তাওহীদের আকীদার দিকে দাওয়াত দেই। আর আকীদাই আমাদেরকে আমাদের সেসব পরীক্ষা ও বালা মুসিবত থেকে মুক্তি দেবে যেসবের মধ্যে আমরা পড়ে আছি।

আমরা এমন সংস্কার চাই না যা আমাদেরকে আমাদের দ্বীন ও বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি চাই। আর যে

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি তাঁর সাহায্যকারী। সংস্কার মুসলমানদের চাহিদা পূরণ করবে না, তাদের চাহিদা পূরণ করবে সালাফে সালেহীন যে পথে ছিলেন সে পথে ফিরে যাওয়া। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের হাদীসে যা এসেছে তার উপর মানুষ আমল ছেড়ে দিয়েছে। যারফলে তারা অন্যায় ও গুনাহের কাদায় আটকে গেছে এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে অপদস্থ করেছেন, আর তারা অপদস্থতা ও হীনতার যে আবস্থায় রয়েছে সেখানে পৌঁছে গেছে। যদি তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে রাখত তাহলে তারা যে অপদস্থতা বিপর্যস্ত গুনাহের অবস্থায় পড়ে আছে তাতে তারা পতিত হত না এবং তারা তাদের ইজ্জত ও গৌরব হারাত না।" -সাউদী আরবের জীবন বিধানের ভিত্তি কুরআন, ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ

তিন. পূর্ণাঙ্গ শরয়ী আদালতের ঘোষণা

সাউদী আরবের সর্বোচ্চ আদালত থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন আদালত পর্যন্ত প্রত্যেকটি আদালত শরীয়াহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এটাই সাউদী আরবের ঘোষণা।

তথ্য

القضاء:

﴿ترعى الدولة الإسلامية إقامة الدين وسياسة الدنيا، ويعد القضاء من أهم المعالم البارزة للدولة إن لم يكن أهمها. والمملكة وفقها الله بالتزامها بالإسلام ديناً وبالقرآن دستوراً وبالشريعة تنظيماً وتشريعاً، اتجهت إلى تنظيم القضاء. بمنهاج الشرع بوصفه من أجلى صور تطبيق الإسلام والالتزام به.

أما الحكم فهو للشرع المطهر وليس هناك إلزام بمذهب معين من المذاهب الفقهية.

ولقد قال الملك عبد العزيز رحمه الله: "وأما المذهب الذي تقضي به المحكمة الشرعية فليس مقيداً بمذهب مخصوص بل تقضي حسبما تظهر لها من المذاهب فإنه لا فرق بين مذهب وآخر"

وقال أيضاً: "لا نتقيد بمذهب من المذاهب الأربعة دون آخر ومتى وجدنا الدليل في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه وتمسكنا به، وأما إذا لم نجد دليلاً قوياً أخذنا بقول الإمام أحمد.

وفي المادة (٤٦) من النظام الأساسي للحكم: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".

وفي المادة الأولى من نظام القضاء: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. وليس لأحد التدخل في القضاء"﴾ {اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية، د. صالح بن عبد الله بن حميد}

"বিচার বিভাগ

ইসলামী দেশটি দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দুনিয়া পরিচালনার প্রতি মনোযোগ দেয়। আর বিচার বিভাগকে দেশের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ মনে না করলেও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর একটি মনে করে।

মামলাকা আল্লাহর তাওফীকে ইসলামকে ধর্ম হিসাবে, কুরআনকে সংবিধান হিসাবে এবং শরীয়তকে আইন ও কানূন হিসাবে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ করে শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামকে বাস্তবায়ন এবং তা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আঁকড়ে ধরার সর্বোচ্চ সুন্দর পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা বিচার বিভাগকে তৈরি করার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে।

আর বিধান হবে পবিত্র ধর্মের আলোকে। এখানে ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

বাদশাহ আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, শরয়ী আদালত যে মাযহাবের আলোকে ফয়সালা করবে তা নির্দিষ্ট কোন মাযহাব নয়। বরং সকল মাযহাবের আলোকে যে সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয় সে আলোকে ফয়সালা করবে। কেননা মাযহাবে মাযহাবে কোন ব্যবধান নেই।

তিনি আরো বলেছেন-

আমরা চার মাযহাবের একটিকে বাদ দিয়ে খাসভাবে একটি গ্রহণ করি না। চার মাযহাবের যে কোন মাযহাবে যখন আমরা দলিল পেয়ে যাব তখন আমরা সে দিকেই যাব এবং সেটিকে গ্রহণ করব। আর যখন আমরা শক্তিশালী কোন দলিল পাব না তখন আমরা ইমাম আহমদের মাযহাবকে গ্রহণ করব।

বিধানের মৌলিক নিয়মের অনুচ্ছেদ (৪৬) এর মধ্যে রয়েছে-

বিচার বিভাগ একটি স্বাধীন বিভাগ। ইসলামী শরীয়তের আধিপত্য ব্যতীত বিচারপতিদের বিচারের ক্ষেত্রে আর কোন শক্তি প্রভাব বিস্তার করবে না।

বিচার বিভাগীয় নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে রয়েছে-

বিচারপতিরা স্বাধীন। বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান ব্যতীত এবং অনুসৃত নিয়মাবলী ব্যতীত তাদের উপর আর কোন কিছুর কোন প্রভাব বিস্তার নেই এবং বিচার বিভাগে কারো দখল দেয়ার অধিকার নেই।" -সাউদী আরবের জীবন বিধানের ভিত্তি কুরআন, ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ

চার. হুদূদ কিসাসের প্রয়োগ

সাউদী আরবে শরয়ী দণ্ডবিধি প্রয়োগ, হুদূদ ও কিসাসের বাস্তবায়ন একটি চাক্ষুষ বিষয়।

তথ্য

﴿ليس في العالم بلد يقيم الحدود ويعلن عن تنفيذها في نشراته الإخبارية الرسمية أمام العالم كله إلا البلاد السعودية، ومن ثم فليس غريباً ولا عجيباً -ولله الحمد والمنة- أن تكون السعودية أقل دول العالم نسبة في انتشار الجرائم، وأكثرها أمناً واستقراراً﴾

{اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية، د. صالح بن عبد الله بن حميد}

"সাউদী আরব ব্যতীত পুরা পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের বিষয়টিকে সরকারী সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সামনে প্রচার করা হয়। আর তাই আলহামদু লিল্লাহ এ বিষয়টি খুব অস্বাভাবিক ও অবাক হওয়ার মত বিষয় নয় যে, সারা বিশ্বের মাঝে সাউদী আরব এমন একটি দেশ যেখানে অপরাধের বিস্তৃতি তুলনামূলকভাবে কম এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বেশি।" -সাউদী আরবের জীবন বিধানের ভিত্তি কুরআন, ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ

পাঁচ. প্রধান মুফতী প্রধান বিচারপতি

সাউদী আরবের প্রধান মুফতী প্রধান বিচারপতি। শরীয়ার সবচাইতে বড় বিশেষজ্ঞ আইনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞরা সকল আদালতের বিচারপতি।

তথ্য

সরকারী গ্র্যান্ড মুফতী হাইআতু কিবারিল উলামার প্রধান এবং মৌলিক সকল সিদ্ধান্ত তার স্বাক্ষরে অনুমোদিত হয়।

'হাইআতু কিবারিল উলামা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে,

﴿**هيئة كبار العلماء السعودية** هي هيئة دينية إسلامية حكومية في المملكة العربية السعودية تأسست عام ١٩٧١ وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة باصدار الفتاوى وابداء آرائها في عدة أمور. يرأسها حاليا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة، اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد

البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى)، ويلحق بها عدد من البحوث﴾ {ويكيبيديا}

ছয়. রাষ্ট্রপ্রধানের ইসলামিক পরিচয়

সাউদী আরবের রাষ্ট্রপ্রধানের পরিচয় হচ্ছে, খাদিমুল হারামাইনিশ শারীফাইন।

তথ্য

এ পরিচয় সরাসরি উপাধী হিসাবে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয শুরু করলেও সাউদী আরবের বাদশাহরা সব সময় নিজেদেরকে হারামাইনের খাদেম হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বগুলোর মৌলিক একটি দায়িত্ব হচ্ছে হারামাইনের যাবতীয় খেদমত আঞ্জাম দেয়া। ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ তার 'সাউদী আরবের জীবন বিধানের ভিত্তি কুরআন' বইয়ে মামলাকা আরাবিয়া সাউদিয়ার রাষ্ট্রীয় মৌলিক দায়িত্বগুলোর তালিকায় লিখেছেন-

﴿تاسعاً: خدمة الحرمين الشريفين ليظلا طاهرين مطهرين للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، بعيدين عن كل ما يحول دون أداء الحج والعمرة والزيارة والتعبد فيهما على الوجه الصحيح الآمن﴾

"নবম. হারামাইন শরীফাইনের সেবা। যাতে এ দু'টি সর্বদা তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও নামায আদায়কারীদের জন্য পবিত্র অবস্থায় থাকে। এমনিভাবে হজ্জ, ওমরা, যিয়ারত ও সব ধরনের ইবাদত সহীহভাবে আদায় করার ক্ষেত্রে যত ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে সেসব কিছু থেকে হারামাইন মুক্ত থাকে সে চেষ্টায় রত থাকা।"

সাত. আইম্মাতুল কুফরের সঙ্গে বন্ধুত্ব

সাউদী আরব বিশ্বের আইম্মাতুল কুফরের বন্ধু।

তথ্য

সাউদী আরব বিশ্ব কুফরী সংঘের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। একাধিক কুফরী সংঘের সক্রিয় সদস্য। সাউদী আরব বিশ্ব কুফরী সংঘগুলোর সবচাইতে বড় আর্থিক যোগানদাতা। ইমামু আইম্মাতিল কুফর সাউদী আরবের বাদশাহর সবচাইতে কাছের বন্ধু। যুগ যুগ থেকে এ বন্ধুত্ব চলে আসছে। সর্বশেষ বিশ্বের কাফের প্রধানদের প্রধান ট্রাম্পকে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ সম্মাননা প্রদর্শন করে, প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে, গলায় সম্মাননা পদক ঝুলিয়ে দিয়ে, নথিপত্রে স্বাক্ষর করে এ বন্ধুত্বকে স্থায়ী ও টেকসই করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার এ বাণীর বিরুদ্ধাচরণের সর্বোচ্চ উদাহরণ হওয়ার সকল যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং উদাহরণ না হওয়ার জন্য কোন ফাঁক রাখা হয়নি-

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ {سورة المجادلة: ٢٢}

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" -সূরা মুজাদালাহ ২২

বিশ্বের কাফের প্রধানের সঙ্গে প্রীতি মুলাকাত, প্রীতি অনুষ্ঠান ও প্রীতি ভোজের ফাঁকে ফাঁকে কুরআনে কারীমে বর্ণিত يُوَادُّونَ শব্দ থেকে বার

বার الود (ভালোবাসা) শব্দ ব্যবহার করে করে هذا لقاء الود والإخاء (এটি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মিলন) বলে বলে কুফরী শক্তির প্রধানের সঙ্গে ভালোবাসার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

আট. শরয়ী জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান

সাউদী আরব কুফরের পক্ষ নিয়ে কুফরের কাতারে দাঁড়িয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র জিহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

তথ্য

খাদেমুল হারামাইন আশশারীফাইন বিশ্ব কুফরী শক্তির প্রধানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে الكرة المضيئة আলোকিত পৃথিবীর গায়ের উপর হাত রেখে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছে। এমন শুভক্ষণের শুকরিয়া হিসাবে বিশ্ব কুফরী শক্তির হাত ধরে নেচে গেয়ে সর্বোচ্চ আনন্দের প্রকাশ করা হয়েছে।

'হাইআতু কিবারিল উলামা' তাদের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে দু'টি বিষয়কে গ্রহণ করেছে। এক. সারা বিশ্বে মুসলমানদের পক্ষে জিহাদের যত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে তার সবগুলোকে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ বলে ফাতওয়া দেয়া। দুই. বিশ্বব্যাপী পরিচালিত জিহাদের সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব কুফরী শক্তির গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপকে বৈধতা দেয়া, মুসলমানরা তাতে অংশগ্রহণ করাকে জরুরী বলে ফাতওয়া দেয়া এবং সব ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা।

নয়. শরীয়াহ লঙ্ঘনের আয়োজন

সাউদী আরব শরীয়তের প্রতিটি বিধান লঙ্ঘন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং তা বাস্তবায়নের পথে দ্রুত অগ্রসরমান।

তথ্য

একটি গণতান্ত্রিক দেশ যে কুফরী মূলনীতিগুলোর উপর পরিচালিত হয় সেগুলো বাস্তবায়নের ঘোষণা ইতিমধ্যে এসে গেছে এবং একটি একটি করে বাস্তবায়ন চলছে।

দশ. আততাহাকুম ইলাততাগুতের অনুশীলন

সাউদী আরব 'আততাহাকুম ইলাত তাগূতে'র অনুশীলন করে চলেছে যুগের পর যুগ এবং এ ক্ষেত্রে তারা এখন অতীতের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর।

তথ্য

সাউদী আরবের শাসক গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরেই রাজপরিবারের ক্ষেত্রে শরয়ী আইনকে আইন হিসাবে গ্রহণ করেনি। সে ক্ষেত্রে তারা তাগুতের আইনকে মেনে চলেছে। আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে সাউদী আরব আজীবন তাগুতের আইন অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামী শরীয়তের আইনকে বাদ দিয়ে কুফরী আইনের আলোকে সকল কার্য পরিচালনা করেছে এবং কুফরী আইনকেই সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে মেনে নিয়েছে।

পাকিস্তান

আপাতত উপরোক্ত দশটি বিন্দুতে আমরা সাউদী আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনমূলক বিশ্লেষণ দেখব, ইনশা-আল্লাহ। যাতে কোন কোন বিন্দুতে পাকিস্তান সাউদী আরবের চাইতে অগ্রসর তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে করে কোন কোন বৈশিষ্ট্যে সাউদী আরব পাকিস্তানকে ধরতে পারছে না তা আমাদের বুঝতে সহজ হবে।

এক. শিরকের বেড়াজালে

পাকিস্তান শিরকে খফী ও শিরকে সূরীকে সেভাবে পরিহার করতে পারেনি যেভাবে সাউদী আরব পেরেছে। শিরক পরিহারের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ঐ তাসাল্লুব-কঠোর মানসিকতা নেই যে তাসাল্লুব-কঠোর মানসিকতা সাউদী আরবের আছে।

তথ্য

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপক্ষ, অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ও অনেক ওলামায়ে কেরাম পীর ও আউলিয়া ভক্তির ঐ মাত্রাকেই গ্রহণ করে থাকে যে মাত্রায় গিয়ে শিরকে খফী ও শিরকে সূরী থেকে বাঁচা সম্ভব হয় না। তাসাওউফ বিভাগকে পবিত্র করতে করতেও যেসব উপসর্গ এখনো রয়ে গেছে এবং যেসব উপসর্গ থেকে অনেক ওলামায়ে কেরামও

নিজেদেরকে বাঁচাতে পারছেন না সে উপসর্গগুলো আকীদা বিশ্বাসের স্বচ্ছতার কারণে শিরকে জলি না হলেও শিরকে খফী ও শিরকে সূরী অবশ্যই।

হাল্লাজের আকীদা বিশ্বাসের প্রতি অপ্রয়োজনীয় ভক্তি, বাতেনী ইলমের ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী এমনকি সরাসরি ঈমানবিরোধী কারামাতের দাবি ও প্রচার, শরীয়ত ও বাতেনী বিভাগের পরস্পরে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে বাতেনী বিভাগকে প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক মাপকাঠি থেকে পাকিস্তান অনেক দূরে রয়েছে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত হঠধর্মিতা না থাকলে বিষয়গুলো স্বীকার করতে আর কোন বাধা নেই।

দুই. তাওহীদের প্রয়োগে দুর্বলতা

পাকিস্তান বিশ্বের মাঝে তাসাল্লুব ফিত তাওহীদ তথা তাওহীদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শনের এমন কোন স্বাক্ষর রাখতে পারেনি যা সাউদী আরব রাখতে পেরেছে। পাকিস্তান তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সে পরিমাণ উদ্যোগ দেখাতে পারেনি যে পরিমাণ উদ্যোগ সাউদী আরব দেখাতে পেরেছে।

তথ্য

এরই বিপরীত পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ওলামায়ে কেরাম ও যিম্মাদার ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ হাল্লাজ এবং হাল্লাজের মত আরো যারা বিভিন্ন কুফর শিরকে জড়িত ছিল, যাদের আচরণ, কথাবার্তা ও আমলের মাঝে ঈমান কুফরের ব্যবধান করা যায় না এমন সব ব্যক্তিবর্গকে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে অনেক মেধা ব্যয় করে থাকেন। হাল্লাজের মত ব্যক্তিদের কুফর শিরকগুলোকে তাদের বুজুর্গী ও কারামত হিসাবে প্রমাণিত করার জন্য সেসব কুফর শিরকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব মূলনীতি উদ্ভাবন করে থাকেন যে সব মূলনীতির আলোকে শরীয়তের তথা কুরআন হাদীসের মূলনীতিগুলোকে অকার্যকর করে ফেলতে হয়।

শরীয়ত ও তাসাওউফ এমন মুখোমুখী অবস্থানে দাঁড়ায় যেখানে এসে তাসাওউফের মূলনীতিকে গ্রহণ করলে শরীয়তের মূলনীতিকে গ্রহণ করা যায় না। আর শরীয়তের মূলনীতিকে গ্রহণ করলে তাসাওউফের

মূলনীতিকে গ্রহণ করা যায় না। এমন সব ক্ষেত্রে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, কুরআন হাদীস দিয়ে তাসাওউফের মূলনীতি বোঝা যাবে না। যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে, শরীয়ত ও তাসাওউফের মুখোমুখী অবস্থানে তাসাওউফের বাতেনী পথই প্রাধান্য পাবে, শরীয়ত সেখানে পরাজিত হবে। কাজে কর্মেও তাই হতে দেখা যায়।

বিষয়গুলোর সঠিক উপলব্ধির জন্য এবং এর যথাযথ মূল্যায়নের জন্য 'মানছুর হাল্লাজ চরিত' বইটি আগাগোড়া দেখা যেতে পারে। এছাড়া 'ভেদে মারেফত', 'মুমিনের হাতিয়ার', 'মছনবিয়ে রূমী'র বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

সাউদী আরবের অবস্থা এমন নয়।

তিন. শরীয়াহমুক্ত আদালত

পাকিস্তানের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন সকল আদালতই শরীয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। আর শরীয়াহ বেঞ্চ নামে আদালতের অতি ক্ষুদ্র যে বেঞ্চটি রয়েছে তারাও গায়রে শরয়ী সর্বোচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন। এটা পাকিস্তানের সাংবিধানিক ঘোষণা।

তথ্য

পাকিস্তানের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন সকল আদালতই শরীয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত; কারণ পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে যেকোন আইন তৈরি হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে। যে সংসদ সদস্যরা মুসলমান হওয়া জরুরী নয়। যে সংসদের প্রধান সিদ্ধান্তদাতা স্পিকার মুসলমান হওয়া জরুরী নয়। যে সংসদ বা আইন প্রণয়ন বিভাগের সদস্য, সভাপতি সবাই তাগুতের আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে। তাগুতের আইনে বিশেষজ্ঞ না হয়ে আইন প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা যায় না। শরয়ী আইনের বিশেষজ্ঞ মুফতী-মুহাদ্দিস-মুফাসসির সেখানে কোন কাজে আসে না।

আর শরীয়াহ বেঞ্চের ব্যাপারে পাকিস্তানের সংবিধানে বলা আছে, তা গায়রে শরয়ী আদালতের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হবে। শরীয়াহ বেঞ্চের রায়ের বিষয়ে গায়রে শরয়ী আদালতের আপীল বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। গায়রে শরয়ী আদালতের আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত হওয়ার আগ

পর্যন্ত শরীয়াহ বিভাগের সিদ্ধান্ত অকার্যকর থাকবে। সংবিধানে বলা হয়েছে-

مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ، اس میعاد کے گذرنے سے پہلے جس کے اندر عدالت عظمی میں اس کیخلاف اپیل داخل ہو سکتي ہو یا، جبکہ اپیل بایں طور پر داخل کردی گئی ہو تو اس اپیل کے فیصلہ سے پہلے مؤثر نہیں ہو گا۔

....

....

ص:١٢١-١٢٣ ....

"তবে শর্ত হচ্ছে, এমন কোন ফয়সালা ঐ সময় অতিক্রম করার আগে কার্যকর হবে না যে সময়ের মাঝে সুপ্রিম কোর্টে তার বিরুদ্ধে আপিল হতে পারে, অথবা যখন এ হিসাবে আপিল করা হয়ে গেছে তা হলে ঐ আপিলের রায়ের আগে তা কার্যকর হবে না।" -বেফাকী (ফেডারেল) আদালত পৃ: ১২১-১২৩

শরীয়াহ বেঞ্চের অধিকাংশ সদস্য হবে তাগুতের আইনে বিশেষজ্ঞ এবং গায়রে শরয়ী আদালতে কাজ করে অভিজ্ঞ। এ শরীয়াহ বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি হবেন যিনি দীর্ঘ জীবন গায়রে শরয়ী আদালতে তাগুতের আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। পাকিস্তান সংবিধানে বলা হয়েছে-

عدالت چیف جسٹس سمیت زیادہ سے زیادہ آٹھ **مسلم ججوں** پر مشتمل ہو گی، جن کا تقرر صدر آرٹیکل ١٧۵-الف کی مطابقت میں کرے گا۔

چیف جسٹس ایسا شخص ہو گا جو عدالت عظمی کا جج ہو، یا رہ چکا ہو، یا بننے کا اہل ہو یا جو کسی عدالت عالیہ کا مستقل جج رہ چکا ہو۔

ججوں میں زیادہ سے زیادہ چار ایسے اشخاص ہوں گے جن میں سے ہر ایک کسی عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہ چکا ہو، یا بننے کا اہل ہو اور زیادہ سے زیادہ تین علماء ہوں گے جو اسلامی قانون، تحقیق یا تعلیم میں کم از کم پندرہ سالوں کا تجربہ رکھتے ہوں۔
وفاقی شرعی عدالت ۱۲۰-۱۱۸/۱

"আদালতটি প্রধান বিচারপতিসহ সর্বোচ্চ আট জন মুসলিম জজ দ্বারা তৈরি হবে। প্রেসিডেন্ট ১৭৫ আলিফ অনুচ্ছেদের আলোকে তাদেরকে নিয়োগ দেবেন।

প্রধান বিচারপতি এমন ব্যক্তি হবেন যিনি সুপ্রিম কোর্টের জজ হবেন, অথবা আগে ছিলেন এমন হবেন, অথবা হওয়ার যোগ্য হবেন, অথবা উচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ জজ হিসাবে ছিলেন এমন হবেন।

জজদের মধ্যে সর্বোচ্চ চার জন এমন ব্যক্তি হবেন যাদের প্রত্যেকে কোন উচ্চ আদালতের জজ হবেন, বা জজ ছিলেন এমন হবেন, অথবা হওয়ার যোগ্য হবেন। সর্বোচ্চ তিন জন আলেম হবেন যারা ইসলামী আইন, গবেষণা ও শিক্ষায় কমপক্ষে পনের বছরের অভিজ্ঞ হবেন।" -বেফাকী শরয়ী আদালত পৃ: ১১৮-১২০

সাউদী আরবে আদালত ও বিচারপতিরা এমন নয়।

চার. হুদূদ কিসাস কখনো হয়নি

পাকিস্তানে শরীয়ার প্রয়োগ, হুদূদ ও কিসাসের বাস্তবায়ন সত্তর/বাহাত্তর বছরের স্বপ্ন। যে স্বপ্নের তাবীর এখনো হয়নি। পাকিস্তান আজো শরীয়ার চেহারা দেখেনি। সংবিধানের পাতায় পাতায় সুন্দর সুন্দর ভাষায় তার ওয়াদা দেখেছে।

তথ্য

পাকিস্তানের মানুষ শরীয়তের এ পরিভাষাগুলো কখনো শোনেনি। এসবের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ তো সে দেশের মালিক পক্ষের মাথায়ও কখনো আসেনি। পাকিস্তান সংবিধানে হুদূদ, কিসাস তথা শরীয়াহ প্রয়োগ বিষয়ক অনুচ্ছেদটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং আমার সঙ্গে চলতে থাকুন।

সংবিধানের ২০০৪ এর সংস্করণে এসেছে-

اسلامی احکام

۲۲۷- (۱) تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا،... اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو- اسلامی جمہوریت پاکستان کا دستور، حصہ نہم ص: ۱۴۳

"ইসলামী বিধান

২২৭- (১) বর্তমানের সকল কানূনকে কুরআন পাক ও সুন্নাহতে বর্ণিত ইসলামী বিধান অনুযায়ী বানানো হবে। .... এবং এমন কোন কানূন তৈরি করা হবে না যা উল্লিখিত বিধানসমূহের বিপরীত হয়।" -ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, নবম খণ্ড, পৃ: ১৪৩

২০১২ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণের ১৪৫ পৃষ্ঠায় কথাটি হুবহু এভাবেই আছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণেও ১৪৫ পৃষ্ঠায় কথাটি হুবহু এভাবেই আছে। জানা গেছে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন এ সংবিধান তৈরি করেন তখনও এ বক্তব্যটি এভাবে ছিল এবং তখনও এ বক্তব্য লিখা হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরিকৃত প্রথম সংবিধানের আলোকে। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানেও কথাটি এভাবেই আছে। অর্থাৎ বলা যায়, সংবিধানের প্রত্যেক সংস্করণেই কথাটি এভাবে আছে।

একটি জটিল প্রশ্ন

প্রশ্ন হচ্ছে, موجودہ قوانین বা বর্তমান কানূন যাকে বলা হচ্ছে তা কে বা কারা তৈরি করেছে? তখন কুরআন সুন্নাহ কোথায় ছিল? পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে সংবিধানে বলা শুরু হয়েছে যে, বর্তমান কানূনকে কুরআন সুন্নার বিধানের মোতাবেক করে তৈরি করা হবে। বলতে বলতে ২০১৫ পর্যন্ত সে কথা বলে চলেছে, ৩০১৫ পর্যন্তও এভাবে বলতেই থাকবে। আর অপদার্থ উম্মত সে কথা গিলতে থাকবে এবং

তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকবে। কোন মুসলমান এতটা অচেতন হওয়া উচিত নয়। আর যদি সচেতনতার সাথে তা কেউ গিলে থাকে তাহলে তার ওযর কী? এবং তার বিচার কী হবে?
মুসলমানের বোঝা উচিত যে, এটি একটি রাজনৈতিক ওয়াদা। ভবিষ্যত ওয়াদা কখনো সংবিধানের কোন অংশ হয় না, কোন কানূন হয় না। সত্তর/বাহাত্তর বছর পর্যন্ত موجودہ قوانین বা বর্তমান কানূন হচ্ছে কুরআন হাদীসের বিরোধী। প্রতি বছর পাঁচ/সাতটি সংসদীয় অধিবেশনের মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইনগুলো প্রণয়ন ও পুনর্বহাল করে চলেছে দেশের মালিক পক্ষ। মুখ ও প্রসারিত হাত থেকে তিন ইঞ্চি দূরে একটি মুলা ঝুলিয়ে রেখে গাধাগুলোকে হাঁকিয়ে চলেছে দেশের গণতান্ত্রিক মুরতাদ পক্ষ। আর সচেতন মহল তার বন্দনা গেয়ে চলেছে। অপদার্থতার একটা সীমা পরিসীমা থাকা উচিত।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় যেসকল আকাবির ওলামায়ে কেরাম তাঁদের সর্বস্ব কুরবান করে গেছেন আমরা তাঁদের ঈমানী জযবা এবং দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

কিন্তু তাঁদের সেসকল অর্জনকে গণতান্ত্রিক কুফরী শক্তির হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা যে ভুল করেছেন এবং যে ভুলের জন্য তাঁরা আজীবন আফসোস করে গেছেন, কান্নাকাটি করে গেছেন, হা-হুতাশ করে গেছেন, সে ভুলকে আর কত দিন লালন করা উচিত? সে ভুলের পক্ষে আর কত দিন বন্দনা গাওয়া উচিত? সে ভুলকে দালিলিক মান দেয়ার চেষ্টা আর কত কাল করা উচিত?

পাঁচ. বিচারপতিরা অমুসলিমও হতে পারে

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই। কুফরী আইনের সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ এবং কুফরী আইনের প্রয়োগকারী পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি। এভাবে বিচার বিভাগের প্রত্যেক কোনে কোনে তারাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যারা মানবরচিত কুফরী আইনে সর্বোচ্চ শিক্ষিত। পাকিস্তানের শরীয়াহ বেঞ্চ নামে অতি ক্ষুদ্র যে বেঞ্চটি রয়েছে সে বেঞ্চের অধিকাংশ বিচারপতি মানবরচিত কুফরী

আইনে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু শরয়ী আইনে বিশেষজ্ঞ নয়। শরীয়াহ বেঞ্চের প্রধান বিচারপতির যোগ্যতা হচ্ছে যিনি দীর্ঘকাল কুফরী আইন প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হয়েছেন।

তথ্য

শায়খে মুহতারাম এক বক্তব্যে বলেছেন, পাকিস্তান একমাত্র মুসলিম দেশ যেখানে কোন অমুসলিম প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না। শায়খে মুহতারাম ভাল অংশটি বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর পাকিস্তানকে সাউদী আরবের উপর প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন সে কারণে তিনি বাকি অংশটি বলেননি। সে অংশটি আমি বলছি, পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ব্যতীত আর সবাই কাফের হতে পারবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিও কাফের হতে কোন সমস্যা নেই। আর এটা তিনিও জানেন।

যার দরুণ প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর হলফনামার শুরুতে একটি কথা এভাবে আছে, 'আমি মুসলমান এবং কাদেরে মুতলাক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার তাওহীদ, আল্লাহর কিতাবসমূহ যার মধ্যে কুরআন পাক সর্বশেষ কিতাব, খাতামুন নাবিয়্যীন হিসাবে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁর পর কোন নবী আসতে পারে না, কেয়ামত দিবস, কুরআন পাক ও সুন্নাহের সকল দাবি ও শিক্ষার উপর ঈমান রাখি.......'।

এরই বিপরীত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত আর কারো হলফনামায় শপথকারী মুসলমান হওয়া বিষয়ে স্বীকৃতিমূলক এ কথাটি নেই। হলফনামাগুলো অনুবাদসহ আরেক বার দেখে নিন।

সাউদী আরবের আদালত পাড়ার অবস্থা কিন্তু এমন নয়।

ছয়. রাষ্ট্রপ্রধানের গণতান্ত্রিক পরিচয়

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পরিচয় হচ্ছে গণতন্ত্রের অগ্রপথিক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জান কুরবানকারী মরদে মুজাহিদ।

তথ্য

পাকিস্তান সংবিধানের ভূমিকার একটি বক্তব্য এরকম-

اس جمہوریت کی تحفظ کے لئے وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ جو ظلم وستم کے خلاف عوام کی انتھک جدجہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔

اس عزم بالجزم کے ساتھ کہ ایک نئے نظام کے ذریعہ مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کرکے اپنی قومی اور سیاسی وحدت اور ایک جہتی کا تحفظ کریں۔

"এই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য কুরবান হয়ে যাওয়ার জযবা নিয়ে যা জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের নিরলস চেষ্টা প্রচেষ্টার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে।

এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে যে, একটি নতুন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাম্যভিত্তিক একটি সমাজ তৈরি করে নিজেদের জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য ও একই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে রক্ষা করবে।" -ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃ: ২

সাউদী আরবের বাদশাহর এ রকম কোন পরিচয় নেই।

সাত. আইম্মাতুল কুফরের অনুগত বন্ধু

পাকিস্তান বিশ্বের আইম্মাতুল কুফরের বন্ধু এবং অনুগত বন্ধু।

তথ্য

পাকিস্তান বিশ্ব কুফরী সংঘের অন্যতম সদস্য। সাউদী আরবের সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে, সাউদী আরব বিশ্ব কুফরী শক্তিকে যে পরিমাণ আর্থিক যোগান দিতে পারে পাকিস্তান সে পরিমাণ পারে না। তবে جهد المقل হিসাবে পাকিস্তানের স্বল্প সহযোগিতাও বিশ্ব কুফরী শক্তির কাছে অমৃতের মত। হাঁ! পাকিস্তান তার সমর শক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্ব কুফরী শক্তিকে যে পরিমাণ সহযোগিতা করতে পেরেছে তা সাউদী আরব পারেনি।

সর্বোপরি কুফরী শক্তির সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ছাড়িয়ে গেছে। সাউদী আরবের কাছে ভালোবাসা প্রকাশের উপায় উপকরণ বেশি থাকার কারণে বেশি প্রকাশ করতে

পেরেছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের কাছে সে পরিমাণ না থাকার কারণে মনের কামনা বাসনা অনুযায়ী ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়নি।

আট. ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

পাকিস্তান কুফরের পক্ষ নিয়ে কুফরের কাতারে দাঁড়িয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র জিহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিজয় লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আল্লাহর পথের মুজাহিদরা লড়ে চলেছে, বিশ্বের কুফরী শক্তির সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে সে সে প্রান্তে পাকিস্তান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নিয়মিত বেতন ও পুরস্কার ভোগ করে চলেছে।

তথ্য

বিশ্বের অপরাপর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মত পাকিস্তানও সারা বিশ্বে চলমান জিহাদী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়ে বিশ্ব কুফরী শক্তির প্রশংসা কুড়িয়েছে। সম্প্রতিকালে পাকিস্তানের হাতে একটি বিশাল ইসলামী ভূখণ্ড এবং সঠিক অর্থে দারুল ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বিশ্ব কুফরী শক্তি পাকিস্তানের কাঁধে বন্দুক রেখে ইসলামের সে নিশানটুকু মুছে দিয়েছে।

আর পাকিস্তান, পাকিস্তানের মুরতাদ সরকার, পাকিস্তানের মুরতাদ সৈন্যবাহিনী খুব গর্বের সাথে কাফেরদের সম্মিলিত জোটের সে বন্দুক কাঁধে বহন করেছে।

আর পাকিস্তানের সচেতন কর্ণধার, পাকিস্তানের দ্বীন দরদী মুসল্লির জামাত, অপদার্থ জনগণ নিরবে মুসলমানদের সে ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছে। কর্ণধারগণ সে দিনের সে নিরবতার দলিল ভিত্তিক কোন জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে জোর গলায় এ কথা ঘোষণা দেয়ার যে, পাকিস্তানের মত পবিত্র দারুল ইসলাম পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

শোনা গেছে, আফগানিস্তানের উপর পবিত্র দারুল ইসলাম পাকিস্তান (?) বিশ্ব কুফরী শক্তি নিয়ে হামলা করা জায়েয হয়েছে; কারণ আফগানিস্তান শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহকে কুফরের হেড কোয়ার্টার আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি। আল্লাহর পথের একজন মুজাহিদকে

আমেরিকার জল্লাদখানায় পাঠিয়ে দিলেই না কি আমেরিকা আর এ হামলা করত না।

কর্ণধারগণ ইতিহাস ভুলে গেছেন। এক ওসমান রাযি. এর রক্তের বদলা নেয়ার জন্য সৃষ্টির সেরা মানবসহ চৌদ্দ/পনের শত সাহাবীর পবিত্র জামাত কুরবান হওয়ার জন্য মৃত্যুর শপথ করেছিলেন। আর এখন কাফেরদের হামলা ঠেকাতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, আল্লাহর পথের একজন মুজাহিদকে কুফরের জল্লাদখানায় পাঠানোর জন্য। মাসআলা দেখার সুযোগ হয়নি।

কর্ণধারগণ বুঝতে চেষ্টা করেননি যে, এ মহান মুজাহিদকে কাফেরদের হাতে তুলে দিলেও তারা সহীহ অর্থের একটি দারুল ইসলামকে কুফরের পৃথিবীতে সহ্য করবে না। তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেননি যে, কুফরের স্বার্থে আঘাত করা একজন মুসলমানের জন্য কোন অপরাধ নয়। এটা তার ইবাদত।

যাই হোক, সে উপাখ্যান অনেক দীর্ঘ। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফরের সঙ্গদানে পাকিস্তান অনেক অগ্রসর। অনেক অগ্রসর।

নয়. শরীয়ার কোন বাস্তবায়ন নেই

পাকিস্তানে শরীয়াহ বাস্তবায়ন এখনো শুরু করেনি। সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত এর প্রস্তুতি চলছে।

তথ্য

পাকিস্তান ভূখণ্ডটি শুধু এ জন্যই ভারত থেকে আলাদা হয়েছে যে, সেখানে শরীয়াহ বাস্তবায়িত হবে। দুর্ভাগ্যবশত একটি দারুল ইসলামের স্বপ্নদ্রষ্টাগণ সে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কুফরী শক্তির ক্রিড়নক এক মুরতাদের হাতে। যার ফলে স্বপ্নের এক বিন্দুও এক মুহূর্তের জন্যও সূর্যের আলো দেখেনি। মালিক পক্ষ তখন ধোঁকা দিয়েছে 'হবে হবে' বলে। আর এখন ধোঁকা দিচ্ছে 'হয়েছে' বলে। তুলনামূলক আগের ধোঁকার চাইতে বর্তমানের ধোঁকা অনেক বেশি ভয়ংকর। আগের পর্বে এক সময় বোঝা গেছে যে, আমরা ধোঁকা খেয়েছি। কিন্তু এখনকার পর্বে তা বোঝার আর কোন পথ রাখা হয়নি। পাকিস্তানে শরীয়াহ কায়েম হওয়ার উপর কর্ণধারগণ বিভিন্ন বক্তব্যে শুকরিয়া আদায়ের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছেন।

দশ. আততাহাকুম ইলাততাগুত শতভাগ

পাকিস্তান 'আততাহাকুম ইলাত তাগূতে'র অনুশীলন করে চলেছে তার জন্ম থেকে। 'আততাহাকুম ইলাশ শারীয়াহ' এখনো পাকিস্তানের নসীব হয়নি।

তথ্য

পাকিস্তান কোন আইন কুরআন হাদীসকে জিজ্ঞেস করে করেনি। যখন রাজনৈতিক কারণে শরীয়াহকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখন সিঁড়ির কামরায় সিঁড়ির নিচে শরীয়াহ আদালত বসার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। পুরা দেশ চলছে কুফরের আইনে, তাগুতের আইনে। ছোট্ট একটি বেঞ্চ চলছে শরীয়াহ শিরোনামে। সে বেঞ্চকে বেঁধে দেয়া হয়েছে তাগুতের শত শিকলে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তান কখনো মনে করে না যে, সেখানে শরীয়াহ ও শরয়ী আইন প্রবেশের মত কোন ছিদ্র আছে। আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে সাউদী আরব ও পাকিস্তান প্রতিযোগিতা করে চলেছে। কারো দৃষ্টিতেই কোথাও শরীয়াহ প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। দেশের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে কর্ণধারগণও সেভাবেই বিষয়গুলোকে বুঝে নিয়েছেন। বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হলে তাগুতের আইন ও আদালতকে সামনে রেখেই তা করেন। তাই শরয়ী বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে ভাবার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না।

{দুই}

সংবিধানের লিখিত রূপ ও বাস্তব রূপ

শায়খে মুহতারাম পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে লিখিতভাবে পাকিস্তান সংবিধানের মূল স্তম্ভ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সাউদী আরবেও লিখিতভাবে এ ধারাটি নেই।

শায়খে মুহতারামের এ দাবির প্রেক্ষিতে এ বইয়ের আগে পরের বিভিন্ন আলোচনায় এ কথা দেখানো হয়েছে যে, পাকিস্তান-সংবিধান বা আইনের মূল স্তম্ভ হিসাবে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে সাব্যস্ত করা হয়নি। সংবিধানের ভূমিকায় শুধুমাত্র আল্লাহকে আল্লাহ বলে স্বীকার করা হয়েছে।

বর্তমান এ শিরোনামে আমি দু'টি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত, মুসলমানদের জন্য কুরআন হাদীস ও ফিকহের বাইরে আলাদা করে লিখিত সংবিধান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনিবার্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। তবে ইন্তেযামী বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপকারিতা অনস্বীকার্য। কারণ ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে সংবিধানে নতুন করে সংযোজন হওয়ার মত কিছু নেই। যা কিছু সংযোজন হবে তার সব কিছু, সকল আইন ইসলামের শুরু থেকেই আছে। সংবিধান তৈরি হলে তাতে বিন্যাসগত কিছ কিছু ব্যবধান হতে পারে। তাই বাস্তবিক একটি দারুল ইসলামের ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ কোন গুরুত্ব বহন করে না।

দ্বিতীয়ত, লিখিত সংবিধান বা সংবিধান রচনার বর্তমান যে পদ্ধতি এবং যে পদ্ধতি পাকিস্তানসহ বিশ্বের অপরাপর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো গ্রহণ করেছে, তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিধানকে সংবিধানে স্থান দেয়া, বা কোন একটি বিধানকে সংবিধান থেকে বিলুপ্ত করা। এ ঝুঁকিটি হচ্ছে ঈমানদারদের ঈমানের ঝুঁকি। কারণ-

পাকিস্তানসহ বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে দেশগুলোর অভিন্ন ধারা হচ্ছে, কোন একটি বিধান সংবিধানে সংযোজন বা বিয়োজন নির্ভর করবে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের উপর। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে স্পিকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন হবে, প্রস্তাবের উপর উপস্থিত সদস্যদের পক্ষে বিপক্ষে ভোট হবে, শতকরা একান্ন ভোট যে দিকে যাবে তা বিধান হিসাবে গৃহীত হবে।

এ কথাগুলো আমাদের সবার জানা আছে। কিন্তু এ পর্বে এসে একজন মুমিনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যে বিষয়টি অপেক্ষা করছে তার প্রতি আমরা অনেকেই লক্ষ করিনি। দু'টি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আশা করি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথম উদাহরণ

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে দেশের প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে রিক্সা-ভ্যান-বেবি-ট্যাক্সি চলাচল নিষিদ্ধ করা

হয়েছে। কেউ নিষিদ্ধ সীমা অতিক্রম করলে কী শাস্তি হবে এ বিষয়ে বিধান পাস করার জন্য সংসদীয় অধিবেশন বসেছে। প্রস্তাব করা হয়েছে, এক বছর জেল এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা। উপস্থিত সদস্যদের শতকরা একান্ন ভাগ পক্ষে ভোট দিয়েছে, উনপঞ্চাশ ভাগ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। আইন হিসাবে আইনের কিতাবে স্থান পেয়েছে। গণতন্ত্র বলে, ৫১% ভোট যদি এ আইনের বিপক্ষে পড়ত তাহলে এ আইন পাস না হয়ে অন্য আইন পাস হত এবং সে আইনই সবাই মেনে নিতে বাধ্য থাকত।

৫১% ভোটে যে বিধানটি পাস হয়েছে তা উপস্থিত ৪৯% মেনে নিয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা মেনে নিতেই হবে। অধিবেশনে যারা উপস্থিত ছিল না তারা এর পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক তা মেনে নিতেই হবে। দেশের কোটি কোটি মানুষ এর পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক তা মেনে নিতেই হবে। পাস করা আইনটিকে যারা একটি অনিবার্য পালনীয় আইন হিসাবে মেনে নেবে না তারা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী ও বিদ্রোহী, সংবিধানকে অপমানকারী।

শতকরা ৫১ ভাগকর্তৃক সমর্থিত বিধানকে বিধান হিসাবে মেনে নেয়ার শপথ করেই সবাই সংসদীয় আসনে বসার অধিকার লাভ করেছে। এ আইনকে বৈধ ও অনিবার্য পালনীয় মেনে না নেয়ার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় আসন থেকে ইস্তফা দেয়া ও তার সঙ্গে বিদ্রোহ করা। গণতন্ত্রের দাবি হচ্ছে, ভোটাভোটির সময় বিধানটির বিপক্ষে রায় দিয়ে থাকলেও পাস হয়ে যাওয়ার পর তা মনে-প্রাণে মেনে নিতে হবে। পাস হওয়ার পর কেউ এর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করলে বা এর বিরুদ্ধে অবস্থান না নিলে মনে করা হবে তিনি এটা মেনে নিয়েছেন। আর তিনি মেনে নিয়েছেন হিসেবেই তার সঙ্গে সকল আচরণ হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ

বিবাহিত নারী-পুরুষ। স্বামী তার স্ত্রী এবং স্ত্রী তার স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। কেউ যদি সে নিষিদ্ধ পথে পা বাড়ায় এবং নিষিদ্ধ কাজে পতিত হয় তাহলে তার শাস্তি কী? সংসদীয় অধিবেশনে তার শাস্তি প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হয়েছে তার শাস্তি হচ্ছে, দুই হাজার টাকা জরিমান। অনাদায়ে দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

স্পিকার প্রস্তাব উত্থাপন করে সদস্যদের ভোট চাইলেন। ৫১% ভোট পড়েছে প্রস্তাবের পক্ষে। ৪৯% ভোট পড়েছে বিপক্ষে। গণতান্ত্রিক নীতিমালার আলোকে প্রস্তাব পাস হয়েছে। প্রস্তাব আইনের কিতাবে স্থান পেয়েছে। যারা বিপক্ষে ভোট দিয়েছে তারাও আইনটি মেনে নিয়েছে এবং মেনে নিতে বাধ্য। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের কাছে এ আইন শ্রদ্ধেয়, মাননীয়, বৈধ ও অবশ্যপালনীয়। গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে এ আইনকে শ্রদ্ধেয়, মাননীয়, বৈধ ও অবশ্যপালনীয় মনে না করার সম্ভাব্য কোন ব্যবস্থা নেই।

এ প্রস্তাবটি যখন পরামর্শের জন্য সংসদে উত্থাপিত হয় তখন নিরপেক্ষ অবস্থানে অবস্থানকারী স্পিকার, প্রস্তাবের পক্ষ ও বিপক্ষ সবাই এ বিশ্বাসই পোষণ করে যে, বিবাহিত নারী পুরুষ যিনায় লিপ্ত হলে তার শাস্তি ও দণ্ড কী হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার এ সংসদের। উপস্থিত সংসদ সদস্যদের অধিকাংশ যে শাস্তি নির্ধারণ করবে সে শাস্তিকে দণ্ড হিসাবে মেনে নেয়া সবার দায়িত্ব এবং এ আইন সবার কাছে শ্রদ্ধেয়, মাননীয়, বৈধ ও অবশ্যপালনীয় বলে বিবেচিত হবে।

এ পর্যায়ে একটি বোঝার বিষয় হচ্ছে, যে সকল ব্যক্তি মনে করে, বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি কী হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার সংসদ সদস্যদের এবং তাদের ৫১% যে সিদ্ধান্ত দেবে সে সিদ্ধান্তই মাননীয়, শ্রদ্ধেয়, বৈধ ও অবশ্যপালনীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তাহলে এ বিশ্বাসের পর এ ব্যক্তিরা মুসলমান থাকবে কি না?

বলাবাহুল্য, আল্লাহর অকাট্য বিধান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যারা মনে করে সংসদ সদস্যরা পরামর্শ করে বিধান নির্ধারণ করার অধিকার রাখে তারা হয়ত আগে থেকেই কাফের হবে, নয়ত এ বিশ্বাসের কারণে তারা কাফের হয়ে যাবে। আর এ কাফের হওয়াটা এ বিশ্বাসের কারণে যে, সংসদ সদস্যরা কুরআনের অকাট্য বিধান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নিজেরা সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার রাখে, সিদ্ধান্তের কারণে নয়।

অতএব বিবাহিত নারী পুরুষের যিনার শাস্তি বিষয়ক পরামর্শের আহ্বানকারী, প্রস্তাবক, সিদ্ধান্তদাতা স্পিকার ও পক্ষে-বিপক্ষে ভোট প্রদানকারী সংসদ সদস্যরা যেহেতু এ বিশ্বাস লালন করেই বৈঠকে বসেছে যে, এ সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার সংসদ সদস্যদের, তাই কোন

প্রকার সিদ্ধান্তের আগেই তারা মুরতাদ হয়ে যাবে। এরপর সিদ্ধান্ত যে দিকেই গড়াক তা বৈঠকের এ সদস্যদেরকে ইরতিদাদ থেকে বাঁচাতে পারবে না। কেউ ইরতিদাদ থেকে বাঁচতে হলে সে নিজে তার কথা ও কাজে প্রমাণ করতে হবে যে, সে ঐ বিশ্বাসটি লালন করে না যার কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়।

চূড়ান্ত উদাহরণ

সংবিধান রচনাকারী আইনসভা সংসদে যখন প্রস্তাব উত্থাপিত হবে যে, সংবিধানের মূল স্তম্ভ কী হবে, রাষ্ট্রধর্ম কী হবে, জাতীয় ধর্ম কী হবে, আর সে প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে স্পিকার বৈঠক আহ্বান করবেন এবং গণতান্ত্রিক নীতিমালার আলোকে সদস্যদের মতামত চাইবেন, তখন ভোট দেয়ার আগে এবং সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে এ বৈঠকের সদস্যরা কী বিশ্বাস নিয়ে বৈঠকে বসেছেন বলে আমরা ধারণা করব? নিশ্চয় এ বিশ্বাস নিয়েই বসেছেন যে, অধিকাংশ ভোট যে দিকে পড়বে সে সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সেটিই হবে আইন এবং সেটিই হবে শ্রদ্ধেয়, মাননীয়, বৈধ ও অবশ্যপালনীয়। যদি এটা মনে না করে থাকে তাহলে সে এ বৈঠকে বসার বৈধতা পাবে না, অমান্য করলে সে বিদ্রোহী হিসাবে বিবেচিত হবে। অথচ বৈঠকে অংশগ্রহণকারী এর কোনটিই মানতে রাজি নয়। এ বৈঠকে বসার বৈধতার জন্য সে শপথ করেছে, সে নিজেকে বিদ্রোহী হিসেবে বিশ্বাস করার কথা ভাবতেই পারে না। এমতাবস্থায় সে কী?

এটা হচ্ছে লিখিত সংবিধানের সমস্যা। শায়খে মুহতারাম যে বিষয়টিকে পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন আমার যত আশঙ্কা সেখানেই ভীড় করেছে। কারণ পাকিস্তান সংবিধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বহু কুফরী আইন পাস করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও পাশ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। আর এটা অনস্বীকার্য বিষয় যে, এটি অধিকাংশ ভোটের মাধ্যমে পাস হয়েছে। ভোট যদি এর বিপরীতে পড়ত তাহলে ইসলাম ইসলাম হওয়ার কারণে এবং কুরআনের অকাট্য ঘোষণার কারণে তা পাস হত না।

সংবিধান লিখিত না হলে একটা সম্ভাবনা এমন থাকে যে, মুসলমানের সকল বিধান যেহেতু কুরআন, হাদীস ও ফিকহের মাঝে রয়েছে অতএব

তা নতুন করে পাস করার কিছু নেই। কিন্তু যখনই তা গণতান্ত্রিক মানব রচিত সংবিধানে স্থান পায় তখন দেখা যায় কুরআন হাদীসের কিছু অকাট্য বিষয় সংবিধানে স্থান পেয়েছে আর অধিকাংশই স্থান পায়নি। তখন এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশের ভোট কুরআনের যে বিধানগুলোকে স্থান দিয়েছে সেগুলো স্থান পেয়েছে, আর যেগুলোকে স্থান দেয়নি সেগুলো স্থান পায়নি। অর্থাৎ, মাপকাঠি কুরআনও নয়, হাদীসও নয়। মাপকাঠি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট। আর এটাই কুফর। আর কোন ব্যাক্তি মুরতাদ হওয়ার জন্য তার এ বিশ্বাসই যথেষ্ট যে, সে কুরআন হাদীসের অকাট্য বিষয়গুলোকে আইনের মান দিতে পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করে।

মনে রাখতে হবে, উপরে আইন প্রণয়নের যে তিন প্রকারের উদাহরণ দেয়া হয়েছে পাকিস্তানসহ বিশ্বের গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশসমূহে এর প্রত্যেকটি প্রকারই চলমান অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটি দেশের আইনসমগ্রের মাঝে শরীয়ত বিরোধী নয় এমন আইনও রয়েছে এবং শরীয়ত বিরোধী আইনও রয়েছে। আর উভয় প্রকারের আইন একই নীতি ও ধারায় তৈরি হয়েছে। একই বিশ্বাসের আলোকে তৈরি হয়েছে। যে নীতি ও বিশ্বাসের সামনে কোন আইনটি শরীয়ত বিরোধী আর কোন আইনটি শরীয়ত বিরোধী নয় -এর কোন পার্থক্য নেই। তবে কোন কোন আইন শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে বেশি গুরত্ব পেয়েছে -এর উদাহরণ আছে।

একটি কারগুজারী

এসব কারণ এবং এর মত আরো কিছু কারণে মজলিসে শূরা যখন পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, এ দেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম হবে তখন প্রশ্ন আসে, এ পরামর্শে শরীক সদস্যরা কাফের না মুসলমান। যেমনিভাবে পরামর্শ করে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষণা দেয়ার পর পরামর্শকারীরা মুসলমান না কাফের প্রশ্ন আসে তেমনিভাবে যখন সংসদ সদস্যরা এ পরামর্শে বসে যে, সংবিধানের 'বুনয়াদী পাথর' বা মূল স্তম্ভ আল্লাহর হাকিমিয়্যাত হবে না কি সংখ্যাগরিষ্ঠের বা দুই তৃতীয়াংশের ভোট হবে। সে পরামর্শ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট যদি এ পক্ষে পড়ে যে, সংবিধানের মূল স্তম্ভ আল্লাহর হাকিমিয়্যাত হবে তাহলে তখনও প্রশ্ন আসে যে, এ মজলিসে শূরার সদস্যরা মুসলিম না অমুসলিম।

এ প্রশ্নটি কেন আসবে এর উপর নীতিগত আলোচনার পর পাঠক মহলের সুবিধার জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক কারগুজারী তুলে ধরছি। ঘটনাটি বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের একটি রায় সংশ্লিষ্ট। আমি উচ্চ আদালতের রায়টিকে প্রেক্ষাপটের উল্লেখসহ সামান্য বিশ্লেষণ করছি।

একটি দিনলিপি

"প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন চলাকালে ১৯৮৮ সালের ৯ জুন অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সংবিধানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তার অন্যতম ছিলো রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্থান দেয়া।

কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৯৮৮ সালেই 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি নামক একটি কমিটি হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করেছিল। কমিটির পক্ষে ছিলো সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ ১৫ জন নাগরিক।

তারপর সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ রিট আবেদনটি শুনানির জন্য ২০১১ সালের জুন মাসে হাইকোর্টে একটি সম্পূরক আবেদন দাখিল করেছিল তাতে এ কথাও বলা হয়েছিল- 'রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতির বিধান সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। তার এই সম্পূরক আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ একটি রুল জারি করেছিল। রুলে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম অন্তর্ভুক্তির বিধান কেন অসাংবিধানিক ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। হাইকোর্টের একটি বৃহত্তর বেঞ্চ ২৮ বছর আগের দায়ের করা রিটটি ১৮ জুমাদাল উখরা [২৮ মার্চ] শুনানি করেছে। শুনানিতে বেঞ্চের সদস্যরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, রিট আবেদন দায়েরকারী সংগঠনটির রিট আবেদন দায়ের করার 'লোকাস স্ট্যান্ডি' [যোগ্যতা] নেই। তাই তারা আবেদনটি খারিজ করেছেন। ফলে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম বহাল থাকল। উল্লেখ্য, রিটকারীদের অনেকেই ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করে নিজ নিজ আমলের ফলাফল ভোগ করছে।

এই হলো বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা এবং দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম বহাল রাখার ইতিহাস। এ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা গেলো যে, ১৮ জুমাদাল উখরা বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম বহাল রাখার যে ন্যায়সংগত সুঘটনা ঘটেছে, তা দেশের ৯০ শতাংশ জনগণের ধর্মানুভূতিকে গুরুত্বপ্রদান করে ঘটেনি। এবং তা সরকার বা অন্য কারো ধর্মপরায়ণতা ও ইসলামকে ভালোবাসার কারণে হয়নি।

কারণ, হাইকোর্টের বেঞ্চ সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ - এর এই যুক্তি খণ্ডন করেনি যে, 'রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতির বিধান সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী।' এমনকি তথাকথিত স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র এই অভিযোগ সম্পর্কেও কিছু বলেনি যে, 'বাংলাদেশে নানা ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ বাস করে। এটি সংবিধানের মূল স্তম্ভে বলা হয়েছে। এখানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে অন্যান্য ধর্মকে বাদ দেয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অভিন্ন জাতীয় চরিত্রের প্রতি ধ্বংসাত্মক।' (দৈনিক নয়া দিগন্ত' ১৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ হি. [২৯ মার্চ ২০১৬ ঈ] পৃ.১, কলাম ১ও ২)

হেফাজতে ইসলাম গত ১৫ জুমাদাল উখরা [২৫ মার্চ] জুমাবার দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। অনুরূপভাবে ১৮ জুমাদাল উখরা [২৮ মার্চ] সকালে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে প্রধান বিচারপতি বরাবর স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। ফলে রিট শুনানিকে ঘিরে দেশে এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এর অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। একে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে আদালতে যা হয়েছে, তা আদালতেরই উক্তিমতে এই ভিত্তিতে হয়েছে যে, রিট আবেদন দায়েরকারী সংগঠনটির রিট আবেদন দায়ের করার লোকাস স্ট্যান্ডি [যোগ্যতা] নেই।

আমাদের যতই খারাপ লাগুক, ধর্মদ্রোহী সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের এ কথা কি ভুল যে, 'রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতির বিধান সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। যে সংবিধানের চার মূলনীতি হলো 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র', আসলেই কি ওই সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ইসলামের পরিপন্থি নয়?

বিষয়টি আজকের দিনলিপিতে লিখে রাখলাম, যেন নতুন ও আগত প্রজন্ম বাস্তবতা বোঝে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করে দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হওয়ার দিবা স্বপ্ন না দেখে।

উল্লেখ্য, দিনলিপিটি পাঠ করার পর এক দ্বীনি ভাই জানতে চেয়েছে, 'রিট আবেদন দায়েরকারী সংগঠনটির রিট আবেদন দায়ের করার লোকাস স্ট্যান্ডি [যোগ্যতা] নেই' উক্তিটির ব্যাখ্যা কী? তাকে বললাম, উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি আমাদের কাছে এসে এই অভিযোগ করে যে আমাদের মহল্লা-মসজিদের ইমাম সাহেব আজকের ফজর নামাযে ভুল করেছেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই কি আমরা অভিযোগটি বাস্তব কি না, তার খোঁজখবর নেয়া ও যাচাই-বাছাই করা শুরু করে দেব? নাকি প্রথমে দেখব যে, অভিযোগকারীর অভিযোগ করার যোগ্যতা [লোকাস স্ট্যান্ডি] আছে কি না? যদি নিশ্চিত হই যে, অভিযোগটা মহল্লার কোনো মুরব্বী বা নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো ব্যক্তি করেছেন, তাহলে তো অবশ্যই অভিযোগটি বাস্তব কি না যাচাই-বাছাই করব ও খোঁজখবর নেব। পক্ষান্তরে যদি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয় যে, অভিযোগকারী হলো এলাকার এমন ব্যক্তি যে জুমার নামাযও পড়ে না, তাহলে কি আমরা খোঁজখবর নেয়া ও যাচাই করা শুরু করে দেব যে, আসলেই ইমাম সাহেব আজকের ফজর নামাযে ভুল করেছেন কি না!?

কয়েকজন দ্বীনি ভাই প্রশ্ন করলেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখের আদালতে রিট আবেদন করার লোকাস স্ট্যান্ডি [যোগ্যতা] নেই, এটা কেমন কথা? তাদেরকে বললাম, পত্রিকার ভাষা শোনো- 'আদালত রিট আবেদনের পক্ষের আইনজীবি সুব্রত চৌধুরির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আদালত বলেন, আমরা আপনাকে আগের দিন বলেছিলাম- "স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি"র এই রিট আবেদন দায়েরের লোকাস স্ট্যাডি [যোগ্যতা] আছে কি না, তা দেখে আসতে। সুব্রত চৌধুরি বলেন, শুধু সংগঠন নয়, প্রত্যেকেই আলাদাভাবে পিটিশনার হয়েছিলেন। আদালত বলেন, না। আমরা দেখছি, সংগঠনের পক্ষেই এই রিট দায়ের করা হয়েছিলো। ওই সংগঠনের লোকাস স্ট্যান্ডি ছিলো না। রিট আবেদনটি খারিজ করা হলো। রুলও খারিজ করা হলো।'

এর দ্বারা এ কথাও বোঝা গেলো যে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদনটি যদি 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র পক্ষে দায়ের করা না হতো, বরং বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখের পক্ষে বা এমন কারো পক্ষে দায়ের করা হতো, এই রিট দায়ের করার যাদের লোকাস স্ট্যান্ডি আছে, তাহলে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতির বিধান সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী কি না, আদালত অবশ্যই তা যাচাই করে দেখত। তখন রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতির বিধান যদি সংবিধান পরিপন্থী প্রমাণিত হতো, তাহলে আদালত অবশ্যই সংবিধানের সুরক্ষার্থে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে বহাল রাখত না।

হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের সুফল সম্ভবত এই হয়েছে যে, দেশে রিট শুনানিকে ঘিরে সৃষ্ট উত্তেজনা অনুভব করে আদালত রিটটি সংগঠনের পক্ষে হওয়া বিবেচনা করেছে। যদি দেশে রিট শুনানিকে ঘিরে এ ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি না হতো, তাহলে আদালত হয়ত রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতির বিধানটি সংবিধান পরিপন্থী কি না সেটাই বিবেচনা করত। তখন রায় কী হতো তা স্পষ্ট । (দিনলিপি সমাপ্ত হলো)

আমাদের খুশি

উচ্চ আদালতে যখন রিট আবেদনটি বিবেচনাধীন এবং যখন চূড়ান্ত রায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে তখন নব্বই/বিরানব্বই/পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানের মুখের ভাষা ও চেহারার অভিব্যক্তি হচ্ছে, মহামান্য আদালত (?) ইসলামের প্রতি করুণার (?) দৃষ্টি দেবেন? না কি ইনসাফের (?) দৃষ্টি দেবেন?

ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সকল ধর্মের গুরু ও অভিভাবক হিসাবে ইনসাফের দাবি হচ্ছে, রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে শুধুমাত্র ইসলামকে না রাখা। এতে অন্যান্য ধর্মের প্রতি বে ইনসাফী হয়ে যায়। সকল ধর্মের অভিভাবক শুধুমাত্র একটি ধর্মের পক্ষে রায় দিতে পারেন না। কিন্তু এত কোটি মুসলমানের অসহায় চেহারা ও চোখের পানির দিকে তাকালে সকল ধর্মের মহামান্য (?) অভিভাবক একটু করুণা করতেই পারেন। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা কিছুটা উদারতার পরিচয় দেবেন এমনটি কোটি কোটি মুসলমান আশা করতেই পারে।

অবশেষে করুণার পাল্লা ভারি হয়েছে। মহামান্য আদালতের করুণায় ইসলাম এ যাত্রায় বেঁচে গেছে (?)। কারণ রিট আবেদনকারী আবেদন করার উপযুক্ত নয়।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, মহামান্য আদালত আগে থেকে কাফের মুরতাদ না হয়ে থাকলে এ রায়ের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি করুণা করার সাথে সাথে এ মহামান্য মুরতাদ হয়ে গেছেন।

অথবা বলা যেতে পারে, তিনি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমরা তখন জানতে পেরেছি। নচেৎ তার দরবারে যখন এ মর্মে মামলা দায়ের হয়েছে যে, রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলাম বহাল থাকবে কি থাকবে না, আর তিনি চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন যে, রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলাম থাকাটা আইনসম্মত, নাকি না থাকাটা আইনসম্মত -ঠিক তখনই তার ঈমান চলে গেছে, যদি এর আগে থেকে তার ঈমান থেকে থাকে।

কারণ

এক. কোন মুসলমান যদি মনে করে মানব রচিত আইন সমর্থন করলে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে, আর যদি মানব রচিত আইন সমর্থন না করে তাহলে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে না। এ কথা মনে করার সাথে সাথে একজন মুসলমান মুরতাদ হয়ে যাবে। সে নামায-রোযা দিয়ে মুসলমান থাকতে পারবে না। সে মুসলমান হতে হলে এ কুফরী বিশ্বাস থেকে তাওবা করতে হবে।

দুই. কোন বিচারপতি যদি মনে করে, রাষ্ট্র ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী চলবে? নাকি অন্য কোন ধর্ম অনুযায়ী চলবে -এ সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্ব কোন বিচারপতির, অথবা আরো সহজ করে বলি, যদি কোন বিচারপতি মনে করে যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে? নাকি থাকবে না -এ সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্ব কোন বিচারপতির তাহলে সে বিচারপতি মুসলমান নয়। আর যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে এ বিশ্বাস লালন করার কারণে মুরতাদ হয়ে যাবে।

তিন. কোন বিচারপতি যদি মনে করেন, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম না থাকার পক্ষের দাবিদার যদি দাবি করার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত হয় তাহলে তার উপযুক্ততার বিবেচনায় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম থেকে বাদ দেয়া যাবে তাহলে সে বিচারক মুরতাদ হয়ে যাবে।

উপরোক্ত কারণগুলো আমাদের বাংলাদেশের ঐ বিচারপতির ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে যে বিচারপতি রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলাম থাকবে বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু এ রায় দেয়ার কারণেও তিনি মুরতাদ হওয়া আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সম্পর্কিত আমার এ কথাগুলো তখনই প্রযোজ্য যখন 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাক্যটির কোন হাকীকত থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এটি একটি হাকীকতশূন্য ও অন্তসারশূন্য বিষয় যা সর্বোচ্চ 'লা ইয়ানী'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যাকে অবসরপ্রাপ্ত মানুষের সময় কাটানোর একটি উত্তম ব্যবস্থা মনে করা হয়।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র ইসলামী আইনে চলবে। আর এ অর্থ হিসাবে কেউই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম মানে না। এছাড়া এর আর কোন অর্থ নেই। কেউ যদি অন্য কোন অর্থ করে তাহলে সে অর্থহীন প্রলাপ বকল। আর সে বকাই পক্ষ-বিপক্ষ বকে চলেছে।

পাকিস্তান প্রসঙ্গ

এবার আমরা আবার পাকিস্তান প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি। শায়খে মুহতারাম পাকিস্তানকে সাউদী আরবের উপরে তুলে এনেছেন এ কথা বলে যে, পাকিস্তানের সংবিধানে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে সাংবিধানিকভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা সাউদী আরবে করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আমি বাংলাদেশের আদালতের একটি রায় বিশ্লেষণ করেছি যা বাহ্যত ইসলামবান্ধব। কিন্তু এরপরও সে রায়টি রায় প্রদানকারীর ইরতিদাদের কারণ হয়েছে। তদ্রূপ যখন পাকিস্তানের পার্লামেন্ট সদস্যরা এ পরামর্শে বসেছে যে, সংবিধানের 'বুনয়াদী পাথর' বা মূলস্তম্ভ আল্লাহর হাকিমিয়্যাত হবে না কি সংখ্যাগরিষ্ঠের বা দুই তৃতীয়াংশের ভোট হবে। সে পরামর্শ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এ পক্ষে পড়েছে যে, সংবিধানের মূল স্তম্ভ আল্লাহর হাকিমিয়্যাত। আর পরামর্শ সভার সভাপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আল্লাহর হাকিমিয়্যাত সংবিধানের মূল স্তম্ভ। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের উপরই এ প্রশ্ন আসে যে, এ সিদ্ধান্তের পর মজলিসে শূরার সদস্যরা এখনো মুসলিম রয়েছে? নাকি মুরতাদ হয়ে গেছে।

এত সুন্দর সিদ্ধান্তের উপর এত কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কারণ যথাক্রমে:

এক. পাকিস্তান সংবিধানে جو بنیادی دستور ہے اس میں اللہ جل جلالہ کی حاکمیت کو اپنے دستور کا سب سے بنیادی پتھر قرار دیا، এ শব্দে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ সাব্যস্ত করা হয়নি। এটা শায়খে মুহতারামের নিজস্ব এবারত। সংবিধানের শুরুতে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শুকরিয়া আদায় করা হয়েছে। আল্লাহকে আল্লাহ হওয়ার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধান একটি আমানত এ কথার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

বলাবহুল্য, এ কথাগুলোর দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে সংবিধানের 'বুনয়াদী পাথর' বানানো হয় না। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হবে এ কথাও প্রমাণিত হয় না। 'বুনয়াদী পাথর' বানানো হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটকে। 'বুনয়াদী পাথর' এভাবে বসানো হয়েছে-

چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے، جس میں مملکت اپنے اختیارات واقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمایندوں کے ذریعہ استعمال کرے گی۔ اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص:۱

অর্থাৎ, পাকিস্তান জনগণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন একটি দেশ গঠন যা গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

গণতন্ত্রের এ 'বুনয়াদী পাথর' বসানোরা পর থেকে শুরু করে পুরো সংবিধানের প্রাসাদ এর উপরই তৈরি করা হয়েছে। যা সংবিধানের প্রতি ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কখনো কোথাও আল্লাহকে, আল্লাহর রাসূলকে, মুসলমানদেরকে, শরীয়াহকে কোন অধিকার দেয়ার প্রয়োজন হলে গণতন্ত্রের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। শরীয়াহ বেঞ্চের আলোচনায় এর অনেক কিছুই আমরা দেখেছি। পুরো সংবিধান জুড়েই আমরা তা আরো দেখতে থাকব, ইনশা-আল্লাহ।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, শায়খে মুহতারামের কথা যদি সঠিক হিসাবে মেনে নেয়া হয় অথবা মনে করা হয় যে, শায়খে মুহতারাম

সংবিধানের বিক্ষিপ্ত ইসলামবান্ধব কিছু কথার সমষ্টিকে সামনে রেখে এ ফলাফলে পৌঁছেছেন যে, পাকিস্তানের সংবিধানের 'বুনয়াদী পাথর' হচ্ছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত, তাহলে সর্বোচ্চ বলা যাবে-

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাতকে পাকিস্তান সংবিধানের মূল স্তম্ভ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে। আবার সত্তর/বাহাত্তর বছর পর্যন্ত মূল স্তম্ভকে জিজ্ঞেস না করে দেশ পরিচালিত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে।

এ ছাড়া শায়খে মুহতারামের এ কথার কোন বাস্তবতা পাকিস্তানের সংবিধানেও নেই, পাকিস্তানের সত্তর/বাহাত্তর বছর জীবনেও নেই। পাকিস্তানের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

ফলাফল

এ দীর্ঘ বিশ্লেষণ হচ্ছে কিছুটা ভূমিকার মত। আমরা বলেছিলাম একটি প্রশ্নের কথা। পাকিস্তান তার গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ইসলামবান্ধব কিছু কথা বলেছে। যেসব কথার মধ্যে শায়খে মুহতারামের ধারণা অনুযায়ী এ কথাও আছে যে, পাকিস্তান সংবিধানের 'বুনয়াদী পাথর' হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাকিমিয়্যাত।

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত বিধান প্রয়োগ করা হবে কি না এ নিয়ে যখন কেউ পরামর্শে বসে তখন পরামর্শকারীদের ঈমান চলে যায়। শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধানগুলো নিয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'শরীয়তে এর বিধান কী এবং তা বাস্তবয়নের শরয়ী পদ্ধতি কী?' এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের কোন বিবেচনা নেই। শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী তা খুঁজে বের করতে হবে।

যারা যারা শরয়ী বিষয়ে শরয়ী সিদ্ধান্ত না খুঁজে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দিয়ে ফয়সালায় পৌঁছতে চাইবে তারাই আল্লাহর বিধানের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর এ কারণে এ পরামর্শে অংশগ্রহণকারীদের ঈমান বাঁচানোর কোন সুযোগ নেই।

অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দিয়ে যদি ফয়সালা করা হয় যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয তাহলে এ ফায়সালা করার কারণেও পরামর্শসভার সদস্যরা কাফের হয়ে যাবে। বিশ্বাস করতে হবে এবং বলতে হবে, যেহেতু কুরআনে হাদীসে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে তাই তা ফরয। এখানে মাসআলা খুব স্পষ্ট এবং পার্থক্য একেবারে পরিষ্কার।

তাই শুধু প্রশ্ন নয়। সিদ্ধান্তই হচ্ছে, গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে যদি সিদ্ধান্ত হয়, সংবিধানের 'বুনয়াদী পাথর' হবে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই যদি সিদ্ধান্ত হয়, সংবিধানের সকল পরিবর্তন পরিবর্ধন সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হবে এবং এ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতারা কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই যদি সিদ্ধান্ত হয়, ভোটদাতারা মুসলিম হওয়া জরুরী নয়, সিদ্ধান্তদাতা মুসলিম হওয়া জরুরী নয়, আইন প্রণেতা মুসলিম হওয়া জরুরী নয়, আইন প্রয়োগকারী মুসলিম হওয়া জরুরী নয়

-তখন এ সংবিধান তৈরিকারীরা একাধিক কারণে মুরতাদ হয়ে যাবে।

{তিন}

এমন দেশের পরিচয় ও মাপকাঠি

পাকিস্তানের মত এমন দেশ আরো আছে। শুধু এমন দেশ নয়; বরং বাস্তবিক অর্থে শরয়ী বিধান চলে এমন দেশ পৃথিবীতে আছে। কিন্তু এখানেও এসে শায়খে মুহতারাম আরেকটি আন্তর্জাতিক বিধানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছেন। অর্থাৎ তিনি সেসব দেশকে দেশ বলতে রাজি নন যে দেশগুলো দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। অর্থাৎ আইম্মাতুল কুফর সে দেশকে দেশ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু দারুল ইসলামের সংজ্ঞা সে ভূখণ্ডে প্রযোজ্য কি না তা দেখা হয়নি। দেখা হয়েছে আন্তর্জাতিক ল'। যা মূলত মানুষের বানানো কিছু নাম ও পরিভাষা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে যার কোন অস্তিত্ব নেই-

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾
{سورة النجم: ٢٣}

শরীয়তের কিতাবে যার কোন অস্তিত্ব নেই।

শরীয়তের পরিভাষায় দেশ হচ্ছে দারুল ইসলাম। যে ভূখণ্ডের মাঝে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা একটি ইসলামী দেশ। আর এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হওয়ার মত দেশ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে। দারুল ইসলাম তথা ইসলামী ভূখণ্ডের একটি হিসাব এখানে দেব, ইনশা-আল্লাহ।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়। জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর এবং উপনিবেশ পরবর্তী পরিস্থিতি বিরাজ করার পর মুসলমানদের কর্ণধারগণের কেউ কেউ একটু বেশি রকমের ভড়কে গেছেন। কিছুটা দ্বীনের মুহাব্বতে, আর কিছুটা ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে।

ভেবেছেন, শরীয়তে যা করতে বলা হয়েছে হুবহু তা করতে গেলে দ্বীনের আরো ক্ষতি হয়ে যাবে। যতটুকু দ্বীন এখনো পর্যন্ত আছে ততটুকুও থাকবে না। কিছুটা কৌশল গ্রহণ করে সামনে বাড়ার চেষ্টা

করেছেন। ঘটনাচক্রে সে কৌশল হয়ে গেছে শরীয়তের মাসআলার বিপরীত। আর এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে ব্যক্তিগত দুর্বলতা।

এ পর্যায়ে এসে যে কোন বিচার বিশ্লেষণের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতিসংঘের আইন, গণতান্ত্রিক আইন ও ধর্মনিরপেক্ষ আইন। সাহস করে কেউ কেউ বলেও ফেলেছে, কুরআন, হাদীস ও ফিকহের সেসব সংজ্ঞা এখন আর চলবে না।

এ কারণে দারুল ইসলাম বা ইসলামী ভূখণ্ড হিসাবে আমরা যেসব ভূখণ্ডের নাম উল্লেখ করব সেগুলো কুরআন, হাদীস ও ফিকহের সংজ্ঞা অনুযায়ী দারুল ইসলাম হলেও জাতিসংঘ আইনে বা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনে সেগুলোর নাম হবে, সন্ত্রাসের আখড়া বা জঙ্গিবাদের আস্তানা।

এ পরিস্থিতিতে পাঠক আমাদের কথা বিশ্বাস করতে হয়ত কষ্ট হবে। কিন্তু দলিলের আলোকে যা সত্য তা গোপন করার কোন অধিকার আমার নেই। আমাকে বলতেই হবে। সে হিসাবেই বিশ্বব্যাপী দারুল ইসলামের আয়তনের একটি খসড়া হিসাব এখানে তুলে ধরছি।

ভূখণ্ড : ১
আফগানিস্তান

মূল আয়তন- ৬,৫২,২৩০ বর্গ কিমি অথবা ২,৫১,৮৩০ বর্গ মাইল

দখলকৃত আয়তন- ২,৯০,২৪২ বর্গ কিমি প্রায়।

ভাগ- ৪৪.৫% [সূত্রঃ আমেরিকান আর্মি]
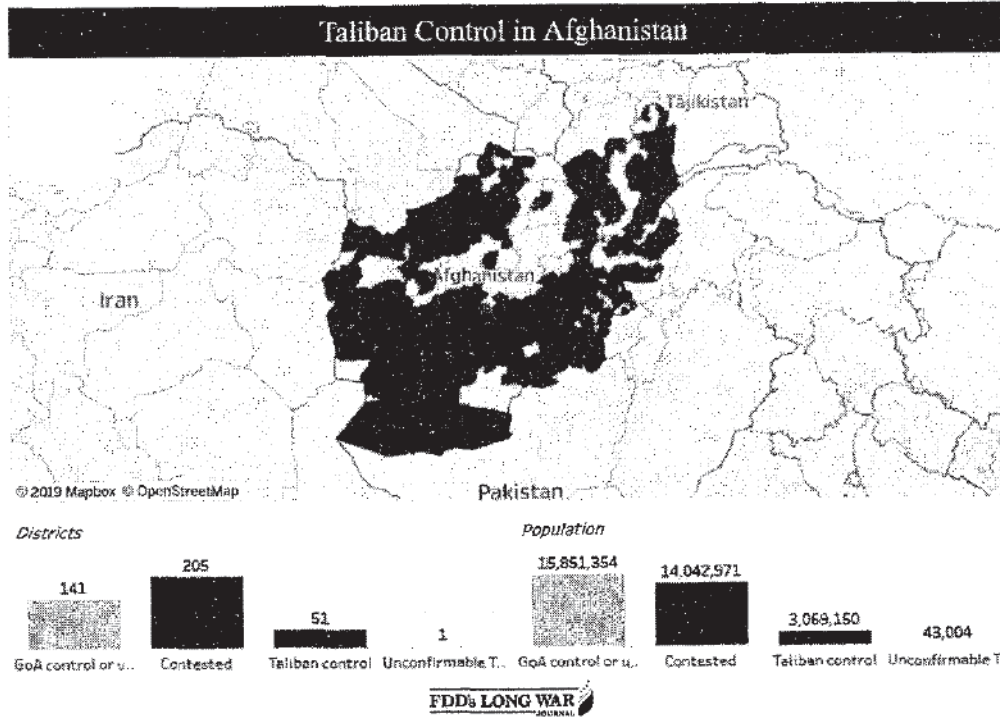
সেন্টার ফর প্রিভেন্টিভ একশন ২০১৯ সালের একটি রিপোর্টে বলেছে, আমেরিকার স্পেশাল ইনস্পেকটর জেনারেল ফর আফগানিস্তান ২০১৮ সালের অকটোবর মাসে তাদের কোয়ার্টার্লি রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, "আফগান সরকারের প্রভাব কমতে কমতে মাত্র ৫৫.৫ শতাংশ এলাকায় নেমে এসেছে।" সে হিসেবে, আমেরিকানদের হিসাব আমলে নিলেও তালিবানদের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে প্রায় ৪৪.৫ শতাংশ এলাকায়।

তবে, লং ওয়ার জার্নাল এর সূত্রমতে, আফগান সরকার দেশটির মাত্র ৩৬% এলাকার উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখে, আর তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে আছে ১৩% এবং বাকি ৫১% এলাকা বিরোধপূর্ণ। তবে বিরোধপূর্ণ এলাকাগুলোর ক্ষেত্রে, কোন এলাকায় তালিবান বা আফগান সরকারের

প্রভাব ৩০% বা ৭০% যাই হোক না কেন সেই এলাকাকে লং ওয়ার জার্নাল বিরোধপূর্ণ হিসেবে দেখিয়েছে। উপরের ম্যাপ দ্রষ্টব্য।

সার্বিকভাবে, বেশিরভাগ বিরোধপূর্ণ এলাকাগুলোতেও তালিবানদের প্রভাব বেশি রয়েছে বলা যায় ইনশাআল্লাহ।

সূত্র- https://www.cfr.org/blog/top-conflicts-watch-2019-afghanistan

https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan

ভূখণ্ড : ২

সোমালিয়া

মূল আয়তন- ৬,৩৭,৬৫৭ বর্গ কিলোমিটার অথবা ২,৪৬,২০১ বর্গমাইল

দখলকৃত আয়তন- ১,২৭,৫৩১ বর্গকিলোমিটার

ভাগ- ২০% [সূত্র : আমেরিকান আর্মি/সিএনএন]

কর্তৃপক্ষ- হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন
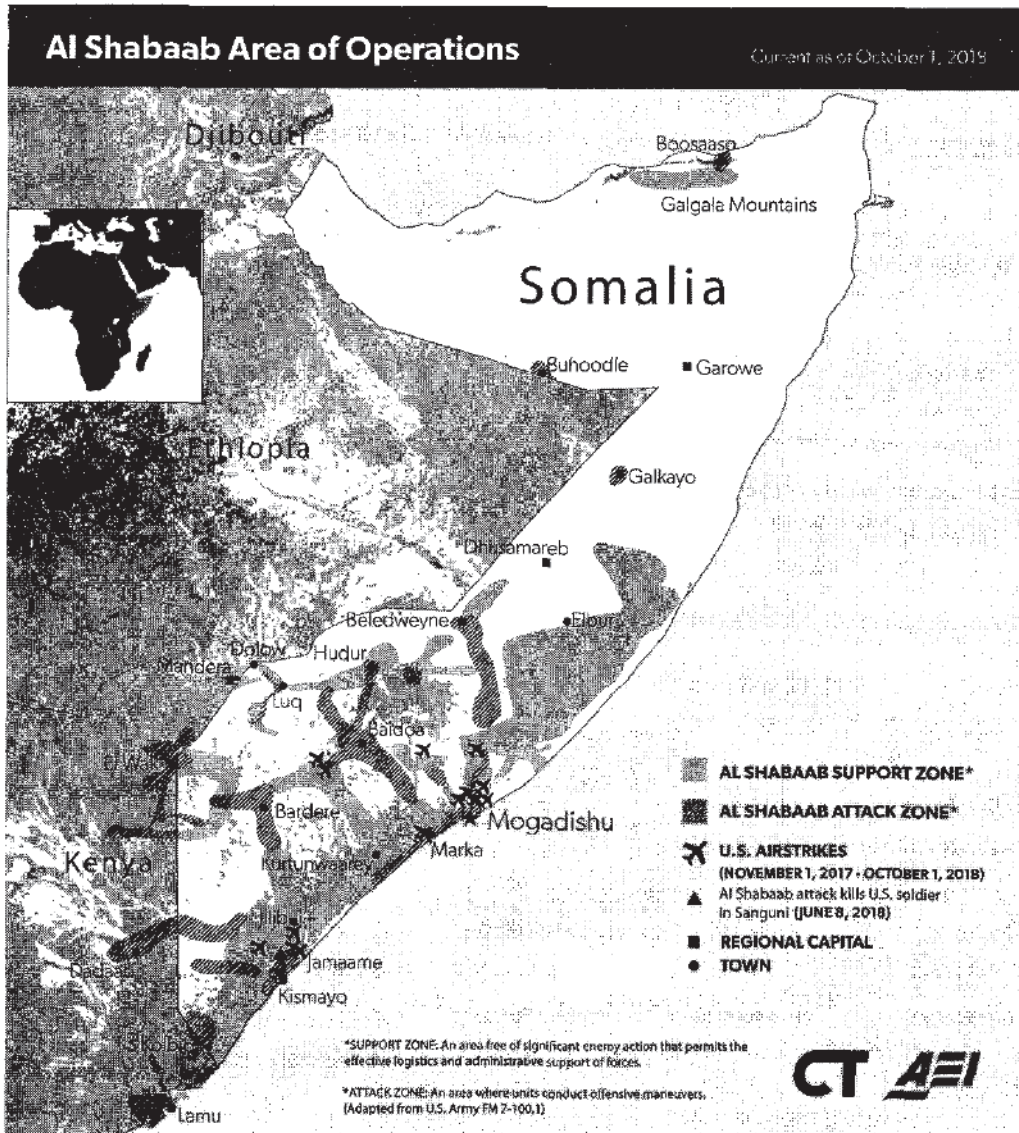
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(militant_group)
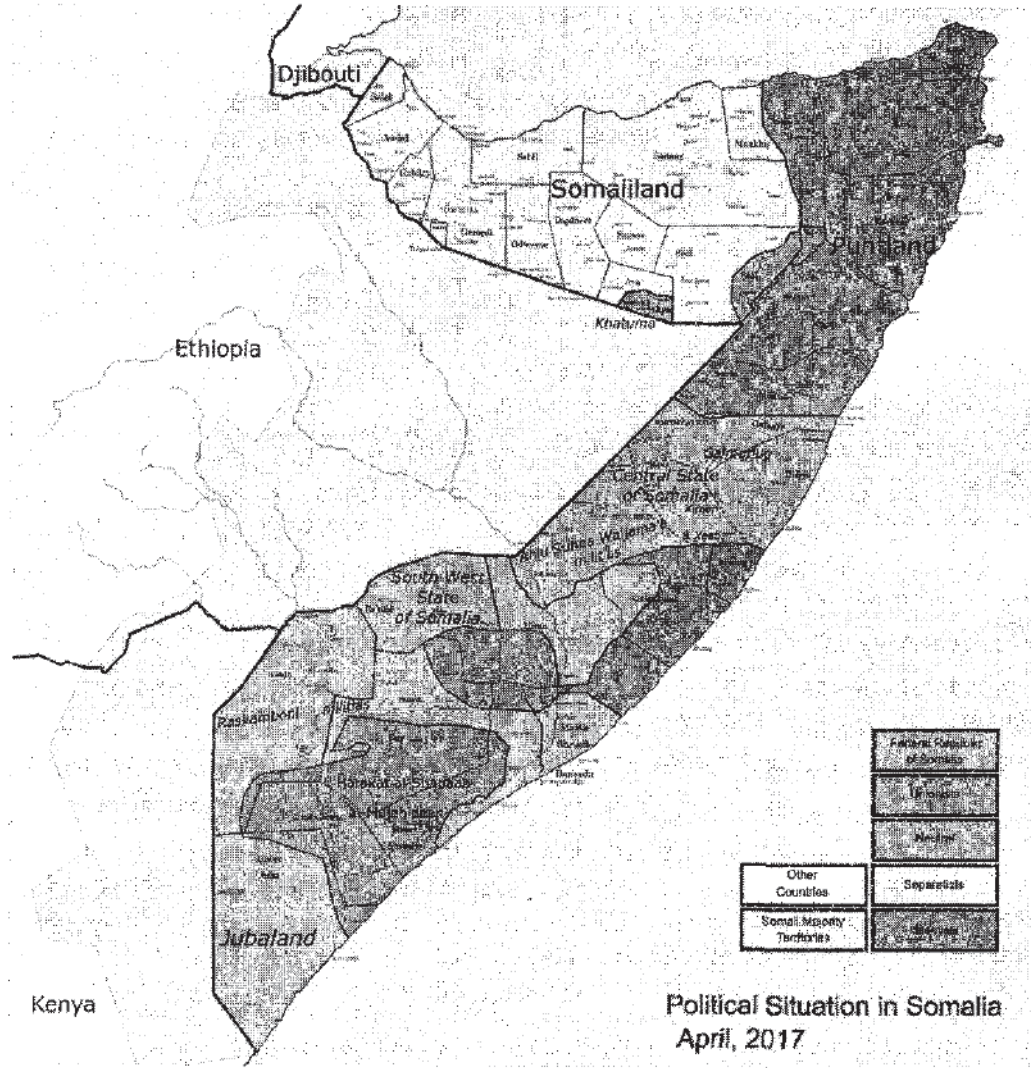
ভূখণ্ড : ৩

ইয়েমেন

মূল আয়তন- ৫,২৭,৯৬৮ বর্গ কিমি অথবা ২,০৩,৮৫০ বর্গ মাইল

দখলকৃত আয়তন- ১ লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার

ভাগ- ১/৫ ভাগ প্রায়

কর্তৃপক্ষ- আল কায়েদা জাজিরাতুল আরব (AQAP)

Al-Qaeda in Yemen - click to expand
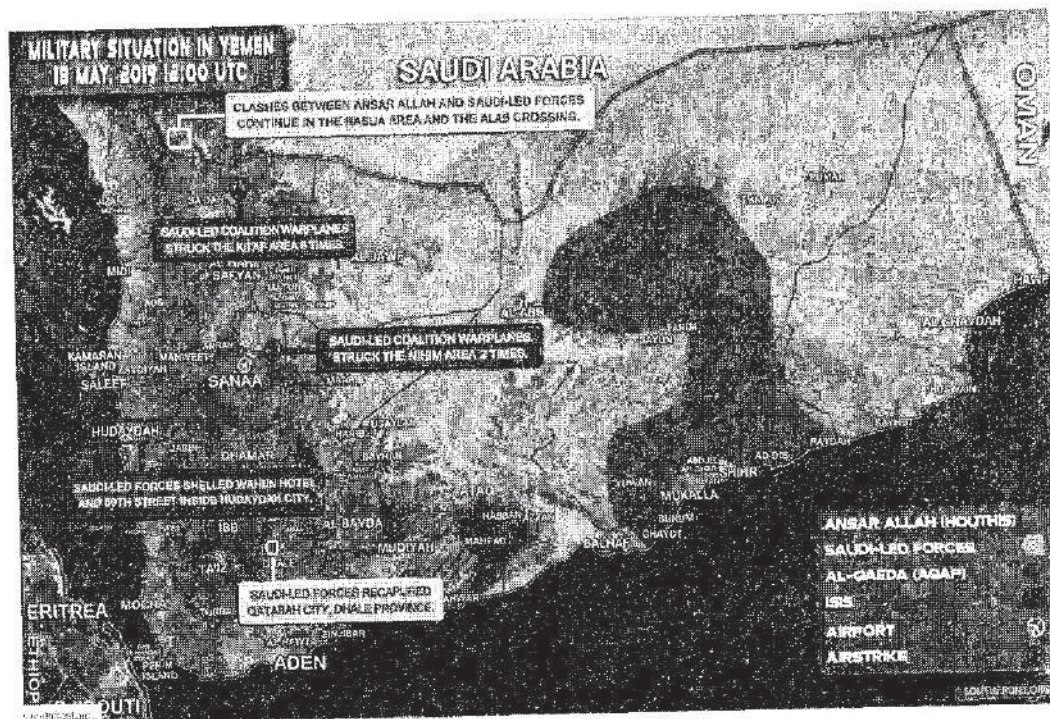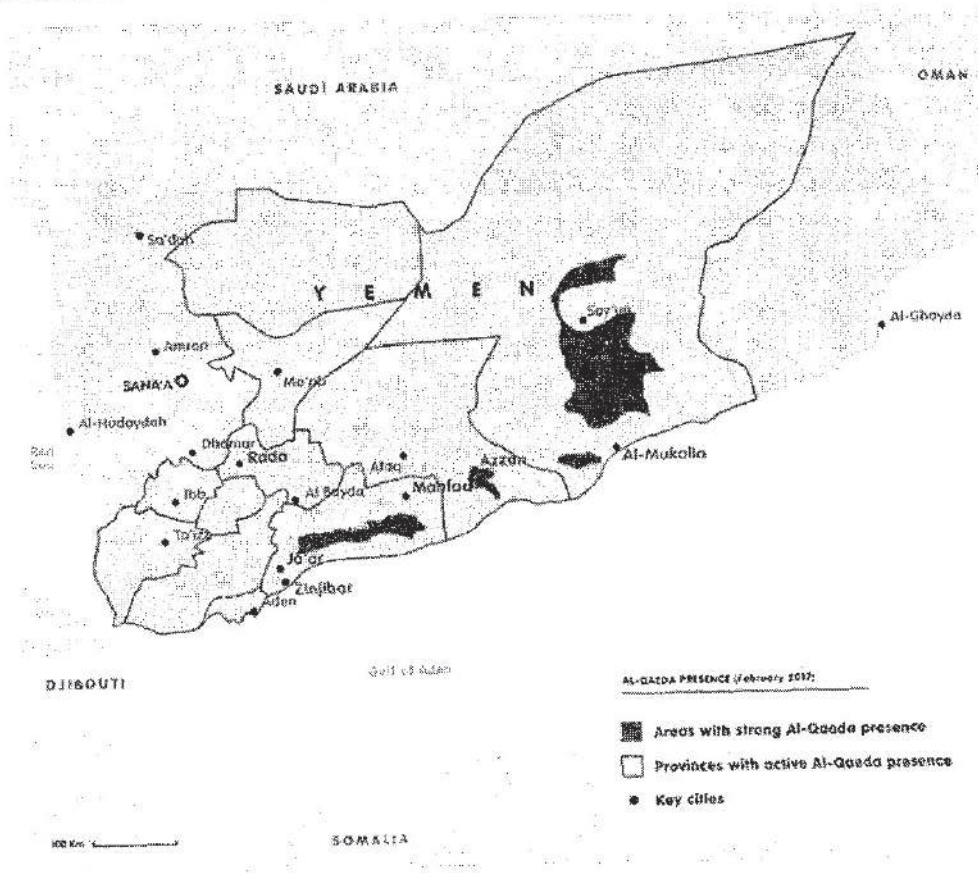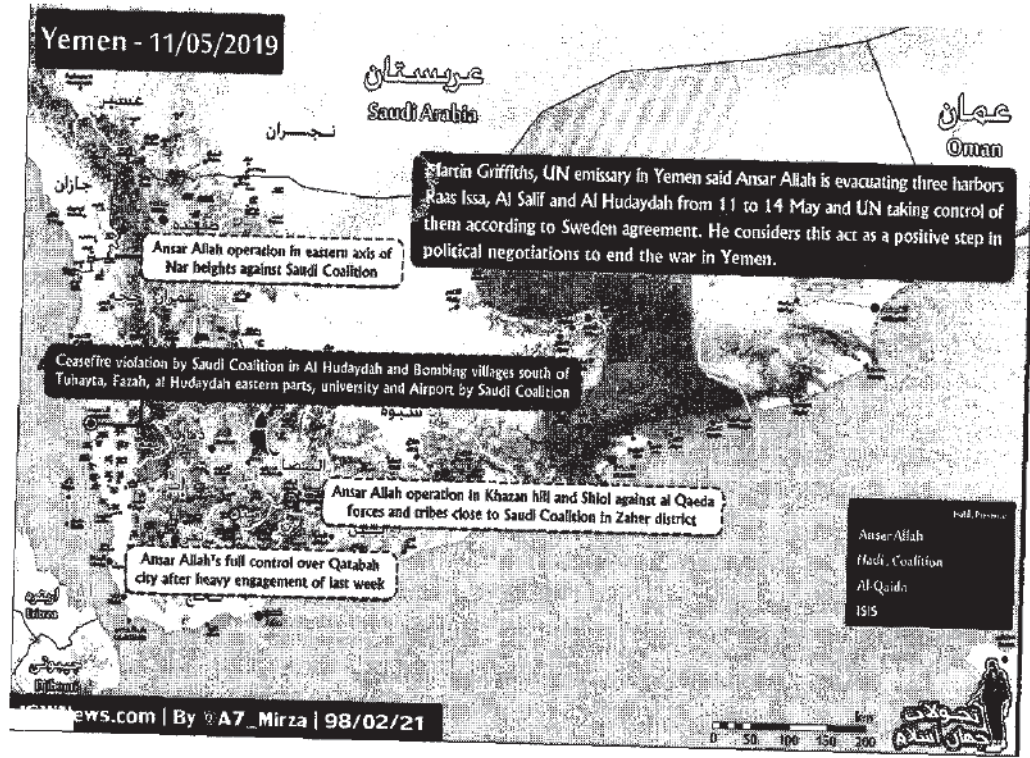
এরকম সুনির্দিষ্ট ভাবে দখলকৃত এলাকা উল্লেখ করা কঠিন, যেহেতু কোন রিপোর্টই তা সুনির্দিষ্ট ভাবে তুলে আনতে পারবে না। উপরন্তু মুজাহিদিনগন কৌশলগত কারণে নিজেদের দখলকৃত এলাকার সঠিক তথ্য গোপন রাখেন। তবে এটা পরিষ্কার যে AQAP গুরুত্বপূর্ণ ৪ টি এলাকা নিয়ন্ত্রন করে আশ শিহর, মুকাল্লা, বালহাফ এবং এডেন।

সুত্র-

https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/yemen-conflict-controls-160814132104300.html

ভূখণ্ড : ৪

সিরিয়া

মূল আয়তন- ১,৮৫,১৮০ বর্গ কিমি বা ৭১,৫০০ বর্গ মাইল
দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।
ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।
কর্তৃপক্ষ- তানজিম হুররাস আদ-দ্বীন (আল কায়েদা শাখা), হাইয়াতু তাহরির আশ শাম, আলহিজবুল ইসলামী আত-তুরকিস্তানী, আনসার আত-তাওহীদ, জুন্দুল আকসা, জাইশুল আ
হরার ইত্যাদি।
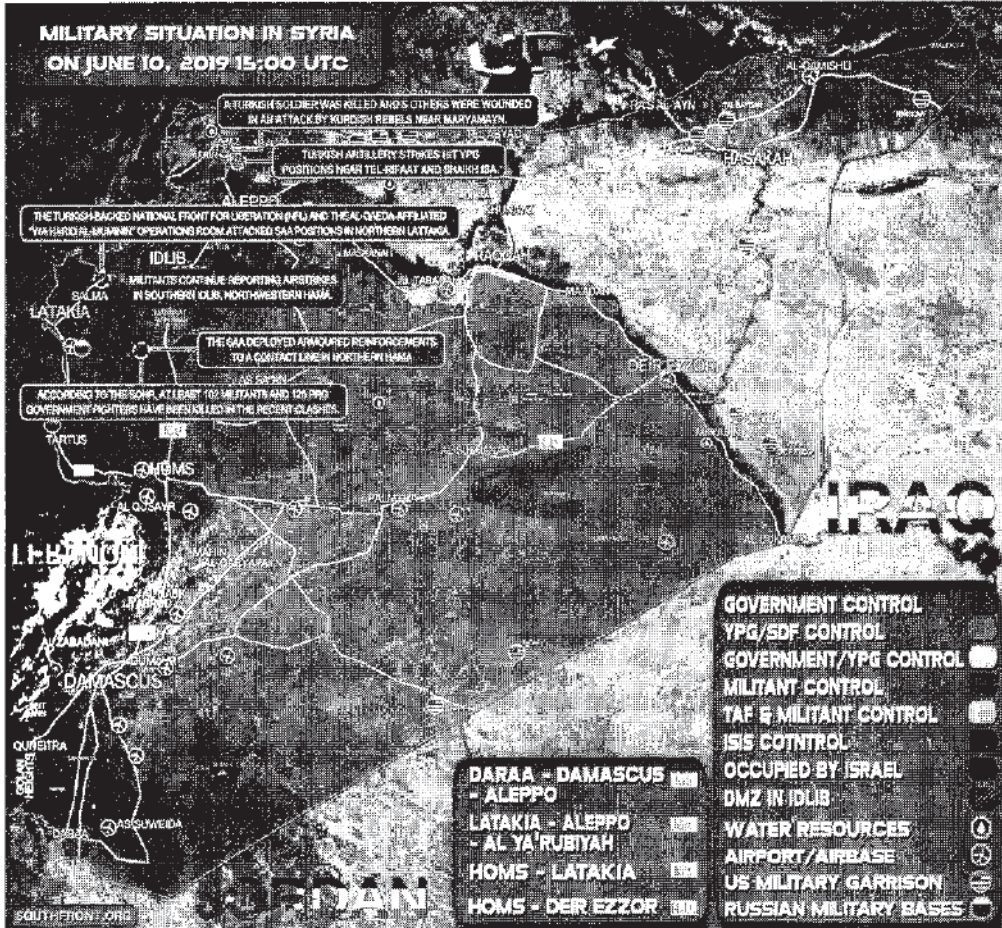
সূত্র- southfront.org

ম্যাপ থেকে যা দেখা যায় তা হচ্ছে শামের বিশাল একাংশ কুর্দিদের দখলে আছে। এর বাইরে সুনির্দিষ্ট ভাবে মুজাহিদিনদের দখলে কতটকু এলাকা

আছে তার সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, শামের অবস্থা এত বেশি ঘোলাটে যে শামের প্রকৃত আপডেট পাওয়া বেশ কঠিন। একই সাথে শামে কে কোন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে তার আপডেট পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। কারণ (এক) মুজাহিদিনগণ নিজেদের প্রকৃত এলাকার আপডেট প্রকাশ করেন না, (দুই) শামে এত বেশি ভাঙ্গা গড়া এবং এত বেশি দল আছে যে, বিরোধপূর্ণ এলাকাও অনেক আছে। সব মিলিয়ে শামে প্রকৃত ভাবে মুজাহিদিন দের এলাকার বর্ণনা দেয়া কঠিন।

ভূখণ্ড : ৫

মৌরিতানিয়া

মূল আয়তন- ১০ লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষ- আল কায়েদা ইসলামিক মাগরিব (AQIM)

Islamist militant groups and their areas of influence in Africa
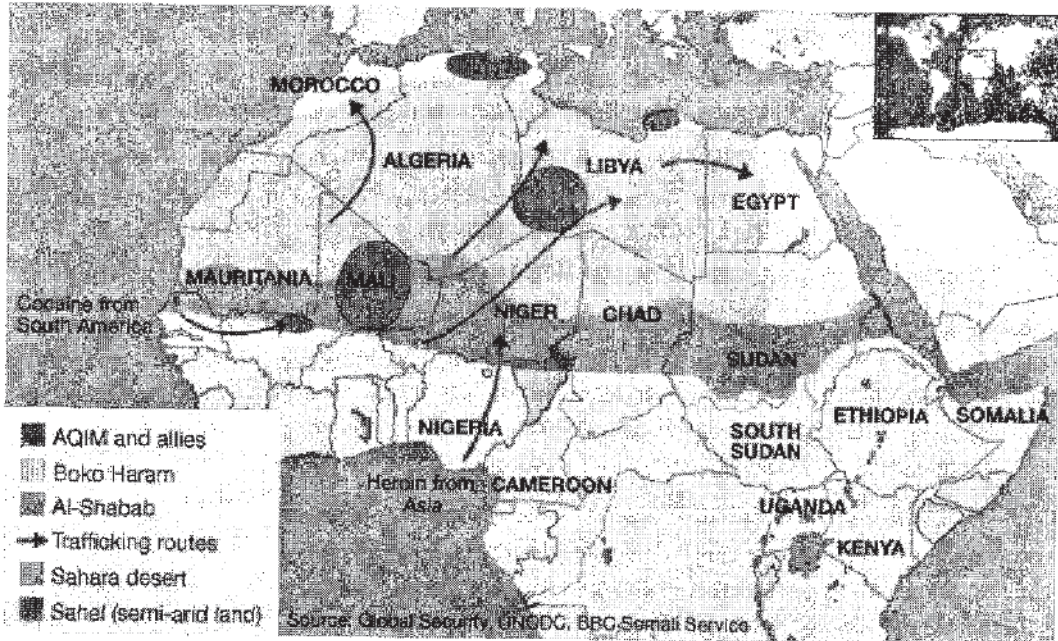
FIGURE: ZONE OF AQIM INFLUENCE
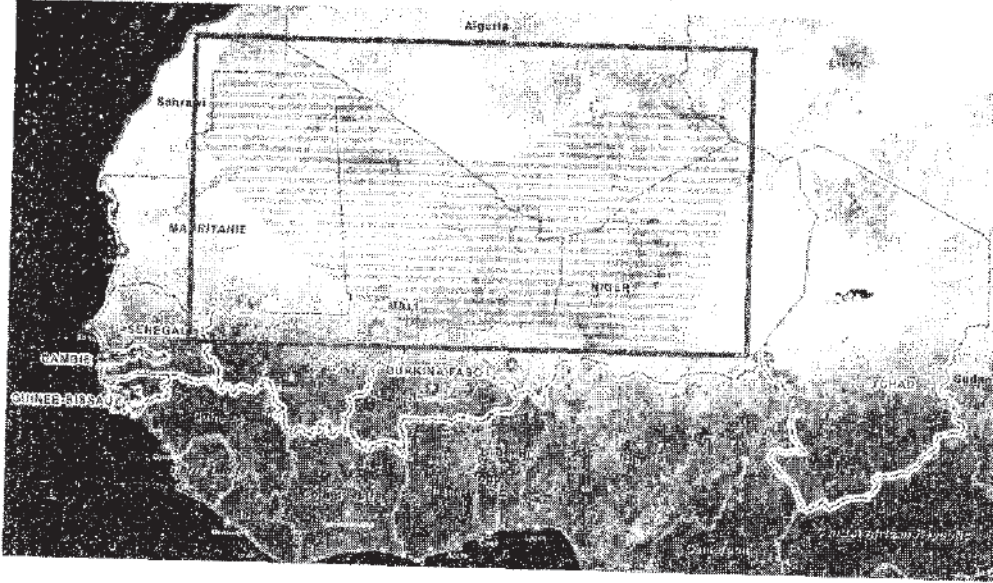
AQIM এর অধীনে মৌরিতানিয়ার কত শতাংশ এলাকা রয়েছে এমন কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। অছওগ এর এরিয়া অফ অপারেশন এর অধীনে মৌরিতানিয়া আছে। কিন্তু এটি দ্বারা অধীনস্থ অঞ্চলের কোন সঠিক উপাত্ত নিশ্চিত করা যায়না। তবে লিবিয়া, মালি, নাইজার এবং মৌরিতানিয়ার একটি বড় অংশ অছওগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন। নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শর'য়ী হুকুম হয়ত পালন করা হয় কিন্তু শারিয়াহ কায়েম হয়ে যাওয়া বা হুকুমত কায়েম হয়ে যাওয়া এমন বলা যাবেনা।

সুত্র- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mauritania

https://ndupress.ndu.edu/portals/68/documents/archives/asb/asb-11.pdf

ভূখণ্ড : ৬

ওয়েস্ট সাহারা

মুল আয়তন- ২ লাখ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটার।

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষ- আল কায়েদা ইসলামিক মাগরিব (AQIM)

এই এলাকায় AQIM এর দখলকৃত এলাকার ব্যাপারে আলাদা করে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি, বরং এটি অছওগ অধীনেই আছে সাহেল অঞ্চল নামে।

৫ নং অনুচ্ছেদের ম্যাপ দ্রষ্টব্য।

সুত্র- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Western_Sahara

ভূখণ্ড : ৭

আলজেরিয়া

মুল আয়তন- ২৩ লাখ ৮১ হাজার ৭৪১ বর্গকিলোমিটার।

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ AQIM
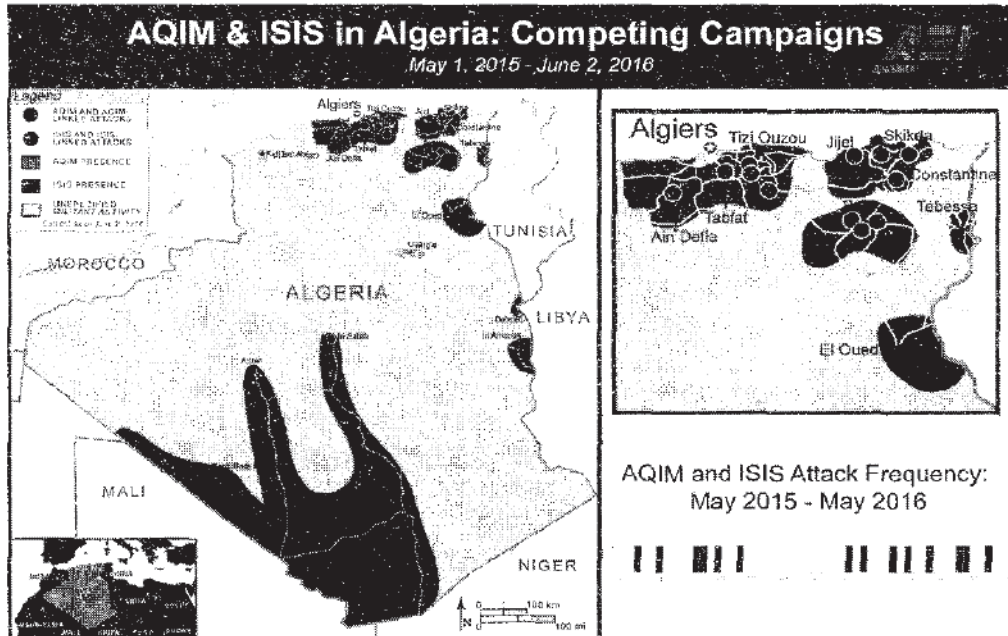
রিসেন্ট কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে ২০১৬ সালের একটি ম্যাপ অনুযায়ী, হয়ত ৩০% - ৪০% এলাকা মুজাহিদিনদের দখলে থাকতে পারে।

সূত্র- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Algeria

ভূখণ্ড : ৮

মালি

মুল আয়তন- ১২ লাখ ৪০ হাজার বর্গকিলোমিটার

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

কর্তৃপক্ষ- জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়ালমুসলিমিন (AQIM শাখা)

FIGURE: ZONE OF AQIM INFLUENCE
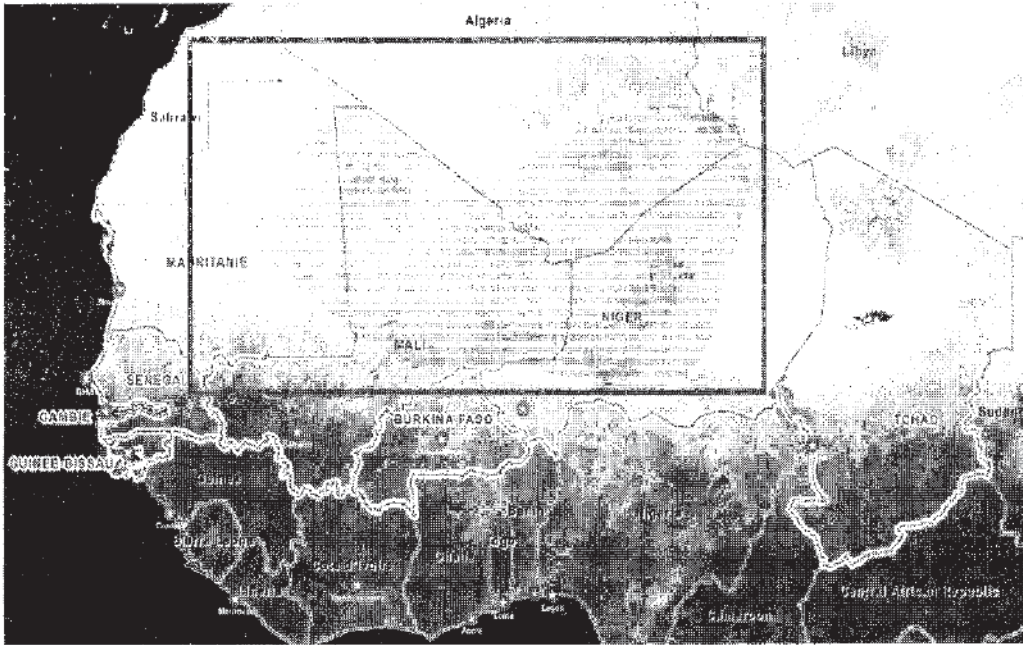
রিসেন্ট কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে উপরের কয়েক বছরের পুরাতন ম্যাপে মালিতে অছওগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল ৫০% এর বেশি দেখা যাচ্ছে।

সূত্র- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mali

ভূখণ্ড : ৯

নাইজার

মুল আয়তন- ১২ লাখ ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটার।

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

কর্তৃপক্ষ- আল কায়েদা ইসলামিক মাগরিব (AQIM)

FIGURE: ZONE OF AQIM INFLUENCE
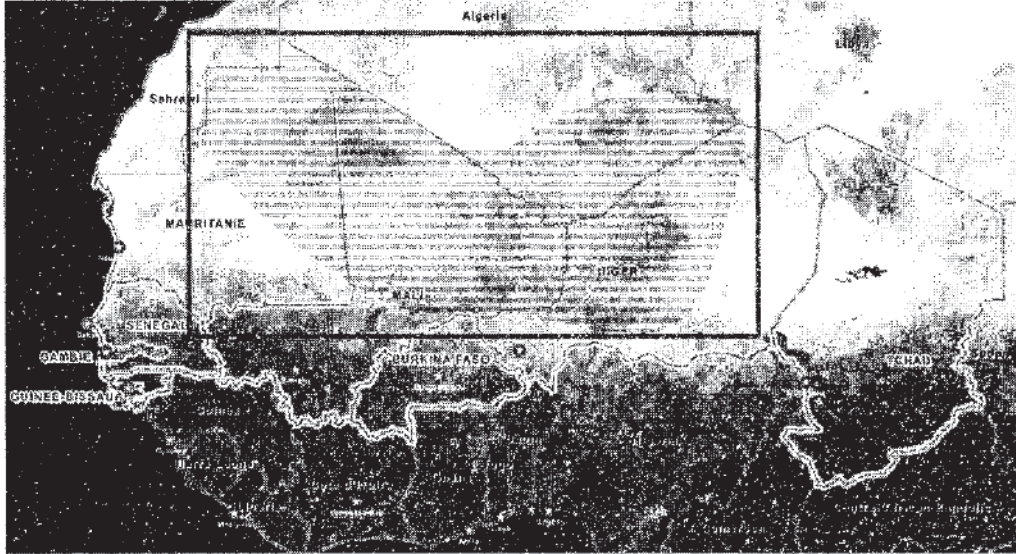
রিসেন্ট কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে উপরের কয়েক বছরের পুরাতন ম্যাপে মালিতে অছওগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল ৫০% এর বেশি দেখা যাচ্ছে।

সুত্র- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Niger

ভূখণ্ড : ১০

চাঁদ

মূল আয়তন- ১২ লাখ ৮৪ হাজার।

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষ- আল কায়েদা ইসলামিক মাগরিব (AQIM)

ভূখণ্ড : ১১

লিবিয়া

মূল আয়তন- ১৭ লাখ ৫৯ হাজার ৫৪১ বর্গকিলোমিটার।

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষ- আল কায়েদা ইসলামিক মাগরিব (AQIM), মজলিসে শুরা মুজাহিদি দিরনাহ ওয়া যাওয়াহিহা (প্রো yAQIM)
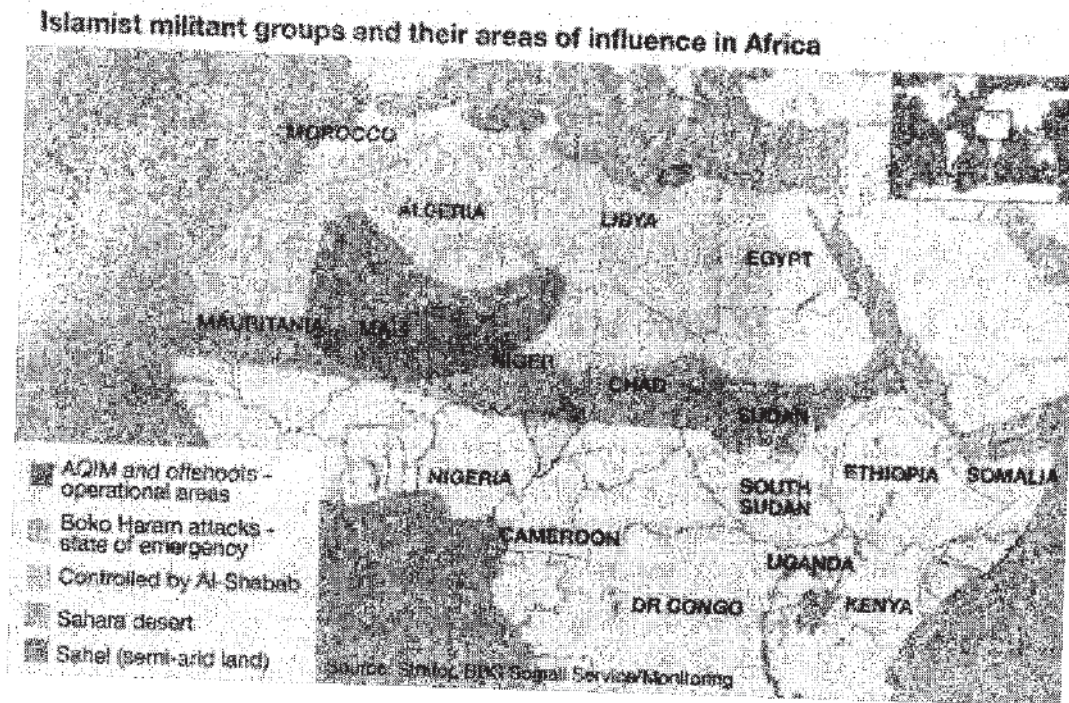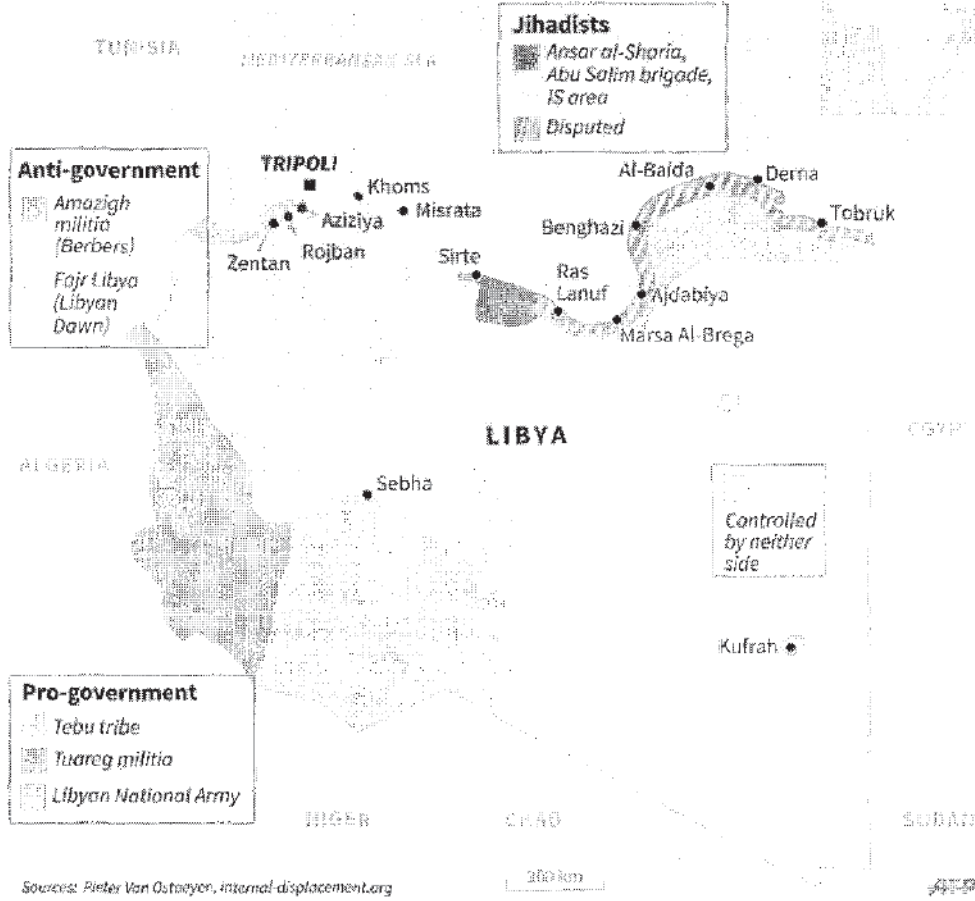
ভূখণ্ড : ১২

তিউনিসিয়া

মূল আয়তন- ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬১০ বর্গকিলোমিটার।

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষ- উকবাহ ইবনু নাফে' বিগ্রেড (AQIM শাখা)
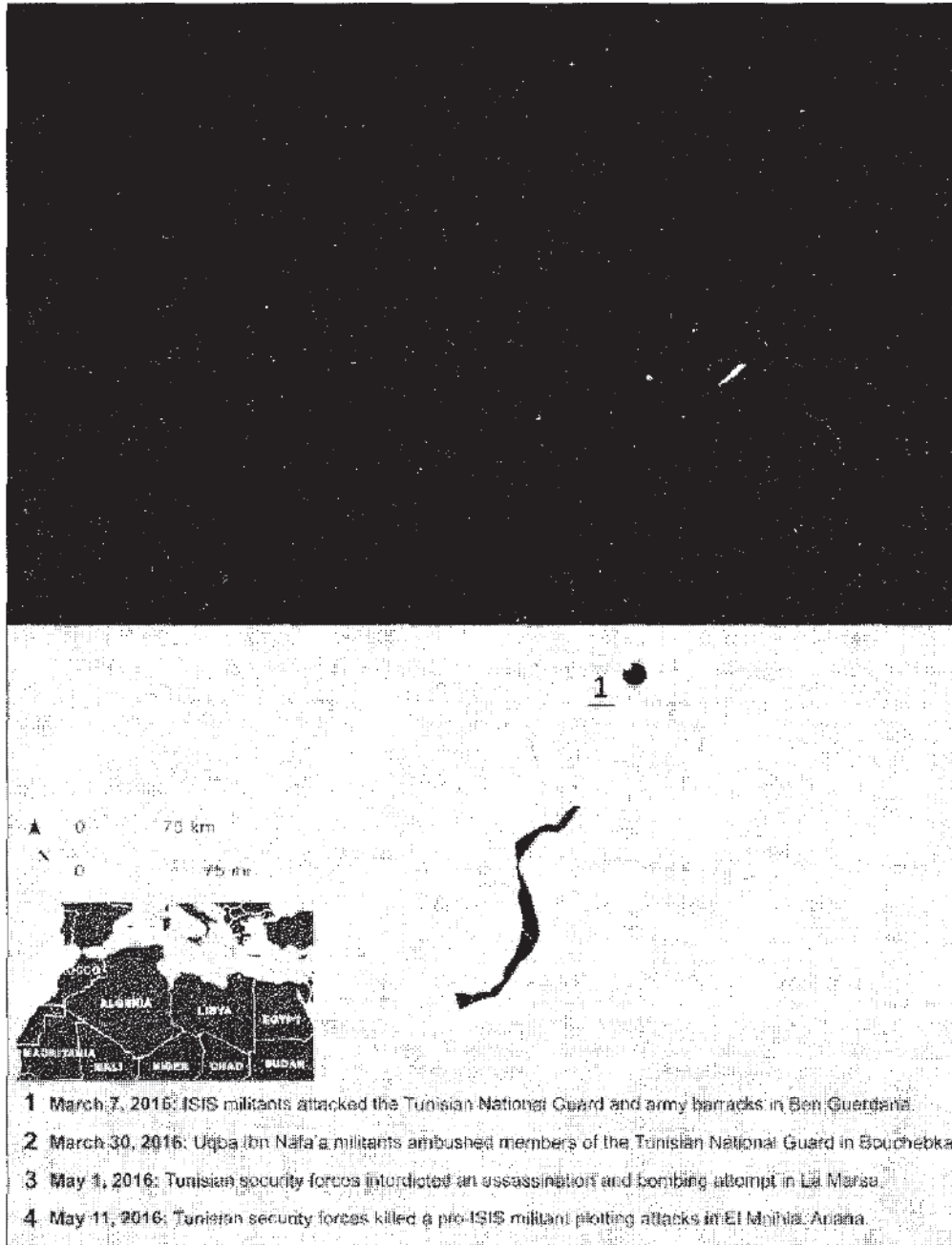
২০১৬ সালের এই ম্যাপ থেকে মনে হচ্ছে মুজাহিদিনদের দখলকৃত এলাকা ১০% এর বেশি হবে না হয়তো।

সূত্র- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tunisia

ভূখণ্ড : ১৩

পাকিস্তান

মূল আয়তন- ৮,৮১,৯১৩ বর্গ কিমি

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

কর্তৃপক্ষ- তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)

ভূখণ্ড : ১৪

কাশ্মির

মূল আয়তন- ১,৮৭,১৮৪ বর্গ কিমি

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

কর্তৃপক্ষ- আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ (প্রো আল কায়েদা শাখা)

ভূখণ্ড : ১৫

ইরান

মূল আয়তন- ১৬,৪৮,১৯৫ বর্গ কিমি

দখলকৃত আয়তন- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

ভাগ- কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।

কর্তৃপক্ষ- আনসার আল ফুরকান (প্রো আল কায়েদা শাখা)

সারাংশ

যদিও ধারণা করা হয় যে, মুজাহিদিনদের দখলে সারা বিশ্বে প্রায় ৫০ লক্ষ বর্গ কিমি এলাকা রয়েছে, এসব এলাকা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি। শুধুমাত্র ৫,৪৭,৭৭৩ বর্গ কিমি এলাকা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট

তথ্য পাওয়া গেছে। আর তাছাড়া সুনির্দিষ্ট ভাবে দখলকৃত এলাকার পরিমাণ নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন এবং এ ব্যাপারে কোন সঠিক উপাত্ত পাওয়া যায় নি।

তবে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (ঈঝওঝ) কর্তৃক প্রকাশিত নভেম্বর ২০১৮ এর রিপোর্ট মতে বর্তমানে সারা বিশ্বে সালাফি মুজাহিদের এর সংখ্যা কমপক্ষে ১,০৫,০৯৫ জন এবং উর্ধে ২,০৩,২৯০।

https://www.csis.org/analysis/evolution-salafi-jihadist-threat

জরুরী টীকা : ৩

আর এ দেশে যে হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে তা আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করার অধীনেই হবে।

জরুরী টীকা-৩

আর এ দেশে যে হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে তা আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করার অধীনেই হবে।

* *আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করে নেয়াই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। ঈমানের জন্য জরুরী হচ্ছে কবুল করা। আর এ স্বীকার করা যে কবুল নয় তা পরবর্তী টীকার আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহ। স্বীকার ও কবুলের মাঝে ব্যবধান স্পষ্ট।*

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

{سورة العنكبوت: ٦١-٦٣}

"আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন রিয্‌ক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা

সীমিত করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে আসমান থেকে বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বল সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।" -সূরা আনকাবূত ৬১-৬৩

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা যারা উদ্দেশ্য তারা কেউ মুমিন নয়। সত্যের শুধু স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই তারা মুমিন হয়নি।

পাকিস্তান সংবিধানে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে কবুল করা হয়নি, এমনকি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁকে হাকেম বলে স্বীকারও করা হয়নি। সংবিধানে আল্লাহকে স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহর দ্বীন একটি আমানত এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের অধীনে দেশ চলবে, শরীয়তের অধীনে দেশ চলবে -এমন কোন স্বীকারোক্তি বা ধারা সংবিধানে নেই।

সংবিধানের যে কথাগুলো থেকে শায়খে মুহতারামের সন্দেহ হয়েছে, যাকে তিনি নিশ্চয়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন যে, পাকিস্তানে যে হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে তা আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের স্বীকৃতির অধীনে প্রতিষ্ঠিত হবে, সংবিধানের সে বক্তব্যগুলো আমি এখানে তুলে ধরছি, যার কিছু কিছু এর আগে পরেও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ও হবে।

উদ্ধৃতিগুলোর পুনরোক্তিতে পাঠক হয়ত কিছুটা বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু বিষয়টির চূড়ান্ত ফলাফলে পৌঁছার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। আমি ছোট হলেও একটি বড় বিষয়ে হাত দিয়ে ফেলেছি। যদিও একান্ত বাধ্য হয়েই দিয়েছি। জবাবদিহির দায়বদ্ধতা থেকেই দিয়েছি। কিন্তু বিষয়টি বড়ই নাজুক ও স্পর্শকাতর।

সংবিধানের সন্দেহসৃষ্টিকারী সেই বক্তব্যগুলো

পাকিস্তান সংবিধানের ইসলামবান্ধব যে কথাগুলো যুগ যুগ ধরে পাকিস্তানের কর্ণধার ও সাধারণ জনগণকে মোহিত করে রেখেছে সে কথাগুলোর উপর এক সঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে দেখা যেতে পারে যে, সেখানে কী আছে। আরো দেখা যেতে পারে, তা থেকে ইসলাম ও মুসলমানরা কী পেয়েছে।

প্রথম বক্তব্য

* چونکہ اللہ تبارک وتعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار واقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہو گا، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص: ۱

"যেহেতু আল্লাহ তাআলাই অন্য কারো অংশিদারিত্ব ছাড়া সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র বিধানদাতা, আর তিনি কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে পাকিস্তানের জনগণ যে ক্ষমতা ও এখতিয়ার ব্যবহার করার অধিকার পাবে তা একটি পবিত্র আমানত।" -ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃ: ১

হাকীকত : আল্লাহ একমাত্র হাকেম ও বিধানদাতা এ কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু সংবিধান তৈরির ক্ষেত্রে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে কবুল করা হয়নি। এমনিভাবে তাঁর দেয়া বিধান একটি আমানত সে কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সে বিধানকে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে জরুরী আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, এ কথাগুলো ভূমিকার কথা, যা সংবিধানের কোন ধারা উপধারার অন্তর্ভুক্ত নয়। সংবিধানের ধারা উপধারাগুলোতে এ বিষয়টিকে স্থান দেয়া হয়নি এবং এর কোন প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা সংবিধানের ধারাগুলোতে রাখা হয়নি।

দ্বিতীয় বক্তব্য

* جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، پوری طرح عمل کیا جائے گا:

جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات ومقتضیات کے مطابق جس طرح

قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، ترتیب دے سکے۔ اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص: ۱

"যার মধ্যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সততা ও ইনসাফপূর্ণ জীবনযাপনের মূলনীতির উপর পুরোপুরি আমল করা হবে যেভাবে ইসলাম সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছে।

যার মধ্যে মুসলমানদেরকে ব্যক্তি ও সামাজিক অঙ্গনে এমন উপযুক্ত করে তোলা হবে যে, তারা তাদের নিজেদের জীবনকে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের দাবি মোতাবেক সাজাতে পারে যেভাবে কুরআন পাক ও সুন্নাহতে বাতলানো হয়েছে।" -ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃ: ১

হাকীকত : অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে এ গদটি তৈরি করা হয়েছে। প্রথমত: ইসলামের বিধান না বলে ইসলামের ব্যাখ্যা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: ইসলামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে, অথচ ইসলামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। তৃতীয়ত: গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা পাকিস্তান সংবিধানে দেয়া হয়েছে সে ব্যাখ্যার মাঝে ইসলাম প্রবেশ করার কোন ছিদ্রপথও রাখা হয়নি। চতুর্থ নম্বরে ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ তৈরির ওয়াদা করা হয়েছে। যার সাথে আইনগত বিষয় জড়িত নয়। এ ধরনের ওয়াদা অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার বেলায়ও করা হয়েছে।

সংবিধানের এ অংশটিকে আমরা এখানে যেভাবে বুঝেছি সেভাবে তা পুরো সংবিধানে এবং সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত তার বাস্তবায়ন হয়েছে। শাব্দিক অর্থের সুবিধা নিয়ে যেসব বুঝ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে পুরো সংবিধানে এবং পাকিস্তানের সত্তর/বাহাত্তর বছরে এর কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

আমাদের ইলমী অঙ্গনে এ কথাটি প্রসিদ্ধ আছে যে, পাকিস্তান সংবিধানের ভূমিকা পাকিস্তানের আকাবির ওলামায়ে কেরাম তৈরি করেছেন। এ কারণে পাঠকদের কেউ মনে করতে পারেন যে, ভূমিকার উপর যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলো প্রকারান্তরে আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরামের উপরই পড়ে।

এ বিষয়ে আমার নিবেদন হচ্ছে, ভূমিকাটি আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরাম লিখে থাকলেও তা গণতন্ত্রের ফর্মায় ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের ফর্মায় পরিপাটি হয়েই সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর বিকল্প কোন কিছু ধারণা করার কোন সুযোগ নেই। অতএব ভূমিকা বিষয়ক অভিযোগের পুরোটাই গণতন্ত্রের উপর। এর অংশবিশেষ হিসাবে আমাদের উপর এতটুকু অভিযোগ আসবে যে, আমরা কেন বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করিনি এবং করছি না।

তৃতীয় বক্তব্য

* قادر مطلق اللہ تبارک وتعالی اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ :

....

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اعلان سے وفاداری کے ساتھ کہ پاکستان عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہو گی۔ اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص: ۲

"কাদেরে মুতলাক আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা ও তাঁর বান্দাদের সামনে নিজের দায়িত্বের অনুভূতির সাথে:

....

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহের ঐ ঘোষণার মান রক্ষা করে যে, পাকিস্তান ইনসাফপূর্ণ জীবনযাপনের ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি গণতান্ত্রিক দেশ হবে।" - ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃ: ২

হাকীকত : এখানে প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সামনে দায়িত্বের অনুভূতির প্রকাশ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কায়েদে আযমের ঘোষণার মান রক্ষা করা। এ দু'টি কথা মূলত দু'টি সোনালী রূপালী কথা। এগুলো কোন আইনী ও সাংবিধানিক ভাষা নয়। এখানে কোন বিধান দেয়াও হয়নি এবং কোন বিধানের মূলনীতিও দেয়া হয়নি। উপরন্তু

কায়েদে আযমের ঘোষণার মান রক্ষা করার জন্য যারা আজ সংবিধানের পাতা নষ্ট করছে তারা ভুলে গেছে যে, কায়েদে আযম যতকাল ক্ষমতায় ছিলেন ততকালের মধ্যে তিনিও তাঁর ঘোষণার মান রক্ষা করেননি। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি দেশ ভাগ করেছেন। কিন্তু দেশ ভাগ করার পর বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে গেছেন। শত হাজার লক্ষ মুখে সে দাবি চলতে থাকার পরও তিনি ব্যস্ততার কারণে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করার সুযোগ পাননি।
'কায়েদে আযমের ঘোষণার মান রক্ষা করা' কথাটি আরেকটি বিষয় প্রমাণ করে যে, ইসলামবান্ধব এ গদগুলো অনেক পরের সংযোজন, যা বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য যুক্ত করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে যারা দেশের মালিকপক্ষ ছিল তাদের সময়কালে এ জাতীয় কিছু কথা সংবিধানে ছিল না। বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের তো প্রশ্নই আসে না।

লম্পট বদমাশগুলো তো লাম্পট্য ও বদমাশী করেই যাবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান কেন ধোঁকা খাবে। ধোঁকা খাওয়াতো নিষেধ।

চতুর্থ বক্তব্য

* جس کا نام اسلامی جمہوریت پاکستان ہو گا۔ اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، ابتدائیہ ص : ۳

"যার নাম হবে, ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তান।" -ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ইবতেদাইয়া পৃঃ ৩

হাকীকত: দেশটির নাম ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তান। বাকি দেশটি শুধু জুমহুরিয়া হয়েছে, ইসলামী হয়নি। গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে যতগুলো যোগ্যতা থাকার দরকার তার সব যোগ্যতাই দেশটির আছে। কিন্তু দারুল ইসলাম হওয়ার মত কোন ব্যবস্থা পাকিস্তানে করা হয়নি। এতটুকু হয়েছে যে, দেশের নাম ইসলামী হওয়ার কারণে গণতন্ত্রের কুফরের প্রহরীদেরকে মুজাহিদ খেতাব দেয়া হয়েছে এবং মানবরচিত আইনের প্রণেতাদেরকে আমীরুল মুমিনীনের ফযীলত ও মান দেয়া হয়েছে।

পঞ্চম বক্তব্য

***باب ٣-الف-وفاقی شرعی عدالت**

دستور میں شامل کسی امر کے باوجود اس باب کے احکام مؤثر ہونگے۔

....

....

اس باب کی اغراض کے لئے ایک عدالت کی تشکیل کی جائے گی جو وفاقی شرعی عدالت کے نام سے موسوم ہوگی۔

عدالت چیف جسٹس سمیت زیادہ سے زیادہ آٹھ **مسلم ججوں** پر مشتمل ہوگی، جن کا تقرر صدر آرٹیکل ١٧٥-الف کی مطابقت میں کرے گا۔ اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، وفاقی شرعی عدالت ص: ١١٩-١١٨

অনুবাদ

অধ্যায় ৩ -আলিফ- বেফাকী (ফেডারেল) আদালত

সংবিধানে সন্নিবেশিত কোন বিষয় থাকা সত্ত্বেও এ অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রভাব বিস্তার করবে।

....

....

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি আদালত তৈরি করতে হবে যা বেফাকী (ফেডারেল) আদালত নামে পরিচিত হবে।

আদালতটি প্রধান বিচারপতিসহ সর্বোচ্চ আট জন মুসলিম জজ দ্বারা তৈরি হবে। প্রেসিডেন্ট ১৭৫ আলিফ অনুচ্ছেদের আলোকে তাদেরকে নিয়োগ দেবেন।" -ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, বেফাকী শরয়ী আদালত পৃ: ১১৮-১১৯

হাকীকত : বেনসন সিগারেটের বিশাল বিলবোর্ডের এক কোনের 'সতর্কীকরণ : ধূমপান স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর' যত ক্ষুদ্র ও ছোট, পাকিস্তানের বিশাল কুফরী আদালতের পাশে সিঁড়ির নিচের শরীয়াহ বেঞ্চ তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষুদ্র ও ছোট। দ্বিতীয়ত এ বেঞ্চ পরিচালিত হবে কুফরী আইন প্রয়োগে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের দ্বারা। তৃতীয়ত এ বেঞ্চের প্রধানও হবে কুফরী আইন প্রয়োগে দীর্ঘ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। চতুর্থত এর সকল তদারকি করবে কুফরী আইনের উচ্চ আদালত।

এরই সাথে সাথে আরো দু'টি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এক. বলা হয়েছে শরীয়া বেঞ্চের বিধান অন্যান্য বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, শরীয়া বেঞ্চ দেশের বৃহৎ গায়রে শরয়ী আদালতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং প্রভাব বিস্তার করার মত কোন ধারা সংবিধানে রাখা হয়নি; বরং বিপরীত ধারাসমূহ রাখা হয়েছে। দুই. শরীয়া বেঞ্চ নামের এ বেঞ্চটিও পাকিস্তানের কিসমতে বহুকাল পরে জুটেছে। বেঞ্চটি যখন জন্মলাভ করেছে তখন যতটুকু শক্তি নিয়ে তার পথচলা শুরু হয়েছিল তাও এখন অবশিষ্ট নেই। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে করে অবস্থা।

কথাগুলো পাকিস্তানের দীর্ঘ জীবনেও আছে এবং সংবিধানে আছে। বার বার পড়ে বিষয়গুলো বুঝে নিন।

ষষ্ঠ বক্তব্য

* صدر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں .... صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت، توحید قادر مطلق اللہ تبارک وتعالی، کتب الٰہیہ، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ

سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک وسنت کی جملہ مقتضیات وتعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔

اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، عہدوں کے حلف ص: ۲۰۷

প্রেসিডেন্ট

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি বড় মেহেরবান, অত্যন্ত দয়াবান)

"আমি মুসলমান এবং কাদেরে মুতলাক আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলার তাওহীদ, আল্লাহর কিতাবসমূহ যার মধ্যে কুরআন পাক সর্ব শেষ কিতাব, খাতামুন নাবিয়্যীন হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁর পর কোন নবী আসতে পারে না, কেয়ামত দিবস, কুরআন পাক ও সুন্নাহের সকল দাবি ও শিক্ষার উপর ঈমান রাখি.......।" -ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, পদসমূহের হলফ পৃ: ২০৮

হাকীকত: প্রথমত এ কথার মধ্যে দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের কোন কথা নেই। দ্বিতীয়ত ঈমানের এ স্বীকৃতির পর যদি কেউ আল্লাহর আইনকে কবুল না করে মানব রচিত আইনকে কবুল করে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। সে পুনরায় মুসলমান হওয়ার জন্য তাওবা করতে হবে এবং কৃত কুফর থেকে ফিরে আসতে হবে। তৃতীয়ত মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতি শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর হলফনামায় রয়েছে। এছাড়া আর কারো হলফনামায় এ স্বীকৃতি নেই।

সপ্তম বক্তব্য

* کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہونگا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔

اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، عہدوں کے حلف ص: ۲۱۰

"যে, আমি ইসলামী ধ্যান-ধারণা বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব।" -ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, পদসমূহের হলফ পৃ: ২১০

হাকীকত: 'ইসলামী ধ্যান-ধারণা বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব' এটি সংবিধানের কোন ভাষা নয়। এর দ্বারা কোন আইনগত অবস্থান প্রকাশ

পায় না। ইসলামী আইনে দেশ চলবে, কুরআনের আইনে দেশ চলবে - এ বক্তব্যের এমন অর্থ করা যায় না। ধোঁকাবাজরা বুঝে শুনেই কথাগুলোকে এভাবে তৈরি করেছে।

স্বীকার করা ও কবুল করা

এ পর্যায়ে একটি মাসআলা একদম স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার। প্রায় ক্ষেত্রে কুফর থেকে কাউকে বাঁচানোর জন্য বলা হয়, তিনি বিষয়টিকে অস্বীকার করেন না। বুঝতে হবে ঈমানের বিষয়গুলোকে শুধু স্বীকার করার দ্বারা ঈমান সাব্যস্ত হয় না। ঈমানের বিষয়গুলোর সত্যতা স্বীকার করার পর ব্যক্তির মাঝে ঈমান সাব্যস্ত হতে হলে সে স্বীকার করার সাথে সাথে তা কবুল করে নিতে হবে। ويسلموا تسليما এর পর্ব পার করতে হবে। নচেৎ ঈমান সাব্যস্ত হবে না।

আবু তালিবের কুফর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব কাফের ছিলেন এ বিষয়ে উম্মতের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কেন কাফের ছিলেন? সহীহ বর্ণনার আলোকেই এ কথা প্রমাণিত যে, আবু তালিব আল্লাহ যে একক সত্তা, তাঁর কোন শরীক নেই -এ কথা বিশ্বাস করতেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী হিসাবে বিশ্বাস করতেন। রাসূলের দাওয়াতের প্রতিটি শাখা প্রশাখাকে হক বলে জানতেন। শুধু এতটুকুই নয়; রাসূলের দাওয়াতী কাজের প্রতিটি পর্বে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সহযোগিতা করে গেছেন। ইসলামের দাওয়াতের কারণে রাসূলসহ সাহাবায়ে কেরাম যেসব কষ্টের মুখোমুখী হয়েছেন আবু তালিবও তার মাঝে শরীক ছিলেন। এত কিছুর পরও তিনি কেন কাফের?

সহীহ বর্ণনার আলোকে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার জীবন সায়াহ্নে মাথার পাশে বসে বসে বলতে থেকেছেন, চাচা! আপনি একটি বার ঈমানের কালিমাটি পড়ুন। আপনি ঈমান গ্রহণ করেছেন শুধু এতটুকু প্রমাণ রেখে যান। চাচা গ্রহণ করেননি। গ্রহণ না করার কারণ কতটুকু ছিল? একেবারেই সামান্য। মক্কার কাফের সর্দাররা বলেছিল, আবু তালিব! তুমি মৃত্যুর

ভয়ে মুহাম্মদের দাওয়াত গ্রহণ করলে? আবু তালিবের স্বচ্ছ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও শুধু কাল্পনিক মান হানীর ভয়ে ঈমানটা গ্রহণ করেননি।

এরকম ছোটখাট অনেক কারণেই মানুষ আল্লাহর বিধানকে গ্রহণ করছে না। কিন্তু কারণ যাই হোক, গ্রহণ না করলে ঈমান সাব্যস্ত হবে না। গ্রহণ না করলে সে মুসলমান থাকতে পারবে না।

ইবলিসের কুফর

ইবলিস কেন কাফের? সে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করেনি। আল্লাহ তাআলা যত গুণে গুণান্বিত তত গুণে গুণান্বিত হিসাবে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করত। আল্লাহ তাআলা যত হুকুম দিয়েছেন সেসব হুকুম যে আল্লাহর এ বিষয়ে ইবলিসের কোন অবিশ্বাস ছিল না। আল্লাহর আনুগত্য নাজাতের কারণ এবং অবাধ্যতা ধ্বংসের কারণ এ কথা ইবলিস বিশ্বাস করত। আল্লাহর কুদরতকে সে স্বীকার করত। আর সে কারণেই সে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে গোমরাহ করার শক্তি আল্লাহর কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছে। তাহলে তার সমস্যাটা কোথায় ছিল?

তার সমস্যা ছিল, সে আল্লাহর আদেশকে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু গ্রহণ করেনি। আল্লাহ বলেছেন, তুমি আদমকে সিজদা কর। সে বলেছে, আমি সিজদা করব না। সে বলেনি যে, এটা আপনার আদেশ নয়। শুধুমাত্র সে আদেশটি গ্রহণ করেনি। সে বলেছে قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ। 'একজন মানুষকে আমি সিজদা করব না'। অর্থাৎ সে আল্লাহর এ আদেশটি গ্রহণ করেনি। এবং শুধুমাত্র এ একটি আদেশকে গ্রহণ না করেই সে কাফের মুরতাদ হয়েছে। এর আগে তার হাজার বছরের ইতিহাস হচ্ছে সে সব কিছু গ্রহণ করেছে। প্রথম যে দিন সে একটি আদেশ গ্রহণ করেনি সেদিন সে কাফের হয়ে গেছে। সে কিন্তু মুমিন থেকে কাফের হয়েছে।

আদম আলাইহিস সালামের ঈমান

ترك عمل বা আমল ছেড়ে দেয়া এবং عدم تسليم বা গ্রহণ না করা এ দুয়ের মাঝেও পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতের একটি নির্দিষ্ট গাছ থেকে খেতে নিষেধ

করেছেন। এরপরও তিনি খেয়েছেন। আল্লাহর আদেশের বিপরীত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে বলেছেন, আদমকে সিজদা কর। ইবলিস সিজদা করেনি। আল্লাহর আদেশের বিপরীত করেছে। এ দুয়ের মাঝে ব্যবধান কী?

ব্যবধান হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আদেশ করার পর ইবলিস বলেছে, আমি করব না। এবং সে করেনি। আল্লাহ তাকে বলেছেন-

﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾
{سورة الحجر: ٣٤ و ٣٥}

আর আল্লাহ তাআলা আদমকে বলেছেন খেয়ো না। তিনি বলেননি যে, না, আমি খাব। কিন্তু খেয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে বলেছেন-

﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾
{البقرة: ٣٦}

এ দুয়ের ব্যবধান যে বুঝতে পারবে না তার আর দুঃখের শেষ নেই। এ ব্যবধানের কারণে ইবলিস কাফের হয়েছে, আর আদম আলাইহিস সালাম মুমিন রয়ে গেছেন।

আমাদের গণতন্ত্রের কর্ণধাররা ইবলিসের কথাটি গ্রহণ করেছে। তাদেরকে যখন বলা হয়েছে, কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করুন। তারা বলেছে, না, করব না। আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করব। কুরআন সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এবং করেনি। কুরআন সুন্নাহর আইনের পক্ষে যারা কথা বলেছে তাদেরকে দমন করেছে, ঠাট্টা করেছে, পশ্চাদপদ বলেছে। প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর সে আদেশ মেনে চলার সকল আয়োজন করেছেন। সে গাছ থেকে খাওয়ার প্রস্তাব বার বার ফিরিয়ে দিয়েছেন। এক পর্যায়ে প্ররোচনার শিকার হয়ে গেছেন এবং ভুল করে

ফেলেছেন। ترك عمل হয়েছে। আমাদের গণতন্ত্রের কর্ণধাররা কুরআন সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের সকল পথ বন্ধ করে, গণতন্ত্র বাস্তবায়নের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে দেশ পরিচালনা শুরু করেছে। এটা হচ্ছে عدم تسليم বা গ্রহণ না করা।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের কর্ণধারদের ব্যাপারে শায়খে মুহতারাম দাবি করতে পারেন, তারা আল্লাহর বিধানকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তরক করেছে। শায়খের এ দাবি সহীহ নয়। পাকিস্তানের সংবিধানের ভাষা অনুযায়ী তারা আল্লাহর বিধানকে গ্রহণ করেনি। করবে বলে ওয়াদা করেছে। আর ঈমানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতকালের সীগা-শব্দ গ্রহণযোগ্য নয়। 'আমি ঈমান আনব' বললে তাকে মুমিন বলা হবে না। 'আমি বিয়ে করব' বললে বিয়ে হয় না। 'আমি ক্রয় করব' বললে বেচা কেনা হয় না।

বরং একই বিষয় যে বিষয়ে আল্লাহর বিধানে অকাট্যভাবে সিদ্ধান্ত দেয়া রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহর বিধানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে কুফরের বিধানকে গ্রহণ করা হয়েছে -পাকিস্তানের আইনে এমন উদাহরণ শত শত রয়েছে। আল্লাহর বিধান অকাট্যভাবে থাকা সত্ত্বেও তাহাকুম ইলাত তাগুতের অনুশীলন চলছে প্রতিদিন।

এসবই عدم تسليم বা গ্রহণ না করা। ترك عمل বা আমল ছেড়ে দেয়া নয়।

জরুরী টীকা : ৪

“

আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাত মেনে নেয়ার মাধ্যমে হবে এবং তাঁর বিধানের অধীনে হবে।

”

জরুরী টীকা-৪

আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাত মেনে নেয়ার মাধ্যমে হবে এবং তাঁর বিধানের অধীনে হবে।

*** এটি শায়খ মুহতারামের নিজের কথা। পাকিস্তান সংবিধানে এমন কোন কথা নেই। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদে 'ইসলামী আহকাম' শিরোনামে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, বর্তমানের সকল আইনকে ইসলামের আইন অনুযায়ী সাজানো হবে। আর এ কথা ১৯৪৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সকল সংস্করণেই আছে। যার অর্থ হচ্ছে, বিধান কখনোই আল্লাহর বিধানের অধীনে তৈরি হয়নি। হুকুমত আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং হওয়ার কোন সুযোগ নেই। হয়নি, এর সাক্ষি বিগত সত্তর/বাহাত্তর বছর। আর হবে না, এর দলিল অতীত বর্তমানের সংবিধান, সংবিধানের বাস্তবায়ন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয়।***

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের হাকীকত হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। গৃহীত সিদ্ধান্তের অবস্থা কী? তার সুবিধা অসুবিধা কী? এসব বিষয় গণতন্ত্রের কোন আলোচ্য বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ

যদি বলে, মানুষে মানুষে বিয়ের প্রথা বন্ধ করতে হবে, যেখানে সেখানে যৌনমিলনের অবাধ অনুমতি দিতে হবে এবং কুকুর, শূয়র, বিড়াল তাদের বিয়ে নিবন্ধন করতে হবে এবং নিবন্ধন না করে রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে তাদের সহবাস নিষিদ্ধ করতে হবে, তাহলে গণতান্ত্রিক সরকার তা করতে বাধ্য। না করলে সে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনোনীত ব্যক্তিই সরকার প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হবে এবং তাদের এসব দাবি পূরণ করবে।

এসব আইন পাশ করার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ কারো কাছে কোন প্রকার জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। ধর্মের কাছেও নয়, ডাক্তারের কাছেও নয়, রুচির কাছেও নয়, ইতিহাসের কাছেও নয়, বিবেকের কাছেও নয়। কোথাও নয়। গণতন্ত্রের এসব হাকীকত শায়খে মুহাতারাম তাঁর বিভিন্ন লেখায় সুন্দর করে তুলেও ধরেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে বিভিন্ন চিত্রও তিনি তুলে এনে পাঠকদেরকে দেখিয়েছেন। আমরা সেসব চিত্র নিজ চোখে দেখতেও পাচ্ছি। নিজ কানে শুনতেও পাচ্ছি।

পাকিস্তানের গণতন্ত্র

পাকিস্তানের কথা কাজেও আমরা উল্লিখিত গণতন্ত্রের ব্যতিক্রম কিছু দেখিনি। সারা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণতন্ত্র যেভাবে চলে, যে শক্তি নিয়ে কাজ করে পাকিস্তানেও সেভাবেই চলছে, সে শক্তি নিয়েই কাজ করছে। সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের চর্চার সঙ্গে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের চর্চার কোন ব্যবধান নেই। পাকিস্তানের সংবিধান পাকিস্তানে গণতন্ত্রের চর্চাকে সেভাবেই তুলে ধরেছে। চলুন সংবিধানের সে পাঠগুলোর কিছু অংশ আমরা আবার একটু দেখি-

مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوریت ہوگی جس کا نام اسلامی جمہوریت پاکستان ہوگا جسے بعد ازیں پاکستان کہا جائے گا-ابتدائیہ ص: ۳

"পাকিস্তান দেশটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ হবে যার নাম হবে ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তান, যাকে এরপর থেকে পাকিস্তান বলা হবে।" -পৃ: ৩

مجلس شوری (پارلیمنٹ) میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطہ کار کی کسی بے قاعدگی کی بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا-ص: ۴۵

"মজলিসে শূরায় (সংসদে) কোন কার্যক্রমের বৈধতার উপর, কার্যপ্রণালীর কোন নীতিহীনতার উপর কোন প্রকার আপত্তি করা যাবে না।" -পৃ: ৪৫

شق (۱) کے تحت وضع شدہ قواعد کو مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مشترکہ اجلاس میں ان میں اضافہ کیا جاسکے گا، کمی بیشی کی جاسکے گی، ترمیم کی جاسکے گی یا انہیں تبدیل کیا جاسکے گا۔

دستور کے تابع کسی مشترکہ اجلاس میں تمام فیصلے حاضر اور رائے دینے والے ارکان کی اکثریت کے ووٹوں سے کئے جائیں گے۔ص: ۴۸-۴۷

"অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে রচিত নীতিমালাকে সম্মিলিত এজলাসের সামনে উত্থাপন করা হবে, সম্মিলিত এজলাসে তার মাঝে বৃদ্ধি করা যাবে, কম-বেশ করা যাবে, সংশোধন করা যাবে, এমনিভাবে পরিবর্তনও করা যাবে।

সংবিধানের অধীনে সম্মিলিত এজলাসে সকল সিদ্ধান্ত নেয়া হবে উপস্থিত এবং রায় প্রদানকারীদের অধিকাংশের ভোটের ভিত্তিতে।" -পৃ: ৪৭-৪৮

دستور میں کسی ترمیم پر کسی عدالت میں کسی بناء پر چاہے جو کچھ ہو کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

ازالہ شک کے لئے بذریعہ ہذا اقرار دیا جاتا ہے کہ دستور کے احکام میں سے کسی میں ترمیم کرنے کے مجلس شوری (پارلیمنٹ) کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ص: ۱۵۸-۱۵۷

"সংবিধানের কোন প্রকার সংশোধনীর উপর কোন আদালতে কোন ভিত্তিতে কোন বিষয়ে কোন আপত্তি করা যাবে না।

সন্দেহ দূর করার জন্য এর দ্বারা সিদ্ধান্ত দেয়া হচ্ছে যে, সংবিধানের বিধানাবলীর মধ্য থেকে কোনটির মধ্যে রদবদল করার ক্ষেত্রে মজলিসে

শূরা (পার্লামেন্ট) এর এখতিয়ারের উপর কোন প্রকারের কোন পাবন্দি নেই।" -সংবিধান সংশোধনী পৃ: ১৫৭-১৫৮

এভাবে গণতন্ত্রের যত ধারা উপধারা রয়েছে তার প্রত্যেকটিই পাকিস্তান সংবিধানে রয়েছে, সেগুলোর প্রয়োগ রয়েছে এবং এসব ধারা উপধারার প্রতি আকিদা বিশ্বাসও রয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। আমরা দু'চারটি খণ্ডচিত্র এখানে তুলে ধরেছি। এ থেকে কিছুটা ধারণা নেয়া যাবে। পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে পাকিস্তানের সংবিধানটি সরাসরি দেখতে হবে। আমি আমার পাঠকবর্গকে তা দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

ধর্মনিরপেক্ষতা

বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি পরিভাষা। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কার্যকরী একটি পদক্ষেপ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে গলায় গলা মিলিয়ে আছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার শব্দ, পরিভাষা, ব্যবহারিক অর্থ ও প্রয়োগ সব কিছুর মূল দাবিই হচ্ছে, কোন ধর্মের পক্ষ গ্রহণ না করা। এক ধর্মকে আরেক ধর্মের উপর প্রাধান্য না দেয়া। পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্ব পরিচালনায় ধর্মের কোন প্রভাব না থাকা। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীর জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। দেশের জনগণ হিসাবে কোন ধর্মের অনুসারীই ছোট নয় এবং কোন ধর্মের অনুসারীই বড় নয়। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই দেশের মালিক এবং সমান অধিকার নিয়ে মালিক। এক পক্ষ আশ্রয়দাতা আরেক পক্ষ আশ্রিত এমন নয়। এক পক্ষ মালিক আরেক পক্ষ বহিরাগত এমন নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলে, ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। এর খুব বিরোধিতা করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে কোন শত্রুতা হবে না, দূরত্ব হবে না, লড়াই হবে না, বিদ্বেষ হবে না, কটাক্ষ হবে না। আর চৌধুরী, পাটওয়ারী, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী আরবী অনারবী এসব গোষ্ঠী ও ভূখণ্ড ভিত্তিক বিভক্তি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। এর গোড়ায় খুব পানি ঢালতে হবে। এ বিভক্তিকে যতই টিকিয়ে রাখা যাবে ততই উন্নতি হতে থাকবে।

এসব কিছুর মূলে রয়েছে ইসলামের মৌলিক সবগুলো দাবিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করা। আর সে কারণে ধর্মনিরপেক্ষতা খুঁজে খুঁজে সেসব

বিন্দুতেই আঘাত করেছে যা ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং প্রচার লাভ করেছে।

এ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। পৃথিবীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে এ ধর্ম খুবই সমাদৃত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন গণতন্ত্রের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সমাদৃত হতে বাধ্য। আসলে গণতন্ত্রের আঁচলে গিট বাঁধার পর ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম গ্রহণ না করে কোন উপায় নেই। বিষয়গুলো সেভাবেই সাজানো।

পাকিস্তানের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। কোন অংশেই পিছিয়ে নয়।

পাকিস্তানের ধর্মনিরপেক্ষতা

পাকিস্তান যে সাংবিধানিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মকে গ্রহণ করেছে তা আমরা ইনশা-আল্লাহ সংবিধানের কিছু উদ্ধৃতি থেকেই দেখব। পাকিস্তানের বাস্তব জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের যে চর্চা হয় তার চিত্রের কোন অভাব নেই। কিন্তু এরপরও মানুষ সংবিধানকেই বেশি বিশ্বাস করে। তাই সেখান থেকেই কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরছি।

ক. পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতার সফল চর্চার কারণে সেখানকার মুসলমানদের জন্য যারা আইন প্রণয়ন করবে ও প্রয়োগ করবে তারা মুসলমান হওয়া জরুরী নয়।

খ. ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চার কারণে অমুসলিমরা পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর যে কোন পর্যায়ে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং কর্তৃত্ব করতে পারে।

গ. সংবিধানে বলা হয়েছে-

قومی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لئے مخصوص نشستوں کے بشمول ارکان کی تین سو بیالس نشستیں ہوگی۔ مجلس شوری ۲۶/۱

شق (۳) میں محولہ نشستوں کی تعداد کے علاوہ قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کے لئے دس نشستیں مختص کی جائینگی۔ مجلس شوری ۲۷/۱

غیر مسلموں کے لئے مخصوص تمام نشستوں کے لئے حلقۂ انتخاب پورا ملک ہوگا۔ مجلس شوری ۲۸/۱

"জাতীয় সংসদে মহিলা ও অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ মোট তিন শত বেয়াল্লিশ আসন হবে। -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, মজলিসে শূরা পৃ: ২৭

অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত আসন ছাড়াও জাতীয় সংসদে অমুসলিমদের জন্য দশটি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে।

অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত সবগুলো আসনের জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্র পুরো দেশ হবে।" -ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান, মজলিসে শূরা পৃ: ২৭

ঘ. আইন প্রণয়ন বিভাগের সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে, যেসব কারণে কোন ব্যক্তি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে-

(د) وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور ہو۔

(ہ) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو۔۔۔

....

....

پیراجات (د) اور (ہ) میں صراحت کردہ نا اہلیوں کا کسی ایسے شخص پر اطلاق نہیں ہوگا جو غیر مسلم ہو، لیکن ایسا شخص اچھی شہرت کا حامل ہو گا۔ مجلس شوری ۳۵/۳۶ا

"(১) সে ভালো অবদান না রেখে থাকে এবং সাধারণভাবে ইসলামী বিধিবিধান থেকে বিমুখ হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়।

(৩) সে ইসলামের শিক্ষা দীক্ষায় যথাযথ ইলমের অধিকারী নয় এবং ইসলামের নির্ধারিত ফরযসমূহের পাবন্দ নয় এবং কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে না।

....

....

পেরাগ্রাফ (১) ও (৩) এর মাঝে উল্লিখিত অযোগ্যতাগুলো এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যারা অমুসলিম হবে। তবে এমন ব্যক্তিরা যেন ভালো প্রসিদ্ধির অধিকারী হয়।" -মজলিসে শূরা পৃঃ ৩৫-৩৬

অর্থাৎ পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য যারা আইন প্রণয়ন করবে তারা মুত্তাকী পরহেযগার হতে হবে। তবে মুত্তাকী পরহেযগার হওয়ার এসব কঠিন শর্ত থাকার প্রয়োজন হবে না যদি আইন প্রণয়নকারী কাফের হয়। নাস্তিক হয় বা মুরতাদ হয়। সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য আইন প্রণয়নকারী হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য সে অমুসলিম হওয়াই যথেষ্ট।

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নিয়ম এরকমই। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের জন্য সবচাইতে বড় সমস্যার বিষয় হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমান। ইসলামের বজ্রকঠিন মূলনীতিগুলো।

৬. মুসলিম অমুসলিম সবার সমান মাত্রার অধিকার সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে-

جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، پوری طرح عمل کیا جائے گا:

جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات ومقتضیات کے مطابق جس طرح

قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، ترتیب دے سکے۔ اسلامی جمہوریت پاکستان کی دستور، تمہید ص: ۱

جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکے اور ان پر عمل کر سکے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکے۔

"যার মধ্যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সততা ও ইনসাফপূর্ণ জীবনযাপনের মূলনীতির উপর পুরোপুরি আমল করা হবে যেভাবে ইসলাম সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছে।

যার মধ্যে মুসলমানদেরকে ব্যক্তি ও সামাজিক অঙ্গনে এমন উপযুক্ত করে তোলা হবে যে, তারা তাদের নিজেদের জীবনকে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের দাবি মোতাবেক সাজাতে পারে যেভাবে কুরআন পাক ও সুন্নাহতে বাতলানো হয়েছে।

যার মধ্যে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেন স্বাধীনতার সাথে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে লালন করতে পারে, তার উপর আমল করতে পারে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সভ্যতাকে উন্নত করতে পারে।" -ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ভূমিকা পৃঃ ১ পাকিস্তান এমন একটি দেশ যেখানে ইসলামী শিক্ষার উন্নতির জন্যও সরকারীভাবে ব্যবস্থা করা হবে, আবার অমুসলিমদের আকিদা বিশ্বাস চর্চার জন্যও সরকারীভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর যে দেশে সব ধর্মের জন্য এভাবে ব্যবস্থা থাকে সে দেশকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। বৃটিশ ভারতে এটা ছিল। বর্তমান ভারতে এটা আছে। বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এটা আছে। বর্তমান আমেরিকা লন্ডনেও তা আছে। এবং পাকিস্তানে যেভাবে আছে সেভাবেই আছে। পাকিস্তানে মুসলমান বেশি তাই মাদরাসার সংখ্যা বেশি। এছাড়া আর কোন ব্যবধান নেই।

সাবধান!

খবরদার! অমুসলিমদেরকে প্রদত্ত এসব অধিকারকে ইসলামের যিম্মী অধিকারের সঙ্গে প্যাঁচ লাগাবেন না। পাকিস্তানের অমুসলিমরা যিম্মী

নয়। তারা মুসলমানদের জন্য আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের অধিকার নিয়ে বসবাস করে। তাদের অধিকারে ও মুসলমানদের অধিকারে কোন মাত্রায় কোন রকমের কোন ব্যবধান নেই। এ বিষয়ক উদ্ধৃতি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, সামনে আরো করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইসলামী আইনে যিম্মীদেরকে ধর্ম বিশ্বাস লালন করা এবং আমল করা পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে থাকে। পাকিস্তান-সংবিধান অমুসলমিদেরকে এতটুকু অধিকার দিয়ে থামেনি। পাকিস্তান তাদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও তাদের সভ্যতাকে উন্নত করার জন্য ব্যবস্থা করার কার্যকরী দায়িত্বও মাথায় নিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতিতে এ দায়িত্ব নিতে হয়। ইসলামের নীতিতে তাদের আকীদা বিশ্বাসের উন্নতির পথগুলো বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হয়। মুলতাকাল আবহুর দেখুন-

﴿وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا. وتعاد المنهدمة من غير نقل﴾ {ملتقى الابحر: ٤٧٦/١}

"দারুল ইসলামে তাদের নতুন কোন গির্জা, মঠ, সন্ন্যাসী আশ্রম তৈরি করা বৈধ হবে না। ধ্বংস হয়ে যাওয়াটিকে স্থানান্তর ব্যতীত পুনর্নির্মাণ করতে পারবে।" -মুলতাকাল আবহুর : ১/৪৭৬

একজন যিম্মী যেন দারুল ইসলামে থেকে ধীরে ধীরে নিজের ধর্মের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ইসলাম ধর্মের আযমত ও বড়ত্বের সামনে ঝুঁকে পড়ে এবং এক সময় তা গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে সে জন্য শরীয়তের আইনে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে-

﴿ويميز الذِّمِّيّ فِي زيه ومركبه وسرجه، وَلَا يركب خيلاً وَلَا يعْمل بسلاح، وَيظْهر الكُستيج ويركب سرجاً كالإكاف، والأحق أَن لَا يتْرك أَن يركب إلاّ لضَرُورَة، وحينئذٍ ينزل فِي المجامع، وَلَا يلبس مَا يخص أهل الْعلم والزهد والشرف، وتميز أنثاه فِي الطَّرِيق وَالْحمام، وَتجْعَل على دَاره عَلامَة كَيْلا يسْتَغْفر لَهُ وَلَا يبدؤ بِسَلام، ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق،

وَيُؤَدِّي الْجِزْيَة قَائِما والآخذ قَاعِدا، وَيُؤْخَذ بتلبيبه ويهز وَيُقَال لَهُ أَدِّ الْجِزْيَة يَا ذمِّي أَو يَا عَدو الله﴾ {ملتقى الابحر : ٤٧٦/١}

পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহন, জিনপোষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদেরকে আলাদা করা হবে। তারা ঘোড়ায় আরোহন করবে না। অস্ত্র ব্যবহার করবে না। 'কুসতীজ' (পশমের তৈরি আঙ্গুল পরিমাণ মোটা সুতা যা যিম্মীরা কাপড়ের উপর ব্যবহার করে) প্রদর্শন করবে এবং গাধার জিনপোষের ন্যায় (নিম্নমানের) জিনপোষ ব্যবহার করবে। বরং সবচাইতে ভালো হচ্ছে তাদেরকে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাহনে চড়তেই দেয়া হবে না। সে ক্ষেত্রেও কোন জমায়েত হলে সেখানে তারা নেমে যাবে।

আহলে ইলম, মুত্তাকী, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ পোষাক পরিধান করবে না।

তাদের মহিলাদের পথ ও গোসলখান আলাদা রকমের হবে।

তার ঘরে যিম্মী হওয়ার কোন নিশানা রাখা হবে, যাতে তার জন্য ইসতেগফারের দোয়া না করা হয়, তাকে আগে সালাম না দেয়া হয়।

তার রাস্তা সংকীর্ণ করে দেয়া হবে।

সে দাঁড়িয়ে কর আদায় করবে, আর কর গ্রহণকারী বসা থাকবে। কর গ্রহণকারী যিম্মী ব্যক্তির জামার বুক চেপে ধরবে, তাকে ঝাঁকুনি দেবে এবং বলবে, এই যিম্মী কর আদায় কর! অথবা বলবে, এই আল্লাহর দুশমন কর আদায় কর!" -মুলতাকাল আবহুর : ১/৪৭৬

পাকিস্তান-সংবিধান অমুসলিমের সঙ্গে যে সাম্যের কথা বলছে তার কোন ধারণা ইসলামে নেই। পাকিস্তান-সংবিধান যে নীতি গ্রহণ করেছে তা শতভাগ ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতি। পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকে আজো পর্যন্ত সে নীতিতেই চলছে।

সূচনালগ্নে হয়নি

পাকিস্তানের সূচনালগ্নে ও তার জন্মলগ্নে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে মেনে নিয়ে তাঁর বিধানের অধীনে দেশ পরিচালিত হয়নি। এক দিনের জন্যও হয়নি। ১৯৪৭ এর সংবিধান থেকে শুরু করে ২০১৫ পর্যন্ত সকল সংবিধানে হবে হবে বলা হয়েছে। সংবিধানের এ বিষয়ক অনুচ্ছেদ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর 'হবে' শব্দটিই প্রমাণ করে যে, এখনো পর্যন্ত হয়নি। এরই বিপরীত তাগুতের আইন, মানবরচিত আইন এবং বৃটিশ আইনের উপর দেশটি তার জন্মলগ্ন থেকে আজো পর্যন্ত শতভাগ চলে আসছে।

আল্লাহর আইনের অধীনে পাকিস্তান পরিচালিত হয়নি বলেই পাকিস্তানের আকাবির ওলামায়ে কেরাম যাঁরা পাকিস্তান নামে একটি ইসলামী ভূখণ্ড তথা একটি দারুল ইসলাম স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা আজীবন রাষ্ট্রের মালিক পক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে গেছেন। রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁদের হাতে দেশের প্রথম পতাকা উড়িয়েছে, তাঁদেরকে আশ্বাস দিয়েছে, ধমক দিয়েছে, প্রশংসা করেছে, জানাযার নামাযে লক্ষ লক্ষ মানুষ এনে হাজির করেছে, জানাযা সামনে রেখে চোখের পানি ফেলেছে, এমন মানুষ আর মিলবে না বলেছে -কিন্তু তারা এক দিনের জন্যও আল্লাহর বিধানের অধীনে দেশ পরিচালনা করেনি।

আমরা বুঝতে পারিনি এবং পারছি না, যে ঘরে বরের কথায় ও আচরণে মুগাল্লাযা তালাক হয়ে গেছে সে ঘরে শুধু ঝগড়া করে করেও সংসার করার বৈধতা কীভাবে প্রমাণিত হয়েছে? এ সংসার কেন তখনই ভেঙ্গে যায়নি? কেন ভেঙ্গে দেয়া হয়নি? কেন বিচ্ছেদ ঘটানো হয়নি? সময়মত সে বিচ্ছেদ না ঘটার কারণে সন্তানরা এ সংসারকে অবৈধ সংসার বলে ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারছে না। উপরন্তু তার ফযীলত রচনা করে চলেছে হাজার লক্ষ পৃষ্ঠায়।

যাই হোক, একটি পর্বের বিশেষ কোন দুর্বলতা পরবর্তী পর্বের জন্য দলিল হতে পারে না, শিক্ষা হতে পারে। ইবরত হতে পারে।

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা: শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. এর কান্না

اور آزادئ ملک کے بعد پاکستان کی اسلامی تعمیر اور اسلامی دستور کی تدوین اور نفاذ کے لئے بھی بڑی جد جہد اور کوشش کی، گویا حضرت شیخ الاسلام بانئ پاکستان کا دایاں ہاتھ تھے اور بانئ پاکستان مسٹر محمد علی جناح صاحب کو بھی آپ پر بہت اعتماد تھا- اس لئے پاکستان کا قومی پرچم بھی آپ کے مبارک ہاتھ سے لہرا کر پاکستان کی

داغ بیل ڈالی گئی، پھر پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد آپ نے بڑی کوشش اور سعی بلیغ جار رکھی کہ ملک کا نظام جلد از جلد خلافت راشدہ کے اسلامی آین کے تحت عمل میں لایا جائے۔

قیام پاکستان اور نفاذ دستور اسلامی کے لئے آپ کی غیر معمولی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ اس لا زوال محنت کی وجہ سے بانیٔ پاکستان نے موت سے قبل وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی ہی پڑھائیں۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ نے جنازہ کی امامت کے فرائض انجام دئے تو پاکستان کے مرزائی وزیر خارجہ آنجھانی سر ظفر اللہ نے قائد اعظم کے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد تعزیتی جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ عثمانی نے قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھ قائد اعظم کا پختہ عہد تھا کہ پاکستان میں ہر حال میں اسلامی نظام کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ آپ زندگی بھر قائد اعظم کے اس مجادہ کی یاددہانی کراتے رہے۔ اب بھی موجودہ حکومت کا فرض ہے کہ قائد اعظم کے اس عظیم معاہدہ کی لاج رکھتے ہوئے ملک میں خلافت راشدہ کے اسلامی نظام کے احیاء کا اعلان کر دیا جائے تو بانیٔ پاکستان کو حقیقی روحانی مسرت حاصل ہوگی۔ تذکرہ وسوانح علامہ شبیر احمد عثمانی، اشاعت خاص ماہنامہ القاسم، رمضان-شوال-ذیقعدہ ۱۴۲۶ھ، ص: ۳۳۵

"আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের ইসলামী নির্মাণ এবং ইসলামী সংবিধান সংকলন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্যও তিনি বড় ধরনের চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেনে। বলা যায় হযরত শায়খুল ইসলাম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার ডান হাত ছিলেন এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ সাহেবও তাঁর উপর খুব ভরসা রাখতেন[ক]। যার দরুণ পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাও তাঁর মুবারক হাতে উড়িয়ে পাকিস্তান দেশটির সূচনা করেছেন। এরপর পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করার পর তিনি অনেক চেষ্টা মেহনত করতে থেকেছেন যেন দেশের আইন কানূনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলাফতে রাশেদার ইসলামী আইনের অধীনে নিয়ে আসা হয়[খ]।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী সংবিধানের জন্য তাঁর অসাধারণ চেষ্টা মেহনতগুলোকে ভুলা যায় না। এ অমর মেহনতের কারণে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে গেছেন যে, আমার জানাযার নামায শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীই পড়াবেন। হযরত শায়খুল ইসলাম আলাইহির রাহমাহ জানাযার ইমামতির দায়িত্ব আদায় করেছেন। আর সে কারণে পাকিস্তানের কাদিয়ানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত স্যার যাফরুল্লাহ কায়েদে আযমের জানাযার নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছে [গ]।

এরপর শোক সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে হযরত আল্লামা ওসমানী রহ. কায়েদে আযমের প্রশংসা[ঘ] করতে গিয়ে বলেন, আমার সঙ্গে কায়েদে আযমের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে কোন কিছুর বিনিময়ে পাকিস্তানে ইসলামী আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা হবে[ঙ]। তিনি সারা জীবন কায়েদে আযমের এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাতে থেকেছেন[চ]। এখনো বর্তমান সরকারের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে, কায়েদে আযমের এ মহান অঙ্গীকারের মান রক্ষা করার জন্য দেশের মধ্যে খেলাফতে রাশেদার ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে দেয়া[ছ]। যাতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার রূহ বাস্তবিকভাবেই আনন্দ লাভ করে[জ]।" - তাযকেরা ওয়াসাওয়ানেহ আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী, মাসিক আলকাসিম বিশেষ সংখ্যা, রমযান-শাওয়াল-যুলকাদাহ ১৪২৬

ইতিহাসে যা পেলাম

ক. কায়েদে আযম; যে ইসমাঈলী শিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ওলামায়ে দেওবন্দ তাদেরকে কাফের মনে করে এবং যে গণতন্ত্রের কুফরী মতবাদের একজন সফল ক্রীড়নক। শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. তার ডান হাত ছিলেন -এমন কথা বলে প্রজন্ম গর্ব করছে।

মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৮৭৬- ১৯৪৮ কে?

মতাদর্শ: প্রথমে ইসমাঈলী পরে শিয়া ইসনা আশারিয়া।

মেম্বার: ইনার টেম্পল সোসাইটি ১৯৩১ খ্রি: (ভূতপূর্ব নাইট টেম্পলার্স)

মেম্বার: ফেবিয়ান সোসাইটি (যা বড় বড় ফ্রি ম্যাসনারি ও থিওসোফিক্যাল সোসাইটি একটি গ্রুপ)

রাজনৈতিক মাতা পিতা: ৩৩ ডিগ্রি ফ্রি ম্যাসনারি, অগ্নীপূজারী 'স্যার দাদা বাই নারুজী'কে নিজের পিতা বলে ডাকতো। থিওসোফিক্যাল সোসাইটি প্রধান শয়তানের পূজারী 'এনি বিসেন্ট'কে নিজের মা বলে ডাকতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খেলাফতে উসমানির বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করে। নিজের আধ্যাতিক মা এনি বিসেন্টের কথায় তাহরীকে খেলাফতের চরম বিরোধিতা করে এবং এটাকে নির্বুদ্ধিতামূলক আক্রমণ আখ্যা দেয়া ইন্ডিয়ান আর্মির জন্য দেরাদুন মিলিটারী একাডেমির প্রতিষ্ঠায় মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুনরায় বৃটেন সরকারকে সামরিক সহায়তার জন্য হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে জোর দিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিন্দুস্তানী সৈন্যদের বৃটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলাকালে মুসলিম সেনাদের বৃটেনের অনুগত থাকতে জোর দেয়।

প্রসিদ্ধ পুরস্কার প্রাপ্ত ইতিহাসবিদ স্টেনলি ওলপার্ট, উইলিয়াম ডালরিম্পল ও পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সমালোচক তারেক ফাতাহ এর অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী জিন্নাহ শূকরের গোস্ত খেত এবং মদ পান করতো। ফাতেমা জিন্নাহের বক্তব্য অনুযায়ী জিন্নাহ প্রতিদিন ক্রেভেন (craven a) ব্রান্ড এর ৫০ টি সিগারেট খেত। বিভিন্ন প্রকার ইংরেজী কুকুর প্রতিপালন করা জিন্নাহের শখ ছিল। বাম হাতে খানা খাওয়াকে সে

কোন দোষের কিছু মনে করতো না। সবসময় ইংরেজী পোষাক পরিধান করতো। মৃত্যুর সময় সর্বশেষ আকাংখাও ছিল যেন ইংরেজ পোষাকে তার মৃত্যু হয়।" -আযাদীর ধোঁকা, আদনান রশীদ পৃ: ১২

খ. পাকিস্তানকে ইসলামী আইনের অধীনে আনার চেষ্টা করতে থেকেছেন। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের জন্ম তা হয়নি। চেষ্টা করেছেন অর্থ হচ্ছে, শাব্বির আহমদ ওসমানী রহ. রাষ্ট্রের মালিক পক্ষের কাছে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য দাবি জানাতে থেকেছেন, আর মালিক পক্ষ তা অস্বীকার করতে থেকেছে।

গ. পাকিস্তান দেশটির সূচনা লগ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছে একজন কাদিয়ানী মুরতাদ। নিয়োগ দিয়েছে সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান।

ঘ. কায়েদে আযম যে ওয়াদার ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রধান ব্যক্তি হয়েছে তা পূরণ না করে প্রশংসা পাওয়ার কারণ কী ছিল? উম্মত এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেনি। কায়েদে আযম তার মৃত্যু পর্যন্ত মানব রচিত কুফরী আইনে দেশ পরিচালনা করেছে। বৃটিশদের তৈরি কুফরী আইন দেশে প্রতিষ্ঠিত করে মারা গেছে। একটি দারুল ইসলামের স্বপ্নদ্রষ্টা কোটি কোটি মুসলমানের সঙ্গে গাদ্দারী করে, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে কেন প্রসংশার অধিকারী হয়েছিল প্রজন্ম তা নিয়ে ভাবার সময় পায়নি।

ঙ. অর্থাৎ কায়েদে আযম তার জীবদ্দশায় আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করেনি তখন পাকিস্তানের বয়স ০০০০০। মানব রচিত আইন তৈরিও হয়েছে, প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। কায়েদে আযম দেশের প্রধান ব্যক্তি। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য তার কাছ থেকে অন্যরা কেন ওয়াদা নিতে হবে। এটা মানুষের সঙ্গে ওয়াদা করে করার বিষয়? না কি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ফরয বিধান?

চ. অর্থাৎ আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. এর জীবদ্দশায়ও পাকিস্তানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা হয়নি, তখন পাকিস্তানের বয়স ০০০০০।

ছ. এ নিবন্ধের লেখক তার এ লেখার সময়কাল পর্যন্তও দাবি জানিয়ে চলেছেন, পাকিস্তানে যেন আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ

এখনো পাকিস্তানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখন পাকিস্তানের বয়স প্রায় সাতান্ন/আটান্ন।

এ লেখকের দাবির মধ্যে অতিরিক্ত একটি মাত্রাও আছে। আল্লাহর ফরয বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে, এতে কায়েদে আযম সাহেবের অঙ্গীকার রক্ষা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে অঙ্গীকার রক্ষা করার প্রতি খোদ কায়েদে আযম সাহেবের কোন আগ্রহ ছিল না সে অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য বর্তমান সরকারগুলোর উপর কেন এত চাপ দেয়া হচ্ছে?

কায়েদে আযমের ডান হাতের চাপ যখন কায়েদে আযমকে তার কুফরী মতবাদ থেকে সরাতে পারেনি তখন আপনারা বর্তমান সরকারগুলোর কত নম্বর হাত? যে আপনাদের চাপে তারা কায়েদে আযমের অঙ্গীকার রক্ষা করবে। তাদের এমন কি গরয পড়েছে?

জ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতার রূহকে আনন্দ দেয়া কি এতই জরুরী?

যাই হোক, ইতিহাসের এ পাতাগুলোকে শায়খে মুহতারাম স্বীকার করেন কি করেন না? স্বীকার না করলে আমাদের দায়িত্ব হবে এ বিষয়ক নথিপত্রগুলো সামনে নিয়ে আসা। আর যদি স্বীকার করেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এ সত্যগুলোর উপস্থিতিতে ঐ দাবিগুলো কীভাবে করা যায় যে দাবিগুলো তিনি তাঁর এ বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। সম্মানিত পাঠক একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে বিচার করুন। ছোটরা শুধু ছোট হওয়ার অপরাধে আপনারা সত্যগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পথ থেকে বেরিয়ে আসুন।

ইতিহাসের আরো কিছু পাতা

পাকিস্তানের মালিক পক্ষের প্রথম সারি

পাকিস্তানের প্রথম রাজা: রাজা আলবার্ট প্রেডেরিক আর্থার জর্জ (জর্জ ষষ্ঠ), ধর্ম: খ্রিস্টান। দ্বীনে মসীহের রক্ষক ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান গভর্ণর, ৩৩ ডিগ্রি ফ্রি ম্যাসন। রাজত্বকাল: ১৯৪৭খ্রি:-১৯৫২ খ্রি: পর্যন্ত।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর: মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ। শাসনকাল: ১৯৪৭-১৯৪৮খ্রি:। ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। মেম্বার: ইনার টেম্পল ১৯৩১খ্রি: (নাইট টেম্পলস)

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্ণর জেনারেল: স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন। ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। রাজত্বকাল: ১৯৪৮খ্রি:-১৯৫১ খ্রি:

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী: লিয়াকত আলি খান। ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। মেম্বর: ইনার টেম্পল (নাইট টেম্পলস)। রাজত্বকাল: ১৯৪৭ খ্রি:-১৯৫১ খ্রি:

সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁন সম্পর্কে (শিয়াদের আল্লামা) জমীর আখতার নাকবী এর বক্তব্য:

"যেমন পাকিস্তানের সম্পর্কিত প্রথম বই, উর্দূ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'শা'রায়ে পাকিস্তান' এতে ড. হাদী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মাতার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, লিয়াকত আলি খানের বাল্যকাল সম্পর্কে উল্লেখ করুন। তখন লিয়াকত আলি খানের মা বললেন: মুজাফ্ফরনগরের যেখানে আমরা বসবাস করতাম সেখানে মুহাররাম মাসে অনেক জসন বের হত, তখন আমার ছেলে লিয়াকত প্রত্যেক জসনের সাথে ঘর থেকে বের হয়ে যেত। মুহাররাম তো শেষ হয়ে যেত কিন্তু সে লাকড়ি তুলে নিয়ে আমার উড়না টুকরা করে পতাকা বানিয়ে সারাদিন বাচ্চাদের নিয়ে ইয়া হোসাইন, ইয়া হোসাইন করতে থাকতো।"

পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী: স্যার খাজা নাযিম উদ্দিন। মাযহাব: শিয়া ইসনা আশারিয়া। খ্রিস্টিয় বৃটিশ প্রশাসনের নাইট কমান্ডার। রাজত্বকাল ১৯৫১খ্রি:- ১৯৫৩খ্রি:

পাকিস্তানের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী: স্যার ফিরোজ খান নূন। খ্রিস্টিয় বৃটিশ প্রশাসনের নাইট কমান্ডার। রাজত্বকাল: ১৯৫৭খ্রি:- ১৯৫৮খ্রি:

শাহ জর্জ ষষ্ঠ এর পর পাকিস্তানের প্রথম রাণী: এলিজাবেথ দ্বিতীয়। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিস্টিয় ধর্মের রক্ষক ইংলান্ডের গির্জার প্রধান গভর্ণর। রাজত্বকাল: ১৯৫২ খ্রি:- ১৯৫৬খ্রি:।

পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী: স্যার জাফরুল্লাহ খান। ধর্ম: কাদিয়ানী। খ্রিস্টিয় রাষ্ট্র বৃটেনের নাইট কমান্ডার। রাজত্বকাল: ১৯৪৭ খ্রি:- ১৯৫৪খ্রি:

পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী: যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। ধর্ম: হিন্দু। শ্যাসনকাল: ১৯৪৭খ্রি:-১৯৫১খ্রি:

পাকিস্তানের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী: স্যার সেকান্দার মির্জা। ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। খ্রিষ্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। মহাগাদ্দার মীর জাফরের নাতি। শাসন কাল: ১৯৪৭খ্রি:-১৯৫৪খ্রি:

পাকিস্তানের প্রথম অর্থমন্ত্রী: স্যার ভিকটর টার্নার। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিষ্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। মন্ত্রীত্ব কাল: ১৯৪৭ খ্রি:- ১৯৫১ খ্রি:

পাকিস্তানের প্রথম আইন সচিব: এ আর কারনিলেস। ধর্ম: খ্রিস্টান।

পাকিস্তানের প্রথম চীফ জাষ্টিজ: স্যার আব্দুর রশীদ। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাঞ্জাব প্রদেশের প্রথম গভর্ণর: স্যার রাবর্ট ফ্রান্সিস মডি। ধর্ম: খ্রিষ্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। শাসন কাল: ১৯৪৭খ্রি: - ১৯৪৯খ্রি:

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাইবার পাখতুনখাহ প্রদেশের প্রথম গভর্ণর: স্যার জর্জ কারেঙ্গম। ধর্ম: খ্রিষ্টান। খ্রিষ্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। শাসন কাল: ১৯৪৭খ্রি:- ১৯৪৮খ্রি:

পাকিস্তান পতিষ্ঠার পর খাইবার পাখতুনখাহ প্রদেশের দ্বিতীয় গভর্ণর: স্যার এম্ব্রোস ডান্ডাস। ধর্ম: খ্রিষ্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সম্রেজ্যের নাইট কমান্ডার। শাসন কাল: ১৯৪৮খ্রি:- ১৯৪৯খ্রি:

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলা প্রদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর প্রথম গভর্ণর: স্যার ফ্রেডরিক। ধর্ম: খ্রিষ্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। রাজত্ব কাল ১৯৪৭খ্রি:- ১৯৫০খ্রি:

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলা প্রদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর দ্বিতীয় গভর্ণর: স্যার ফিরোয খান নূন। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। রাজত্ব কাল ১৯৫০খ্রি:- ১৯৫৩খ্রি:

ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যৌথ সুপ্রিম কমান্ডার: ফিল্ডমার্শাল স্যার ক্লড অকিরলেক। ধর্ম: খ্রিষ্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছে। চাকরীকাল: আগষ্ট ১৯৪৭খ্রি:- নভেম্বর ১৯৪৮ খ্রি:

পাকিস্তানের প্রথম সেনাপ্রধান: জেনারেল স্যার ফ্রাঙ্ক মিসার্ভি। ধর্ম: খ্রিষ্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। চাকরীকাল: ১৯৪৭খ্রি: থেকে ১৯৪৮খ্রি:

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সেনা প্রধান: স্যার ডাগলাস গ্রেসি। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। চাকরীকাল: ১৯৪৮খ্রি:- ১৯৫১খ্রি:

পাকিস্তানের তৃতীয় সেনাপ্রধান: ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ আইউব খান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। চাকরীকাল: ১৯৫১খ্রি:- ১৯৫৮খ্রি:

পাকিস্তানের চতুর্থ সেনা প্রধান: জেনারেল মুহাম্মাদ মুসা। ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। চাকরীকাল: ১৯৫৮খ্রি:- ১৯৬৬খ্রি:

পাকিস্তানের পঞ্চম সেনাপ্রধান: জেনারেল ইয়াহইয়া। ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া।

পাকিস্তান প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান: এয়ার ভাইস মার্শাল এলান পেরি কেইন। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। চাকরীকাল: ১৯৪৭খ্রি:- ১৯৪৯খ্রি:

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় চীফ: এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার রিচার্ড আচার্লি। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। চাকরীকাল: ১৯৪৯খ্রি:- ১৯৫১খ্রি:

পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর তৃতীয় এয়ার চীফ: এয়ার ভাইস মার্শাল লেসলি উইলিয়াম ক্যানন। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। চাকরীকাল: ১৯৫১খ্রি:- ১৯৫৫খ্রি:

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর চতুর্থ এয়ার চীফ: এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার আর্থার ম্যাকডোনাল্ড। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। চাকরীকাল: ১৯৫৫খ্রি:- ১৯৫৭খ্রি:

পাকিস্তান নৌ বাহিনীর প্রথম কমান্ডার ইন চীফ: জেমস উইলফ্রেড জেফর্ড। ধর্ম: খ্রিস্টান। চাকরীকাল: ১৯৪৭খ্রি:- ১৯৫৩খ্রি:। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা সমূহ (আই এস আই এবং এম আই) এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ডিজি: মেজর জেনারেল স্যার রবার্ট কথোম। ধর্ম: খ্রিস্টান। চাকরীকাল: ১৯৫০খ্রি:- ১৯৫৯খ্রি:

পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমি কাকোর এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা: ব্রিগেডিয়ার ফ্রান্সিস এংগল। ধর্ম: খ্রিস্টান। খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। চাকরীকাল: ১৯৪৭খ্রি:- ১৯৫১খ্রি:

পাকিস্তানের কমান্ডো বাহিনী এস,এস, জি এর প্রতিষ্ঠাতা: কর্নেল গ্রান্ট টেইলর ও মেজর কেথ ওকিলি (১৯৫০)

এস এস জি এর প্রথম কমান্ডার: কর্নেল কাহুন (১৯৫১খ্রি:)

পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা: জাগন্নাথ আযাদ। ধর্ম: হিন্দু।

-আযাদীর ধোঁকা, আদনান রশীদ পৃ: ২২-৩০

এ হচ্ছে পাকিস্তানের মালিক পক্ষের প্রথম সারি। শুধু ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি দেশকে প্রতিষ্ঠাতাগণ যাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। বিষয়গুলোকে কীভাবে ব্যাখ্যা করলে সবচাইতে নিরাপদ হবে, সেভাবেই ব্যাখ্যা করার জন্য আহলে ইলমের দরবারে আবেদন রেখে যাচ্ছি।

না হওয়া বার বার প্রমাণিত হয়েছে

এ ছিল ইতিহাস। সূচনালগ্নে যা হয়েছে, বার বার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থেকেছে। ধোঁকাবাজরা ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে শতভাগ সফল হয়েছে। আর ধোঁকাখোররা যথেষ্ট পরিমাণ ধোঁকা খেয়ে খেয়ে তৃপ্তি বোধ করেছে। পাকিস্তানের সত্তর বাহাত্তর বছরের কোন অংশেই আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার মত সুযোগ হয়নি। দেশটি শতভাগ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক অঙ্গনে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বিষয়টি একটি ধরা ছোঁয়ার মত সত্য বিষয়। এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার মত চোখ রয়েছে কোটি কোটি। কান রয়েছে কোটি কোটি। এরপরও উদ্ধৃতির এ যামানায় উদ্ধৃতি ছাড়া চলে না। তাই দু'চারটি উদাহরণ দিয়েই বিষয়টিকে সামনে আনতে চাই।

ক. মাওলানা মুফতী মাহমূদ রহ. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এক প্রসঙ্গে বলেছেন-

"হুকুমতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাইশ বছরের বেশি অতিক্রম হওয়ার পরও শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করেনি। আর আদালতগুলো বরাবর মানবরচিত আইন দিয়েই বিচার করে আসছে যে আইন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদীরা তৈরি করেছে।" -তাহকীকু যাদিল মুনতাহি শরহুল জামিয়িত তিরমিযী, মুকাদ্দিমায়ে শায়খ শাব্বীর আলি শাহ পৃ: ১৬, বরাতে, আসসুবহু ওয়ালকিনদীল

খ. শায়খে মুহতারামের 'সুদের ঐতিহাসিক রায়'টিকেও এর উদাহর হিসাবে উল্লেখ করা যায়। পাঠক ঐতিহাসিক রায় দেখবেন سود پر تاریخی فیصلہ বইটি পড়ে। রায়টি ঐতিহাসিক হয়েও যে বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি তা দেখবেন বইয়ের উপর লিখিত শায়খ রফী ওসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ভূমিকা থেকে। আর কেন হয়নি সে কথাটা আমাদের কাছ থেকে শুনে নিতে পারেন। আমাদের বাতলানো কারণ বিশ্বাস না হলে আপনি অন্য কারণ দর্শাতে পারেন।

সুদের ঐতিহাসিক রায়

ব্যাংকসুদ একটি অনৈসলামিক বিষয় যা বৈধ নয়। শায়খে মুহতারাম দা. বা. পাকিস্তান শরীয়া বেঞ্চের জজ থাকা অবস্থায় দীর্ঘ তাহকীকের পর এ রায় দিয়েছিলেন। যে রায় সারা দেশের সুদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল একটি খড়্গের আঘাতের মত। সে কারণে রায়টি ছিল ঐতিহাসিক। এ বিষয়ক বইটি পড়ে সে ঐতিহাসিক রায় সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেবেন। আপনার কাছে রায়টিকে ঐতিহাসিক মনে হবে।

রায়টি ঐতিহাসিক হওয়ার বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত থাকার সুযোগ নেই। বইটির ভূমিকায় শায়খ রফী ওসমানী দামাত বারাকাতুহুম পাকিস্তানের সংবিধানের কিছু ভালো কথা তুলে ধরেছেন। রায়টি যে

ঐতিহাসিক তাও বলেছেন এবং এরপর এ কথা স্বীকার করেছেন যে, ঐতিহাসিক রায়টি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। পাঠক প্রথমে শায়খ রফী ওসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ভূমিকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। এরপর তা কেন হয়নি সে কথাটি আমাদের কাছ থেকে শুনে নেবেন।

সবার আগে শায়খের ভূমিকা-

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین، والصلوۃ والسلام علی رسولہ الکریم،

وعلی آلہ وصحبہ أجمعین، أما بعد

اسلامی جمہوریت پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی خصوصیت میں ایک یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ ائینی حق حاصل ہے کہ وہ موجودہ کسی قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں اس وجہ سے چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ قانون قرآن وسنت پر مبنی اسلامی احکامات کے خلاف ہے۔ اس قسم کے درخواست وصول کرنے کے بعد وفاقی شرعی عدالت، حکومت پاکستان کو ایک نوٹس جاری کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں اپنا نقطۂ نظر بیان کرے، اگر متعلقہ فریقین کی سماعت کے بعد عدالت اس نتیجے پر پھنچے کہ زیر دعوی قانون واقعتا اسلام کے خلاف ہے تو وہ ایک فیصلہ صادر کرتی ہے کہ ایک متعین مدت تک حکومت ایسا قانون لے کر آئے گی جو کہ اسلامی احکامات کے مطابق ہو گا، اور وہ قانون جسے اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا تھا اس مدت کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گا۔

وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلٹ بنچ میں چیلنج کیا جاسکتا ہے جس میں اس فیصلے سے متأثر کوئی بھی شخص یا فریق اپیل دائر کر سکتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کی اس بنچ کا فیصلہ حتمی تصوّر ہوتا ہے۔

وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلٹ بنچ سنہ ۱۹۷۹ء کے آئین پاکستان کے چیپڑ a-3 کے تحت وجود میں آئی تھیں، لیکن ابتداء میں کچھ قوانین کو ان کی جانچ پڑتال سے مستثنی قرار دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر غور وخوض ان عدالتوں کے دائرۂ اختیار سے باہر تھا۔

چنانچہ مالیاتی قوانین بھی دس سال تک کے لئے ان عدالتوں میں سماعت سے محفوظ تھے، اس مدّت کے ختم ہونے کے بعد بہت سی درخواستیں وفاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئیں تاکہ ان قوانین کو چیلنج کیا جاسکے جو سود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وفاقی عدالت نے ان درخواستوں کی سماعت کے بعد سنہ ۱۹۹۱ء میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ ایسے قوانین، اسلامی احکامات کے خلاف ہیں۔ وفاقی حکومت پاکستان اور ملک کے مختلف بینک اور تمویلی اداروں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بنچ میں دعویٰ دائر کر دیا، سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بنچ میں محترم جسٹس خلیل الرحمٰن خان صاحب، محترم جسٹس منیر اے شیخ صاحب، محترم جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب اور جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب شامل تھے۔ اس بنچ نے ان اپیلوں کی سماعت مارچ ۱۹۹۹ء میں شروع کی، اس بنچ نے بیس علمائے کرام اور ملکی وغیر ملکی محققین کو دعوت دی، کہ وہ اس اہم مسئلے پر عدالت کی معاونت کریں۔ یہ ماہرین جنہوں نے آکر عدالت سے خطاب کیا، ان مین علمائے کرام، بینکار، قانون دان، معیشت دان، تاجر حضرات اور چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس

مقدمے کی سماعت جولائی سنہ ۱۹۹۹ء کے آخر تک جاری رہی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔

۲۳ دسمبر سنہ ۱۹۹۹ء کو اس نئی صدی سے صرف آٹھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلٹ بنچ نے اپنا یہ تاریخ ساز عظیم فیصلہ سنایا جس میں سود کو غیر قانونی اور اسلامی احکامات کے منافی قراردیا اور اس کے تحت ۳۱ مارچ سنہ ۲۰۰۰ء، اور کچھ قوانین کو ۳۱ جولائی ۲۰۰۰ء، اور باقی دوسرے قوانین کو ۳۰ جون ۲۰۰۱ء سے منسوخ اور غیر مؤثر قرار دے دیا گیا، اس بنچ نے وفاقی حکومت کو یہ بھی ہدایت کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا جائے جو موجودہ سود پر مبنی مالیاتی نظام کو اسلامی نظام پر منتقلی کی نگرانی اور کنٹرول کرنے اور مکمل طور پر اپنے اختیارات سے متعلقہ اُمور سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس فیصلے نے کافی جامع ہدایات جاری کیں تا کہ اس متعین ٹائم فریم میں یہ عملِ انتقال مکمل ہو سکے۔

سپریم کورٹ کا مکمل فیصلہ تقریباً ۱۱۰۰ صفحات پر محیط ہے، اور یہ بات ایک حقیقتِ مُسلَّمہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اس ملک کی تاریخ میں ضخیم ترین فیصلہ ہے، یہ مرکزی فیصلے محترم جسٹس خلیل الرحمن خان صاحب (تقریبا ۵۰۰ صفحات) اور جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کے (تقریباً ۲۵۰ صفحات) ہیں، جبکہ محترم جسٹس وجیہ الدین احمد صاجب نے ۹۸ صفحات پر مشتمل ایک تائیدی نوٹ کے ساتھ لکھا ہے۔

سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو میڈیا(media) نے ایک تاریخ ساز فیصلہ قرار دیا اور اسے پورے ملک اور مسلم دُنیانے خوش آمدید کہا، مگر بعد میں ایک بینک کی درخواست پر سپریم کورٹ کی شریعت بنچ میں (جو جسٹس منیر احمد شیخ صاحب کے سوا باقی تمام نئے ججوں پر مشتمل تھی) فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے کیس دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس بھیج دیا، تاہم اس فیصلے میں جو علمی بحث ہے اس کی اہمیت اس واقعے سے کم نہیں ہوتی۔

ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم محترم جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ فیصلہ طبع کررہے ہیں، کیونکہ اس نے ان تمام اُمور کو جو مقدمے کی سماعت کے دوران اُٹھائے گئے تھے، بہترین طریقے سے مختصر کرکے بیان کردیا ہے۔ ہم نے قارئین کے استفادہ کے لئے اس فیصلے کے بعد کورٹ آرڈر کو بھی شامل کردیا ہے۔

یہ اگرچہ مکمل فیصلے کا ایک حصہ ہے، لیکن اُمید ہے کہ یہ قارئین کے لئے ان بنیادی عوامل اور وجوہات کو سمجھنے میں معاون ہوگا جو اس بنچ کے لئے اس تاریخ ساز فیصلے کا سبب بنیں۔

(مفتی) محمد رفیع عثمانی

جامعہ دارالعلوم کراچی

سود پر تاریخی فیصلہ، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، سابق جج شریعت اپیلٹ بنچ سپریم کورٹ آف پاکستان

ترجمہ:ڈاکٹر مولانا محمد عمران اشرف عثمانی (پی ایچ ڈی)

طبع جدید: ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ-اپریل ۲۰۰۸ء، مکتبۂ معارف القرآن کراچی

پیش لفظ: از مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی

অনুবাদ

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم،

وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের আইনগত অবকাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত এ অধিকার আছে যে, সে বর্তমান আইনের বিরুদ্ধে বেফাকী (ফেডারেল) আদালত এ জন্য চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যে, আইনটি কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক বিধানের বিপরীত। এ ধরনের আবেদন পাওয়ার পর শরয়ী আদালত পাকিস্তান সরকারের বরাবরে এ মর্মে একটি নোটিশ জারি করে যে, সরকার যেন এ বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করে। সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের শুনানির পর আদালত যদি এ ফলাফলে পৌঁছে যে, দাবিকৃত আইনটি বাস্তবেই ইসলামের বিপরীত তাহলে আদালত এ মর্মে একটি সিদ্ধান্ত দেয় যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে হুকুমত এমন আইন নিয়ে আসবে যা ইসলামী বিধান অনুযায়ী হবে। আর ঐ আইন যাকে ইসলামের বিপরীত আইন হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে সে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর তা অকার্যকর হয়ে যাবে।

বেফাকী (ফেডারেল) আদালতের সিদ্ধান্ত সুপ্রীমকোর্ট অফ পাকিস্তানের শরীয়া এপিলেট বেঞ্চে চ্যালেঞ্জ করা যায় যেখানে এ রায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

যে কোন ব্যক্তি অথবা দল আপিল করতে পারবে। এরপর সুপ্রিম কোর্টের এ বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে ধরা হবে।

বেফাকী (ফেডারেল) আদালত এবং সুপ্রীম কোর্ট অফ পাকিস্তানের শরীয়া এপিলেট বেঞ্চ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তান আইনের ৩-এ অনুচ্ছেদের অধীনে অস্তিত্ব লাভ করেছিল[ক]। কিন্তু শুরুতে কিছু কানূনকে তাদের যাচাই বাছাইয়ের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল। যারফলে সেসব বিষয়ে যাচাই বাছাই করার বিষয়টি এসব আদালতের এখতিয়ারের বাইরে ছিল[খ]।

সে কারণে অর্থ বিষয়ক আইন কানূনগুলো দশ বছরের জন্য এসব আদালতে শুনানি থেকে বেঁচে ছিল[গ]। এ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর (বেফাকী) শরয়ী আদালতে এ মর্মে অসংখ্য পরিমাণ আবেদন পেশ করা হয়েছে যে, সেসব বেফাকী (ফেডারেল) আদালতে আইনকে চ্যালেঞ্জ করা হোক যে আইন সুদকে বৈধতা দেয়[ঘ]। বেফাকী (ফেডারেল) আদালত এ আবেদনগুলোর শুনানি শেষ করে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এ রায় দিয়েছে যে, এমন সব আইন ইসলামের বিধানের খেলাফ। পাকিস্তান সরকার এবং দেশের বিভিন্ন ব্যাংক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো বেফাকী (ফেডারেল) আদালতের এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ এপিলেট বেঞ্চে আপিল করে দিয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ এপিলেট বেঞ্চে মুহতারাম জাস্টিস খলীলুর রহমান খান সাহেব, মুহতারাম জাস্টিস মুনীর এ শায়খ সাহেব, মুহতারাম জাস্টিস ওজীহুদদ্বীন আহমদ সাহেব ও জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব ছিলেন। এ বেঞ্চ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এ আপীলগুলো শুনানি শুরু করেছেন[ঙ]। এ বেঞ্চ বিশজন ওলামায়ে কেরাম এবং দেশী বিদেশী বিশ্লেষকগণকে দাওয়াত করেছেন, যেন তাঁরা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আদালতকে সহযোগিতা করেন। এ বিজ্ঞজন যাঁরা এসে আদালতের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তাঁদের মধ্যে ওলামায়ে কেরাম, ব্যাংকার[চ], আইনজীবী[ছ], অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং চার্টার্ড একাউনটেন্ট প্রমুখও ছিলেন। এ মামলার শুনানি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত জারি ছিল, যারপরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এ নতুন শতাব্দীর মাত্র আট দিন আগে সুপ্রীম কোর্ট অফ পাকিস্তানের শরীয়াহ এপিলেট বেঞ্চ তাদের এ ইতিহাস

বিনির্মাণকারী মহান রায় শুনিয়েছে। যে রায়ের মধ্যে সুদকে বেআইনী এবং ইসলামী বিধানের বিপরীত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে[জ]। আর এ রায়ের আলোকে ৩১ মার্চ ২০০০ খ্রি., কিছু কানুন ৩১ জুলাই ২০০০ খ্রি., আর অবশিষ্ট আইনগুলোকে ৩০ জুন ২০০১ খ্রিস্টাব্দে রহিত এবং অকার্যকর সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। এ বেঞ্চ সরকারকে এ দিক নির্দেশনাও দিয়েছে যে, স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানে যেন একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন তৈরি করা হয়, যে কমিশন বর্তমানে প্রচলিত সুদনির্ভর ব্যবস্থাপনাকে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপূর্ণভাবে নিজেদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়গুলোকে সম্পাদন করার যোগ্যতা রাখে। এ রায় খুবই স্বয়ংসম্পূর্ণ দিক নির্দেশনা জারি করেছে, যেন নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ব্যবস্থাপনা রূপান্তরের এ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

সুপ্রীম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রায় ১১০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত। আর এ কথা একটি স্বীকৃত বাস্তব যে, এ দেশে সুপ্রীম কোর্টের ইতিহাসে এটি ছিল সবচাইতে বড় রায়। এ কেন্দ্রীয় রায় মুহতারাম জাস্টিস খলীলুর রহমান খান সাহেবের (প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা) এবং জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের (প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা) সম্বলিত। সঙ্গে মুহতারাম জাস্টিস ওজীহুদদ্বীন আহমদ সাহেব ৯৮ পৃষ্ঠার একটি সমর্থনমূলক নোট লিখেছেন[ঝ]।

সুপ্রীম কোর্টের এ রায়কে গণমাধ্যম একটি ইতিহাস বিনির্মাণকারী রায় হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। সারা দেশ এবং মুসলিম বিশ্ব একে খোশআমদেদ জানিয়েছে[ঞ]। **কিন্তু পরবর্তীতে একটি ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ বেঞ্চে (যা জাস্টিস মনীর আহমদ শায়খ সাহেব ব্যতীত অন্য তিনজন নতুন জজ দ্বারা গঠিত ছিল) রায়ের উপর দ্বিতীয় বার বিবেচনা করার জন্য মামলাটিকে দ্বিতীয়বার ফেডারেল শরীয়াহ কোর্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে**[ট]। এরপরও এ রায়ের মাঝে যে ইলমী আলোচনা রয়েছে এ আলোচনার কারণে তার গুরুত্ব কমে না।

আমরা এ সম্মান অর্জন করেছি যে, আমরা মুহতারাম জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের এ রায়টি মুদ্রণ করছি। কেননা মামলা শুনানির সময় যতগুলো বিষয়কে উত্থাপন করা হয়েছে সেসব কিছুকে

তিনি সুন্দর করে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আমরা পাঠকদের উপকারার্থে এ রায়ের পর কোর্ট ওয়ার্ডারটিও সংযুক্ত করে দিয়েছি।

এটি যদিও পূর্ণাঙ্গ রায়ের একটি অংশ, এরপরও আশা করি পাঠকদের জন্য এটি সেসব মৌলিক সূত্রগুলো ও কারণগুলো বুঝতে সহাযোগিতা করবে যা এ বেঞ্চের জন্য এ ইতিহাস বিনির্মাণকারী রায় দেয়ার কারণ হিসাবে কাজ করেছে।

(মুফতী) মুহাম্মদ রফী ওসমানী

জামেয়া দারুল উলূম করাচী

প্রয়োগ হয়নি; কারণ

কারণ দেশটি শতভাগ গণতান্ত্রিক দেশ। দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। দেশটি মানবরচিত আইনে পরিচালিত দেশ। দেশটি বৃটিশ আইনে পরিচালিত দেশ। দেশটি কুফরী আইনে পরিচালিত দেশ। এখানে শরীয়তের সর্বোচ্চ অভিনয় হতে পারে। মুলা প্রদর্শন করা যেতে পারে। ধোঁকা দেয়ার সব আয়োজন করা যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের নাম মুসলমান হওয়ার কারণে কখনো কখনো গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের গায়ে আঁচড় না লাগে মত তাদের দু'য়েকটি আবদারও রক্ষা করা যেতে পারে।

সে কারণেই একটি শরয়ী আইনের জন্য হাজার হাজার আবেদন পত্র জমা হবে। বছরের পর বছর তার পেছনে মেহনত হবে। হাজার পৃষ্ঠার রায় রচনা হবে। রায়ের নাম ঐতিহাসিক রায় হবে। রায়টি ইতিহাস বিনির্মানকারী রায় হবে। সে রায় নিয়ে আমাদের গর্ব হবে। দেশ বিদেশ থেকে বাহবা পাওয়া যাবে। মিডিয়ায় তোলপাড় হয়ে যাবে। মোটকথা সব কিছু হবে। শুধু যা হবে না তা হচ্ছে, এসবের কোন বাস্তবায়ন হবে না, কোন প্রয়োগ হবে না।

প্রয়োগ না হওয়ার বিষয়টিকে শায়খ দামাত বারাকাতুহুম খুব সংক্ষেপে বলে ফেলেছেন। যার ফলে আমি ও আমার মত পাঠকরা বুঝে উঠতে পারেনি। বিষয়টি আরেকটু খুলে বললে সাধারণ পাঠকদের জন্য বুঝতে সহজ হত। যাইহোক, ঐতিহাসিক রায় বাস্তবায়নের মুখ না দেখার বিষয়টি আমরা শায়খের লেখা থেকেই জানতে পারলাম। এর সঙ্গে

আরো জরুরী কিছু তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। তথ্যগুলো নিয়ে আমার পাঠকের সঙ্গে আমি আরো কিছু সময় কাটাতে চাই। সে তথ্যগুলো হচ্ছে এই-

ক. যে দেশটি শুধু ইসলামের জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছে সে দেশে কুরআন হাদীস তথা শরীয়তের আলোকে একটি মাসআলার বিষয়ে কথা বলার টেবিল অস্তিত্ব লাভ করেছে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ বত্রিশ বছর পর। এর আগ পর্যন্ত একটি দারুল ইসলামে (?) আল্লাহর বিধানগুলোর কী হাশর হয়েছিল? একটি দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধারগণ সে সময়গুলো কোন অজুহাতে কাটিয়েছিলেন? শরীয়তের কোন সিদ্ধান্তের আলোকে তা মেনে নিয়েছিলেন? এর মাঝে গর্বের কী কী সূত্র লুকায়িত ছিল? এ বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা দরকার ছিল। এতে চিন্তাভাবনাগুলো সঠিক পথ খুঁজে পেত।

খ. একটি দারুল ইসলাম (?) প্রতিষ্ঠার বত্রিশ বছর পর শরীয়তের আলোচনার যে টেবিল অস্তিত্ব লাভ করেছে সে টেবিলে শরীয়তের সব মাসআলা ওঠার সুযোগ পায়নি। সে মাসআলাগুলোর তালিকাও আসেনি। অর্থাৎ বত্রিশ বছরে দারুল ইসলাম উন্নতি করে أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ। আর বিষয়গুলো শরীয়া আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকার অর্থ হচ্ছে, শরীয়তের এখতিয়ারের বাইরে ছিল। আল্লাহর বিধানের এখতিয়ারের বাইরে ছিল। বিষয়গুলো অনেক ভয়ংকর। বলতে বলতে দেখতে দেখতে আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে।

গ. শরীয়তের আওতামুক্ত বিষয়গুলোর ছোট্ট একটি উদাহরণ এসেছে, আর তা হচ্ছে অর্থ বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল। অর্থাৎ এমন একটি মাসআলা তখনো শরীয়তের টেবিলে ওঠার সুযোগ পায়নি যে মাসআলার সঙ্গে দেশের শত ভাগ মুসলমান জড়িত। যে মাসআলার সঙ্গে প্রতিদিনের, সকাল সন্ধ্যার হালাল হারাম জড়িত। যে মাসআলার

সঙ্গে প্রতিটি লোকমা, প্রতিটি সূতা ও প্রতিটি ইঞ্চির হালাল হারাম জড়িত। আর এ হচ্ছে একটি দারুল ইসলামে (?) বত্রিশ বছর পরে জন্ম নেয়া শরীয়তের টেবিল।

ঘ. একটি দারুল ইসলামে (?) সুদ বৈধতা পেয়েছে আইনের মাধ্যমে। কোন প্রকার দ্বিধা ও আপত্তি ছাড়া তার বৈধতা বহাল ছিল বত্রিশ বছরের বেশি। বত্রিশ বছর পরে সে বিষয়ে কথা বলার সুযোগ বের হয়েছে। দেখা যাক সামনে কী হয়।

ঙ. আরো বার বছর পর অর্থাৎ একটি দারুল ইসলাম (?) প্রতিষ্ঠার চুয়াল্লিশ বছর পর আদালতের একটি বেঞ্চ থেকে রায় এসেছে সুদ হারাম। চুয়াল্লিশ বছর যাবত একটি দারুল ইসলামের আদালত জানত না যে, সুদ হারাম। আর যদি বলা হয়, আদালত তা জানত, তাহলে বলতে হবে, দেশটির পরিবেশ এমন যেখানে শরীয়ত অনুযায়ী রায় দেয়া যায় না। দারুল ইসলামের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং দারুল ইসলামের মুসলমানরা সুদকে হারাম বলে ফাতওয়া দেয়ার বিরুদ্ধে আপিল করেছে। সে আপিলের শুনানি শুরু হয় আরো আট বছর পরে। ইতিমধ্যে একটি দারুল ইসলামের পঞ্চাশ/বায়ান্ন বছর বয়স হয়ে গেছে।

চ. মনে রাখতে হবে, এ গন্যমান্য ব্যাংকাররা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যারা যুগের পর যুগ সুদের মহাজনি করেছে। সুদের ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে এবং তা লালন করার ক্ষেত্রে বড় বড় অবদান রেখেছে। তারা শরীয়া আদালতের আমন্ত্রিত গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ছ. এ আইনজীবী মানে হচ্ছে, যারা সারা জীবন কুফরী আইনের অনুশীলন করে পৃথিবীর বুকে কুফরী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন লড়ে চলেছে। যারা আইনের পেশা নিয়ে প্রতিদিন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে কখনো বুক কাঁপেনি এবং আল্লাহর বিধানের জন্য কখনো মন কাঁদেনি। পাঠক কথাগুলো একটু মনে রাখলেই হবে। এখানে কিছু করতে হবে না। এ কথাগুলো নিয়ে ভাবার অভ্যাসটা যদি আবার ফিরে আসত তাহলে হয়ত আমরা বদলে যেতাম। অনেক বদলে যেতাম।

জ. অবশেষে ১৯৯৯ এর শেষ মাথায় গিয়ে অর্থাৎ তেপ্পান্ন বছর পরে গিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, সুদ একটি শরীয়ত বিরোধী বিষয় (!) এর পর কী হয়েছে? দেখা যাক।

ঝ. একটি দারুল ইসলাম (?) প্রতিষ্ঠার তেপ্পান্ন বছরের মাথায় হাজার হাজার পৃষ্ঠা খরচ করে প্রমাণ করতে হয়েছে সুদ হারাম। এটা সত্যি ইতিহাস রচনার মত বিষয় (!) আমরা যখন সীরাত ও খেলাফতের ইতিহাস ভুলে গেছি তখন এভাবেই আমাদের ইতিহাস তৈরি করতে হচ্ছে। যাই হোক, এর পর কী হয়েছে। ইতিহাসের কী ইতিহাস তৈরি হয়েছে?

ঞ. তেপ্পান্ন বছরের ব্যর্থতার কথা কারো মাথায় আসেনি। কারণ সামনেও অবস্থা আপন অবস্থায়ই থাকবে। মাঝে যে কিছুক্ষণ মাতামাতি হল এটাই হচ্ছে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদের বিষয়। এটাই হচ্ছে ইতিহাস ও ইতিহাসের নির্মাণ। আর তাই .....

ট. সকল ইতিহাস, সকল আয়োজন, সকল সমারোহ আবার জমা হয়েছে হিমাগারে। যে পরিমাণ গরম হয়েছে সে পরিমাণ ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঝে সংবিধানের সে অনুচ্ছেদটি আবার আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়ার সুযোগ পেল। অবস্থা আবার সেখানে এসে থেমেছে যেখানে সে আগেই ছিল।

সর্বশেষ অবস্থা

সারা দেশে সুদের কারবার সেভাবেই চলছে যেভাবে ছিল। বৃটিশ ভারতে যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে। বর্তমান ভারতে যেভাবে আছে সেভাবে আছে। আমেরিকা লন্ডনে যেভাবে আছে সেভাবেই আছে। বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যেভাবে আছে সেভাবেই আছে। সারা বিশ্বে তাগুতের আইনে অর্থনীতি যেভাবে চলছে সেভাবেই পাকিস্তানে চলছে। ব্যবধান হচ্ছে, সারা বিশ্বের মুসলমানরা যে পরিমাণ ধোঁকা খেয়ে চলেছে সে তুলনায় পাকিস্তানের মুসলমানরা একটু বেশি খেয়ে চলেছে। অবশ্য যারা খাচ্ছে তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। আল্লাহর এমন বহু বান্দাও আছে যারা এসব ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে চলছে।

আল্লাহ আমার উপস্থাপনের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন। আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে চেষ্টা করার পরও যে বেয়াদবিগুলো হয়ে গেছে সেগুলো ক্ষমা করে দিন।

জরুরী টীকা : ৫

এ মর্যাদা...

জরুরী টীকা-৫

এ মর্যাদা...

** ঈমান ও ফরয-ওয়াজিব বিষয়গুলো যখন শুধু মর্যাদা ও ফযীলতের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে তখন থেকে আমরা ঈমান ও ফরয-ওয়াজিব দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে মর্যাদার তালাশ করে ফিরছি এবং তা তালাশ করছি এমন পথে যেখানে আমাদের জন্য মর্যাদা রাখা হয়নি।*

একটি বিশেষ ভূখণ্ডের মর্যাদা, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মর্যাদা, একটি বিশেষ ভাষার মর্যাদা খুঁজে বের করছি আর নিজেরা কৃত্রিম মর্যাদায় মর্যাদাবান হয়ে চলেছি। মুসলমানের একজন কর্ণধার এ কথার উপর খুব খুশি যে, পুরো বিশ্ব থেকে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তা তাঁর ভূখণ্ডে এখনো আছে। ভূখণ্ডের ভালোবাসায় তালাশ করার প্রয়োজন হয়নি যে, আসলে আমরা যার জন্য খুশি তার কোন অস্তিত্ব আছে কি না? المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله এর ধারণা ভুলে যাওয়ার উপর আফসোস করার মত কোন পথও আমাদের সামনে খোলা নেই। আমরা খোলা রাখিনি।

এ মর্যাদা কেন?

শায়খে মুহতারামই এ বিষয়টি সবচাইতে ভালো করে জানেন যে, পাকিস্তানের আইন ও সংবিধান আল্লাহর বিধানের অধীনে তৈরি হয়নি।

বিষয়টি শায়খে মুহতারাম যে পরিমাণ জানেন তা অন্য কেউ জানার কথা নয়। শায়খে মুহতারাম বিশ্বের বহু ইসলামী রাষ্ট্র দেখেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন, হুবহু এ কথা আরো বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংবিধানে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পাকিস্তানের অবস্থা ও সেসব দেশের অবস্থা এ ক্ষেত্রে অভিন্ন। তিনি এমন বহু দেশ দেখেছেন যেখানে এ ধরনের কথা লেখা না থাকলেও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে জিজ্ঞেস করা হয়।

তবে সবচাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধানের একটি অকার্যকর অনুচ্ছেদ যার প্রায়োগিক কোন রূপ নেই তা নিয়ে মর্যাদা বোধ করা এবং গর্ব বোধ করাটা কেমন? অথবা যা সংবিধানের কোন ধারা উপধারা ভিত্তিক অনুচ্ছেদ নয়, এমন একটি বিষয় নিয়ে এভাবে মর্যাদা বোধ করার কী অর্থ হতে পারে? বিষয়টা অনেকটা কাগজের ফুলের ঘ্রাণে মোহিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা নয়? এভাবে কাল্পনিক মর্যাদা অনুভব করে এবং প্রচার করে কতকাল চলা যাবে? এবং কতকাল চালানো যাবে?

এ মর্যাদা কখন থেকে?

আমরা পাকিস্তানের ইতিহাস অল্প সামান্য যা দেখেছি এবং শায়খ রফী ওসমানী দা. বা. এর লেখা থেকে এবং শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. এর জীবনী থেকে যতটুকু উল্লেখ করেছি তা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহর বিধানের অধীনে দেশ পরিচালান করেনি। পাকিস্তান শিরোনামে একটি দারুল ইসলামের স্বপ্নদ্রষ্টা আকাবিরে ওলামায়ে কেরামের জীবদ্দশায় পাকিস্তান আল্লাহর বিধানের অধীনে পরিচালিত হয়নি। পরবর্তী প্রজন্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে মুকাল্লাফ বা দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পঁচিশ/ত্রিশ বছর মেয়াদের মধ্যেও পাকিস্তান আল্লাহর বিধানের অধীনে পরিচালিত হয়নি। প্রজন্মের পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের উপর থেকে মেঘখণ্ডটি কেটে যাচ্ছে যাচ্ছে করতেই সূর্যটি অস্তমিত হয়ে গেছে। কাল্পনিক গর্বের মাহেন্দ্রক্ষণটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এ মর্যাদা কেন মর্যাদা?

এ প্রশ্নটি চারটি কারণে সৃষ্টি হয়েছে। **এক.** একটি অঙ্গ অসুস্থ ও দুর্বল হলে সে কারণে আরেকটি অঙ্গ সুস্থতার কারণে গর্ব ও সুখ বোধ করার কোন

বৈধতা নেই। বিশেষত যখন অপর অঙ্গগুলোকে সুস্থ করার ফরয দায়িত্ব সুস্থ অঙ্গের উপরই এসে যায়। আর তাই একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে অন্য অঙ্গগুলো ব্যথা অনুভব করার কথা হাদীসে এসেছে। **দুই.** মর্যাদার কারণটি এখনো প্রয়োগ হয়নি। প্রয়োগ হওয়ার আগ পর্যন্ত মর্যাদার আশায় খুশি থাকা যেতে পারে, মর্যাদা অর্জনের তৃপ্তি আসতে পারে না। **তিন.** একটি কাগজের ফুলের ঘ্রাণে কোন অবুঝ শিশু মোহিত হতে পারে এবং মুহূর্তের জন্য হতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ যুগের পর যুগ কাগজের ফুল দিয়ে মোহিত হয়ে থাকার কোন বৈধতা নেই। **চার.** পাকিস্তানের যে অবস্থার উপর পাকিস্তানের আকাবির ওলামায়ে কেরাম কেঁদে কেঁদে আফসোস করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, সে একই অবস্থার উপর প্রজন্মের কোন আফসোস ও দুঃখ তো নেই-ই, উপরন্তু আগের অপরিবর্তিত অবস্থার উপর গর্ব ও মর্যাদার প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে।

বিষয়গুলো অনেকটাই সাম্প্রদায়িক তথা জাতীয়তাবাদ মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হয়। যেমন বাংলাদেশের মানুষ জানে, তারা পৃথিবীর সেরা দুর্নীতিবাজ হিসাবে বার বারই প্রথম পুরষ্কার পেয়েছে। হুজুগে বাঙ্গালী হিসাবে তাদের পরিচিতি নিজেরাই স্বীকার করে। দুনিয়ার বিচারে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর অন্যতম একটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষ একটি সুঁই ও ব্লেড বিদেশ থেকে আমদানী করে ব্যবহার করে থাকে। হাসের ডিম আর কলা পেপে ছাড়া এ দেশে প্রত্যেকটি জিনিসই কিনতে গেলে মানুষ জিজ্ঞেস করে থাকে, এটা দেশী না কি বিদেশী? দেশী হলে যা দাম বিদেশী হলে তার তিন গুন, চার গুন ও অনেক গুনে আমরা তা কিনে থাকি।

এতসব বিষয় আমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দাবি, আমরা পৃথিবীর সেরা জাতি। জাতি হিসাবে আমাদের কোন তুলনা নেই। একই দাবি পাকিস্তানীদের, একই দাবি ভারতীয়দের, একই দাবি আরবের, একই দাবি শ্বেতাঙ্গের, একই দাবি কৃষ্ণাঙ্গের। পূর্বের দাবি, তোমাদেরকে আলো দেয়ার জন্য আমরা সূর্যকে তোমাদের কাছে পাঠাই। পশ্চিমের দাবি, সূর্যকে আমরা আমাদের কাছে আশ্রয় দেই।

আসলে এসবই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক তথা জাতীয়তাবাদের প্রভাব। ধীরে ধীরে ইসলামের অনুসারীগণও এসব ফালতু বিষয়ে জড়িয়ে পড়ছে। যিম্মাদারদের জন্য এটা উচিত নয়। বিশেষ ভূখণ্ড ও জাতি নিয়ে বড়াই

করলে তো কুতুবে বাঙ্গাল (?) আর কুতুবে আলমের (?) মতই হয়ে গেল। যারা নিজেদের ভূখণ্ডের নাস্তিক মুরতাদ এবং নিজেদের ভূখণ্ডের হিন্দু ও হিন্দুদের মূর্তি নিয়েও গর্ব করে, মর্যাদা বোধ করে।

কুতুবে আলম (?) মাহমূদ মাদানীর গর্বভরা দাবি: "পৃথিবীর বুকে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে সকল ধর্মের মানুষ মিলে মিশে একটি সুন্দর ফুলের কানন তৈরি করেছে। কারণ বাগানে যখন সব ধরণের ফুল থাকে তখন বাগান সুন্দর হয়। পক্ষান্তরে বাগান যদি গোলাপ ফুলে ভর্তি থাকে তখন তা সুন্দর হয় না।"

কুতুবে বাঙ্গাল (?) ফরীদ উদ্দীন মাসউদের গর্বভরা দাবি: "আমাদের এ বাংলাদেশে মসজিদে মন্দিরে গির্জায় পাশাপাশি এবাদত হয়। মুসলমানরা হিন্দুদের পূজামণ্ডপ পাহারা দেয়, আর হিন্দুরা মুসলমানদের ঈদ উদযাপনে শরিক হয়। কত সুন্দর অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ!"

কিন্তু এসব শোভা ও গর্বের বিষয় তো কুতুবে আলম (?) ও কুতুবে বাঙ্গালদেরকে (?) মানায়। ভূখণ্ডভিত্তিক এসব গর্ব আমাদের মাশায়েখ ও কর্ণধারগণের জন্য একেবারেই মানায় না।

এ প্রশংসায় আসলে কারা উপকৃত হয়?

এটি একটি জটিল প্রশ্ন। পাকিস্তানের সংবিধানে এমন ভালো ভালো বিষয় আছে যা পৃথিবীর আর কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংবিধানে নেই। এ কথা গণমাধ্যমে ও জনসমাবেশে কেন বলা হয়? জনগণকে তাদের দায়িত্বে সচেতন করার জন্য? না কি পাকিস্তান রাষ্ট্রপক্ষের ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য। শায়খে মুহতারাম তাঁর এক বক্তব্যে পাকিস্তানের নেক আমলগুলোর উদাহরণ দিয়ে বলেন, এ নেক আমলগুলোর শুকরিয়া আদায় করা দরকার। তাহলে আল্লাহ আমাদের নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবেন।

শায়খে মুহতারামের এ জাতীয় কথা থেকে আমাদের প্রশ্নটি জেগেছে যে, এ কথাগুলো আসলে কাদের বেশি উপকারে আসে এবং কাদের বেশি কাজে লাগে। শায়খে মুহতারাম যে মজলিসে পাকিস্তানের নেক আমলগুলোর শুকরিয়া আদায় করার দাওয়াত দিয়েছেন সে মজলিসটি ছিল, পাকিস্তান যে শরীয়ত বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তার

প্রতিকারের জন্য কি করা যায় তা নিয়ে। সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি শরীয়ত বিরোধী কার্যক্রমের প্রতিকার বিষয়ে আলোচনার দিকে না গিয়ে তাদের কৃত নেক আমলগুলোর শুকরিয়া আদায় করার দাওয়াত দিয়েছেন।

শ্রোতাদের মনে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে যে, যে দেশের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত সকল আদালত তাগুতের আইন তথা গায়রুল্লাহর আইনে চলে এবং যে দেশের কর্তৃপক্ষ গায়রুল্লাহর সে আইনের প্রণয়নকারী, প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী, যারা শত ভাগ মুসলমানের সিদ্ধান্ত ও কুরবানী উপেক্ষা করে ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য গঠিত একটি দেশে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হতে দেয়নি তাদের নেক আমলগুলোর ধরন কী হবে এবং তার কেমন শুকরিয়া আদায় করা উচিত? এ বাস্তবতাগুলো খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত।

এ মর্যাদা থাকা না থাকার ফলাফল: বক্তার দৃষ্টিকোণ

শায়খে মুহতারাম যে মর্যাদার দাবি করেছেন এ মর্যাদার কারণে পাকিস্তানের মুসলমানরা অতিরিক্ত এমন কী কী সুবিধা পেয়েছে যা বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মুসলমানরা পায়নি। শায়খে মুহতারাম সাউদী আরবের উদাহরণ এনেছেন। তাই শুধু সাউদী আরবকে তুলনা করে প্রশ্ন রাখা যায় যে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তান কোন কোন বিভাগে সাউদী আরবের চাইতে বেশি নম্বর পেয়েছে?

হুদূদ, কিসাস, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার, সুদ, ঘুষ, পর্দা, মদ, জুয়া, ইলমের চর্চা, আইন-আদালত, মিথ্যা, দুর্নীতি, পতিতা ব্যবসা, ঈমান, আমল, কুফর-শিরক-বিদআত, হারাম খেলা, সিনেমা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নে সাউদী আরবের প্রাপ্ত ফলাফল কী? এবং পাকিস্তানের প্রাপ্ত ফলাফল কী? আমি যদি বলি এ ক্ষেত্রে শরীয়তকে মাপকাঠি বানিয়ে পাকিস্তানে এর প্রাপ্তির মোট হার হচ্ছে শতকরা ০০.০১%, আর সাউদী আরবে প্রদর্শনী ও হাকীকতসহ এর হার হচ্ছে শতকরা ২৫% থেকে ৩০% -তাহলে আমার হিসাব হয়ত অনেকেই মানতে চাইবেন না। তাই সবচাইতে ভালো হবে শায়খে মুহাতারামের

কাছ থেকে সরাসরি অথবা তাঁর আস্থাভাজন কারো কাছ থেকে এর একটা জরিপ সংগ্রহ করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দেয়া বিস্তারিত জরিপ সামনে আসলে বিষয়গুলো বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সংবিধানের যে বাণী কখনো আলোর মুখ দেখেনি এবং দেখবে না সে বাণী শুধু আওড়ানোর কোন ফযীলত আমাদের জানা নেই। তাই সংবিধানে এমন কোন ধারা উপধারা থেকে থাকলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিচারেই তার মূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন হবে। প্রয়োগের হার হিসাবে মর্যাদার পরিমাপ হবে। আসলে আমাদের কোন মর্যাদা অর্জিত হয়েছে কি না তাও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

জরুরী টীকা : ৬

এই মর্যাদা আর কোন দেশের অর্জিত নেই .... পাকিস্তানের কোন আইন কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ বানানো হবে না ....

জরুরী টীকা-৬

এই মর্যাদা আর কোন দেশের অর্জিত নেই .... পাকিস্তানের কোন আইন কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ বানানো হবে না ....

** এটা কোন দারুল ইসলামের আইন বিষয়ক সিদ্ধান্তের ভাষা হতে পারে না। এটা হচ্ছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি করুণার ভাষা। শয়তানী আইনের পক্ষ থেকে কুরআন সুন্নাহর প্রতি করুণার ভাষা। একটি দারুল ইসলামের আইন বিষয়ক সিদ্ধান্তের ভাষা হবে 'দারুল ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে না এমন প্রতিটি সিদ্ধান্তই প্রত্যাখ্যাত। যেসব বিষয়ে কুরআন সুন্নাহে সিদ্ধান্ত দেয়া আছে সেসব বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্তের জন্য পরামর্শ করারও কোন বৈধতা নেই'। কুরআন সুন্নাহের পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না এমন কেউ একটি দারুল ইসলামের আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্য হওয়া ও বিচারপতি হওয়ার কোন বৈধতা নেই।*

এটি পাকিস্তানের কোন বৈশিষ্ট্য নয়

বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব দেশের প্রায় দেশের সংবিধানেই এ ধারাটি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইদানিং দেখা যায়, যে বিষয়টি সর্বত্র পাওয়া যায় তাকেই যে কোন একটির বৈশিষ্ট্য বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। যেমন সবুজ পাতার গাছ

পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়, এরপরও এটা না কি আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য। নদী পৃথিবীর বহু দেশে পাওয়া যায়, এরপরও আমাদের দেশের নাম নদীমাতৃক দেশ। চুরি ডাকাতি পৃথিবীর সব এলাকার মানুষই করে, এরপরও মানুষ শুধু আমাদেরকেই চোর ডাকাত বলে বিভিন্ন দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

'কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন করা হবে না' এ জাতীয় কথাগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংবিধানে সাধারণত থাকে। তবে সবচাইতে বেশি থাকে নির্বাচনের আগে নির্বাচনী প্রচারণার ইশতেহারে। নির্বাচনের ইশতেহারে বিষয়টি স্থান পাওয়ার পর এসব বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত হয়নি যে, এর সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। একটি দেশে যে জাতির সংখ্যা বেশি হবে সে দেশে ক্ষমতার রাজনীতিতে তাদেরকে এতটুকু মূল্যায়ন দিতেই হয় যতটুকুতে নির্বাচনের স্বার্থ উদ্ধার করা যায়। আর নির্বাচনের ইশতেহার যখন অনেক বেশি প্রচার করা হয়ে যায় তখন নির্বাচনের পর সংবিধানের ক্ষেত্রেও তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

গণতান্ত্রিক দেশে কোন ধর্মের বিপরীতই কোন কানুন তৈরি করা হয় না। এরকম করার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু ধর্মের কিতাব দেখলে দেখা যায় দেশের প্রতিটি কানুনই ধর্মের বিপরীত। আমরা যতটুকু দেখেছি এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের অবস্থার সঙ্গে পাকিস্তানের অবস্থার কোন ব্যবধান নেই। বরং অন্যান্য দেশে ধর্মবান্ধব আরো সুন্দর সুন্দর কথাও দেশের মালিক পক্ষের ঘোষণার মাঝে রয়েছে।

অন্য দেশের বাড়তি বৈশিষ্ট্য

পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে বিষয়টিকে শায়খে মুহতারাম এখানে উল্লেখ করেছেন সে বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশেরই আছে। সেসব বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে মদীনা সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার মত ঘোষণাও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে দেয়া আছে। যা পাকিস্তানের এ ঘোষণার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। কোন কোন রাষ্ট্রপ্রধান এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জের ভাষণের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পারিচালিত হবে। কোন কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রধানের পক্ষ থেকে ইলমে ওহির

সঠিক চর্চার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে গেছে। কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে তা থেকে ভুল মাসআলা উদ্ভাবনের রাস্তা বন্ধ করার জন্য আয়োজন করা হয়ে গেছে।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা এখনো করা হয়েছে কি না আমরা জানি না।

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে বিচ্যুত করতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে গণতান্ত্রিক সরকার জুমার খতিবদেরকে খুতবা ও ওয়াযের বিষয়বস্তু পর্যন্ত শিখিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি দলীয় মাস্তানদেরকে জুমার নামাযে উপস্থিত হওয়ার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। যেন কোন খতিব কুরআনের অপব্যাখ্যা দিতে না পারে, কুরআনকে বিকৃত করতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের প্রহরী, অনুসারী ও ক্যাডাররা মসজিদে মসজিদে, ওয়াজ মাহফিলে, দাওয়াতের মারকাযে এবং এসলাহের খানকায় রীতিমত মহড়া দিয়ে চলেছে, যেন এসব ধর্মীয় অঙ্গনে কেউ দুনিয়াবি কথা বলতে না পারে। সুদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাল্যবিবাহ আইন, পহেলা বৈশাখ, দূর্গা উৎসব ইত্যাদি দুনিয়াবি বিষয়ে কেউ মসজিদের মাইকে কথা বলে কি না সে দিকে নজর রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে রীতিমত তাগিদ দেয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানে এখনো এসব ব্যবস্থা করা হয়নি। এ বিষয়ক কোন আয়োজন করা হয়নি।

সব ধরনের প্রভাবমুক্ত খাঁটি ইলমে ওহি শেখানোর জন্য দারুল আরকাম শিরোনামে দেশব্যাপী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ওলামায়ে কেরাম তাদের দরসগাহগুলোতে কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কী কী ভুল করছে, ভুল ব্যাখ্যা করছে ও অপব্যাখ্যা দিচ্ছে তার উপর নযরদারির জন্য স্থানীয় কর্মকর্তা ও কর্মীবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দারুল আরকামে খাঁটি ইলমে ওহি শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহী করার জন্য বেতন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তকে সহজ করে দেয়া হয়েছে এবং আরো বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাবশীরে কাজ না হলে ইনযারের ব্যবস্থাসহ রাখা আছে। তাহরীযে কাজ না হলে ইজবারের ব্যবস্থাসহ রাখা আছে; কারণ নাদান উম্মতকে ঘাড় ধরে দ্বীনের সঠিক পথে না আনলে তাদের ইহকাল পরকাল সব বরবাদ হয়ে যাবে।

পাকিস্তানে এমন কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে আমাদের কাছে কোন খবর আসেনি।

এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, যেসব দেশে এসব ভালো ভালো ঘোষণা এসেছে এগুলোর উদ্দেশ্য ভালো নয়। এগুলোর সবই হচ্ছে 'কথা সত্য মতলব খারাপ' বিভাগের কথা। এ কথা বলা যাবে না; কারণ মতলব কারোই ভালো নয়। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অনুসারী হয়ে কেউ ভালো মতলবে ইসলামের পক্ষের কথাগুলো বলবে এমন আশা করার মত বোকামী আর হতে পারে না। পাকিস্তানও মতলবের জন্যই সে কথাটি বলেছে এবং সংবিধানে স্থান দিয়েছে। তাদের মতলব আদায়ও হয়েছে। সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত মুসলমানদেরকে এ মুলা দেখিয়ে দৌড়ের উপর রাখা গেছে।

গণতান্ত্রিক সব দেশের এসব কথা ধোঁকা দেয়ার জন্যই। আমলের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব কোন দেশকে অপর দেশের উপর প্রাধান্য দিতে হলে শুধু কথাগুলোকে মেপেই দিতে হবে। আর কথা মাপতে গেলে আমাদের দেশের কাছেই পাকিস্তান হেরে যাবে নিশ্চিত।

গণতান্ত্রিক ধোঁকার সফল একটি ফাঁদ

এ বিষয়টি গণতন্ত্রের মূল পরিকল্পনার একটি অংশ। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম কারো গলায় ছুরি চালায় না। শুধুমাত্র টার্গেট করা লোকটিকে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির ক্যাম্পে নিয়ে যায়। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ রগের মধ্যে স্যালাইনের মাথার সুঁই লাগিয়ে বিপরীত দিকে একটি ব্লাডব্যাগ কাঁথার নীচে রেখে দেয়। রক্তদাতা সাহেব বুঝে উঠতে পারেন না ব্লাডব্যাগটি কত মণ রক্ত ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহেব রক্ত চলাচলের সুঁইটি চালু করে দিয়ে তা বন্ধ করতে ভুলে যান। যখন ফিরে আসেন তখন দাতা সাহেবের শরীরের শেষ বিন্দু রক্তও ব্লাডব্যাগে গিয়ে অবস্থান করে ফেলে। দাতা সাহেব বুঝেও উঠতে পারেন না যে, তিনি কখন মারা গেছেন। তিনি মনে করতে থাকেন, এক বিন্দু রক্ত ছাড়াও মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে, যেমন আমি আছি। সে আর জীবন মরণের ব্যবধান বুঝতে পারে না। কেউ যদি তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে, তুমি মারা গিয়েছ তখন সে তা বিশ্বাস করতে চায় না।

ইতিহাসের খুব সহজ পাঠ থেকেই জানা যায়, পৃথিবীটা আদি ও অনন্তকাল থেকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কোলে লালিত হয়নি। পৃথিবী তার জন্ম থেকে ধর্মের কোলে লালিত হয়েছে। ধর্মকে বিকৃত করে যে অযাচিত উপসর্গগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কুফর ও শিরক। আর এ কুফর শিরকের সর্বশেষ এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বচূড়ান্ত ও সফল সংস্করণ হচ্ছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। এ দু'টি ধারা যখন তাদের যাত্রা শুরু করেছে তখন পৃথিবীর ইসলামী ভূখণ্ডগুলো ধর্মীয় অনুশাসনের একেবারে দুর্বল পর্বগুলো অতিক্রম করছে। যখন ধর্মের অনুসারীরা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত মনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। এরকমভাবে ধর্মের অনুসারীদের কাছে ধর্মের বিপরীত চলা যতটা সহনীয় ছিল, বিষয়টি মানুষ জেনে ফেলা ততটা সহনীয় ছিল না।

এসব পরিস্থিতি সামনে রেখে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তার নীতি ধারার গদগুলো এমনভাবে তৈরি করেছে যেখানে ধর্ম আটকা পড়ে যাবে, কিন্তু ধর্মের অনুসারী বড় ধরনের কিছু অনুভব করবে না। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে শিথিলতার সুযোগ পেয়ে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবে। আবার এ ফাঁদে যে ধর্ম পুরোপুরি আটকে গেছে তা বুঝতে না পেরে এর বিরোধিতা করার মত কোন প্রয়োজন অনুভব করবে না।

ঠিক এ নীতি ধারাকে সামনে রেখে পরস্পর সহযোগী দু'টি মতবাদ বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডগুলো ছিল প্রধান লক্ষবস্তু। কারণ দু'টি মতবাদের জন্য ইসলাম যতটা ঝুঁকি সৃষ্টি করে, অন্য কোন ধর্ম সে রকম ঝুঁকি সৃষ্টি করে না এবং করার কথাও নয়। মতবাদদু'টি প্রবেশ করতে গিয়ে প্রত্যেক দেশের ধর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারীর সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিমাণকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য এ গদটি প্রয়োগ করে থাকে যে গদটি শায়খে মুহতারাম পাকিস্তানের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। সে সফল ঐতিহাসিক গদ হচ্ছে, 'পাকিস্তানের কোন আইন কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ বানানো হবে না'। এখানে শুধু শুরুতে দেশের নামটি বদলাতে থাকে।

এ কালের মুসলমানও বড় আজব যোগ্যতার অধিকারী। যে সংবিধানের একটি ধারাও কুরআন সুন্নাহকে জিজ্ঞেস করে করা হয় না সে সংবিধানের বিষয়ে বলা হয়, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন তৈরি করা হবে না। মুসলমান তার আজব যোগ্যতার বলে এ কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে। যে সংবিধানের প্রণেতারা ও প্রণেতাদের প্রধান মুসলমান হওয়া জরুরী নয়, তারা হিন্দু, খ্রিস্টান, নাস্তিক, মুরতাদও হতে পারে তারা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন তৈরি করবে না -এ কথা বিশ্বাস করার মত আজব যোগ্যতাও বর্তমান মুসলমানদের আছে।

এ মিথ্যার উদাহরণ পুরো আইন ব্যবস্থা

পাকিস্তান সংবিধানের এ অনুচ্ছেদটি মিথ্যা হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে সে দেশের পুরো আইন ব্যবস্থা। আইন বিভাগটির আগাগোড়া পুরোটাই কুরআন সুন্নাহ বিরোধী। পাকিস্তান আইন বিভাগের আইন, আইনের প্রয়োগ এবং শরয়ী আইনের বিলুপ্তি প্রতিদিন হাজার বার ঘোষণা করে চলেছে যে, পাকিস্তান দেশটি কুরআন বিরোধী আইনে চলে। শরীয়তের আইনে চলে না। এটা হচ্ছে প্রতিদিনের দেখা ও শোনা। কিন্তু বিশ্বাসে বসে আছে সে গদ ও মন্ত্র যার বাস্তব চেহারা কেউ কখনো দেখেনি। দেখার কোন রাস্তাও খোলা রাখা হয়নি।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উদাহরণ এ বইয়ে আসবে, ইনশা-আল্লাহ। আপাতত শরীয়ত বিরোধী কয়েকটি আইন এখানে তুলে ধরছি। আর সঙ্গে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি, পাকিস্তানে শরীয়ত বিরোধী এ আইনগুলোর বয়স কত?

১. রাষ্ট্রপ্রধান নারী হওয়া: পাকিস্তানের আইনে রাষ্ট্রপ্রধান নারী হতে কোন সমস্যা নেই। এ আইনের প্রয়োগ হয়েছে। বার বার হয়েছে। অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে হয়েছে।

২. বিচারপতি অমুসলিম হওয়া: পাকিস্তানের আইনে প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে যে কোন পর্যায়ের বিচারপতি হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া জরুরী নয়। বিচারপতি অমুসলিম হয়েও মুসলমানদের বিচার করতে পারবে। একজন অমুসলিম বিচারপতির কাছে একজন মুসলমান তার জীবনের শরয়ী মাসআলাগুলোর জন্য কীভাবে হাজির হবে মুসলমানও তা ভেবে দেখেনি, মুসলমানদের কর্ণধারও ভেবে দেখেনি।

৩. আইন প্রণেতা অমুসলিম হওয়া: পাকিস্তান আইনে অমুসলিমরা মুসলমানদের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারবে। তারা আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্যও হতে পারবে, সভাপতিও হতে পারবে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো কোন ধরনের দায়িত্বশীলরা পালন করেছে তা 'পাকিস্তানের মালিক পক্ষের প্রথম সারি' শিরোনামে ... পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

৪. পাকিস্তান আইনে প্রেসিডেন্ট যে কোন অপরাধীর গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারে। সংবিধানের ৪৫নং ধারায় বলা হয়েছে-

۴۵- صدر کو کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر ہیئت مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لئے روکنے، اور اس میں تخفیف کرنے، اسے معطل یا تبدیل کرنے کا اختیار ہو گا۔

"ধারা-৪৫: প্রেসিডেন্ট কোন আদালত, ট্রাইবুনাল, অথবা অন্য কোন অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি ক্ষমা করে দেয়ার, মুলতবি করে দেয়ার এবং একটি মেয়াদ পর্যন্ত আটকে রাখার, শাস্তি কমিয়ে দেয়ার, শাস্তি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়া অথবা পরিবর্তন করার এখতিয়ার রাখেন।" -ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ধারা ৪৫

৫. পাকিস্তানের বিধানদাতারা কোন অপরাধের বিধান দেয়ার আগ পর্যন্ত সে অপরাধের কোন শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। আইন করার আগ পর্যন্ত যারা অপরাধ করেছে তারা কেউ শাস্তির আইনের আওতায় আসবে না। এমনিভাবে পাকিস্তান আইনের বিপরীত অন্য কোন কানূনের আলোকে যদি অপরাধীর ভিন্ন কোন শাস্তি থাকে বা পাকিস্তান আইনের শাস্তির চাইতে কঠিন কোন শাস্তি থাকে তাহলে সে শাস্তি দেয়ার কোন অনুমতি নেই। সংবিধানের নিম্নোক্ত আনুচ্ছেদটি একটু গভীরভাবে দেখুন-

۱۲-۱(الف) کوئی قانون کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے لئے جو اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا: یا

(ب) کسی جرم کے لئے ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون کی رو سے اس کے لئے مقررہ سزا سے زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو، اجازت نہیں دے گا۔

"১২-১(আলিফ) কোন আইন কোন ব্যক্তিকে এমন কোন অপরাধ করার কারণে বা এমন কোন কাজ না করার কারণে শাস্তি দেয়ার অনুমতি দেবে না যে কাজ সংঘটিত হওয়ার সময় কোন আইনের অধীনে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল না।" অথবা

(বা) কোন অপরাধের জন্য এমন শাস্তি দেয়ার অনুমতি দিবে না যা এ অপরাধ করার সময় কোন আইনের আলোকে এর জন্য নির্ধারিত শাস্তির চাইতে কাঠিন শাস্তি অথবা ভিন্ন শাস্তি হবে।" -ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান, ধারা ১২-১ (আলিফ)

৬. পাকিস্তান সংবিধানে সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্তের মান হচ্ছে لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ যাদের উপর কোন প্রশ্ন চলতে পারে না। কারোই না। এমন কি শরীয়তের পক্ষ থেকেও নয়।

۶۹- (۱) مجلس شوری (پارلیمنٹ) میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطہ کار کی کسی بے قاعدگی کی بناء پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

"৬৯-(১) মজলিসে শূরায় (পার্লামেন্টে) যে কোন কার্যক্রমের বৈধতার উপর কর্মপদ্ধতির কোন নীতিহীনতার ভিত্তিতে কোন আপত্তি করা যাবে না।" -ইসলামী জুমহুরিয়া পাকিস্তানের সংবিধান

এত কিছুর পরও আমাদেরকে এ ঐতিহাসিক গদটি মুখস্থ করতে হবে যে, 'পাকিস্তানের কোন আইন কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ বানানো হবে না'। এ কথা বিশ্বাস করার অর্থই কী? উল্লিখিত এ আইনগুলো এবং এর মত আরো শত হাজার আইন সবই কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত আইন? অর্থাৎ আরেকটি কুফরের শিকার হওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত করা।

মোটকথা, সব কথার গোড়ায় রয়েছে, সকল আইন তৈরি হবে সংসদ সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে, ভোটদাতারা অমুসলিমও হতে পারে, সংসদের প্রধান ব্যক্তিও অমুসলিম হতে পারে, শরীয়তের আলোকে ভোট দেয়ার বা সিদ্ধান্ত দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা সংবিধানে নেই। কিন্তু এরপরও বলতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে,'পাকিস্তানের কোন আইন কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ বানানো হবে না'। এটাই পাকিস্তানের মুসলমানদের কিসমত এবং এটাই গণতান্ত্রিক প্রতিটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মুসলমানদের কিসমত।

জরুরী টীকা : ৭

এবং বর্তমান কানূনকে কুরআন ও সুন্নাহর
আলোকে পরিবর্তন করা হবে।

জরুরী টীকা-৭

এবং বর্তমান কানূনকে কুরআন ও সুন্নাহর
আলোকে পরিবর্তন করা হবে।

** হবে না। কারণ, হচ্ছে না এবং হয়নি। যে দেশের অধিবাসীরা তাদের দেশকে দারুল ইসলাম ভাবতে পছন্দ করে সে দেশের বর্তমান কানূন কুরআন সুন্নাহর বিপরীত কেন? যে দেশটি তার জন্মের দিন থেকেই দারুল ইসলাম সে দেশের বর্তমান আইন কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কেন যাকে পরিবর্তন করতে হবে। এ বর্তমানটা কাদের হাতে হয়েছে? এবং পরিবর্তনটা কাদের হাতে হবে? ভবিষ্যতে যা হবে তা অতীতে কেন হয়নি? অতীতে যা হয়নি তা ভবিষ্যতে কেন হবে? অতীতের দুর্বলতাগুলো কী? এবং ভবিষ্যতের সুবিধাগুলো কী? যে দেশে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরি হবে না বলে সংবিধানে মূলনীতি রয়েছে সে সংবিধানের বর্তমান আইনকে পরিবর্তন করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক বানানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কীভাবে?*

এসব কথার আগের কথা হচ্ছে, এ বর্তমানের মেয়াদ অনেক অনেক দীর্ঘ। অন্য প্রসঙ্গে এর আগে বলা হয়েছে যে, 'বর্তমান কানূনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিবর্তন করা হবে' এ বক্তব্যটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান থেকে শুরু করে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান পর্যন্ত সংবিধানের প্রতিটি সংস্করণে হুবহু রয়েছে। অর্থাৎ সত্তর/বাহাত্তর বছরে গায়রে শরয়ী আইনের বর্তমানও শেষ হয়নি এবং শরয়ী আইনের ভবিষ্যতের সঙ্গেও দেখা হয়নি।

কুফরী আইন হয়েছে কীভাবে?

বর্তমান কানূন যাকে বলা হচ্ছে তা হচ্ছে মূলত বৃটিশ আইন। কুফরী আইন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত মানবরচিত আইন। কুরআন সুন্নাহর আলোকে রচিত শরয়ী আইন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিম অমুসলিম এ দু'টি জাতির বিভক্তির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের স্বপ্ন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের অস্তিত্ব। সমকালের সেরা ইলমী ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে দেশটির জন্ম হয়েছে। একটি দারুল ইসলাম শরয়ী আইন অনুযায়ী চলার জন্য যা দরকার তার সবই ইসলামের জন্য যুগ যুগ থেকে রচিত গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ রয়েছে। হাতে গোনা কিছু নতুন বিষয়ের জন্য ওলামায়ে কেরামের নির্বাচিত বিশাল একটি কাফেলা সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

এত কিছুতে ঘেরা প্রাচীরের ফাঁক গলিয়ে কুফরী আইনটাই কীভাবে সিংহাসনে গিয়ে বসে গেল? এর সদুত্তর আজো পর্যন্ত কেউ দেয়নি। এরই বিপরীত কুফরী আইনের ফযীলত বয়ান করেছে অনেকেই। যারা শতভাগ মুসলমানের ঈমানী দাবির সঙ্গে গাদ্দারী করে কুফরী আইন প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের বন্দনা গেয়েছে অনেকেই। কিন্তু কেউ খোঁজার চেষ্টা করেনি এবং উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেনি যে, কুফরী আইন কোন কাফের ও মুলহিদদের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। সে কাফের মুলহিদদেরকেও কেউ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেনি।

আজকের এই দিনে যখন গণতন্ত্রের সকল হাকীকত, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সকল হাকীকত সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে তখনও আমাদের অনেকে সেসব হাকীকতকে আড়াল করার চেষ্টা করে চলেছে। বোঝার চেষ্টা করা উচিত যে, হাকীকতকে আড়াল করে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলে মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর দায় দায়িত্বের বড় একটি অংশ কর্ণধার ওলামায়ে কেরামের উপরই বর্তাবে।

বলবৎ থেকেছে কীভাবে?

যাঁদের হাতে পাকিস্তানের জন্ম। যে সকল আকাবির ওলামায়ে কেরামের কুরবানীর বিনিময়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি ভূখণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। যে সকল মরদে মুজাহিদ শত ভাগ শরীয়তের অধীনে চলার জন্য ভারতের মত বিশাল একটি শক্তিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে

ফেললেন। যে সকল আকাবির ওলামায়ে কেরাম নববী তরীকায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর মত হাজার হাজার আকাবির ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে দ্বিমত করে, লড়াই করে নিজেদের আলাদা পরিচয় তৈরি করলেন। যে সকল ওলামায়ে কেরাম ভারতের মুসলমানদেরকে ভারতের কুফরী আইন থেকে মুক্ত করে শরীয়তের আইনে লালন পালন করার জন্য ভিন্ন একটি দেশ তৈরি করলেন। তাঁরা-

তাঁরা যখন দেখেছেন, যাদেরকে বিশ্বাস করে উম্মতের বিশাল এ আমানতকে তাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন তারা আল্লাহর আইনের বিপরীতে গায়রুল্লাহর আইনকেই বেশি পছন্দ করে। তাঁরা যখন দেখেছেন, ক্ষমতার আসনে যাদেরকে বসানো হয়েছে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিনিধি নয়, তারা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রতিনিধি। তাঁরা যখন দেখেছেন, যাদেরকে মুসলমানদের জন্য আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চাইতে রুশো-ভোল্টায়ারকে বেশি পছন্দ করে, কুরআন-হাদীসের তুলনায় আমেরিকান ও বৃটিশ আইন তাদের কাছে বেশি ভালো লাগে। তাঁরা যখন দেখেছেন, সকল আয়োজন ও উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসরণ না করে তাগুতের অনুসরণ করে চলেছে এবং এভাবে দিন, মাস, বছর, যুগ এমনকি যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। তখন-

তখন পাকিস্তানের আকাবির ওলামায়ে কেরাম বেঁচে থাকতে এ ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটে চলেছে? প্রতিদিন তাগুতের আইন তৈরি হয়েছে, প্রতিদিন প্রয়োগ হয়েছে, প্রতিদিন তার বিপরীত শক্তিকে দমন করা হয়েছে, শরীয়তের আইনের দাবিকে প্রতিদিন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, প্রতিদিন শরীয়তের একেকটি বিধানকে জবাই করা হয়েছে, প্রতিদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছে এবং তা হতে থেকেছে।

আকাবিরে উম্মত কীভাবে সেগুলোকে দেখতে থেকেছেন এবং চলতে দিয়েছেন? বিষয়গুলো একেবারেই বোধগম্য নয়। সেসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর না পেয়েই আমরা শুনতে পাচ্ছি, পাকিস্তান পৃথিবীর সেরা দারুল ইসলাম। পাকিস্তান পৃথিবীর সেরা দারুল খিলাফাহ।

বিচারকরা বিচার করেছেন কীভাবে?

পাকিস্তানের কুফরী ও তাগুতের আইনের এ যে দীর্ঘ এক 'বর্তমান', যাকে সংবিধানে বর্তমান আইন বলা হয়েছে এবং যাকে পরিবর্তন করে কুরআনের আইন চালু করা হবে বলে শোনানো হচ্ছে তাগুতের সে দীর্ঘ বর্তমান আইনের মেয়াদে বিচারকরা কী করে চলেছেন? তাদের বিচারগুলো কোন আইনে করেছেন। তারা যখন প্রতিদিন শরীয়তের গলায় ছুরি চালিয়ে চালিয়ে বৃটিশ ও আমেরিকান আইন প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন তখন তাদের ঈমানের কী অবস্থা চলছে।

একই অবস্থা আইন প্রণয়নকারীদের। যারা প্রতিদিন আল্লাহর আইনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজেদের মত করে 'বর্তমান' আইন তৈরি করে চলেছে তখন সে আইন প্রণয়নকারীদের ঈমানের কী অবস্থা? তারা যখন বিচারকের আসন থেকে কুরআন ও হাদীসকে সরিয়ে দিয়ে বৃটিশ আমেরিকাকে বসিয়ে চলেছে তখন তাদের ঈমান কীভাবে টিকে ছিল?

আর এরই সাথে বিচারের বিষয় হচ্ছে, এসব 'বর্তমান' আইনের সেসব ধারক বাহকদের সঙ্গে আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরামের সম্পর্ক কী ছিল? তাদের সঙ্গে লেনদেন কেমন ছিল? হৃদ্যতা কেমন ছিল, বিদ্বেষ কেমন ছিল? তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়াগুলো কেমন ছিল, আর শত্রুতা কেমন ছিল? উলুল আমরের ইতাআতের প্রক্রিয়া কেমন ছিল, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ কেমন ছিল? সেসব বিষয়ের যথাযথ বিশ্লেষণ না করেই আমরা ঢালাওভাবে অতীতকে বর্তমানের জন্য দলিল বানিয়ে চলেছি। সকল আকাবিরকে এক পাল্লায় মেপে, নিজের মত করে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকে নিজের দাবি প্রমাণ করে চলেছি।

আর সে 'বর্তমান' আইনের যে এখনো অবসান ঘটেনি সে বিষয়ে কোন পেরেশানী আমাদেরকে ঘিরে ধরেনি। এক্ষেত্রে বর্তমান কর্ণধারগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা কী বার্তা পাচ্ছি?

জরুরী টীকা : ৮

আর এত স্পষ্টভাবে কোন
দেশে এ ধারাটি নেই।

জরুরী টীকা-৮

আর এত স্পষ্টভাবে কোন
দেশে এ ধারাটি নেই।

** ধারাটি আছে। অনেক দেশেই আছে। এ শব্দে আছে, অথবা অন্য শব্দে আছে, বা এর কাছাকাছি শব্দে আছে। বাস্তবিকভাবেই আছে। প্রায়োগিকভাবে আছে। বরং বলা যায়, পাকিস্তানের সংবিধানে এ বিষয়টি ঐভাবে নেই যেভাবে শায়খে মুহতারাম দাবি করেছেন। ঐ শব্দে নেই যে শব্দে শায়খে মুহতারাম বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার পরিমাপে ইসলামের মূল বিধানে কতটুকু ব্যবধান হবে বলে মনে করা যেতে পারে। শুরুতে বলা হয়েছে কোথাও এ ধারাটি নেই। এখন বলা হচ্ছে, এত স্পষ্টভাবে কোথাও নেই। আসলে যেসব ধারার কার্যকারীতা শুধু এতটুকু যে, কেউ ইসলামের কথা বললেই এ ধারাটি দেখিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়া হবে সে ধারা থাকলেই কি আর না থাকলেই কি? স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন কাজে আসবে?*

আছে

কথাটি আছে। অন্যান্য দেশেও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া আছে। এমনকি যেসব দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেসব

দেশেও এ ঘোষণা দেয়া আছে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অধীনে পরিচালিত প্রত্যেক দেশেই এ ঘোষণা আছে এবং এ ঘোষণা থাকার পেছনে যৌক্তিক কারণও আছে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতি হচ্ছে এ ধর্ম যে দেশেই প্রবিষ্ট হবে সেখানে বসবাসরত কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই এমন কোন কথা ও কাজ করা যাবে না যা থেকে মূর্খ সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলতে পারে যে, এর দ্বারা আমার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে।

এটা খুব সত্য কথা যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে মূর্খ। সাধারণ দৃষ্টিতে যাদেরকে শিক্ষিত মনে করা হয় তাদেরও অধিকাংশ মূর্খ। এ সুযোগে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম তাদের ব্যবসাটা করে যাচ্ছে। একটি দেশের মূল চালিকা শক্তি সংবিধান প্রণয়নের শতভাগ এখতিয়ার সকল ধর্মের সম্মিলিত শক্তির হাতে ন্যস্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় 'ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন করা হবে না'।

ঠিক যে শ্রেণীটি বুঝতে পারে না যে, সংবিধান রচনার শত ভাগ এখতিয়ার যখন অধর্মের হাতে থাকে তখন সকল আইনই ধর্মের বিরুদ্ধে হয় -ঠিক সে শ্রেণীর জন্য 'ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন করা হবে না' বড়িটি খুবই কার্যকর। কুফর, নাস্তিকতা, সুদ, যিনা ও মিথ্যার মহাজনদেরকে আইন প্রণয়নের পূর্ণাঙ্গ শক্তি দেয়ার পর তারা ধর্মের বিরুদ্ধে আইন করবে না -এ বিশ্বাস যাদেরকে গিলানো যায় তাদেরকে 'এ্যাবনরমাল' বা 'অপ্রকৃতিস্থ' বলা হয়। আর এ শ্রেণীর ভোটেই গণতন্ত্রের প্রভুরা প্রভুত্ব করে। এ শ্রেণীর উপর ভরসা করেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের আত্মপ্রকাশ।

যারা ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয় অবস্থানের বাইরে প্রকাশ্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও পৃথিবীতে ধর্মকে অচল মনে করে তাদের হাতে আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতা অর্পণ করেও যারা বিশ্বাস করে 'ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন করা হবে না' তাদের জন্যই এ বাক্যটি বানানো হয়েছে। যারা বিশ্বাস করে ধর্মের অনুসরণে দেশ পরিচালনা করলে দেশ পিছিয়ে যাবে তাদের হাতে দেশকে অর্পণ করে যারা আশা করে বসে আছে যে, 'ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন করা হবে না' তাদের জন্যই মূলত এ বাক্যটি তৈরি করা হয়েছে।

আর সে কারণেই বাক্যটি পাকিস্তানের কোন বৈশিষ্ট্য রয়নি। কারণ এ শ্রেণীর মানুষ পাকিস্তানে সবচাইতে বেশি এমনটি আমরা মনে করি না। পৃথিবীর যত দেশে ধর্মের অনুসারীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আছে সে দেশেই এ শ্রেণীর মানুষও পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। আর তাই সেখানে ধর্মের অনুসারীদের জন্য এ বড়িটির ব্যবস্থাও আছে।

তাই বলা যায়, এ বাক্য সব দেশেই আছে। ভাষা ভিন্ন হতে পারে। প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন ভিন্নতা নেই। এ সত্যটি উপলব্ধিতে আসলে আমাদের সবার জন্য ভালো হবে। কর্ণধারগণের জন্যও ভালো হবে, কর্ণবাহকদের জন্যও ভালো হবে, ইনশা-আল্লাহ।

আরো স্পষ্টভাবে আছে

যে দেশের নাগরিকদের বোঝানোর জন্য যত স্পষ্ট করে বলা দরকার সে দেশের সংবিধানে তা তত স্পষ্ট করেই আছে। যে দেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে ধর্মীয় আইন চালু করা এবং ধর্মের বিরোধী আইন বাতিল করার জন্য কিছু দিন পরপরই সমাবেশ ও মিছিল হয়, সেসব দেশে এ কথাটি আরো স্পষ্ট করে আছে। যেসব দেশে ইসলাম শিরোনামে গণতান্ত্রিক রাজনীতির আনাগোনা বেশি সেসব দেশে এসব কথা আরো বেশি পাওয়া যায়।

কারণ গণতন্ত্রের সংবিধানে এসব কথা থাকলে গণতন্ত্রের কোন সমস্যা নেই। গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রই হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যে কোন সময় যে কোন বিধান তৈরি বা বিলুপ্তির জন্য সংখ্যাধিক্যের নীতি রেখে দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের জানা আছে যে, ইসলাম যখনই তার আইনকে বাস্তবায়ন করতে চাইবে তখন সে গণতন্ত্রের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করবে। ইসলাম চাইলেই কোন আইন কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এমনিভাবে কোন আইন বিলুপ্ত করতে চাইলে তা গণতন্ত্রের নীতিকে উপেক্ষা করে করতে পারবে না।

আপনি যখনই কুরআনের কোন আইনকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন বা কুরআন বিরোধী কোন আইনকে বিলুপ্ত করতে চাইবেন তখনই তা গণতন্ত্রের পাইপে ঢেলে দেয়া হবে। তখন আর সৃষ্টির অনুমোদন ছাড়া স্রষ্টার আইন বাস্তবায়নের মুখ দেখবে না। আর সৃষ্টির যে যে সদস্য মনে করবে যে, সে স্রষ্টার আইনকে অনুমোদন করা না করার অধিকার রাখে

সেই সেই সদস্য আগে থেকে মুসলমান থেকে থাকলেও এ বিশ্বাসের পর আর মুসলমান থাকবে না। মুরতাদ হয়ে যাবে।

কার্যকারীতাসহ আছে

আর যেসকল দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসাবে আছে সেসব দেশে এ ধরনের গদ ও বক্তব্য কার্যকারীতাসহ আছে। পাকিস্তানে যেমন সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ধর্ম চর্চা এবং তাদের সভ্যতার বিকাশের জন্য সকল উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে তেমনিভাবে বিশ্বের যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসাবে বাস করে সেসব দেশে মুসলমানদের সঙ্গে এ ধরনের ওয়াদা করা আছে। আবার পাকিস্তানে যেমন অমুসলিমদের ধর্মবিরোধী কোন আইন করা হয় না এবং এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় তেমনিভাবে সেসব দেশেও মুসলমানদের ধর্মের বিরোধী কোন আইন যেন না করা হয় সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়।

গণতন্ত্র কেন এত উদার? ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কেন এত উদার? কারণ এ দু'টি ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে, কোন ধর্মের উপর কোন ধর্মের কোন প্রাধান্য নেই। জীবন পরিচালনায় কোন ধর্মেরই কোন প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়। সবকিছুর মূল মাপকাঠি হচ্ছে, মেজরিটি। সংখ্যাধিক্য। তিনশত বিধানদাতার একশত একান্ন বিধানদাতা যদি এ পক্ষে ভোট দেয় যে, প্রত্যেক নাগরিক প্রত্যেক দিন এক সের করে মানুষের মলমূত্র খেতে হবে, তাহলে বাকি একশত উনপঞ্চাশ বিধানদাতাসহ দেশের সকল নাগরিক তা খেতে হবে। কিছু করার নেই। এখানে কারণ দর্শানোর কোন বিধান নেই। লাভ ক্ষতির কোন হিসাবে নেই। কারো পক্ষ থেকে আপত্তি করার কোন অধিকার নেই। ধর্মের উদ্ধৃতি ব্যবহার করার কোন সুযোগ নেই।

আসলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম নিজেকে যেভাবে বুঝেছে অন্য কোন ধর্মের অনুসারী তাকে সেভাবে বোঝেনি। আর এ কারণে ধর্মবিলাসী কিছু মানুষকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, আমেরিকা লন্ডনে ধর্মের উপর চলা যত সহজ, আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশ পাকিস্তানে ধর্মের উপর চলা ততটা সহজ নয়। অর্থাৎ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে শত ভাগ সফল। পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তি বুঝতেই পারে

না যে সে কখন মারা গেছে, বা সে আদৌ মারা গেছে কি না। আরো বলতে শোনা যায়, বৃটিশ আমলেই আমরা ভালো ছিলাম। আসলেই ভালো ছিলাম। কারণ সেখানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তার আবিষ্কারকদের হাতে পরিচালিত হয়েছে। দক্ষ হাতে হয়েছে এবং নিষ্ঠার সাথে হয়েছে।

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবরচিত আইন, তাগুতের আইন, গায়রুল্লাহর আইন ইত্যাদির গোড়ায় আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না ততক্ষণ পর্যন্ত এসবের সঠিক মূল্যায়ন আমরা করতে পারব না। পৃথিবীর পেটের মধ্যে বসে পৃথিবীর চলার গতি ও ঘোরার গতি অনুভব করা সম্ভব নয়। ফোকাসটা ফেলতে হবে বাহির থেকে, অনেক দূর থেকে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অক্টোপাস থেকে নিজেকে আগে মুক্ত করতে হবে। এরপর বুঝে আসবে এ দু'টি মতবাদ কীভাবে ধর্মের অনুসারীদের সম্মতির ভিত্তিতে তাদেরকে জবাই করে।

জরুরী টীকা : ৯

আর শুধু এতটুকুই নয়; বরং .... প্রত্যেক নাগরিকের এ অধিকার আছে, যদি সে কোন কানূনকে কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ মনে করে তা হলে সে তা আদালতের মাধ্যমে বিলুপ্ত করাবে....

জরুরী টীকা-৯

আর শুধু এতটুকুই নয়; বরং .... প্রত্যেক নাগরিকের এ অধিকার আছে, যদি সে কোন কানুনকে কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ মনে করে তা হলে সে তা আদালতের মাধ্যমে বিলুপ্ত করাবে....

** পারবে না। কারণ, একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যে কোন নাগরিক চাইলেই কুরআন সুন্নাহর দোহাই দিয়ে আইন পরিবর্তন করতে পারে না। বিচারকরা চাইলেই পারে না। বিচারকদের সেই শক্তিও নেই, সেই জ্ঞানও নেই। পাকিস্তান ভূখণ্ডের মুসলিম প্রতিষ্ঠাতাগণও তাঁদের আজীবনের চেষ্টা ব্যয় করে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রতিরোধ করতে পারেননি। সংবিধানে এসব ঘোষণা দেয়া থাকে নিরক্ষর সাদাসিধে নাগরিকদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। তাদেরকে ভুলিয়ে রাখার জন্য। এসব দেশে অমুসলিমের সংখ্যা বেশি হলে সংবিধানে এমন কিছু ঘোষণা থাকে যার দ্বারা অমুসলিমরা খুশি হতে পারে।*

এবার আরেকটু বিস্তারিত। এ বিষয়ে একটু খোলামেলা কথা হয়ে গেলেই ভালো হবে, ইনশা-আল্লাহ।

নাগরিকদের অধিকার নেই

গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের আলাদা ও নিজস্ব কোন অধিকার থাকে না। কোন ক্ষেত্রেই থাকে না। শতকরা একান্ন ভাগ যা বলবে তাই

অপর পক্ষকে মেনে নিতে হবে। একটি যাত্রীবাহী বাসে চড়ার পর কোন যাত্রী চাইলেই গান চালু করতে পারবে না, আবার কোন যাত্রী চাইলেই গান বন্ধ করতে পারবে না। এখানে সংখ্যাধিক্য নির্ণয়ের জন্য ভোট হবে। চালুর পক্ষে বেশি ভোট পড়লে চলবে, বন্ধের পক্ষে বেশি ভোট পড়লে বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যক্তির চাহিদা, প্রয়োজন, উপকারিতা ও অপকারতির কোন হিসাব এখানে নেই। মহল্লায় রাতব্যাপী উচ্চ আওয়াজে ড্রাম বাজবে কি বাজবে না তা ব্যক্তির প্রয়োজন, চাহিদা, লাভ ও ক্ষতির ভিত্তিতে নির্ণিত হবে না। ড্রামের বিকট শব্দের কারণে কার বৃদ্ধ বাবা মার হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কার শিশু বাচ্চা ঘুমের মাঝে চিৎকার করে উঠছে এসব কিছুই বিবেচ্য কোন বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সংখ্যাধিক্যের রায়।

সচেতনদের কেউ কেউ সর্বোচ্চ বলতে পারেন, এসব বিষয়ে আইন আছে। আইনের আশ্রয় নিলেই এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু এ সচেতন অবস্থার অচেতন ব্যক্তিরা জানে না যে, যেখানে আইনটি তৈরি হবে সেখানেও সংখ্যাধিক্যের কোন বিকল্প নেই। সেখানেও লাভ ক্ষতির কোন হিসাব নেই। চাহিদা ও প্রয়োজনের কোন হিসাব নেই। বিধানদাতাদের একশত একান্ন চেয়ার থেকে যদি আওয়াজ আসে, ড্রাম বাজাতে হবে তাহলে অবশিষ্ট একশত উনপঞ্চাশ বিধানদাতাও সে অভিশপ্ত ড্রামের আওয়াজ শুনতেই হবে। সেটা তখন আইন হবে। মহল্লার মোড়ে মোড়ে তখন সে আইনের আওয়াজ শোনা যাবে। এ হচ্ছে গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক রূপ। যেখানে এমন হবে না সেখানে নিশ্চয় গণতন্ত্রের কোন দুর্বলতা আছে।

ইসলামের জন্য মুসলমান

এবার আসি ইসলামের ক্ষেত্রে মুসলমানের অধিকারের আলোচনায়, যে প্রসঙ্গটি শায়খে মুহতারাম উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, একটি শতভাগ গণতান্ত্রিক দেশে একজন মুসলমান চাইলেই তার দাবি বাস্তবায়নের পথে নিয়ে যেতে পারে না। কারণ বাস্তবায়নের পথে সব কিছুই নির্ভর করে সংখ্যাাধিক্যের ভোটের উপর। এটা কখনো ব্যক্তিবিশেষের এখতিয়ারভুক্ত কোন বিষয় নয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বিষয়টি যখন ইসলাম তথা কুরআন সুন্নাহ বিষয়ক হবে এবং কুরআন সুন্নাহনির্ভর হবে তখন একটি গণতান্ত্রিক দেশে

সংখ্যাধিক্যের ভোটেও তা বাস্তবায়নের পথে যেতে পারবে না। কারণ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতিতে এ কথা আছে যে, সংখ্যাধিক্যের অভিমত, রুচি ও চাহিদা সংখ্যালঘুর উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে, কিন্তু ধর্মের চাহিদা ও দাবি অন্যের উপর কোন এক ব্যক্তির উপরও চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

আর এ কারণেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি অনুযায়ী সেসব দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হয় না। আর এর সবচাইতে সুন্দর ও পরিষ্কার উদাহরণ হচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের গণতন্ত্রে সংখ্যাধিক্যের ভোটে সবকিছু পাস হয়েছে, শুধু ইসলাম পাস হয়নি। কুরআনের বিধান পাশ হয়নি। ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে এসে সংসদ ও দেশ এবং সংসদ সদস্য ও সাধারণ নাগরিকের একটি পার্থক্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা একটু পরে ব্যাখ্যা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ!

বলছিলাম, কোন নাগরিকের কোন অধিকার নেই যে, সে দেশের কোন আইনকে বদলে দেবে। শায়খে মুহতারাম সংবিধানের এ বিষয়ক যে কথাটির দিকে ইঙ্গিক করেছেন **তা মূলত জিলাপীর পাইপের মত একটি সূত্র। যে পাইপের মুখ দিয়ে ঢোকা যাবে কিন্তু শেষ মাথা দিয়ে বের হওয়া যাবে না। এমনকি সে যে মুখ দিয়ে ঢুকেছে সে দিকে ফিরে আশার পথও খুঁজে পাবে না। কারণ, জিলাপীর পেঁচানো পাইপের কোন্ মোড়ে যে সে আটকে পড়বে তা সে কখনো বুঝতে পারবে না।**

কথা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তাই অমি বিষয়টিকে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাই না। **প্রথম** সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, পাকিস্তানের কোন মুসলিম নাগরিক ইসলাম বিরোধী কোন আইনকে বিলুপ্ত করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তাকে যত ঘাটের পানি খেতে হবে তত ঘাটের পানি খেয়ে কেউ কোন দিন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারবে না। কারণ এ কাজ করতে গিয়েও তাকে তাগুতের বহু আইন কানূনের সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। অবশেষে সে তাগুতের হাতেই আটকে যাবে। কারণ দেশের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তাগুত। মূল পরিচালনা তাগুতের হাতে।

দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, একজন নাগরিক নয়; হাজার হাজার নাগরিকের আবেদন এবং লক্ষ কোটি মুসলমানের সমর্থনে শক্তিমান

দাবির ধাক্কায়ও ইসলামবিরোধী আইন তার আপন জায়গা থেকে সরে দাঁড়ায়নি এবং সে স্থলে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর সাক্ষি হচ্ছেন খোদ শায়খে মুহতারাম। যা ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করে এসেছি। আমরা সেখানে দেখেছি, সুদের মাসআলার সমাধান ব্যক্তিবিশেষের দাবির প্রেক্ষিতেও হয়নি, লক্ষ মুসলমানের দাবির প্রেক্ষিতেও হয়নি, আদালতে রায়ের প্রেক্ষিতেও হয়নি, এরপর আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তের পরও হয়নি। কারণ আগেরটাই। মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তাগুত, কুফর, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। সাধারণ কোন দাবি কখনো গণতন্ত্রের মালিকদের পছন্দ হয়ে যেতেও পারে, কিন্তু ইসলাম নির্ভর কোন দাবি তাদের পছন্দ হওয়ার কোন কারণ নেই।

সংসদ আর নাগরিক এক কথা নয়

গণতন্ত্র আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, এর মাঝে জনগণের রায়ের প্রতিফলন ঘটে। অর্থাৎ সংসদ সদস্যরা যে সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকে তা মূলত জনগণের সিদ্ধান্ত। জনগণের কথামত দেশ চলে। আসলে বিষয়টি এমন নয়। সাধারণ জনগণ সংসদ সদস্যদেরকে সংসদে পাঠানোর পর তাদের আর কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না। সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর আগের সসদস্যকে ভোট না দিয়ে নতুন সদস্য পদপ্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। এছাড়া আর কিছুই সে করতে পারবে না। নতুন প্রার্থীকে ভোট দেয়ার পর জনগণ আবার ছুটি পেয়ে যাবে। ভোট দিয়ে নির্বাচিত ব্যক্তিকে সংসদ ভবনে পাঠানোর পর সংসদ সদস্যরা রব ও রব্বে আলার স্থান দখল করে ফেলে। তখন সারা দেশের জনগণের দাবি এক দিকে থাকা অবস্থায় যদি একশত একান্ন জন সংসদ সদস্য অন্য দিকে থাকে তাহলে একশত একান্ন সদস্যের কথাই কথা হিসাবে ধরা হবে, দশ কোটি/পনের কোটি মানুষের কথা কোন কথা হিসাবে গণনায় আসবে না।

আমি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছি এ কথা বলার জন্য যে, একটি দেশের আইন প্রণেতা ও বিলুপ্তকারী হচ্ছে সংসদ সদস্যরা। আর শায়খে মুহতারাম বলছেন, যে কোন নাগরিক চাইলে চলমান একটি আইনকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করার অধিকার রাখে। অথচ দেশটি হচ্ছে শত ভাগ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। সংসদ হচ্ছে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। যে কোন

আইন সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন ও পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণকারী একটি প্রতিষ্ঠান। একজন নাগরিকের আবেদন এমন শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানের মোকাবেলা করতে পারে না।

আমরা এরই বাস্তব চিত্র দেখেছি শায়খে মুহতারামের ইতিহাস বিনির্মাণকারী সুদের রায়ের ক্ষেত্রে। সে রায়ের বিস্তারিত প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি, একটি ইসলামী দেশ জন্ম লাভ করার ৩২ (বত্রিশ) বছর পর নাগরিকদের আবেদন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তারও ১২ (বার) বছর পর সে রাস্তায় গিয়ে আবেদন করার সুযোগ হয়েছে। এর ৯ (নয়) বছর পর গিয়ে আবেদনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সুযোগ হয়েছে। এরপর ৫৩ (তেপ্পান্ন) বছরের স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা সব একটি মাত্র ব্যাংকের একটি ছোট্ট ফুঁতে উড়ে গেছে।

সে দিন এক মুরুব্বী এ ধরনের বিষয়গুলোকে খুব সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে অনেক সুন্দর করে ব্যক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের আয়োজন অনেক। পুরো এলাকা জুড়ে লাইটিংয়ের বাহারে চোখ ও মন ভরে যায়। কিন্তু শুধু মাত্র তারের সংযোগটা দেয়া হয় না। কারণ, সংযোগটা আমাদের হাতে নয়। ছোট্ট তারের সে সংযোগের দায়িত্বে আছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম।

বিষয়গুলো আমরা একটু বুঝে নিলেই হত। আমরা আমাদের করুণ অবস্থা যত দ্রুত অনুভব করতে পারব তত দ্রুত আমরা ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাব। প্রতিদিনই যে দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বেড়ে চলেছে।

নাগরিকরা যেভাবে পারবে না

এ কাজটিকে একজন দ্বীনদার সাধারণ নাগরিকের সাধ্যের আওতায় রাখা হয়নি। এর জন্য এমন প্রক্রিয়া সাজানো হয়েছে যে প্রক্রিয়ায় একজন সাধারণ মুসলমান যাওয়ার হিম্মত করার কথা নয়। যদি আল্লাহর বিধান, কুরআনের আইন তথা শরীয়তের প্রতি আগ্রহের কারণে এ ধারাটি তৈরি করা হত তাহলে বিষয়টিকে যে কোন পর্যায়ের একজন মুসলমান যে কোনভাবে সরকারের যে কোন পর্যায়ের একজন দায়িত্বশীলের কানে পৌঁছে দেয়াই যথেষ্ট হত। যে কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে মাসআলার দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহ প্রকাশ করাই দায়িত্বশীলগণকে তাহকীকের প্রতি মনোযোগী করার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা।

সীরাতের ঘটনা আমাদের মনে রাখতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফেরানোর কারণে যুলইয়াদাইন রা. এর মত একজন সাহাবী তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করে বলেছেন, নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? না কি আপনি ভুলে দুই রাকাতের সময় সালাম ফিরিয়ে ফেলেছেন? মনের মাঝে সৃষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা পর্যন্ত দায়িত্ব ছিল একজন নাগরিকের। তাহকীক রাসূল নিজেই করেছেন। একজন সাহাবীর সন্দেহ প্রকাশের প্রেক্ষিতেই তাহকীক করেছেন।

ইসলাম কী বলে? কোন নাগরিকের চোখে রাষ্ট্রপক্ষের কোন ভুল ধরা পড়ার পর নাগরিকের করণীয় কী? নিজের সন্দেহ প্রকাশ করবে? না কি চ্যালেঞ্জ করতে হবে? আদালতে গিয়ে লড়াই করতে হবে? লড়াই করতে গিয়ে কাঠ খড় পোড়াতে হবে? শরীয়ত কী বলে?

পাকিস্তানের কোন একটি আইন কারো কাছে কুরআন সুন্নাহ বিপরীত মনে হলে সে বিষয়ে শরীয়া কোর্টের শরণাপন্ন হওয়ার যে প্রক্রিয়া পাকিস্তান আদালতের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে এবং যে প্রক্রিয়া পাকিস্তান সংবিধানে বলা হয়েছে একজন নাগরিকের জন্য সে প্রক্রিয়া বুঝে নেয়াই বড় কঠিন। এরপর তাগুতের আইনের হাজারো মার পেঁচ অতিক্রম করে ফলাফলে পৌঁছাতে গেলে তার আগ্রহের সব তেলই ফুরিয়ে যাবে।

প্রশ্ন আসতে পারে, দ্বীনের জন্য এতটুকু সহ্য করতে হবে। এতে সমস্যা কোথায়? এর উত্তর হচ্ছে, দ্বীনের জন্য গণতন্ত্রের বানানো জিলাপীর পেঁচের মধ্যে ঢুকতে হবে কেন? এর জন্য শরীয়ত সহজ সরল যে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে সে পথ পছন্দ না হওয়ার কারণ কী?

এটা নাগরিকের দায়িত্ব নয়

সবচাইতে সহজ কথা হচ্ছে, এটা নাগরিকের দায়িত্ব নয়। তিনশত প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠানো হয়েছে মুসলমানদেরকে শরীয়তের আলোকে পরিচালনা করার জন্য। তারা সেখানে বসে বসে জেনে শুনে শরীয়ত বিরোধী আইন তৈরি করে তার প্রয়োগ শুরু করে দেবে, আর সাধারণ জনগণ তা বিলুপ্ত করার জন্য আবেদন করে যুগের পর যুগ আদালত পাড়ায় ঘুরতে থাকবে এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে শূন্য হাতে ফিরে আসবে। অপর দিকে শরীয়ত বিরোধী সে আইনের উপর আমল চলতে

থাকবে। সাধারণ মুসলমানদেরকে শরীয়তের পক্ষ থেকে এমন কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এটা সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্ব নয়। কারণ:

ক. শরীয়ত বিরোধী আইনটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কুফরী নীতি ধারার অধীনে তৈরি হয়েছে। যে নীতি ধারার অধীনে যত আইন তৈরি হবে সবই শরীয়ত বিরোধী হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব একটি পূর্ণাঙ্গ কুফরী ধারার অধীনে থেকে মূল ধারার বিরুদ্ধে লড়াই না করে তার একটি মাত্র আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি শরীয়ত দেবে না।

খ. আইনটি যারা তৈরি করেছে তারা জানে যে, এ আইনটি শরীয়ত বিরোধী। জেনে শুনেই তারা শরীয়ত বিরোধী আইনটি তৈরি করেছে। আর আইন প্রণয়নের মত দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে এ বিষয়টি না জানার কোন সুযোগ নেই। এই না জানা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোন ওযর নয়। বিশেষত যখন প্রতিষ্ঠানটি এক ব্যক্তির নয়, দু'চার ব্যক্তিরও নয়; বরং তিনশত প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠান। এখানে অজ্ঞতা অবৈধ।

গ. যদি অজ্ঞতাই হয়ে থাকে তাহলে অন্যদের দায়িত্ব হচ্ছে অজ্ঞতা দূর করে দেয়া। শুধুমাত্র জানিয়ে দেয়া যে, আইনটি শরীয়ত বিরোধী। গণতন্ত্রের জিলাপীর পাইপে প্রবেশ করা তার দায়িত্বের আওতায় আসে না।

ঘ. এমনিভাবে অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে যদি আইনপ্রণেতারা আইন প্রণয়নের আগে কুরআন হাদীসকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করেন। আর যদি তারা মনে করেন গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে বসে কোন আইন তৈরি করতে কুরআন হাদীসকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন, তাহলে বোঝা যাবে তারা কাফের বা মুরতাদ।

নাগরিকের দায়িত্ব

নাগরিকের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে চারটি। **এক.** সরকারকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য পথ দেখিয়ে দেয়া। **দুই.** তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত শরীয়ত বিরোধী আদেশকে অমান্য করা এবং উপেক্ষা করে চলা। **তিন.** তার অন্যায় কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে হলেও তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়ন করবে এমন কোন শাসককে দায়িত্ব দেয়া। **চার.** যদি সে তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে নিজের দ্বীন ও ঈমান নিয়ে হিজরত করা। পালিয়ে যাওয়া।

প্রথম দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য

প্রথম দায়িত্বের বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য দেখুন-

﴿إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه﴾ {سنن أبي داود :رقم الحديث:٢٩٣٢-: ٢٦/٣}

"আল্লাহ যখন কোন আমীরের জন্য ভালোর ফায়সালা করেন তখন তার জন্য একজন সত্যবাদী সহযোগীর ব্যবস্থা করে দেন। সে ভুলে গেলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ থাকলে তাকে সহযোগিতা করে।" -সুনানে আবু দাউদ : ৩/২৬, হাদীস নং : ২৯৩২

দ্বিতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য

দ্বিতীয় দায়িত্বের বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য দেখুন-

﴿عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه و سلم .... قال: أيما أمير أمرته عليكم فأمركم بغير طاعة الله فلا تطيعوه، فإنه لا طاعة في معصية الله﴾ {مصنف عبد الرزاق : رقم الحديث: ٢٠٦٩٩- ٣٣٥/١١}

"ইয়াহয়া ইবনে আবী কাসীর থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য যে আমীর নির্ধারণ করে দেব সে আমীর যদি তোমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত কোন আদেশ করে তাহলে তোমরা তার অনুসরণ করবে না, কেননা আল্লাহর অবাধ্যতার মাঝে কোন আনুগত্য নেই।" -মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, কিতাবুল জামে ...., باب لا طاعة في معصية

তৃতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য

তৃতীয় দায়িত্বের বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য দেখুন-

﴿عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله! حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في

منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان﴾ {صحيح البخارى : رقم الحديث: ٧٠٥٥- ٢٥٨٨/٦}

"জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া বলেন, আমরা ওবাদা ইবনে সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন তিনি অসুস্থ। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার ভালো করুন! আপনি আমাদেরকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন।

তিনি বলেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডেকেছেন, আমরা তাঁর হাতে বাইআত হয়েছি। তখন তিনি আমাদের কাছ থেকে যেসব বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়েছেন তার মধ্যে ছিল, আমরা আমাদের পছন্দের সময়ে, অপছন্দের সময়ে এবং সহজ অবস্থা ও কঠিন অবস্থায় এবং নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে শুনব ও মানব এ কথার উপর বাইআত হয়েছি। আর আমরা ক্ষমতার বিষয়ে ক্ষমতাবানদের সঙ্গে টানাটানি করব না, তবে যদি তোমরা তার থেকে এমন কোন স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পেতে দেখ যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে।" -সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান।

ফকীহ মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত

সরকার মুরতাদ হয় যখন তার থেকে স্পষ্ট কুফর পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কী বিধান তা বিস্তারিত বলতে গিয়ে কাযী ইয়ায রহ. বলেন-

﴿قَالَ الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ﴾

{شرح مسلم للنووى : ٢٤٠/٤}

"কাযী বলেন, যদি সে নতুনভাবে কুফরে পতিত হয় এবং শরীয়তের বিধানকে বদলে দেয়, অথবা বিদআতের শিকার হয় তাহলে সে ক্ষমতার অধিকার থেকে বেরিয়ে যাবে এবং তার আনুগত্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা অবস্থান নেয়া এবং তাকে পদচ্যুত করা এবং সে স্থলে সম্ভব হলে একজন উপযুক্ত ইমাম (খলিফা) বসানো ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি বিষয়টি মুসলমানদের শুধু একটি কাফেলার ক্ষেত্রে হয় তাহলে তাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে ঐ কাফেরকে পদচ্যুত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিদআতীর ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হবে না, তবে যদি তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করে তাহলে ব্যবস্থা নেবে। -শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী, কিতাবুল ইমারাত।

চতুর্থ দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য

চতুর্থ দায়িত্বের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য দেখুন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ {سورة النساء: ٩٧}

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।" -সূরা নিসা ৯৭

চতুর্থ দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য

চতুর্থ দায়িত্বের বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য দেখুন-

﴿عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن﴾ {الموطأ : رقم الحديث: ٣٥٥٨- ٩٧٠/٢}

"এমন হতে পারে যে, মুসলমানের সবচাইতে উত্তম সম্পদ হবে ছাগল যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে এবং বিভিন্ন উপত্যকায় নিজের ঈমান নিয়ে ভেগে যাবে ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য।" -মুয়াত্তা মালেক, কিতাবুল ইসতিযান, বাবু মা জাআ ফী আমরিল গানামি

ফকীহ মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত

কাফের মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার মত শক্তি না থাকলে কী করণীয় সে বিষয়ে ফকীহ মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত দেখুন-

﴿فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ وَلْيُهَاجِرِ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِه إِلَى غَيْرِهَا وَيَفِرَّ بِدِينِهِ﴾ {شرح مسلم للنووي : ٢٤٠/٤}

"আর যদি তারা নিশ্চিত হয় যে, তারা বিপক্ষে অবস্থান নিতে সক্ষম নয় তাহলে বিপক্ষে অবস্থান নেয়া ওয়াজিব হবে না। বরং তখন মুসলমান তার এলাকা থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাবে এবং নিজের দ্বীন ঈমান নিয়ে পালিয়ে যাবে।" -শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী, কিতাবুল ইমারাত।

শায়খে মুহতারাম এ দায়িত্বগুলোর কথা আলোচনায় আনেননি। এ বিষয়ে তিনি এমন কিছু পথই দেখিয়েছেন যে পথে গেলে গণতন্ত্রের অনুশীলন হবে, তাগুতের আইনের সামনে ও তাগুতের আইনের প্রক্রিয়ার সামনে নিজেকে ন্যস্ত করতে হবে। এ বিষয়টি এখন আর ব্যাখ্যা করলাম না। সামনে আরো অনেক কথা রয়ে গেছে। আশা করি সেসব কথা সামনে আসলে বিষয়গুলো ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে যাবে।

জরুরী টীকা : ১০

“

তার পরিবর্তে ইসলামী আইন আনার দাবি উত্থাপন করবে।

”

জরুরী টীকা-১০

তার পরিবর্তে ইসলামী আইন আনার দাবি উত্থাপন করবে।

এ দাবিগুলোও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সম্মান রক্ষা করে করতে হয়। আর সেখানেই এসে দাবির চাকা আটকে যায়। দীর্ঘ অতীতে সে চাকা আটকে গিয়েছে। এখানে গভীর ও সূক্ষ্ম আর কোন কারণ নেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের দাবি মানে গণতন্ত্র বাস্তবায়নের দাবি, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের দাবি নয়।

দাবি উত্থাপনের দায়িত্ব

এ পরিভাষাটি একটি গণতান্ত্রিক পরিভাষা। যেখানে গণতন্ত্রের মালিক পক্ষ প্রজাদের প্রভু হয়। গণতন্ত্রের প্রজারা বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন, আর প্রভুরা সেগুলো বিবেচনা করেন। কখনো করুণা দেখান, কখনো ইনসাফ করেন, আবার কখনো পরাক্রমশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কোন দারুল ইসলামে এসব পরিভাষার কোন ব্যবহার ক্ষেত্র নেই। ইসলাম শাসিত কোন দেশে এ পরিভাষার পরিধি সর্বোচ্চ এতটুকু হতে পারে যে, দেশের কোন নাগরিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পুরা করার জন্য কোন কিছু দাবি করবে, আবদার করবে, কোন বৈধ কাজের অনুমতি চাইবে। কিন্তু শরীয়তের আইন বাস্তবায়নের দাবি?! এটা কোন দাবি, আবদার, আবেদন বা মামলা দায়েরের কোন বিষয়ই নয়।

গণতন্ত্রের অনুশীলন করতে করতে আমরা শরীয়তের মূল হাকীকত ও তার পাওয়ারের কথা একদম ভুলে গেছি। শরীয়তের যে কোন আইন বাস্তবায়নের পর্ব তিনটি: ইলাম, ইজবার এবং হিজরাহ ও শক্তি সঞ্চয়। প্রথমে জানিয়ে দেয়া হবে, এর পর প্রেশার ক্রিয়েট হবে যা অস্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়, তা সম্ভব না হলে নিজের দ্বীন ও ঈমান নিয়ে হিজরত করে চলে যাবে এবং শক্তি সঞ্চয়ের ফরয দায়িত্ব আদায় করতে থাকবে। আবু জাহাল, আবু লাহাব, বা কমপক্ষে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের কাছে ইসলামের কোন আইন বাস্তবায়নের জন্য দাবি উত্থাপনের কোন ধারণা ইসলামে নেই। একটি দারুল ইসলামে এর সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি নেই।

এগুলো অনেকটা ছেলেখেলার মত কথা। লুকোচুরি খেলার মত। অথবা 'আমি যা দেখি তুমি তা দেখ না' খেলার মত। অথবা কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার মত। আল্লাহর আইনের খেলাফ আইন তৈরি করা হচ্ছে প্রতিদিন। সবার সামনে। ঘোষণা দিয়ে। ধর্মের প্রভাবমুক্ত আইন হবে - এ মূলনীতি রচনা করে। সবাই জানে, সবাই দেখে। এরপরও কুরআনের আইনের বিপরীত আইনকে বিলুপ্ত করে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন নিবেদন করতে হবে সাধারণ নাগরিককে।

এক্ষেত্রে দারুল ইসলামের আমীরুল মুমিনীনের কোন দায়িত্ব নেই যিনি জেনে শুনে কুরআন বিরোধী আইনের অনুমোদন দিয়েছেন। সংসদ সদস্যদের কোন দায়িত্ব নেই যারা কুরআনের আইন বিরোধী আইনের পক্ষে জেনে শুনে রায় দিয়েছেন। সংসদের স্পীকারের কোন দায় দায়িত্ব নেই যিনি কুরআন বিরোধী আইনকে ভোট গ্রহণ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ দায়িত্ব হচ্ছে বেচারা সাধারণ জনগণের, যারা গণতন্ত্রের খেলার পুতুল। বেচারা জনগণকে এ দায়িত্ব দিয়ে তাকে গণতন্ত্রের দশ ঘাটের পানিতে চুবিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে, যেন কখনো গণতান্ত্রিক আইনের বিরুদ্ধে এমন দুঃসাহসিকতা না দেখায়।

দীর্ঘকাল যাবত অধর্মের বিষয়গুলোকে আমরা ধর্মের কষ্টিপাথরে মাপছি না। ধর্মের কষ্টিপাথরে মেপে গ্রহণ ও বর্জনের হিম্মত দেখাতে পারছি না। যারফলে পুরো ধর্মটাই এখন গণতন্ত্রময় হয়ে গিয়েছে। ইসলামের স্বকীয়তা হারিয়ে গেছে। সব হারিয়ে আমরা এখন ইসলামের আইনকে, আল্লাহর বিধানকে গণতন্ত্রের করুণার ভিখারী বানিয়ে ছেড়েছি।

এ অধিকার সব ধর্মের লোকদেরই আছে

শায়খে মুহতারাম ইসলামী আইনের জন্য মুসলমানদের যে অধিকারের কথা বলেছেন, এ অধিকার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের জন্যই আছে। শক্তভাবে আছে এবং প্রায়োগিকভাবেই আছে। খোদ পাকিস্তানেও আছে। এ ধারার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে অতিরিক্ত কিছুই দেয়া হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানে যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইন পাস করা হয় যে, একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ক্রুশ প্রদর্শন অবৈধ। অতএব গির্জার বাইরের দেয়ালে, অফিস আদালতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের গলায়, মুদ্রিত কোন বই পত্রের প্রচ্ছদে ক্রুশের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেউ এমন করলে তা দণ্ডণীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হবে।

এ আইন পাস হওয়ার পর প্রয়োগ হওয়ার আগেই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল হয়ে যাবে। আইনটি বিলুপ্তির জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন হবে। এ আবেদন হওয়ার পর কোন গণতান্ত্রিক দেশ এ মামলা খারিজ করে দেয়ার হিম্মত করবে না। বরং পাকিস্তানসহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশই এ কথা বলবে যে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোন আইন গ্রহণযোগ্য নয় এবং যে ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন তৈরি হবে সে ধর্মের অনুসারীদের এ অধিকার আছে যে, তারা ধর্মবিরোধী সে আইন বিলুপ্ত করার জন্য আবেদন করতে পারবে।

প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে এ ধরনের সম্প্রীতিমূলক আচরণ ছাড়া গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম চলতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মকে ভেঙ্গে যখন একটি ধর্ম তৈরি করা হবে তখন প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে খাতির ঠিক রাখা যায় পরিমাণ ছাড় তাকে দিতে হবে। আর মূল স্তম্ভ ভেঙ্গে দেয়ার পর দু'চারটি শাখা প্রশাখা টিকিয়ে রাখলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের এমন কোন ক্ষতি নেই।

বিশেষত ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারে সহনীয়। কারণ বিধান দেয়া ও আইন দেয়ার দায়িত্ব যখন আল্লাহর হাত থেকে এনে বান্দার হাতে দিয়ে দেয়া গেছে তখন ইসলাম ও মুসলমানদের একশত দাবি রক্ষা করলেও কোন সমস্য নেই। কারণ এ ধর্মে নামায, রোযা, হজ্জ,

যাকাত, দান খয়রাত, তাসবীহ তাহলীল সব কিছুর সঙ্গেও যদি আল্লাহর সঙ্গে শুধুমাত্র কাউকে শরীক হিসাবে গিলিয়ে দেয়া যায় তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম এ কাজটুকু অনেক আগেই করে ফেলেছে। এখন ধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার কিছু দাবি মেনে নিতে তাদের এমন বড় ধরনের কোন সমস্যা নেই। এরপরও বাস্তবতা হচ্ছে, অন্যান্য ধর্মের কিছু কিছু আইন মেনে নেয়া গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের জন্য যতটা সহজ, ইসলাম ধর্মের কোন বিধানকে মেনে নেয়া ততটা সহজ নয়। আর সে কারণেই সংবিধানে এ ধারাটি সুস্পষ্ট করে থাকার পরও শরীয়তের কোন বিধান সূর্যের মুখ দেখার সুযোগ পায় না।

তাই বলছিলাম, ধর্মের বিরুদ্ধে আইন হলে তা বিলুপ্ত করার অধিকার শুধু মুসলমানরাই পায় না; বরং যে কোন ধর্মের অনুসারীরাই এ অধিকার পায়। একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এ অধিকার পাওয়া ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্য নয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের কোন বৈশিষ্ট্য নয়। এটি হচ্ছে মূলত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তাই পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক দেশে সকল ধর্মই এ অধিকার পায়। ইসলাম ও মুসলমানদের চাইতে একটু বা অনেক বেশি পরিমাণে পায়।

জরুরী টীকা : ১১

> আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে....

জরুরী টীকা-১১

আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে....

** এ 'যদি'র মধ্যে পুরা কুরআন সুন্নাহই আটকে গেছে। আদালত গ্রহণ না করার জন্য হাজার হাজার ব্যবস্থা সংবিধানে ও আইনে রাখা আছে। আর আদালতের সবচাইতে বড় যোগ্যতা হচ্ছে, আদালত কুরআন সুন্নাহর আইন সম্পর্কে সাধারণত ব-কলম হয়ে থাকে। আর কুরআন সুন্নাহ'র আইনকে প্রতিরোধ করার মত সকল প্রশিক্ষণ তাদের নেয়া থাকে। আর তা থাকে সরাসরি ইউরোপ-আমেরিকার তত্ত্বাবধানে। মুস্তাশরিকদের নির্দেশনা অনুযায়ী। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতি ধারা অনুযায়ী। একটি গণতান্ত্রিক দেশের আদালত কী এবং সে আদালতের বিচারক কে তা বুঝে আসলে আমাদের জন্য বুঝে নেয়া আরো সহজ হবে যে, আদালত একজন মুসলমান নাগরিকের এ দাবি গ্রহণ করবে কি করবে না।*

আদালত কী?

একটি গণতান্ত্রিক দেশের আদালত হচ্ছে সে দেশের জন্য রচিত আইনের প্রয়োগ বিভাগ। যে দেশের আইন তৈরি হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে সে দেশের আদালত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নকারী। রুচি, প্রয়োজন, লাভ ও ক্ষতির কোন বিবেচনা ছাড়া শুধু সংখ্যাধিক্যের ভোটের ভিত্তিতে যে দেশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

সে দেশের আদালত সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে রুচি, প্রয়োজন, লাভ ও ক্ষতির বিবেচনায় মামলার রায় দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান আদালতের কোন ভিন্নতা নেই।

আদালত শব্দটি উচ্চারণ করতে গেলে আমরা সাধারণত পবিত্র ও মহান বিশেষণ যোগ না করে শব্দটি উচ্চারণ করি না। মহামান্য আদালত, মাননীয় আদালত, আদালতের পবিত্র প্রাঙ্গণ, মহান আদালত ইত্যাদি শব্দ এখন এত বেশি চর্চিত হয়েছে যে, আদালতকে কল্পনা করলে আমরা এসব বিশেষণ ছাড়া কল্পনা করতে পারি না। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থাও অভিন্ন।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে দুইভাবে মূল্যায়ন করা যায়। **একটি হচ্ছে,** ইসলামের ইতিহাসে যে আদালতের উল্লেখ রয়েছে সে আদালত হচ্ছে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের একটি প্রতিষ্ঠান। আর সে হিসাবে আদালত অবশ্যই মহামান্য এবং আদালতের অঙ্গন একটি পবিত্র অঙ্গন। যে অঙ্গনে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব ছাড়া আর কারো কোন কর্তৃত্ব গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে আদালতের প্রতিটি অঙ্গ ছিল আল্লাহর বিধানের গোলাম ও অনুগত বাস্তবায়ক।

কিন্তু অচেতন মুসলমান বুঝে উঠতে পারেনি যে, সময়ের ব্যবধানে সেখানে কী ঘটে গেছে। সময়ের ব্যবধানে সে আদালতের বিধানদাতা হয়ে গেছে এক আল্লাহর পরিবর্তে তিনশত সংসদ সদস্য। বিধানদাতা হিসাবে খালেকের আসন দখল করে বসেছে মাখলুক। যে ব্যবধান শুধু মুসলমানই বোঝার কথা ছিল সে কথা মুসলমান বুঝতে পারেনি। ফলে পবিত্র মহামান্য সে প্রতিষ্ঠান যে প্রত্যাখ্যাত ধিকৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে অচেতন মুসলমান তা বুঝতে পারেনি। আর সে কারণে মাখলূক খালেকের আসন দখল করে নেয়া সত্ত্বেও এ অঙ্গনটি মুসলমানের কাছেও মহামান্য ও পবিত্রই রয়ে গেছে। এ হচ্ছে এক ধরনের মূল্যায়ন।

আরেকটি মূল্যায়ন হচ্ছে, মুসলমান দীর্ঘকাল ব্যাপী আল্লাহর দুশমনের গোলামী করতে করতে আল্লাহর দুশমনই তাদের কাছে মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে গেছে। আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর দুশমনকেই নিজেদের মান ইজ্জতের ঠিকাদার হিসাবে মনে করেছে। তারা আবার সে চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছে যে চরিত্রের বিষয়ে তাদেরকে বার বার সতর্ক করা হয়েছে।

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ {سورة النساء ١٣٨-١٣٩}

"সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।" -সূরা নিসা ১৩৮-১৩৯

খালেকের বান্দা হয়েও, নিজেকে খালেকের গোলাম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার পরও তারা সম্মানের জন্য ধর্ণা দিয়ে চলেছে মাখলূকের দরবারে দরবারে। তাও আবার আল্লাহর দুশমনদের দরবারে দরবারে। আর এভাবেই আল্লাহর দুশমন এবং আল্লাহর দুশমনদের সকল কার্যক্রম আল্লাহর বান্দাদের কাছে মহামান্য, মাননীয়, শ্রদ্ধেয়, পবিত্র ও শিরোধার্য হয়ে পড়েছে। এখন মুসলমান সে আদালতকেই মাননীয় ও পবিত্র বলে চলেছে যে আদালতে প্রতিদিন শতবার আল্লাহর বিধানের গলায় ছুরি চালানো হয় এবং সে জন্য গর্ব প্রকাশ করা হয়।

শায়খে মুহতারাম সে আদালতের কথাই বলছেন এবং আশা করছেন যে, আদালত মুসলিম নাগরিকের ইসলামী আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক দাবি গ্রহণ করবে এবং তার মাধ্যমে দেশ ইসলামী হবে। বা এ সুযোগ থাকার কারণে দেশ ইসলামী হয়েই গেছে।

আরেকটু স্পষ্ট হোক

এতসব কথার পরও মনে হয় এখানে একটি ছিদ্র এখনো রয়েই গেছে। শায়খে মুহতারামে পক্ষ থেকে কেউ বলতে পারেন, আমার সব কথা চলছে গায়রে শরয়ী আদালতকে সামনে রেখে। আর শায়খে মুহতারাম সব কথা বলেছেন শরয়ী আদালতকে সামনে রেখে। দুই কথা দুই ময়দানে চলছে।

এ বিষয়ে আমার নিবেদন হচ্ছে, শরীয়াহ আদালত সম্পর্কে আগেও কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে, সামনে আরো তথ্য ইনশা-আল্লাহ আসবে। যে

তথ্যগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, তাগুতের আদালত থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান শরীয়াহ আদালতের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। পাকিস্তান শরয়ী আদালত গণতান্ত্রিক পাকিস্তান থেকে মুক্ত ও স্বাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের নাম নয়। গণতন্ত্রের সকল নীতি ধারাকে কুর্নিশ করেই পাকিস্তান শরয়ী আদালতকে চলতে হয়, চলতে হবে এবং অতীতে চলেছে। সে তথ্যগুলোর দু'চারটি এখানে আবারো উল্লেখ করছি-

ক. পাকিস্তান শরীয়াহ আদালতের আটজন বিচারকের সর্বোচ্চ তিন জন হবে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ, আর অবশিষ্ট পাঁচ জনই হবে তাগুতের আইনে বিশেষজ্ঞ এবং কুফরী আইনের সফল প্রয়োগকারী হিসাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

খ. এ বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ হবে না। প্রধান বিচারপতি হবে তাগুতের কুফরী আইনের বিশেষজ্ঞ ও মানবরচিত আইনের প্রয়োগকারী হিসাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞ।

গ. শরীয়া বেঞ্চের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে গায়রে শরয়ী আদালত। তাগুত ও মানবরচিত কুফরের সর্বোচ্চ আদালতের অনুমোদন ব্যতীত শরীয়াহ আদালতের কোন সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে না।

ঘ. গায়রে শরয়ী কুফরী আদালত শরীয়াহ বেঞ্চের পরিচালিত সকল কার্যক্রমের রেকর্ড তলব করার অধিকার রাখে এবং শরয়ী আদালত তা প্রদর্শন করতে বাধ্য।

ঙ. পাকিস্তান আদালতের যে কোন পর্যায়ের যে কোন বেঞ্চের যে কোন বিষয়ের যে কোন সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট মুলতবি করতে পারবেন, উল্টে দিতে পারবেন, সংযোজন করতে পারবেন, বিয়োজন করতে পারবেন। এ সকল পারার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের শুধুমাত্র মর্জি কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে কোন আইন, কোন ভালো মন্দের বিবেচনা বা কোন লাভ ক্ষতির বিবেচনা কোন কিছুই প্রভাব বিস্তার করবে না।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই বলছিলাম, শরয়ী আদালত হোক বা যে আদালতই হোক কোন আদালতই পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করতে পারবে না। বৃটিশ আমেরিকা তথা তাগুতের আইন এবং মানবরচিত আইনের মূল ধারাগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। অতীতে পারেনি, বর্তমানে পারছে

না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। এসকল ক্ষেত্রে শরীয়াহ বেঞ্চ ও শরয়ী আদালতকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখার কোন সুযোগ সংবিধানে রাখা হয়নি।

বিচারক কে?

একটি গণতান্ত্রিক দেশের আদালত বিভাগ কাদের দখলে থাকে? আদালতের বিচারপতিরা কারা হয়ে থাকে? তাদের যোগ্যতা কী? শায়খে মুহতারাম যে বিচারপতিদের কাছে আশা করছেন, তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত ইসলামী আইন বাস্তবায়নের দাবি বিবেচনায় নিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক আইনকে বিলুপ্ত করে ইসলামী আইন প্রয়োগ করবে সে বিচারপতিদের সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা থাকা চাই। সবচাইতে সহজ হবে, বিচারপতিদের যোগ্যতার তালিকা সামনে থাকলে। তাই তাদের কিছু যোগ্যতা নিম্নরূপ-

ক. যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের আদালতের বিচারপতিরা সাধারণত কুরআন হাদীসের ইলম সম্পর্কে একদম অজ্ঞ থাকে। একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ কোন মাসআলা হয়ত দেখার সুযোগ হয়, নচেৎ স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে, ইলমে ওহির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এর একটি কারণ হচ্ছে, গণতান্ত্রিক দেশে বিচারপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইলমে ওহির কোন প্রয়োজন হয় না।

খ. শরীয়াহ বিরোধী গায়রুল্লাহর আইন শেখার বিষয়ে তারা প্রতিযোগী হয়ে থাকে।

গ. আল্লাহর আইন শিক্ষার ফরয দায়িত্বকে তারা একটি ঐচ্ছিক বিষয় মনে করে থাকে এবং ক্ষেত্র বিশেষ অতিরিক্ত ও অনর্থক মনে করে থাকে।

ঘ. গায়রুল্লাহর আইন তথা শরীয়ত বিরোধী আইন প্রয়োগ করার জন্য তারা অর্থ ব্যয় করেও সে সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকে।

ঙ. শরীয়ত বিরোধী আইনগুলো প্রয়োগ করতে পেরে গর্বে তাদের বুক ফুলে উঠে। গায়রুল্লাহর আইনের ভিত্তিতে যে কোন রায় দেয়ার পর তারা ছবি তোলার জন্য যে পোজ দিয়ে থাকে তা থেকে মনের অবস্থা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

চ. কুফরের আইনগুলো রপ্ত করার জন্য তাদের রাত দিনগুলো সম্পূর্ণ ওয়াকফ থাকে।

ছ. প্রতিদিন আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য বিরোধিতার উপর তাদের কোন আফসোস ও দুঃখ নেই।

জ. গায়রুল্লাহর আইন ছেড়ে কখনো আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেয়ার কোন স্বপ্ন তাদের চোখে নেই।

ঝ. গায়রুল্লাহর আইনের অনুশীলন করতে করতে যে সারাটি জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে কখনো চিন্তা আসে না যে, এ জীবনটি বৈধ জীবন না কি অবৈধ জীবন।

জরুরী টীকা : ১২

“

আদালতের এ অধিকার আছে যে, সে ঐ কানূন বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ইসলামী কানূন বাস্তবায়ন করার হুকুম জারি করবে।

”

জরুরী টীকা-১২

আদালতের এ অধিকার আছে যে, সে ঐ কানূন বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ইসলামী কানূন বাস্তবায়ন করার হুকুম জারি করবে।

***** একটি দারুল ইসলামের আদালতের এটা অধিকার নয়, এটা তার উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব। এ ভাষাগুলো হচ্ছে পরাজিত শক্তির ভাষা। যে কোন কারণেই হোক আমরা এখন ইসলাম ও মুসলমানদেরকে একটি পরাজিত শক্তি হিসাবে ভাবতে পছন্দ করি। যারফলে আমাদের প্রত্যেকটি শব্দের ব্যবহার সে আঙ্গিকেই হয়ে থাকে। আর সে কারণে আমরা গর্ত থেকে উঠে আসার সুতা দেখতে পাওয়ার গর্বে মাটিতে পা রাখতে পারছি না। সুতাধারী অপর প্রান্তের গণতান্ত্রিক ইবলিসের শুকরিয়া আদায় করার মত ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না।*

এ করুণার আধার কে?

এ অধিকার আদালতকে কে দিয়েছে? যে দিয়েছে সে অধিকার দেয়ার কী অধিকার রাখে? দেখা যায়, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম তার স্বাভাবিক নীতি ধারার আলোকে তার অধীনস্ত প্রত্যেকটি ধর্মকে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে যে দেশে যে ধর্মের অনুসারী বেশি সে দেশে সে ধর্মের অনুসারীদেরকে একটু বাড়তি সুবিধা দেয়া, একটু বাড়তি অধিকার দেয়া গণতন্ত্রের নীতি বহির্ভূত কিছু নয়।

সফল রাজা

দুনিয়ার বিচারে এবং দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করার ক্ষেত্রে সফল রাজা ও সফল রাজনীতি হচ্ছে যে রাজা ও রাজনীতি তার প্রজাদের কোন গোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তুলবে না, ক্ষেপিয়ে তোলার মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। এক সময় রাজা ছিল একক রাজা। এক দেশের এক রাজা। ভিন্ন দেশের ভিন্ন রাজা। প্রত্যেক রাজা তার সুবিধা অসুবিধাগুলো নিজেই বিবেচনা করত। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, বিভিন্ন বিষয় বর্জন করত। এ ক্ষেত্রে তাদের কৌশলে অনেক ভুল হয়ে যেত।

গণতন্ত্রের রাজা

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের রাজ্য শাসনের থিওরী এমন নয়। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে পুরো পৃথিবী এক দেশ। পুরো পৃথিবীর পরিচালনা এক কেন্দ্রিক। সকল সিদ্ধান্ত এক কেন্দ্রিক। আবার বিষয়গুলো এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়; টিম ও কাফেলা কেন্দ্রিক। ছোটখাট কোন কাফেলা নয়, একটু বৃহৎ আকারের কাফেলা।

এসকল কারণে গণতন্ত্রের রাজারা সাধারণত সেসব ভুলের শিকার হয় না যেসব ভুলের কারণে আগেকার রাজারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে খুব তাড়াতাড়ি ব্যর্থ হয়ে যেত। এ কারণে গণতন্ত্রের রাজাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রজাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জামাতকে এমন এমন সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দেয়া হয় যার মোহে গোষ্ঠীর অধিপতি থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী সমর্থকরা পর্যন্ত আত্মভোলা হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের রাজাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের মাইল ফলক অনেক দূরে স্থির করা থাকে। যারফলে ছোটখাট গর্তে তাদের পা আটকে যায় না। অল্পস্বল্প কাদায় তাদের গাড়ির চাকা দেবে যায় না।

এভাবেই গণতন্ত্রের রাজারা তাদের কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্যের গুণে পৃথিবীর সকল গোষ্ঠীকে, এমনকি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকেও, এমনকি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকেও বাগে আনতে সফল হয়েছে। এজন্য তাদেরকে যে কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে তা হচ্ছে, অধিকারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া এবং এমনসব অধিকারকে খুঁজে খুঁজে বের করা যার সংখ্যা বেড়ে গেলেও গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের মূল থিওরীতে কোন প্রকার আঁচড় পড়বে না।

ইসলামের জন্য বাড়তি সতর্কতা

গণতান্ত্রিক আইন বাতিল করে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য গণতন্ত্র আদালতকে যে অধিকার দিয়েছে তা সেসব অধিকারের একটি। অবশ্য মুসলমানদেরকে এসব অধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে, যে সতর্কতা অন্যান্য ধর্মের বেলায় তারা দেখায়নি।

তাদের সে সতর্কতার রূপ হচ্ছে, অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এমন একটি প্রক্রিয়া মুসলমানদেরকে দেয়া হয়ে থাকে যে প্রক্রিয়ায় ইসলামী আইনটি বাস্তবায়ন হওয়ার অনেক আগেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এরপর ইসলামী আইন যদি বাস্তবায়নের মুখ দেখেও তবু তা ততটুকু পরিমাণই বাস্তবায়িত হবে যতটুকুতে গণতন্ত্রের মূল ধারায় কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটবে না।

কারণ

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ইসলামের বিষয়ে একটু বাড়তি সতর্ক কেন এ বিষয়ে আগেও কিছু কথা বলা হয়েছে। এখানেও প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি কথা বলে রাখি।

ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম এবং মানব জন্মের শুরু থেকে পৃথিবীর বিলুপ্তি পর্যন্ত সবার ধর্ম। ধর্মের নামে প্রচলিত অন্যান্য মতবাদগুলো এরকম নয়। ইসলাম যেমন দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ স্থির করে কাজ করে বিশ্বব্যাপী সফলতা লাভ করেছে, তাকে বিলুপ্ত করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের আগে আবিষ্কার হয়নি। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ইসলামের মূল পাওয়ার ও গতিপথকে যেভাবে উপলব্ধি করেছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের আগে কোন তন্ত্র বিষয়টিকে ঠিক সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি।

এসব বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম নিজেদেরকে পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্বের আসনে সমাসীন করে সকল জাতি গোষ্ঠীর মাঝে করুণা বিলি করে চলেছে। দান অনুদান করে চলেছে।

এ করুণার ভিখারী কে?

এখন এ করুণার ভিখারী হচ্ছে যারা পৃথিবীতে করুণাময় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। যারা রহমতে আলমের উম্মত। আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন তাঁর প্রিয় নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন করুণাময় হিসাবে। তাঁরা দ্বীনী বিষয়ে মানুষের উপর করুণা করেছেন, পার্থিব বিষয়েও মানুষের প্রতি করুণা করেছেন।

দ্বীনী বিষয়ে কোন নবী কোন মানুষের করুণা গ্রহণ করেননি, পার্থিব বিষয়েও কখনো কোন নবী মানুষের করুণা গ্রহণ করেননি। আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি আমাদের নবী এবং আমরা যে নবীর উম্মত সে নবী ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সবার উপর করুণার সর্বোচ্চ মাত্রা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, আর পার্থিব বিষয়েও কখনো কারো করুণা গ্রহণ না করে সবার প্রতি সর্বোচ্চ ও সবচাইতে ব্যাপক করুণা করে গেছেন।

আল্লাহর কোন নবীর মুখে কখনো করুণা ভিক্ষার ভাষা ছিল না। কখনো কোন লম্পট কাফের নিজের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নবীর উপর অনুগ্রহ ফলাতে গেলে কোন করুণার খোঁটা দিতে গেলে নবী তা তার মুখের উপর মেরে দিয়েছেন। তারা যাকে করুণা মনে করছে তা যে করুণা নয় তা তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু মহা করুণাময়ের বান্দা, রহমতে আলমের উম্মত করুণাময় মুসলমান আজ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের মত দু'টি নষ্ট মতবাদের দ্বারে দ্বারে করুণার ভিখারী হয়ে ফিরে চলেছে। গণতন্ত্রের আধিপত্য মেনে নিতে কোন প্রকার লজ্জাবোধ হচ্ছে না, ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অধীনস্ততা মেনে নিতে কোন প্রকার ইতস্ততাবোধ হচ্ছে না। উপরন্তু দু'টি মতবাদের উচ্ছিষ্ট যখন দান অনুদান হিসাবে বিলি বণ্টন হয় তখন আমরা তা গ্রহণ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। গণতন্ত্রের এখানেই জিত। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম এখানেই সফল।

সারা বিশ্বের প্রকৃত করুণাময়দের হাতে যখন করুণা ভিক্ষার থলি ধরিয়ে দেয়া যায় তখন শত্রুর জন্য এর চাইতে বড় আর কোন সফলতা হতে পারে না।

কেমন হওয়ার কথা ছিল?

হওয়ার কথা ছিল, সকল কুফরী শক্তি ইসলাম ও মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে। অমুসলিম হওয়ার অপরাধে মুসলমানদেরকে কর দিয়ে চলবে। নিজেদের হীনতার স্বীকৃতি দেবে। ইসলাম ও মুসলমানদের

বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবে। ইসলাম ও মুসলমানদের চাপিয়ে দেয়া সকল শর্ত মেনে নেবে। চাল চলনে নিজেদের হীনতার প্রকাশ করবে। নিজেদের আচার আচরণে ইসলাম ও মুসলমানদের সামনে নিজেদের হীনতার পরিচয় দেবে।

এসব কিছুর পর ইসলাম ও মুসলমান তাদের প্রতি করুণা করবে। তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে। তাদেরকে উপার্জনের সুযোগ করে দেবে। তাদের একান্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো করার সুযোগ দেবে। ইসলাম ও মুসলমানের ইজ্জত সম্মানের উপর আঁচড় না লাগে মত করে তারা যা যা করতে পারবে তা তা করতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। ইসলাম ও মুসলমানের মান মর্যাদার উপর আঘাত আসতে পারে এমন সব আচার আচরণ থেকে বিরত থাকতে তাদেরকে বাধ্য করা হবে।

এ হচ্ছে কুরআনের হুকুম। এ হচ্ছে হাদীসের নির্দেশনা। এ হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস এবং ইসলামী খেলাফতের ইতিহাস। ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ইসলামের এ মৌলিক নীতিটিই গ্রহণ করেছে। সবার প্রতি করুণা করবে, সবাইকে অধিকার দেবে, আর সবার উপর প্রভুত্ব করবে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন-

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ {الفرقان : ٤٨}

"তিনি ঐ সত্ত্বা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন নিয়ে পাঠিয়েছেন তাকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" – সূরা ফুরকান : ৪৮

এমন কেন হয়েছে?

অমুসলিম ধ্যানধারণা থেকে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলাম যে নীতি ধারা গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রভুত্ব করা ও করুণা করা, তা যদি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে তা ইসলাম কেন গ্রহণ করেছে? আর যদি তা ভালো হয়ে থাকে তাহলে তা অন্য কেউ গ্রহণ করলে সমস্যা কী? যে নীতি ধারা ইসলাম গ্রহণ করেছে সে নীতি ধারাই এখন অন্যদের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ইসলাম ও মুসলমানের মাথা ব্যথার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এ প্রশ্নের উত্তর মুসলমানদের জন্য একেবারেই সহজ। মুসলমান স্রষ্টার প্রভুত্বকে মেনে নিয়েছে। মুসলমান যা করে ও করতে বলে এবং যা বলে ও বলতে বলে সবই স্রষ্টার নির্দেশে করে ও বলে। সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব চলবে স্রষ্টার। অতএব যারা স্রষ্টার আনুগত্য করবে তাদের কথাই সবাই মেনে চলতে হবে। তাদের কাছেই সবাই বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে হবে।

আরহামুর রাহীমীন বিশ্বকরুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানই বিশ্বব্যাপী করুণা বিতরণ করবে। অন্যরা সে করুণার ভিখারী হবে। মুসলমান করুণা ভিক্ষা করবে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে। আর যারা আল্লাহর গোলামীকে স্বীকার করে নেবে না তারা আল্লাহর গোলামদের গোলামী করেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহর গোলামদের করুণা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে।

এ দাবি মুসলমান ব্যতীত আর কেউ করতে পারবে না। কারণ, মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও একমাত্র মাবুদ হিসাবে মেনে নেয়নি। আর যারা মেনে নিয়েছে তারাও আল্লাহর সঙ্গে গায়রুল্লাহকে শরীক করেছে। তাই তারাও এ দাবি করতে পারবে না। এসব বিষয়ে মুসলমানের কোন দ্বিধা থাকার কোন সুযোগ নেই।

মুসলিম বিচারপতির দায়িত্ব কী?

ইসলামী আইন ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ নাগরিকরা দাবি জানাবে, এরপর বিচারপতি আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবেন - ইসলামী শরীয়তে এমন কোন থিওরী নেই। মুসলিম বিচারপতি তখনই মুসলমান যখন তিনি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ থেকে বৃহৎ প্রতিটি মামলা কুরআনের আইনে ফায়সালা করাকে ফরয ও ওয়াজিব মনে করবেন।

যে বিচারপতি এ বিষয়টিকে ফরয মনে করবে না সে মুসলমান বিচারপতি নয়। যে বিচারপতি সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের আবেদনের অপেক্ষায় থাকবে, বা বলবে, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য কেউ দাবি করেনি তাই আমি গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে মামলার ফয়সালা করেছি সে বিচারপতিও মুসলমান নয়।

একজন বিচারপতি নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করতে হলে তাকে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে-

ক. প্রথমত অপ্রাপ্ত বয়স অবস্থায় যখন অভিভাবক তাকে আল্লাহর আইন না শিখিয়ে তাগুতের আইন শেখানোর পথে নিয়ে গেছে তখন তার ক্ষুদ্র বুঝ অনুযায়ী আল্লাহর আইন শেখার জন্য, অর্থাৎ মাদরাসায় পড়ার জন্য বায়না ধরা দরকার ছিল বা কাম্য ছিল। তবে শরীয়তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বয়সের সকল অপরাধের দায়দায়িত্ব অভিভাবকের উপর বিধায় এ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু নিস্তার পেয়ে যাবে। কিন্তু তার অভিভাবক, সহযোগী, পরামর্শদাতারা প্রত্যেকেই এ অপরাধের জবাব দিতে হবে।

খ. যে মুহূর্তে শিশু তার জবাবদিহিতার বয়সে উপনীত হবে, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হবে, যখন থেকে তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধান ফরয হয়ে যাবে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে তার দায়িত্ব হচ্ছে, তাগুতের আইন শেখার পথ পরিহার করে আল্লাহর বিধান শেখার পথে পা বাড়ানো।

এ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলে সেও ঐ অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে যে অপরাধে এত দিন তার অভিভাবক অপরাধী ছিল। তবে সে অপরাধী হওয়ার দ্বারা অভিভাবক তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না। অভিভাবকের জবাব অভিভাবককেই দিতে হবে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জবাব প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকেই দিতে হবে।

গ. তাগুতের আইন শেখার সময় যখন সে দেখতে পেত প্রতিদিন আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন তাকে শেখানো হচ্ছে, অথবা যখন সে দেখতে পেত প্রতিদিন একেকটি আইন কোন না কোন অমুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখানো হচ্ছে, তখন তার প্রতিদিনের ফরয দায়িত্ব ছিল সে শিক্ষার সকল নথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের দ্বীন ও ঈমান নিয়ে পালিয়ে আসা।

ঘ. যেদিন তার কর্মজীবন শুরু হয়েছে সেদিন তার উপর ফরয দায়িত্ব ছিল, নিজের জীবিকার জন্য একটি হালাল রোজগারের পথ খুঁজে বের করা। যে কর্মজীবনে প্রতিদিন কুরআন হাদীসের আইনের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিয়ে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে সে

কর্মজীবনে প্রবেশ করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সব রকমের হাতছানিকে প্রত্যাখ্যান করা, উপেক্ষা করা তার উপর ফরয ছিল।

ঙ. তাগুতের আদালতে বিচারক হিসাবে প্রবেশ করার পর তার প্রতি মুহূর্তের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে কুফরের এ ভয়ংকর পথ থেকে ঈমানের পথে ফিরে আসা।

আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে এবং তাগুতের আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করার শপথ করার সাথে সাথে যে ঈমান চলে গেছে সে কারণে যদি মুসলিম দায়িত্বশীলগণ তার জানাযার নামায না পড়েন, মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে কবর দিতে না দেন, তার সাথে মুসলমানদের বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দেন তাহলে এজন্য বিচারপতি সাহেব নিজেকেই যেন গালমন্দ করেন। কারণ, এ জন্য তিনিই দায়ী।

ইসলাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুফর শিরক থেকেও তওবা করে ফিরে আসার পথ খোলা রেখেছে। কিন্তু মৃত্যু যদি কুফর বা শিরকের উপর হয় তাহলে মুসলমানদের কিছু করার নেই।

আর যদি

আর যদি মুসলিম বিচারপতি শরয়ী আদালতের বিচারপতি হয়ে থাকেন, কোন দারুল ইসলামের আদালতের বিচারপতি হয়ে থাকেন, মুসলমানদের বিচারপতি হয়ে থাকেন তাহলে সে বিচারপতির দায়িত্ব হচ্ছে, মামলা দায়েরকারীকে জিজ্ঞেস না করেই প্রতিটি মামলার রায় দেবেন কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরয়ী আইনের আলোকে। এমনকি মামলা দায়েরকারী যদি কোন মুনাফিক, মুলহিদ বা যিন্দীক হওয়ার কারণে শরয়ী বিচারকে পছন্দ নাও করে, তবু বিচারপতি শরীয়তের আলোকেই সিদ্ধান্ত দেবেন।

শরয়ী আদালতের বিচারপতির কাছে জনগণ আবেদন করবে, যেন গণতান্ত্রিক আইন বিলুপ্ত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা হয় -এমন আবেদনের কোন প্রশ্নই আসে না। এমন প্রশ্ন আসতেই পারে না। দারুল ইসলামের বিচারপতিকে এ জন্য নিয়োগ দেয়া হয় না যে, সে গণতান্ত্রিক আইন বিলুপ্ত করে আল্লাহর আইন চালু করার আবেদন মঞ্জুর করবে। দারুল ইসলামে বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয় বিচারকার্য পরিচালনার জন্য।

গায়রুল্লাহর আইন ও তাগুতের আইনের বিলুপ্তি ঘটবে দারুল ইসলামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। এভাবে ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع জাহেলী সকল প্রথা নিয়ম নীতি সব আমার পায়ের নীচে পদদলিত। গায়রুল্লাহর আইন বিলুপ্তির জন্য এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য গণতন্ত্রের দ্বারে দ্বারে ফেরার কোন প্রক্রিয়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তে নেই। এমন অপমানজনক কোন প্রক্রিয়া তিনি তাঁর উম্মতকে দিয়ে যাননি।

জরুরী টীকা : ১৩

“

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এ গুরুত্বপূর্ণ ধারা যা পাকিস্তানের সংবিধানে রয়েছে হুকুমত.......

জরুরী টীকা-১৩

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এ গুরুত্বপূর্ণ ধারা যা পাকিস্তানের সংবিধানে রয়েছে হুকুমত.......

** সংবিধান তৈরি করে হুকুমত। অতীতেও করেছে হুকুমত। বর্তমানেও করছে হুকুমত। কুরআন সুন্নাহর সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে যে হুকুমত সংবিধান তৈরি করেছে সে হুকুমত মুসলমান (!), সে সংবিধানে যে রাষ্ট্র পরিচালিত সে দেশ দারুল ইসলাম (!)। আবার সে হুকুমতকেই অপবাদ দেয়া হচ্ছে, হুকুমত বেখবরীর কারণে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারছে না। কথাগুলো খুবই এলোমেলো হয়ে গেল।*

শায়খে মুহতারামের ভাষ্যমতে হুকুমত একটি ধারা তৈরি করেছে এভাবে যে, আইনের খাতায় যদি এমন কোন আইন থাকে যা কুরআনের আইনের বিপরীত তাহলে যে কোন নাগরিক তার বিরুদ্ধে আবেদন করে তা বিলুপ্ত করতে পারবে এবং সে জায়গায় কুরআনের আইন বসাতে পারবে। এটি হচ্ছে একটি ধারা।

এ ধারা তৈরি করেই হুকুমত আরো নিরানব্বইটি ধারা কুরআনের আইনের বিপরীত তৈরি করে চলেছে। একটি আইনের পেছনে সাধারণ নাগরিকদেরকে ব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। আমরা পেছনে দেখে এসেছি সাধারণ নাগরিকরা এ আইনটি কাজে লাগাতে গিয়ে এর পেছনে কত বছর ব্যয় করেছে এবং এর ফলাফল কী হয়েছে। আমরা দেখেছি, সেখানে ফলাফল ছিল শূন্য।

হুকুমত কী?

হুকুমতের বদনাম করা হয়েছে, হুকুমত তার বেখবরীর কারণে এ ধারাটিকে কাজে লাগাতে পারেনি। শায়খে মুহতারামের এ কথাটি আমি একদম বুঝতে পারিনি। হুকুমতের বেখবরীর কারণে সংবিধানের একটি ধারা কাজে লাগানো যাবে না এটা আবার কেমন কথা? এমন কথা হতেই পারে না।

প্রথম কথা হচ্ছে, হুকুমত তার নিজের তৈরি করা ধারা সম্পর্কে বেখবর হবে কেন? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ ধারা সম্পর্কে বেখবর থাকার কারণে আরো নিরানব্বই ধারা কুরআনের আইনের বিপরীত তৈরি করতে থাকবে এটাই বা কেমন কথা। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের পাতায় পাতায় আল্লাহর আইনের বিধানের বিপরীত বিধান পাস করা আছে। আর এসব কিছুর কারণ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি ধারা সম্পর্কে হুকুমতের বেখবরী। তাহলে হুকুমত আসলে কী?

হুকুমত হচ্ছে দেশের নির্বাহী শক্তি, যার উপর কারো কোন কথা চলে না। হুকুমত হচ্ছে একটি সম্মিলিত শক্তি, যার এক জনের ভুলের কারণে সবাই ভুলে যায় না। হুকুমত হচ্ছে একটি চলমান শক্তি, যার প্রতিটি পদক্ষেপ নবায়ন করতে হয়। সংবিধানের প্রতিটি আইনের পক্ষে বিপক্ষে তার প্রতিদিন দেন-দরবার করতে হয়। এ হুকুমত সম্পর্কে যদি বলা হয়, হুকুমতের বেখবরীর কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি অকার্যকর হয়ে আছে তাহলে কথাটি কেমন হল?

কথাটা বিপরীত রকমের হয়ে গেল

হুকুমত বেখবর হবে কেন? আমরা তো বরং দেখেছি হুকুমতের খবরদারীর কারণে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষরা মিলেও এ ধারাটিকে কাজে লাগাতে পারেনি। হুকুমতের সচেতনতার কারণেই আল্লাহর বিধানের পক্ষে হাজার হাজার আবেদন, লক্ষ কোটি মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থন, বছরের পর বছর এর পেছনে গবেষণা ও মেহনত করার পরও শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। গণতন্ত্রের আইনের বিপরীতে আল্লাহর বিধানকে প্রয়োগ করা যায়নি হুকুমতের সচেতনতার কারণে।

হুকুমত গণতন্ত্রের আইনের গিরা যত শক্ত করে দিয়েছে শরয়ী বিধানের গিরা সেভাবে দেয়নি। আর সে কারণে গণতন্ত্র ও শরীয়ার লড়াইয়ে

গণতন্ত্রেরই বিজয় হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এমনই হওয়ার কথা। এটা হুকুমতের সচেতনতারই প্রমাণ।

সংবিধান কী?

সংবিধান হচ্ছে, হুকুমতের সিদ্ধান্তসমগ্র। সংসদ সদস্যরাই হুকুমত, আর হুকুমত হচ্ছে সংসদ সদস্যদের সমষ্টি। এ হুকুমত বা সংসদ সদস্যরা মিলে দেশ পরিচালনার জন্য যে বিধানগুলো তৈরি করে থাকে তাই সংবিধান। দেশ পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ও ধারাগুলোর সমষ্টি হচ্ছে সংবিধান। হুকুমত, সংসদ সদস্য ও সংবিধান এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। সংবিধানের কোন ধারা সম্পর্কে হুকুমত বা সংসদ সদস্যরা বেখবর থাকার কোন সুযোগ নেই। ব্যক্তিবিশেষ সাময়িক সময়ের জন্য ভুলে গেলেও সামষ্টিকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য তা না জানা সম্ভব নয়। কেউ না জানলে বা না জানার ভান করলে কোন আদালতেই তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

যারা মানব রচিত এ সংবিধানকে অস্বীকার করে ও প্রত্যাখ্যান করে তারা সংবিধানের আইনগুলো ও মূলনীতিগুলো না জানলে না জানতে পারে। কিন্তু এ মানব রচিত বিধানই যাদের জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনের ভরসা তারা এ সংবিধান সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারে না। কারণ, আইনগুলো এমনভাবে সাজানো যে, হুকুমতের প্রত্যেক সদস্য প্রতিদিন আইনগুলোর উপর দিয়েই চলতে হয়। বেখবর চলতে গেলে সিসি ক্যামেরায় তা ধরা পড়ে যাবে।

তাই আমি আবারো বলছি, সংবিধান এমন জিনিস নয় যা সম্পর্কে হুকুমতের লোকেরা বেখবর থাকতে পারে। বরং তা এমন জিনিস যা ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় তার ধারাগুলো হুকুমতের লোকেরা ইয়াদ রাখতে হয়। রাখতে হবেই। এর নাম হচ্ছে সংবিধান।

আইন প্রণেতা কারা?

এ সংবিধানে যেসব আইন ও আইনের মূলনীতি সন্নিবেশিত হয় তা হুকুমতের লোকেরাই করতে হয়। অর্থাৎ সংসদ সদস্যরাই তা করেন। মানবরচিত আইন ও সংবিধান মানবের হাতে রচিত হয়। এ মানব ও

মহামানবরা হচ্ছেন হুকুমতের যারা মালিক, যারা সংসদ ভবনে বসে আইনগুলো তৈরি করেন। ধারাগুলো রচনা করেন। তারা একটি দেশের আইন প্রণেতা।

এ আইন প্রণেতারা কিছু আইন বৃটিশ থেকে এনে তার উপর হাঁ ভোট দিয়ে পাস করেন। কিছু আমেরিকা থেকে এনে তা পাস করেন। কিছু ফ্রান্স থেকে এনে তা পাস করেন। কিছু ভারত থেকে এনে পাস করেন। কিছু নিজেদের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। আইনগুলো ধার করা হোক বা উদ্ভাবন করা হোক সর্বাবস্থায় তা জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। তাদের সমর্থন ও অনুমোদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোনটি সম্পর্কে বেখবর থাকার কোন সুযোগ নেই। অতএব হুকুমত ও আইন প্রণেতাদের কয়েকটি বিষয়ে কোন প্রকার কোন সংশয় থাকার কোন প্রয়োজন নেই। বিষয়গুলো হচ্ছে এই-

ক. আইনের খসড়া কাগজে কলমে অন্য কেউ করলেও এর প্রণেতা হুকুমত তথা সংসদ সদস্যরাই। এর দায়দায়িত্ব হুকুমত ও সংসদের উপরই আসবে।

খ. আইন আমেরিকা লন্ডন থেকে ধার করে আনলেও এর প্রণেতা হুকুমত ও সংসদ সদস্যরাই। তারা একেকটি আইনকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে পাস করেছে।

গ. একটি দেশের চলমান হুকুমত ও আইন প্রণয়ন পরিষদ সেসকল আইনেরও দায়দায়িত্ব নিতে হবে যে আইন আগের সরকার ও আগের আইন প্রণয়ন পরিষদ তৈরি করে গেছে এবং বর্তমানে তা বাতিল করা হয়নি; বরং তা চালু রয়েছে।

ঘ. চলমান সংসদের সদস্যরা অতীত ও বর্তমানের কোন আইনের বিষয়ে অজ্ঞতার ওজরে বাঁচতে পারবে না। সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে গৃহীত প্রত্যেকটি ধারা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন বিভাগের প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। ঈমান কুফরের প্রশ্নে প্রত্যেকের বিচার হবে।

ঙ. রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত বলেও সংসদ সদস্যরা নিজেদেরকে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারবে না। কারণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলোর প্রণেতাও সংসদ সদস্যরাই।

চ. দলীয় সিদ্ধান্ত বলেও সংসদ সদস্যরা নিজেদেরকে আইন প্রণয়নের অপরাধ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ সংসদ সদস্যরা দলের অনেক ঊর্ধ্বে।

ছ. দলের শরীয়ত বিরোধী আইনের বিরোধিতার জন্য সংসদে গিয়েছি বললেও শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়নের অপরাধ থেকে বাঁচা যাবে না, যদি যথাযথ ক্ষেত্রে বিরোধিতার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায়।

জ. সংসদে বিরোধী দল হিসাবে অংশগ্রহণ করলেও শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়নের অপরাধ থেকে বাঁচা যাবে না। কেননা সংসদে বিরোধী দলের সরব বা নীরব উপস্থিতি দু'টিই সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাড়তি শক্তি যোগায়।

অতএব এসকল সমস্যার এমন কোন সমাধানই বের করে আনতে হবে যা কুরআনে হাদীসে বলা হয়েছে এবং যে সিদ্ধান্ত ফকীহ মুজতাহিদগণ দিয়ে গেছেন। হালাতের পরিবর্তনে হুকুমের কোন পরিবর্তন হবে না, সাময়িক এবং একান্ত সাময়িকভাবে কৌশলের পরিবর্তন হতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে হুকুম ও কৌশলের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলা যাবে না। কোন হাওয়াই ভাষণ ও বক্তব্য দিয়ে করা যাবে না, জযবা ও ওয়াজদ দিয়ে করা যাবে না। কোন বাতেনী ইলম দিয়ে করা যাবে না। প্রচলিত বেলায়েতের ইলম দিয়ে করা যাবে না। নবুয়তের ইলম, ওহির ইলম ও যাহেরী ইলম দিয়েই এসব সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জরুরী টীকা : ১৪

“

ও সাধারণ মানুষ; বরং আমি বলব, আফসোস হচ্ছে দ্বীনী মহলগুলোর বেখবরী...

”

জরুরী টীকা-১৪

ও সাধারণ মানুষ; বরং আমি বলব, আফসোস
হচ্ছে দ্বীনী মহলগুলোর বেখবরী...

** শায়খে মুহতারাম যে সাধারণ মানুষ ও দ্বীনী মহলগুলোর উপর বেখবরীর অপবাদ দিয়েছেন এ সাধারণ মানুষ ও দ্বীনী মহলের তালিকার মাঝে রয়েছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা বীরপুরুষগণ থেকে শুরু করে পাকিস্তান রক্ষাকারী বীরপুরুষগণ পর্যন্ত সকল মহামনীষীগণ। যাদের শুরুতে রয়েছেন শাব্বির আহমদ ওসমানী রহ., আর আপাতত শেষ প্রান্তে রয়েছেন শায়খে মুহতারাম দামাত বারাকাতুহুম। কত কোটি মানুষ ও কত হাজার কর্ণধারকে বেখবর বলে অপবাদ দিলে পরে আমাদের ইনসাফ যথাযথ হবে।*

আর ইসলামী আইন বাস্তবায়নের অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য সবচাইতে সহজ ওজর কি বেখবর হওয়া? শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার সবচাইতে উপযুক্ত কারণ কি বেখবর হওয়া?

ওজর হিসাবে বেখবর

প্রায় ৮ লাখ ৮১ হাজার ৯১৩ বর্গ কিলোমিটারের একটি দেশ, যে দেশে প্রায় একুশ কোটি মুসলমানের বসবাস, যে দেশটি জন্ম হওয়ার বৈধতা পেয়েছে শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য, যে দেশটির

জন্মদাতাগণ হচ্ছেন যামানার শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, সচেতন আলেমে দ্বীন, দরদমন্দ দিলের অধিকারী আলেমে দ্বীন, দ্বীনের পথে দাওয়াত দানকারী সচল আলেমে দ্বীন, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লালনকারী আলেমে দ্বীনের বিশাল জামাত, ৮ লাখ ৮১ হাজার ৯১৩ বর্গ কিলোমিটার ও প্রায় ২০ কোটি মুসলমান নিয়ে যে দেশটির বয়স ৭০/৭২ বছর, যে দেশটিতে একটি দারুল ইসলামের স্বপ্নদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঁদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সে দেশটিতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা যায়নি সাধারণ মানুষ ও দ্বীনী মহলের বেখবরীর কারণে। সে দেশ থেকে কুরআনের বিধানের বিরোধী বিধানগুলো বিলুপ্ত করা যায়নি সাধারণ মানুষ ও দ্বীনী মহলের বেখবরীর কারণে। সে দেশে সুদের ফাউন্ডেশন তৈরি হয়েছে বেখবরীর কারণে। সে দেশে হুদূদ কিসাসের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়নি বেখবরীর কারণে। সে দেশে কুরআন সুন্নাহর আলোকে আইন তৈরি না হয়ে মানবরচিত আইন তৈরি হয়েছে বেখবরীর কারণে। সে দেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেখবরীর কারণে।

শায়খে মুহতারাম এমন কিছুই বলতে চেয়েছেন। সবাই সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে বেখবর হয়ে যাওয়ার কারণেই এ অঘটনগুলো ঘটেছে, ঘটে চলেছে এবং ঘটতে থাকবে।

আমার অপারগতা

হৃদয়ের সংকীর্ণতা বশত শায়খে মুহতারামের এ কথাটি আমি বুকে জায়গা দিতে পারিনি। এতবড় একটি মহাপ্রলয় ঘটে গেছে শুধু বেখবরীর কারণে?! পৌনে এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত আল্লাহর বিধান পদদলিত হয়েছে শুধু বেখবরীর কারণে?! একটি দারুল ইসলামে (?) গণতান্ত্রিক কুফরী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধুমাত্র বেখবরীর কারণে?! মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধুমাত্র বেখবরীর কারণে?!

অর্থাৎ সত্তর/পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত আল্লাহর বিধান পদদলিত হয়ে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে যত মানুষের যত অপরাধ রয়েছে সব জাহালাত ও অজ্ঞতার এক ছোট্ট বায়বীয় ওযরে মাফ হয়ে গেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বা ফেরেশেতার পক্ষ থেকে বা মানুষের পক্ষ থেকে যখনই প্রশ্ন আসবে, পাকিস্তানে আল্লাহর বিধান পদদলিত হয়ে

আল্লাহর আইন বিরোধী গণতন্ত্র ও মানব রচিত কুফরী আইন কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? উত্তর হবে আমরা জানতাম না مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ।

এভাবেই একটি উম্মত তার কৃত বিশাল অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। এ অজ্ঞতা ও জাহালাতের ওযরেই কুফরী আইনে ও মানব রচিত আইনে পরিচালিত একটি শতভাগ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ পূর্ণাঙ্গ দারুল ইসলাম হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে চলেছে। চলতে পারছে। দেশের জনগণ ও কর্ণধারগণ অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে কালাতিপাত করে চলেছেন।

অপবাদ হিসাবে বেখবর

আমার মনে হচ্ছে এটি একটি অপবাদ। সংবিধানের যে ধারা সম্পর্কে দেশের প্রায় সর্বস্তরের মানুষকে বেখবর ও অজ্ঞ বলা হয়েছে সে ধারা সম্পর্কে আমার দু'টি নিবেদন-

এক. যত স্তরের মানুষদেরকে ধারাটি সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর হওয়ার দাবি করা হয়েছে এত দীর্ঘ কাল যাবত এত স্তরের এত মানুষ ধারাটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সম্ভব নয়। আমি যদি স্তর হিসাবে ব্যক্তিদের নামগুলো উল্লেখ করা শুরু করি তাহলে পাঠকের জন্য আমার কথাটি বিশ্বাস করা সহজ হবে। কিন্তু আমি নামগুলো উল্লেখ করতে চাই না।

দুই. সংবিধানের যে ধারা সম্পর্কে এত স্তরের এত মানুষ এত কাল যাবত অজ্ঞ থাকবে সে ধারার আসলে কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে একটি অস্তিত্বহীন ধারা। অথবা এ ধারাটিকে মানুষের চোখের আড়ালে রাখার জন্য গণতন্ত্রের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যারফলে এ ধারাটি কারো চোখে ধরা পড়ে না।

এখানে সমস্যাটি দ্বিমুখী। আপনি যদি বলেন, বাস্তবেই এরা বেখবর ছিল এবং বেখবর আছে। তাহলে আমি বলব, এতগুলো মানুষ বেখবর হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এ মানুষগুলো গোশত ও রক্ত দিয়ে তৈরি মানুষ নয়; বরং এরা হচ্ছে কাঠের তৈরি বা লোহার তৈরি কিছু নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ। যারফলে তাদের উপর দিয়ে জোয়ার বয়ে গেল নাকি ঝড় বয়ে গেল তার কোনটিই বোঝার মত অবস্থা তাদের নেই। আর যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তাদের উপর যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তা পতিত হওয়ার মত ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না এটাই সত্য।

বা-খবরের দায়িত্ব

যদি কথা এটা হয় যে, বিভিন্ন স্তরের বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর বেখবরীর কারণে ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, তাহলে আমরা দাবি করতেই পারি যে, কমপক্ষে যাঁরা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে বেখবরী, আইনগত কোন বাধা নেই তাঁরা নিশ্চয় বেখবরদের তালিকায় নেই। তাদের নাম বাখবরদের তালিকাতেই আছে। তাঁরা গোড়া থেকেই বিষয়টিকে উপলব্ধি করেছেন। এটি হচ্ছে একটি কথা।

আরেকটি কথা হচ্ছে, এ বাখবরের সংখ্যা এক দুই হওয়ার কথা নয়। বাখবরেরও একটি বড় জামাত থাকার কথা। আর জামাতটি পাকিস্তানের জন্ম থেকেই থাকার কথা। যদি বাখবর একটি জামাত থেকে থাকে তাহলে শরীয়তের মাসআলা হিসাবে সকল দায়দায়িত্ব সে বাখবর জামাতের উপরই আসবে। বেখবরের অপরাধ হবে জাহালাতের অপরাধ, আর বাখবরের অপরাধ হবে জেনেও না করার অপরাধ।

বা-খবর যে জামাতটি জানত যে, সংবিধানে এমন একটি ধারা আছে যে ধারার শক্তিতে পুরো দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, সে জামাতটি তাদের এ অবগতির উপর কী আমল করেছে? আর শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের কী করার ছিল? এ বিষয়ক যথাযথ প্রতিবেদন অবগত মহলই দিতে পারবেন। তার উপর বিবেচনা করেই বেখবর অজ্ঞ জামাতের বিচার করা হবে।

আর যদি

দ্বিতীয় আরেকটি কথাও বলে যাই। কথাটি হচ্ছে, কেউ বলতে পারেন, ধারাটি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে কিছু কাল আগে। আর সে কারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালনকারী আকাবির ওলামায়ে কেরাম এ ধারাটি কাজে লাগানোর মত সময় সুযোগ পাননি।

কারো মনের ভাব যদি এমন হয় তাহলে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এ একটি ধারার গুণে মানবরচিত আইনে পরিচালিত একটি শতভাগ গণতান্ত্রিক দেশ নিজেকে দারুল ইসলাম বলে দাবি করছে। এখন হাকীকত যদি এমন হয় যে, এ দেশের ইতিহাসে এবং সংবিধানের

ইতিহাসে এমন দীর্ঘ একটি পর্ব পার হয়েছে যখন এ ঐতিহাসিক ধারাটি সংবিধানে ছিল না, তাহলে তখন এ দেশটি দারুল ইসলাম ছিল? না কি একটি গণতান্ত্রিক দারুল হারব ছিল?

সত্য কোনটি

সমস্যা কিন্তু দ্বিমুখী। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কথাটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এ সত্যটি স্বীকার করতে হবে। ধারাটি যদি দেশ ও সংবিধানের জন্ম থেকেই থেকে থাকে তাহলে আকাবির ওলামায়ে কেরামও কেন ধারাটিকে কাজে লাগাননি? কেন তাঁরা তাদের সারা জীবনের স্বপ্নকে এভাবে ভুলে গেলেন? আর যদি ধারাটি তখন থেকে না থেকে থাকে যে ধারার গুণে দেশটি দারুল ইসলাম তাহলে সে ধারাটি না থাকা অবস্থায় সে দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতাগণ নীরব ছিলেন কীভাবে? এমন একটি দেশের বিষয়ে তাদের অবস্থান কী ছিল?

পাঠক ভুলে যাবেন না যে, এ প্রশ্নগুলো এবং এসব জটিল জটিল পরিস্থিতিগুলো শায়খে মুহতারামের সে অভিযোগের ভিত্তিতেই জন্ম নিয়েছে যে অভিযোগ তিনি হুকুমত, সাধারণ মানুষ ও দ্বীনদার মহলের বিরুদ্ধে করেছেন। তিনি বেখবরীর যে অভিযোগ করেছেন সে কারণে। নচেৎ আমাদের ভাসা ভাসা অধ্যয়ন অনুযায়ী কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে এখানে মুশতাবিহ কোন বিষয় নেই। তাই স্পষ্ট বিষয়গুলোকে মুশতাবিহ ও অস্পষ্ট করে তোলারও কোন মানে হয় না।

জরুরী টীকা : ১৫

“

ও অনুভূতিহীনতার উপর...

জরুরী টীকা-১৫

ও অনুভূতিহীনতার উপর...

এরকমভাবে 'অনুভূতিশীল' বা 'অনুভূতিহীনতা' এগুলো শরয়ী কোন পরিভাষা নয়। একটি ফরয দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা চলছে। ঈমান নিয়ে টানাটানি চলছে। এ ক্ষেত্রে আবেগী শব্দ ব্যবহার কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর দ্বারা শরয়ী বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। কার উপর কী দায়িত্ব তা সুনিশ্চিত করে বন্টন করে দেয়া যায় না। তবে মনে রাখতে হবে, দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণের খাতায় সব কিছু সুনির্দিষ্ট করেই লিপিবদ্ধ আছে এবং থাকবে।

শব্দগুলোর কুরআনী ব্যবহার

'অনুভূতিশীল' বা 'অনুভূতিহীনতা' বা এ ধরনের শব্দগুলোর ব্যবহার কুরআনে কারীমে রয়েছে। কিন্তু কুরআনের যেসব আয়াতে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার হয়েছে সেসব আয়াতের ভাবার্থ নিয়ে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, যাদের সম্পর্কে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাদের জন্য তাদের এ অবস্থাকে গ্রহণযোগ্য ওযর হিসাবে ধর্তব্য করা হয়নি। কিন্তু আমরা যে ক্ষেত্রে শব্দগুলোকে ব্যবহার করি তা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না যে, যার অনুভূতি নেই সে তার এ অনুভূতিহীনতার কারণে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে কি পাবে না।

এ জন্য এসব ক্ষেত্রে ফকীহ মুজতাহিদগণ যেসব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন সেগুলো ব্যবহার করা উচিৎ। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুভূতিহীনতাকে যদি আমরা কুরআনের ভাষায় ব্যক্ত করি তাহলে মাসআলা অনেক জটিল হয়ে যাবে।

আমরা এ কথা স্বীকার করছি যে, কুরআনে যে অনুভূতিহীনতার কথা বলা হয়েছে তা যে চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুভূতিহীনতা শায়খে মুহতারাম সে পর্যায়ের কোন অনুভূতিহীনতার কথা এখানে বলেননি। বরং স্বাভাবিক অবহেলা বা গুরুত্ব না দেয়ার অর্থে বলেছেন। কিন্তু শব্দটির উপর আমাদের আলোচনা বিশেষ দু'টি কারণে। **এক.** অনুভূতিহীনতার যে মাত্রা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায় সে মাত্রার অনুভূতিহীনতা এখন জন্মগত মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক। পাকিস্তানের মুসলমানরাও এর ব্যতিক্রম নয়। **দুই.** শায়খে মুহতারামের মত ব্যক্তিদের বক্তব্যের ভাষাগুলোও সাধারাণ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দলিল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এর মুখোমুখী হচ্ছি।

আরেকটি কথা হচ্ছে, এ অনুভতিহীনতাকে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সহজ অর্থে নেয়া গেলেও দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম এবং দেশের নির্বাহী শক্তির ক্ষেত্রে সহজ অর্থে নেয়া যায় না। সহজ অর্থে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ বিষয়গুলো মুস্তাহাব, মুবাহ বা ঐচ্ছিক কোন বিষয় নয়। আর শায়খে মুহতারাম শব্দটি এ দু'টি শ্রেণীর বেলায়ও ব্যবহার করেছেন।

এ সকল বিবেচনায় এ বিষয়ে কুরআন থেকে দুয়েকটি উদাহরণ দেখে নিলেই ভালো হবে। আমাদের জরিপমতে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে যে পর্যায়ের অনুভূতিহীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর যে ফলাফল বলা হয়েছে পাকিস্তানের নির্বাহী শক্তির ক্ষেত্রে সে পর্যায়ের অনুভূতিহীনতা এবং সে পর্যায়ের ফলাফলই প্রযোজ্য হবে।

এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ {سورة البقرة: ١١-١٢}

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না।" -সূরা বাকারা ১১-১২

এ আয়াতে যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে 'তারা অনুভব করতে পারে না' তারা আল্লাহর বিচারে মুনাফিক, ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কাফের। তাদের এ অনুভব না করা কোন পর্যায়ের কোন ওযর হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি।

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ {سورة البقرة: ١٣}

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।" -সূরা বাকারা ১৩

এ আয়াতে যাদেরকে বোকা বলা হয়েছে তাদেরকে দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়নি। যাদের বিষয়ে বলা হয়েছে, 'তারা জানে না' তাদের এ না জানাকে কোন পর্যায়ের কোন ওযর হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। এদেরকে বোকা বলে এবং বোঝে না বলে আল্লাহ তাআলা এ সিদ্ধান্তই দিয়েছেন যে, এরা মুনাফিক ও নিকৃষ্ট কাফের। যাদের ঠিকানা জাহান্নামে।

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ {سورة الأعراف: ١٧٩}

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা তারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা তারা

শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল।" -সূরা আরাফ ১৭৯

এ আয়াতে যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'তারা বোঝে না' এবং যাদেরকে গাফেল ও বেখবর বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফয়সালা হচ্ছে, তাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা চতুষ্পদ প্রাণী এমনকি তার চাইতে অধম বলে ঘোষণা করেছেন।

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ {سورة الأنفال: ٦٥-٦٦}

"হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর; কারণ তারা এমন জাতি যারা বোঝে না। এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে।" -সূরা আনফাল ৬৫-৬৬

এ আয়াতে যাদেরকে অবুঝ সম্প্রদায় বলা হয়েছে তারা কারা? এ অবুঝ ব্যক্তিরা তারাই যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন। আল্লাহর খাতায় এরা কাফের। অবুঝ সম্প্রদায় বলে তাদের কোন ওযরকে গ্রহণ করার রাস্তা খোলা রাখা হয়নি।

﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ {سورة التوبة: ٨٦-٨٧}

"আর যখন এ মর্মে কোন সূরা নাযিল হয় যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, আর তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ কর তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না।" -সূরা তাওবা ৮৬-৮৭

'তারা বোঝে না' বলে আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হচ্ছে মুনাফিক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভাষ্যমতে তাদের অন্তরে মহর মেরে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা আর কখনো হক ও সত্যকে গ্রহণ করবে না। যাদের জন্য জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে গেছে।

﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ {سورة التوبة: ١٢٧}

"আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কিনা অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন! নিশ্চই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।" -সূরা তাওবা ১২৭

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদের অন্তরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিমুখ করে দিয়েছেন তাদের বিষয়ে শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'তারা এমন সম্প্রদায় যারা বোঝে না'। 'তারা বোঝে না' এ জন্য বলেননি যে, তাদের এ না বোঝাকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করে দেবেন। বরং তাদের এ না বোঝাটা তাদের অপরাধ।

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ {سورة المنافقون: ٣}

"এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বোঝে না।" -সূরা মুনাফিকূন ৩

এমন একটি সম্প্রদায় সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তারা বোঝে না যারা ঈমানের পর আবার কুফরী করেছে। আর তাদের কুফরীর অবস্থা এমন যে এ কুফরী থেকে তারা আর কখনো ফিরে আসবে না। এ থেকে বোঝা যায়, তাদের এ না বোঝাটাই একটি ভয়ংকর অপরাধ।

﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ {سورة المنافقون: ٧}

"তারাই বলে, আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ভূ ও নভোমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।" -সূরা মুনাফিকূন ৭

এমন মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন 'তারা বোঝে না' যারা আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য বহুমুখী ষড়যন্ত্র করেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয়, না বোঝা কোন ওযর হতে পারে না।

জাহালাত ও গাফলতের ফযীলত

যে না বোঝাকে আমরা যে কোন অপরাধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত মনে করার জন্য ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছি কুরআনের ভাষায় তা অপরাধ থেকে বাঁচার কোন ঢাল ছিল না; বরং এসব না বোঝা, না জানা ও অনুভব না করা কুরআনের ভাষ্য অনুসারে অপরাধের তালিকায় রয়েছে।

তাহলে আমরা যে এসব শব্দ ব্যবহার করছি এগুলোর উদ্দেশ্য কী? কুরআনে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সে অর্থে হলে এ শব্দগুলো ওযরের কোন শব্দ নয়; বরং এগুলো সবই হচ্ছে অপরাধের শব্দ। কিন্তু আমরা শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করছি তা থেকে সন্দেহ

হতেই পারে যে, আমাদের বা উম্মতের এসকল অবস্থা কোন ফযীলতের বিষয়, অথবা কমপক্ষে এগুলো অপরাধের তালিকায় পড়ে না, অথবা এগুলো এমন অপরাধ যা মুছে যাওয়া খুবই সহজ বিষয়।

তাই আমাদের নিবেদন হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে আমাদের ও উম্মতের আচরণগুলোর ফিকহী মূল্যায়ন হওয়া জরুরী। মুশতাবিহ ও আবেগের শব্দ ও বাক্য দিয়ে আমাদের দায়িত্বগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে না। আমরা যে অবস্থায় যেভাবে সময় পার করছি অবশ্যই এর একটি ফিকহী মূল্যায়ন আছে। সে মুল্যায়নটা ফিকহের পরিভাষায় শরীয়তের দায়িত্ব হিসাবে স্পষ্টভাবে সামনে আসা দরকার।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিধান

আমি বলতে চাচ্ছি, অবস্থাগুলোর 'তাকয়ীফে ফিকহী' হওয়া দরকার। পাকিস্তান জন্মের আগ থেকে শুরু করে বর্তমান পাকিস্তান পর্যন্ত প্রতিটি পর্বের শরয়ী অবস্থান পরিষ্কার হয়ে উম্মতের সামনে আসলেই প্রতিদিনের মাসআলাগুলোতে উম্মত সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারত। এসব ক্ষেত্রে আবেগের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার না করে ফিকহী পরিভাষা ব্যবহার করার অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে।

সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে, পাকিস্তানের একজন নাগরিক যেন আল্লাহর বান্দা হিসাবে তার করণীয় বুঝে নিতে পারে। আমি উদাহরণস্বরূপ দু'চারটি মাসআলা এখানে তুলে ধরছি, যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের ধারণা হচ্ছে, এসব বিষয়ে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত হয়নি। উদাহরণগুলো তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সন্দেহের কারণও সামান্য ব্যাখ্যা করব, ইনশা-আল্লাহ।

অমীমাংসিত অতীত

ক. ভারত নামের একটি দারুল হারব থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান শিরোনামে একটি দারুল ইসলাম তৈরি হয়েছে? না কি একটি দারুল ইসলামকে দুই ভাগ করে একটি ভাগ পাকিস্তান নামে অত্মপ্রকাশ করেছে।

যদি একটি দারুল ইসলামকে দুই ভাগ করে এক ভাগ পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে থাকে তাহলে এর কী প্রয়োজন ছিল? কেন

মুসলমানদের এত বৃহৎ একটি শক্তিকে এবং ওলামায়ে কেরামের এত বিশাল একটি জামাতকে ভেঙ্গে দুই ভাগ করা হল? এর প্রাপ্তি ও অর্জন কী? এবং এর বিসর্জন কী?

খ. যদি একটি দারুল হারব থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দারুল ইসলাম তৈরি হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সেই দারুল হারব ভারত এখনো দারুল হারবই আছে? না কি পাকিস্তান দেশটি জন্ম লাভ করার পর অলৌকিক কোন কারণে ভারত দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ভারত যদি দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে তা কীভাবে? এবং তা কখন থেকে?

গ. আর যদি ভারত তখন থেকে এখনো পর্যন্ত দারুল হারবই হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এ দারুল হারবের সঙ্গে বিগত সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত পাকিস্তানের আচরণ কী ছিল? এখন কী আচরণ চলছে? একটি দারুল হারবের সঙ্গে একটি দারুল ইসলামের যেসব আচরণের কথা কিতাবে লেখা আছে তার কী কী পাকিস্তান করেছে?

ঘ. ভারতকে দারুল হারব হিসাবে রেখে পাকিস্তান শিরোনামে দারুল ইসলাম তৈরি হওয়ার পর ভারতের মুসলমানরা দারুল হারব ভারতে অবস্থান করার ব্যাপারে পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরামের ফাতওয়া কী ছিল এবং কোন দলিলের ভিত্তিতে ছিল? এখন সেখানে মুসলমানদের অবস্থানের বিষয়ে পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত কী?

ঙ. সম্প্রতিকালে 'দারুল আমান' নামে যে পরিভাষাটির বহুল ব্যবহার শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তানের যিম্মাদারদের দৃষ্টিতে ভারতের বেলায়ও সে পরিভাষাটি প্রযোজ্য কি না? প্রযোজ্য হয়ে থাকলে তা পাকিস্তান জন্মের আগে থেকে না কি পরবর্তী কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে? প্রযোজ্য হয়ে থাকলে সে মেয়াদ কত কালের এবং কত যুগের? এবং ভারতের ক্ষেত্রে পরিভাষার এ পরিবর্তনের হেতুগুলো কী ছিল?

চ. বর্তমান ভারতের সংবিধান ও বর্তমান পাকিস্তানের সংবিধানের মাঝে মৌলিক ব্যবধানগুলো কী? যার কারণে পাকিস্তান দারুল ইসলাম, আর ভারত তা নয়। এমনিভাবে বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোর সংবিধানের সঙ্গে পাকিস্তানের সংবিধানের মৌলিক ব্যবধানগুলো কী কী? যার দরুন পাকিস্তান দারুল ইসলাম এবং অন্যান্য দেশগুলো তা নয়।

ছ. যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে পাকিস্তান দারুল ইসলাম সেসব বৈশিষ্ট্য অন্যান্য দেশে না থাকার কারণে সেসব দেশ পাকিস্তানের যিম্মাদারগণের দৃষ্টিতে দারুল হরব কি না? সেগুলো দারুল হারব না হয়ে থাকলে পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্য কী? আর সেসব দেশ দারুল হারব হয়ে থাকলে সেগুলোর সঙ্গে পাকিস্তানের আচরণ কী?

জ. পাকিস্তান জন্মের পর সেখানে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন হয়েছিল কি না? যা একটি দেশ দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য শর্ত। যদি আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন হয়ে থাকে এবং পাকিস্তান যদি দারুল ইসলাম হয়ে থাকে তাহলে শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহকে কোন বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য আজীবন পীড়াপীড়ি করে গেছেন? জিন্নাহ মারা যাওয়ার পর আবারও কেন সে বিধান বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তীদেরকে অনুরোধ করতে থাকলেন? সবশেষে শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. এর ইন্তেকালের পর তাঁর অনুসারীরাও হুকুমতকে কোন আইন বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করতে থেকেছেন?

ঝ. পাকিস্তান জন্মের পর যখন সেখানে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত হয়নি, কিন্তু এর বিপরীতে মানবরচিত গণতান্ত্রিক কুফরী আইন বাস্তবায়িত হয়েছে তখন পাকিস্তানের মুসলমান ও মুসলমানদের যিম্মাদার ওলামায়ে কেরামের করণীয় কী ছিল?

ঞ. যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের জন্ম সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি দেখার পর মানবরচিত কুফরী আইনের উপর চলার জন্য পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে শরীয়ত কত দিন, কত মাস বা কত বছরের সময় দিয়েছে?

ট. একটি দেশের নির্বাহী শক্তি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, দেশের শতকরা নিরানব্বই ভাগ নাগরিকের পক্ষ থেকে কৃত আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের দাবিকে প্রত্যাখান করে সম্পূর্ণ এখতিয়ারের সাথে আল্লাহর বিধানকে বিধান হিসাবে গ্রহণ না করে মানবরচিত কুফরী আইনকে আইন হিসাবে প্রণয়ন করে বাস্তবায়িত করে মানুষদেরকে তা মানতে বাধ্য করে দিয়েছে। কোটি কোটি মুসলমানকে আল্লাহর বিধানের উপর না চলতে বাধ্য করেছে এবং মানবরচিত কুফরী আইনের উপর চলতে বাধ্য করেছে। সে নির্বাহী শক্তি মুসলমান না কি কাফের?

যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে কেন? ইবলিস, আবু তালিব, কারূন, বাদশাহ আকবর, কাদিয়ানী, ইসমাঈলী শিয়া, ইসনা আশারিয়া শিয়া, নুসাইরি শিয়া ইত্যাদি এরা কেন কাফের এবং পাকিস্তানের নির্বাহী শক্তি কেন কাফের নয়?

ঠ. নির্বাহী শক্তি কাফের হয়ে থাকলে তাদের সঙ্গে মুসলমানদের করণীয় দায়িত্ব কী? তাদের সঙ্গে আচরণের বিধান কী? তাদের সঙ্গে লেনদেন বিবাহ শাদীর বিধান কী? তাদের অধীনস্ত দেশের নাম দারুল হারব না কি দারুল ইসলাম? সে দেশে মুসলমানদের বসবাস করার বিধান কী?

ড. পাকিস্তানের সে মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের ফরয দায়িত্ব ছিল কি না? ফরয হয়ে থাকলে সে ফরয দায়িত্ব তাঁরা কীভাবে আদায় করেছেন? অথবা লড়াই করার মত সামর্থ্য না থাকলে তাঁরা হিজরত করেছিলেন কি না? অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে হবে এ মর্মে কোন ফাতওয়া দিয়েছিলেন কি না? অথবা সামর্থ্য নেই প্রমাণিত হওয়ার পর হিজরত করা ফরয এ মর্মে কোন ফাতওয়া দিয়েছিলেন কি না?

ঢ. পাকিস্তানের মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা বা সামর্থ্য না থাকলে হিজরত করা যদি ফরয না হয়ে থাকে তাহলে নিম্নোক্ত আয়াত, হাদীস ও মুহাদ্দিস ফকীহগণের ভাষ্যগুলোর জবাব কী?

পাকিস্তানের কর্ণধারগণ বলতে হবে

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ {سورة المائدة: ٤٩-٥٠}

“আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের

কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসেক। তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" -সূরা মায়েদাহ ৪৯-৫০

﴿وقوله: {**أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون**} ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله [صلى الله عليه وسلم]فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير﴾ {تفسير ابن كثير : ١٣١/٣}

"আল্লাহর বাণী **أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون** আল্লাহ তাআলা সেসব লোকের অবস্থানকে অস্বীকার করছেন যারা আল্লাহ তাআলার সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান থেকে বের হয়ে গেছে যে বিধানে সকল কল্যাণ রয়েছে এবং সকল অকল্যাণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে সে বিধান থেকে বের হয়ে অন্যান্য বিভিন্ন মত, মনস্কামনা ও বিভিন্ন পরিভাষার অনুগামী হয়ে পড়েছে যা মানুষ রচনা করেছে,

যেগুলোতে আল্লাহর বিধানকে ভিত্তি বানানো হয়নি। যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা এসব ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা দিয়ে তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করত যা তারা নিজেদের মতামত ও মনস্কামনার ভিত্তিতে তৈরি করত।

এরকমভাবে যেমন তাতারীরা তাদের রাজপরিবারের শাসননীতি দিয়ে শাসন করে যা তাদের আদি পুরুষ চেঙ্গিস খান থেকে নেয়া হয়েছে। যে চেঙ্গিস খান তাদের জন্য 'ইয়াসাক' (নামের একটি সংবিধান) তৈরি করেছিল। আর 'ইয়াসাক' হচ্ছে একটি রচনা যা বিভিন্ন বিধিবিধানের সমষ্টি যে বিধানগুলো সে বিভিন্ন শরীয়ত থেকে গ্রহণ করেছে। যেমন ইহুদী ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি থেকে। এর মাঝে বহু বিধান ছিল এমন যা শুধু নিজস্ব মতামত ও মনস্কামনা থেকে গৃহীত। এ বিধানসমগ্র পরবর্তীতে তার বংশধরদের মাঝে অনুসৃত শরীয়ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের উপর তাদের এ বিধানসমগ্রকে প্রাধান্য দিত।

তাদের মধ্যে যারা এ কাজ করবে তারা কাফের, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের দিকে ফিরে আসবে না এবং ছোট বড় অল্প বেশি সর্ব ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিচার করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর

﴿عن جنادة بن أبي أمية ... بايعنا على .... وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان﴾ {البخاری : رقم الحديث: ٧٠٥٦ -٦/٢٥٨٨}

"জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া বলেন, ... তখন তিনি আমাদের কাছ থেকে যেসব বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়েছেন তার মধ্যে ছিল, ... আর আমরা ক্ষমতার বিষয়ে ক্ষমতাবানদের সঙ্গে টানাটানি করব না, তবে যদি তোমরা তার থেকে এমন কোন স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পেতে দেখ যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে।" -সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها

﴿قَالَ الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ﴾

"কাযী বলেন, যদি সে নতুনভাবে কুফরে পতিত হয় এবং শরীয়তের বিধানকে বদলে দেয়, অথবা বিদআতের শিকার হয় তাহলে সে ক্ষমতার অধিকার থেকে বেরিয়ে যাবে এবং তার আনুগত্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা অবস্থান নেয়া এবং তাকে পদচ্যুত করা এবং সে স্থলে সম্ভব হলে একজন উপযুক্ত ইমাম (খলিফা) বসানো ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি বিষয়টি মুসলমানদের শুধু একটি কাফেলার ক্ষেত্রে হয় তাহেল তাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে ঐ কাফেরকে পদচ্যুত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিদআতীর ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হবে না, তবে যদি তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করে তাহলে ব্যবস্থা নেবে। -শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী, কিতাবুল ইমারাত।

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ {سورة النساء: ٩٧}

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।" -সূরা নিসা ৯৭

﴿عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن﴾ {الموطأ : رقم الحديث: ٣٥٥٨- ٢/٩٧٠}

"এমন হতে পারে যে, মুসলমানের সবচাইতে উত্তম সম্পদ হবে ছাগল যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে এবং বিভিন্ন উপত্যকায় নিজের ঈমান নিয়ে ভেগে যাবে ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য।" -মুয়াত্তা মালেক, কিতাবুল ইসতিযান, বাবু মা জাআ ফী আমরিল গানামি

﴿قَالَ الْقَاضِي: فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ وَلْيُهَاجِرِ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَيَفِرَّ بِدِينِهِ﴾ {شرح مسلم للنووى : ٢٤٠/٤}

"আর যদি তারা নিশ্চিত হয় যে, তারা বিপক্ষে অবস্থান নিতে সক্ষম নয় তাহলে বিপক্ষে অবস্থান নেয়া ওয়াজিব হবে না। বরং তখন মুসলমান তার এলাকা থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাবে এবং নিজের দ্বীন ঈমান নিয়ে পালিয়ে যাবে।" -শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী, কিতাবুল ইমারাত, باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية

আপাতত এতটুকুই। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রয়োজন। কুরআন, হাদীস, সীরাত, উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইফতার আলোকে উত্তরগুলো দরকার। একটি তালাকের মাসআলায় যেভাবে তাহকীক করে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। একটি রোযার মাসআলায় যেমন বলা হয়। একটি নামাযের মাসআলায় যেভাবে বলা হয়। ঠিক সেভাবে উপরোল্লিখিত মাসআলাগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসা দরকার। স্পষ্টভাবে আসা দরকার। এগুলোর সঠিক ও সুস্পষ্ট উত্তরের উপর নির্ভর করছে বিশ্বের মুসলমানদের পথ ও পন্থা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত।

জরুরী টীকা : ১৬

“

তাদের এ অনুভূতিহীনতার কারণে এ ধারাটি অকার্যকর হয়ে আছে.....

”

জরুরী টীকা-১৬

*তাদের এ অনুভূতিহীনতার কারণে এ
ধারাটি অকার্যকর হয়ে আছে.....*

এসব শিশুসুলভ আবদারের কথা। দায়িত্বশীলদের জন্য দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সিদ্ধান্তমূলক কোন কথা নয়। বিষয়গুলো দুনিয়া আখেরাতের উভয় বিবেচনায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেক্ষেত্রে এ জাতীয় কথা একদম মানায় না।

অকার্যকর... ধারা....

আর কোন ধারা যখন অকার্যকর হয় তখন তা আর ধারা হয় না। তা ধারা হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এমন সব ধারার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্তই এমন হয় যে, তা কখনো সূর্যের মুখ দেখবে না। এটা হচ্ছে হাতির দাঁত। এ দাঁত যত বড়ই হোক সমস্যা নেই। কারণ এর কোন কাজ নেই।

এর আগেও আমরা বলে এসেছি যে, এগুলো হচ্ছে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা। যে খেলায় ব্যক্তি নিজেই বলে দেয় যে, আমার চোখ বেঁধে দাও, যাতে আমি তোমাদেরকে না দেখি। দ্বীনের এতবড় একটি বিষয় নিয়ে এসব ছেলেখেলা আর চলে না।

কিছু মানুষের অবহেলার কারণে কোটি কোটি মুসলমানের একটি ভূখণ্ডে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত হতে পারেনি -এসব কোন ধরনের কথা?! এ

অবহেলাকারীরা কে? তাদের এ অবহেলা কুফর? না কি হারাম? না কি মাকরূহ? না কি এসব অবহেলা মুস্তাহাব?! যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের উপর এসব অবহেলার অপবাদ দেয়া হয়েছে তাদের জীবন চরিত রচয়িতাগণ দাবি করেছেন, তাঁরা জীবনে কোন মাকরূহে তানযীহিরও শিকার হননি।

কর্ণধারগণ কেন বুঝতে চেষ্টা করেন না, যে ধারাটি যুগের পর যুগ অকার্যকর থাকে সে ধারার জন্মই এ উদ্দেশ্যে। কর্ণধারগণ বুঝে শুনেও এমন কথা বলছেন বলে সন্দেহ করতে একদম ইচ্ছা করে না। পুরো দেশের যিম্মাদারী যাদের হাতে ন্যস্ত করে কোটি কোটি মুসলমান শত শত শরয়ী যিম্মাদারী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলেছে বলে নিশ্চয়তা বোধ করছে, দেশের সেসব যিম্মাদাররা তাদের চেয়ারে বসা থাকা অবস্থায় জনগণের অবহেলার কারণে কেন সংবিধানের এত জটিল একটি ধারা অকার্যকর হয়ে থাকবে?!

যে দেশের মালিক পক্ষকে দ্বীনের যিম্মাদারগণ আমীরুল মুমিনীন হিসাবে ভাবতে পছন্দ করেন, যে দেশের সেনাবাহিনীকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ মনে করেন, যে দেশের সীমান্ত প্রহরীদেরকে রিবাতের মুজাহিদ মনে করতে পছন্দ করেন, সে দেশের সাধারণ মানুষদের অবহেলার কারণে কেন সংবিধানের এমন একটি ধারা অকার্যকর হয়ে থাকবে যার উপর নির্ভর করছে কোটি কোটি মুসলমানের দুনিয়া আখেরাতের ভাগ্য। অনন্তকালের সুখ বা দুঃখ।

আলহামদু লিল্লাহ! সুম্মা আলহামদু লিল্লাহ!!

শায়খে মুহতারাম এ বিষয়ে দ্বিমত করার কথা নয় যে, ধারাটি এক সময় ছিল না, এরপর যখন থেকে মনে করা হচ্ছে যে, ধারাটি আছে তখন থেকে ধারাটি অকার্যকরই ছিল, এখনো অকার্যকরই আছে। যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে, সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত পাকিস্তানে আল্লাহর বিধান কার্যকর হয়নি। সাথে সাথে শায়খে মুহতারাম এ কথা স্বীকার করবেন যে, পাকিস্তান তার জন্ম থেকে মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনের উপর চলছে এবং আইনগুলো তৈরি ও পাস করার আগে পাকিস্তান সংসদের সদস্যগণ ও স্পীকার কুরআন, হাদীস ও হেদায়া অধ্যয়ন করে আসেনি।

এতসব অবস্থার উপলব্ধি রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কি 'আলহামদু লিল্লাহ' এর মকামে আছি, না কি 'সুম্মা আলহামদু লিল্লাহ' এর মকামে আছি। বিষয়টি কি একান্তই দুনিয়াবি কোন প্রাপ্তির বিষয় যার উপর আমরা 'কানাআত' এর ফযীলত অর্জন করার চেষ্টা করব। না কি এটি একটি দ্বীনী দুর্বলতার বিষয় যার উপর আমাদের ভয় পাওয়া উচিত।

জরুরী টীকা : ১৭

“

এবং তারা একে কাজে লাগাচ্ছে না।

”

জরুরী টীকা-১৭

এবং তারা একে কাজে লাগাচ্ছে না।

** তারা কারা? ধারার প্রবর্তকরা কেন এর আওতাভুক্ত নয়? ধারার প্রহরীরা কেন এ হুকুমের আওতাভুক্ত নয়? এ বাক্যগুলো বক্তৃতার মঞ্চে যতটা মানানসই, গবেষণার টেবিলে ততটা মানানসই নয়; বরং গবেষণা ও সিদ্ধান্তের টেবিলে এগুলো হাস্যরসের উপাদানমাত্র। রাষ্ট্রের মালিক পক্ষ আইন প্রণয়ন করবেন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে, আর বায়বীয় 'তারা' জাতীয় কিছু মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, কুরআন সুন্নাহর জন্য করুণার ভিক্ষা করতে 'মাননীয় আদালতে'র দরবারে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা। এটা হতেই পারে না।*

কুরআন সুন্নাহর পাওয়ার হচ্ছে **فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ** *ও* **ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع** *-এর কোন বিকল্প নেই।*

এ সকল ধারা উপধারার মূল লক্ষ হচ্ছে, কুরআন সুন্নাহকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার চুঙ্গায় আবদ্ধ করা। কারণ বক্তা, শ্রোতা ও পাঠক সবাই এ কথা জানেন যে, শায়খে মুহতারাম যা যা বলেছেন তা বাস্তবায়ন করার জন্য একজন নাগরিককে অবশ্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের কুফরী আইনকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই সামনে বাড়তে হবে।

কাজে লাগাতে পারছে না

কাজে লাগাচ্ছে না, বিষয়টি এমন নয়। এ ধারা কাজে লাগানো সম্ভব নয়। আমরা আগে বলে এসেছি, যে ধারা তার জন্ম থেকে অকার্যকর সে ধারা আসলে কোন ধারা নয়। দ্বিতীয়ত বলেছি, এ ধারা কাজে লাগানোর দায়িত্ব ধারা প্রবর্তকদের। নিরক্ষর ও বেখবর জনগণের এ দায়িত্ব নয়। তৃতীয়ত এখন বলছি, এ ধারা কাজে লাগানো সম্ভব নয়। কারণ-

ক. পাকিস্তানে যে তাগুতী শক্তি কুফরী আইন তৈরি করে তাদের শক্তি এবং যারা তাগুতের আইনের বিরুদ্ধে মামলা করবে তাদের শক্তি বরাবর নয়। তাগুতী আইন প্রণেতারা হচ্ছে দেশের প্রভু, আর এর বিপরীতে অবস্থানকারীরা হচ্ছে তাদের দরবারে করুণার ভিখারী।

খ. দেশ হচ্ছে শত ভাগ গণতান্ত্রিক এবং সারা বিশ্বে প্রচলিত অর্থেই গণতান্ত্রিক। যারা তাগুতের আইনের বিরুদ্ধে মামলা করবে তারা হচ্ছে শরীয়াহ অনুসারী। আর গণতন্ত্রের আদালতে শরীয়াহ ভিত্তিক কোন মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। বাক স্বাধীনতার শিরোনামে গণতন্ত্রের আদালতে শরীয়ার পক্ষে আওয়াজ করা যাবে, এরপরে আর কিছু করা যাবে না। গণতন্ত্রের আদালতে, গণতন্ত্রের এলাকায় এবং গণতন্ত্রের সীমানার ভিতরে অনেক কিছুই করা যায়, শুধু গণতন্ত্রকে অতিক্রম করা যায় না।

গ. তাগুতের বিরুদ্ধে এবং শরীয়ার পক্ষে দায়েরকৃত মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাগুতের কাছেই। মানবরচিত গণতন্ত্রের হাতেই।

ঘ. তাগুতের আইনের বিরুদ্ধে এবং শরয়ী আইনের পক্ষে মামলা দায়ের করার পর ফলাফল যাই হোক, ফলাফলের আগে মামলা নিয়ে চলার পথে তাগুতের বহু আইনের সামনে, মানবরচিত বহু কুফুরী আইনকে সিজদা করে করেই সামনে বাড়তে হবে। ততক্ষণে ঈমান তার খাঁচা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে

ঐতিহাসিক ধারাটি কাজে লাগানো সম্ভব নয় বলে আমরা যে দাবি করেছি তা কাল্পনিক কোন বিষয় নয়; এমনকি যুক্তি তর্ক ভিত্তিক কোন বিষয়ও নয়। এটি একটি বাস্তব কারগুজারী। এ ধারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। সর্বোচ্চ মহল থেকে, সর্বোচ্চ সময় নিয়ে, সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে চেষ্টা করা

হয়েছে। এমন চেষ্টা করা হয়েছে যে, শুধু চেষ্টার বাহারেই সর্বদিক থেকে বাহবা, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদের জোয়ার বইয়ে দেয়া হয়েছে।

কেন সম্ভব হয়নি প্রশ্ন করা হলে হয়ত এমন কিছু ওযরই পেশ করা হবে যে ওযর থেকে সোনালী গাভীটিকে কখনোই বাঁচানো যাবে না। গাভী দুর্বা ঘাসের ঘ্রান নেয়া থেকে বাঁচতে পারলে প্রতিদিন তিনটি করে স্বর্ণমুদ্রা মলত্যাগ করবে। দুর্বা ঘাসের ঘ্রাণ না নিয়ে গাভী বাঁচতেও পারবে না, স্বর্ণমুদ্রা মলত্যাগ করাও সম্ভব হবে না।

কিন্তু আমরা যতটুকু জানি, ঐতিহাসিক ধারাটি কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের জিলাপীর পেঁচে আটকে গেছে। তাগুতের আদালতে হেরে গেছে। মানবরচিত আইনের বিপরীতে লড়ার শক্তি পায়নি। আর এমন হওয়াই স্বাভাবিক, এমন না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

জরুরী টীকা : ১৮

কিন্তু এ ধারা আলহামদু লিল্লাহ রয়েছে। আজও যদি আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই যে, এ ধারাটিকে কাজে লাগাব তাহলে এর জন্য আলহামদু লিল্লাহ রাস্তা খোলা রয়েছে।

জরুরী টীকা-১৮

> *কিন্তু এ ধারা আলহামদু লিল্লাহ রয়েছে। আজও যদি আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই যে, এ ধারাটিকে কাজে লাগাব তাহলে এর জন্য আলহামদু লিল্লাহ রাস্তা খোলা রয়েছে।*

**এই আমরাটা কে? সবাই মিলে দায়িত্ব দিয়ে দিল সংবিধান প্রণয়নকারীদেরকে। ভোট দেয়াকে ওয়াজিব বলা হল। মুসলমানদেরকে ভোট দিতে বাধ্য করা হল। কর্ণধারগণের নির্দেশনা অনুযায়ী মুসলমানরা ভোট দিয়ে তাদের আইনদাতা ও বিধানদাতা নির্বাচন করে দিল। আর সংবিধান প্রণয়নকারীরা আল্লাহর বিধানকে পেছনে ফেলে দিয়ে মানবরচিত কুফরী আইনে গণতান্ত্রিকভাবে সংবিধান তৈরি করল এবং সেভাবে দেশ পরিচালনা করতে থাকল। এখন বলা হচ্ছে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এ আমরাটা কে বা কারা?*

আর শায়খে মুহতারাম যে সিদ্ধান্তের কথা বলছেন নতুন করে সে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। যদি বাস্তবে সে সুযোগ থাকত তা হলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জীবন শেষ করে গেছেন তারা কেন এ সুযোগটি গ্রহণ করলেন না?

তাঁদের উপর এ অপবাদ আনাকে আমি বৈধ মনে করি না যে, ইসলামের জন্য যারা রাষ্ট্র তৈরি করেছেন তারা এত সুবর্ণ সুযোগ থাকা

সত্ত্বেও ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য সত্তর/বাহাত্তর বছর পর্যন্ত চেষ্টা করেননি। আর যদি এ কথা হয় যে, তাঁরা চেষ্টা করেছেন, তা হলে এমন চেষ্টার পরও যে দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হয়নি সে দেশ দারুল ইসলাম হতে পারে না এবং সে দেশের মালিক পক্ষ মুসলমান হতে পারে না।

এ রাস্তা খোলা নেই। এ রাস্তার মুখে এমন জাল বসানো আছে যার প্রবাহ চালু থাকবে কিন্তু মাছগুলো সব আটকে যাবে। সে জাল হয়ত আমরা দেখছি না, অথবা দেখেও দেখছি না।

রাস্তা খোলা

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সে পৃথিবী নতুন কোন পৃথিবী নয়। মানবরচিত আইনগুলোরও শতাব্দীর পর শতাব্দী অনুশীলন হয়ে আসছে, যদিও ফলাফলে তা সব সময়ই বিফল হয়েছে। শরীয়তের আইনগুলোও সহস্রাব্দীর পর সহস্রাব্দী কাল ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে এবং সফলতার সাথে হয়ে আসছে। সর্বাবস্থায় ধারাগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি অনেকে পুরাতন। কোন ধারাটি প্রয়োগ করার জন্য, আর কোন ধারাটি শুধু দেখানোর জন্য ও প্রদর্শনীর জন্য এ বিষয়গুলো বোঝার মত ব্যবস্থা সংবিধানেই থাকে। বিশেষত গণতান্ত্রিক সংবিধানগুলোতে এমন অসংখ্য গদ ও ধারা সন্নিবেশিত করা হয় যার সঙ্গে প্রায়োগিক কোন সম্পর্ক থাকে না। তবু প্রথাগতভাবে সব সময় কথাগুলো বলে যেতে হয়।

এ ধারাগুলো তৈরি করা এবং সংবিধানে লিখে রাখার সব চাইতে বড় ফায়দা হচ্ছে, গণতন্ত্রের মালিক পক্ষ যেন প্রয়োজনের সময় বলতে পারে, 'রাস্তা খোলা' রাখা আছে। ধর্মের অনুসারীরা এ কথা বোঝা দরকার যে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা শুধুমাত্র একটি ধর্ম নিয়ে চলে, বাকি সব ধর্মকে তারা উপেক্ষা করে চলে। কিন্তু গণতন্ত্র তা পারে না। গণতন্ত্রকে সব ধর্ম নিয়ে চলতে হয়।

গণতন্ত্রের মূল থিওরীগুলোর একটি হচ্ছে 'তাওহীদুল আদয়ান' বা সকল ধর্মকে এক করা। এ কাজটি করা কোন চাট্টিখানি বিষয় নয়। প্রত্যেক ধর্মের লেজ কেটে কেটে এক মুঠোয় ধারন করার উপযুক্ত করা একটি সুকঠিন বিষয়। সে কারণে সব ধর্মের উপর রাজত্ব করতে গিয়ে গণতন্ত্রকে এভাবে রাস্তা খোলা রাখতে হয়। কিন্তু যারা জগতে বিচরণ

করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারা এ কথাগুলো না বুঝলে চলে না যে, সংবিধানের বক্তব্য ও ধারাগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে। কিছু প্রয়োগের জন্য, আর কিছু প্রদর্শনীর জন্য।

তাই আমি বলতে চাই, দুনিয়ার বিচারে এবং মানবরচিত আইনের বিচারে হোক বা দ্বীনের তথা আল্লাহর আইনের বিচারে হোক সকল ধারা অনুযায়ী একটু বিবেচনা করুন, এ 'রাস্তা খোলা' থাকার কী অর্থ? আদৌ একে রাস্তা খোলা বলা হয় কি না? জেলেরা এভাবে মাছের জন্য অনেক রাস্তা খুলে রাখে। কিন্তু মাছ বুঝতে পারে না যে, আসলে তার জন্য রাস্তা খোলা হয়েছে না কি রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু মাছের এ চরিত্র মানুষের জন্য মোটেও মানায় না। তাও আবার উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যাদের জন্য ধোঁকা খাওয়াও হারাম। তাও আবার যামানার রাহবারদের ক্ষেত্রে।

রাস্তা বন্ধ

আসলে রাস্তা বন্ধ। এ ধারার মাধ্যমেই আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের আসল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে কথা শায়খে মুহতারাম একটু পরে বলবেন। তখন আমরাও সে সম্পর্কে কিছু কথা বলব, ইনশা-আল্লাহ। আজ রক্তশূন্য এ ধারাটি যদি পাকিস্তান সংবিধানে না থাকত তাহলে পাকিস্তানের মালিক পক্ষের আসল চেহারা কিছু মানুষকে বোঝানো আরো সহজ হত।

আমাদের বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মালিক পক্ষের পক্ষ থেকে যখন বলা হয়েছে, সংবিধান থেকে ধর্মের ছায়া পর্যন্ত মুছে ফেলা হবে, তখন আমরা কিছু লোককে বোঝাতে পেরেছি যে, এখন ধর্মের যা কিছু আছে তা আসলে ধর্ম নয়, ধর্মের ছায়া মাত্র। রাষ্ট্রপক্ষ সে ছায়াটুকুকে সহ্য করতে পারছে না। তাই তা মুছে দেয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু যারা মনে করে ছায়াটা বাকি থাকলে ভোটের রাজনীতিতে কাজে লাগবে তাদের কারণে ছায়াটুকু মোছা যাচ্ছে না।

পাকিস্তান সংবিধানের এ ধারাটিও মূলত ধর্মের একটি ছায়া। যে ছায়ার কারণে পাকিস্তান জনগণকে বোঝানো কঠিন হয়ে গেছে যে, এখানে ধর্ম নেই। যারফলে একটি দেশে ধর্ম না থাকলে যা করতে হয় তা করা যাচ্ছে না। পাকিস্তানের জনগণ যদি বুঝতে পারত পাকিস্তানের প্রথম

গণতান্ত্রিক রাজাই ইসলামের গলায় ছুরি চালিয়ে দিয়ে গেছে তাহলে তারা ঐ দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত না যে স্বপ্ন আজো পর্যন্ত তারা দেখেই চলেছে।

'আলহামদু লিল্লাহ' বলার কোন অবস্থা নেই

তাই পাকিস্তানের এ অবস্থার উপর আজ আলহামদু লিল্লাহ বলার কোন অবস্থা নেই। বর্তমানে দেশভিত্তিক জাতীয়তাবোধের যে জোয়ার চলছে এবং জাতীয়তার প্রতিযোগিতায় সবাই এক নম্বরে পাস করার চেষ্টা করছে সে প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য বা জেতার মানসিকতা নিয়ে কেউ এসব ক্ষেত্রে আলহামদু লিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় করতে পারে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ শুকরিয়া সব দেশের কর্ণধারগণ আদায় করে চলেছেন। ভারতের কুতুবে অলম (?) শুকরিয়া আদায় করে চলেছেন, তার দেশে মুসলমানরা এত ভালো অবস্থায় আছে যে, পৃথিবীর কোথাও কোন মুসলমান এত ভালো অবস্থায় নেই। বাংলাদেশের কুতুবে বাঙ্গাল (?) শুকরিয়া আদায় করে চলেছেন, বাংলাদেশের মুসলমানরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে না। তারাই খাঁটি মুসলমান। সকল ধর্মের মানুষদেরকে নিয়ে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সুন্দর একটি সমাজ তারা গড়েছে। যেখানে ধর্মে ধর্মে কোন দূরত্ব নেই, ধর্মে ধর্মে কোন লড়াই নেই। এ দেশই একমাত্র দেশ যে দেশ মুসলিম অমুসলিম সবাই মিলে যুদ্ধ করে কেউ গাজী হয়ে, আর কেউ শহীদ হয়ে জিহাদের সর্বোচ্চ ফযীলত অর্জন করেছে।

এভাবে পাকিস্তানের মুসলমানরা পাকিস্তানে যেতে পেরে খুশি। ভারতের মুসলমানরা ভারতে থেকে যেতে পেরে খুশি। পাকিস্তানের মুসলমানরা বাঙ্গালীদেরকে তাড়িয়ে দিতে পেরে খুশি। বাঙ্গালীরা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে পেরে খুশি। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে মারতে পেরে খুব খুশি। আবার উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের হাতে মার খেতে পেরে আরো বেশি খুশি।

পাকিস্তানীরা বাঙ্গালী ও ভারতীয় না হতে পেরে খুব খুশী, আর বাঙ্গালীরা পাকিস্তানী ও ভারতীয় না হতে পেরে খুব খুশি। আবার ভারতীয়রা বাঙ্গালী ও পাকিস্তানী না হতে পেরে অরো অনেক বেশি খুশি।

এভাবেই জাতীয়তাবাদের প্রতিযোগিতায় সবাই সবাইকে হারিয়ে প্রত্যেকে জিতে চলেছে। কিন্তু বিপত্তি ঘটেছে অন্য জায়গায়। প্রত্যেক দেশের কর্ণধারগণই আন্তর্জাতিক মানের বড় হওয়ার কারণে সবার কথা সবাই জেনে যায়, আর বিপরীতমুখী যুক্তির কষাঘাতে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

মাসআলা হচ্ছে মুসলমানদের, মাসআলা হচ্ছে ইসলামের। সে মাসআলা যখন ইসলামের কিতাবের আলোকে আলোচনার টেবিলে না এসে জাতীয়তাবাদের কিতাবের আলোকে আলোচনায় আসে তখন মুসলমান আর এসব বিষয়ের শরয়ী সমাধান পায় না।

প্রত্যেক দেশের কর্ণধার যেসব দলিলের আলোকে নিজের দেশকে প্রাধান্য দিতে থাকে অপর দেশের কর্ণধার সেসব দলিলের সম্পূর্ণ বিপরীত দলিল দিয়ে তার দেশকে প্রাধান্য দিতে থাকে। দলিলে দলিলে বৈপরীত্যের কারণে উভয় পক্ষের দলিল শরীয়তের কিতাবে পাওয়া যায় না এবং জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক প্রাধান্য দেয়ার সূত্রগুলোও শরীয়তের কিতাবে পাওয়া যায় না।

যে মুসলমানরা এ কথা জানে যে, সারা বিশ্বের সব মুসলমান এক জাতি, তারা ভূখণ্ড ভিত্তিক এ ফযীলতগুলো দেখলে মনে ব্যথা অনুভব করে। এ ক্ষেত্রে এসে আলহমদু লিল্লাহ পড়ার কোন কারণ খুঁজে পায় না। শুকরিয়া আদায় করার মত কোন বিষয় খুঁজে পায় না।

'ইন্না লিল্লাহ' পড়ার সব ব্যবস্থা আছে

পরিস্থিতির ভয়াবহতার উপর তারা ইন্না লিল্লাহ পড়তে থাকে। কারণ ইন্না লিল্লাহ পড়ার সব ধরনের অবস্থা তৈরি হয়ে আছে। যে অবস্থাগুলো আমাদের দেখা ও শোনার আওতায়ই রয়েছে। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের কথাই আপাতত বলি। যে দেশগুলোর কর্ণধারগণ তাদের নিজ নিজ দেশের ফযীলত বয়ান করেই চলেছেন সে দেশগুলোর সংবিধানে ও বাস্তব চিত্রে এমন সব কারণ ও ঘটনা ঘটে আছে যেগুলোর উপর ইন্না লিল্লাহ বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু আমাদের শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা খুব লজ্জাজনক পরিমাণে তৃপ্তি বোধ করে চলেছি। এখানে তিন দেশের সম্মিলিত কিছু ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছি-

ক. তিন দেশেরই নীতি নির্ধারক ও আইনপ্রণয়কারী পরিষদ হচ্ছে তাগুত। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কুফরী শক্তি।

খ. তিন দেশেই মুসলিম অমুসলিম সবাই সমান অধিকার ও সমান শক্তি নিয়ে বসবাস করে।

গ. তিন দেশেই আইন প্রণয়নকারী, প্রয়োগকারী ও আইনের প্রহরী হিসাবে সকল ধর্মের মানুষ সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

ঘ. তিন দেশেই প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য তাদের ধর্মের দাবি অনুযায়ী কিছু আলাদা সুযোগ সুবিধা রাখা আছে।

ঙ. তিন দেশেই খেলাফত প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র পদ্ধতি গ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে দমন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে তার প্রয়োগ চলছে।

ঘ. তিন দেশেই ওলামায়ে কেরামের একটি বড় জামাত তাগুত ও গণতান্ত্রিক কুফরী শক্তির পক্ষ নিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং তাগুতকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে চলেছেন।

ঙ. তিন দেশেরই সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির নেতৃত্বে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কৃতিত্ব অর্জন করে চলেছে।

চ. তিন দেশই বিশ্ব কুফরী সংঘের অত্যন্ত অনুগামী ও বাধ্য সদস্য।

ছ. তিন দেশই বিশ্বের আইম্মাতুল কুফরের বন্ধুত্বের গর্বে গর্বিত।

জ. তিন দেশেরই ধর্মীয় প্রতিনিধিরা বিশ্ব কুফরী শক্তির সঙ্গে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একাত্মতা ঘোষণা করে ইসলামের শান্তিনীতিকে জবাই করে এসেছে।

ঝ. তিন দেশেরই মুসলিম প্রতিনিধিরা বিশ্বের আইম্মাতুল কুফরের কাছ থেকে জিহাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জিহাদকে সন্ত্রাস হিসাবে আখ্যায়িত করার সকল কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে।

ঞ. তিন দেশের ওলামায়ে কেরামের একটি বিশাল অংশ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে, এখন আর কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা সম্ভব নয়; বরং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বৈধও নয়।

ট. তিন দেশের ওলামায়ে কেরামের একটি বড় অংশ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে, জাতিসংঘ চুক্তির পর সকল কুফরী শক্তির সঙ্গে আজীবনের জন্য মুআহাদা হয়ে গেছে। এ মুআহাদা আর কখনো ভঙ্গ করা যাবে ন।

এভাবে অসংখ্য বিষয়ে পাকিস্তান অপরাপর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মত অনেকগুলো কুফরের অঙ্গীকার করে সে কুফরগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছে। আর আমরা তার সগীরা গুনাহের ওযর খুঁজে বেড়াচ্ছি। মুস্তাহাব-মানদূবের তালিকা তৈরি করে চলেছি।

এ ঘরে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বহু আগে। আমরা এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছি কার কনিষ্ঠা আঙ্গুলের মাথাটা এখনো অক্ষত আছে, কার চোখের কালিমা এখনো নষ্ট হয়নি। কার পাঁজরের তিনটা হাড় খুব বেশি পুড়ে যায়নি। আর এভাবেই আমাদের পরিতৃপ্তির পাহাড় উঁচু থেকে আরো উঁচু হয়ে চলেছে। আমরা আমাদের দুর্ভিক্ষকে অনুভব করতে পারিনি।

জরুরী টীকা : ১৯

“

অতএব যেসব লোক এ প্রোপাগাণ্ডা...

”

জরুরী টীকা-১৯

অতএব যেসব লোক এ প্রোপাগাণ্ডা...

'প্রোপাগাণ্ডা' শব্দের অর্থ

'প্রোপাগাণ্ডা' শব্দের অর্থ প্রচার-প্রচারণা। শব্দটি যদিও নিশ্চিত নেতিবাচক নয়; কিন্তু এরপরও দাওয়াতের শব্দ হিসাবে এটি খুব মানানসই শব্দ নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে যেখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে দ্বীনের গুরত্বপূর্ণ একটি বিধান পালন বিষয়ে দাওয়াত, দাওয়াতের ক্ষেত্র নিরূপণ, দাওয়াতের প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং এসব বিষয়ে ইলম ও ফিকহের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগতি।

শুধু প্রোপাগাণ্ডা আর ঢোল বাজিয়ে শরীয়তের কোন বিধান প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। শায়খে মুহতারাম যে বিষয়টির জন্য এ শব্দ ব্যবহার করেছেন আমাদের জানামতে সে বিষয়টি এমন নয় যার জন্য মিটিং মিছিল ও গণ সমাবেশ করা হয়। এমন বিষয়ও নয় যার জন্য মাইকিং করা হয় বা বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

আমাদের জানামতে আল্লাহর কিছু বান্দা ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের দিকে ধাবিত মুসলিম জাতিকে লেজুড় ভিত্তিক যে কোন কার্যক্রম থেকে ফিরিয়ে এনে আপন পরিচয়ে, আপন শক্তিতে ও আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হওয়ার মত একটি পথের দিশা দিতে চেষ্টা করছে।

আর বিষয়টি যেহেতু শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে কারণে পদক্ষেপটি যেন, পথ ও পন্থাটি যেন শতভাগ শরীয়ত সম্মত হয়, কুরআন হাদীস ও

ফিকহের সিদ্ধান্ত ভিত্তিক হয় সে জন্য তারা ইলমীভাবে গবেষণা করে চলেছে। নিজেদের অধ্যয়নের উপর ভরসা না করে দেশের নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতাগুলোতে ইস্তিফতা পাঠাচ্ছে। বিষয়টির যে যে জায়গায় তাদের দলিল ভিত্তিক সংশয় রয়েছে সে সংশয়গুলোকে দলিলসহ উপস্থাপন করেছে এবং আলোচনা পর্যালোচনা করে একটি দলিলভিত্তিক নির্ভুল ফলাফলে পৌঁছার জন্য ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অঙ্গনে বিষয়টির আলোচনাকে ব্যাপক করার চেষ্টা করেছে।

শায়খে মুহাতারাম যদি এ আচরণটিকেই 'প্রোপাগাণ্ডা' বলে ব্যক্ত করে থাকেন তাহলে আমদের সবিনয় নিবেদন হচ্ছে, ইলমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি দলিল অধ্যয়নের পর যদি তার মনে হয়, আল্লাহর একটি বিধান চলমান অবস্থায় আমাদের উপর ফরয হয়ে আছে, আর আমলীভাবে তা মাতরূক হয়ে আছে, তখন আল্লাহর এ বান্দার করণীয় কী?

আমাদের তো মনে হয় খুব স্বাভাবিক গতিই এটি যে, সে আল্লাহর বান্দা দলিলের আলোকে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে এবং সিদ্ধান্ত নির্ভুল কি না তা যাচাই করার জন্য নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতাগুলোতে ইস্তিফতা করবে এবং বিষয়টিকে ইলমের অঙ্গনে বিচরণকারী প্রত্যেকের গোচরিভূত করবে। এর বিপরীত আর কী হতে পারে? এছাড়া আর কোন সহজ ও সঠিক পদ্ধতি তো নেই।

এখন শায়খে মুহতারাম যদি এ বিষয়টিকে এবং আচরণটিকেই প্রোপাগাণ্ডা বলে ব্যক্ত করে থাকেন তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মনে কষ্ট পেতেই পারে। যদিও পিঁপড়া ও উঁই পোকার মনে কষ্ট যাওয়াতে হিমালয়ের কোন সমস্যা নেই, তবু কমপক্ষে এতটুকু নিশ্চয়তা দরকার যে, এ মনে কষ্ট পাওয়াটা কোন অপরাধ নয়।

প্রোপাগাণ্ডাকারীদের পরিচয়

যাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, তারা প্রোপাগাণ্ডা ছড়াচ্ছে তারা আসলে কারা। আমাদের জানামতে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের কুফরী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য যারা প্রোপাগাণ্ডা -শায়খে মুহতারামের ভাষায়- করছে তারা বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র-বেখবর-অজ্ঞ কোন গোষ্ঠী নয়। তারা ঐ কাফেলারই একটি অংশবিশেষ যে কাফেলা বিশ্বব্যাপী কুফরী শক্তির

উত্থান এবং তাগুতের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের মুখে শক্ত প্রাচীর তৈরি করে চলেছে। যে কাফেলা ঈমান ও কুফরের মাঝে সুস্পষ্ট ব্যবধান রেখা তৈরি করে চলেছে। যে কাফেলা আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সকল রশি একের পর এক কেটে চলেছে। যে কাফেলা হারিয়ে যাওয়া খেলাফতকে পুনরুদ্ধার করার জন্য শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় নিজের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বইয়ে দিতে নিজের মন ও প্রাণকে শানিত করে চলেছে। যে কাফেলা শত্রুর আগুনের পাহাড় ডিঙ্গিয়েও আপন লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। যে কাফেলা তাদের জীবনের সব কিছুর বিনিময়েও আল্লাহর এ আদেশগুলোর উপর আমল করার পথ খুঁজে চলেছে-

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ {سورة الصف: ٤}

"বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশাঢালা প্রাচীর।" -সূরা সাফ্ফ ৪

﴿يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ {سورة المائدة: ٢١-٢٣}

হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে প্রবেশ কর এবং নিজেদের পশ্চাদ দিকে ফিরে যেয়ো না; তা হলে তোমরা উল্টে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যায়, আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা (সেখানে) প্রবেশ করব। যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্যে দু'জন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বলল,

তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে (নগরের) দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রেখ, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।" -সূরা মায়িদা ২১-২৩

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ {سورة الممتحنة: ٤}

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" -সূরা মুমতাহিনা ৪

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ {سورة المائدة: ٥١}

"হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।" -সূরা মায়িদা ৫১

আপনার কি জানা আছে?

আপনারা কি জানেন এঁরা কারা? ইলম, তাকওয়া, বীরত্ব, ইখলাস, কুরবানী, দ্বীনের জন্য হৃদয়ের ব্যথা, কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণের প্রতি অনুরাগ, সলফের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, জগত সম্পর্কে অবগতি, উম্মতের জন্য দরদ, জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের প্রতি আসক্তি, সর্বোপরি আল্লাহর ভয় এ সকল বিষয়ে এ মানুষগুলোকে একটি পাল্লায় রাখুন, আর অপর পাল্লায় রাখার জন্য এসব গুণের অধিকারী এমন কিছু মানুষ নিয়ে আসুন

যাদেরকে আপনি অপর পাল্লায় রাখবেন, এমন ওজনের কিছু মানুষ নিয়ে আসুন যাদেরকে নিয়ে পাল্লা নীচের দিকে চলে যাবে।

সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখবেন, কুফর শাসিত এ পৃথিবীতে ইসলামের পক্ষে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ এ বিভাগটিতে আমরা শুধু তাদের নামই জানি ও শুনি যাদের নাম সচরাচর আলোচনায় আসে। নচেৎ আরো হাজারো নাম এমন আছে যাদের ওজন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে তাদের আলোচনা ও তাদের নাম সচরাচর শোনা যায় না এবং তাদেরকে আমরা চিনতে পারি না।

আসল কথা হচ্ছে, এ প্রোপাগাণ্ডার বীরদেরকে চিনতে হলে এ প্রোপাগাণ্ডার আঙ্গিনায় আসতে হবে। তখন প্রোপাগাণ্ডাকে আর প্রোপাগাণ্ডা মনে হবে না। অথবা প্রোপাগাণ্ডাকে আসল সুর বলে মনে হবে, ইনশা-আল্লাহ।

এ প্রোপাগাণ্ডার বিপরীত অবস্থার বিশ্লেষণ

কথিত এ প্রোপাগাণ্ডার বিপরীত অবস্থার বিশ্লেষণ একটু কঠিন। সুকঠিন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের 'হাইআতে কাযাইয়া' বা প্রচলিত প্রথা ও ধারার সকল আয়োজন। এ প্রোপাগাণ্ডার বিপরীত অবস্থা হচ্ছে, যে অবস্থার উপর আমরা চলছি। যে অবস্থার উপর পৃথিবী চলছে। সে অবস্থার সংক্ষিপ্ত শিরোনাম হচ্ছে, **'যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকা'**।

কথিত প্রোপাগাণ্ডার বিপরীতে অবস্থানকারী মহল অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। অনেক রুচি প্রকৃতিতে বিভক্ত। অনেক প্রকারের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্ম পদ্ধতিতে বিভক্ত। তবে কথিত প্রোপাগাণ্ডা প্রচলিত সকল মহলে সকল স্তরের যে বিন্দুতে গিয়ে প্রথম আঘাত করে তা হচ্ছে 'যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকা'র বিন্দু।

প্রত্যেক মহল ও স্তর তখনই খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে যখন যেভাবে চলছে সেভাবে চলার পথে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে। প্রত্যেক মহল ও স্তর যখনই বুঝতে পারে তার পথ ও গতি বদলাতে হবে তখন সে পরিবর্তনের সকল হিম্মত হারিয়ে ফেলে।

বলাবাহুল্য, কথিত প্রোপাগাণ্ডার বিপরীত প্রথাগত যে অবস্থাগুলো বিরাজ করছে সে অবস্থাগুলোর অধিকাংশই এমন যা সুচিন্তিতভাবে দলিলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকাংশই এমন যা কারো ব্যক্তিগত রুচির ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। অধিকাংশই এমন যা একেবারেই সাময়িক কোন প্রয়োজনের ভিত্তিতে করতে হয়েছে।

কিন্তু কিছুকাল পার হওয়ার পর শুধু সময় পার হওয়ার কারণে এবং তা একটু দীর্ঘ হওয়ার কারণে তা এত বেশি ভিত্তিবহুল বলে মনে হওয়া শুরু হয়েছে যে, তার বিপরীতে দলিল ভিত্তিক কোন প্রোপাগাণ্ডাও কিছু করতে পারে না। অর্থাৎ যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকার বিপরীত কোন কিছু মানার জন্য কেউ প্রস্তুত থাকে না। প্রথা ও প্রচলনের বিপরীত কোন কথাই কেউ শুনতে চায় না। কোনভাবেই না। যেমনটি আমরা সামনে আরো স্পষ্টভাবে দেখব, ইনশা-আল্লাহ।

জরুরী টীকা : ২০

“

ছড়াচ্ছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই.....

জরুরী টীকা-২০

ছড়াচ্ছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই.....

অস্ত্র হাতে নেয়ার শরয়ী পরিভাষা

শরয়ী পরিভাষায় মুসলমানদের অস্ত্র হাতে নেয়াকে বলা হয় 'জিহাদ'। অস্ত্র হাতে নেয়া মানে হচ্ছে, অস্ত্র ব্যবহার করা। অর্থাৎ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সেসব লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দেয়। ফিকহের কিতাবাদিতে জিহাদের সংজ্ঞা করা হয়েছে এভাবে-

﴿وَالْجِهَادُ اصْطِلاَحًا: قِتَال مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ بَعْدَ دَعْوَتِهِ لِلإِسْلاَمِ وَإِبَائِهِ، إِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللهِ﴾

"পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে, যে কাফেরের সঙ্গে চুক্তি নেই তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য।"

কুরআন বলছে, মুমিনরা আল্লাহর পথে আল্লাহর পক্ষে লড়াই করে, কাফেররা শায়তানের পথে আল্লাহর বিপক্ষে লড়াই করে। আর আল্লাহর পথ হচ্ছে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার পথ, আর শয়তানের পথ হচ্ছে গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার পথ।

কয়েকটি খোলামেলা কথা

এখন প্রোপাগাণ্ডাকারীরা যে বলছে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই, তারা কেন এসব কথা বলছে? এ বিষয়ে কিছু খোলামেলা কথা হয়ে যাওয়া দরকার।

ক. জিহাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, আল্লাহর দ্বীনকে ও আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধকে বলা হয় জিহাদ।

খ. পাকিস্তানে আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর বিধান বিজয়ী হয়নি। গায়রুল্লাহর দ্বীন, গায়রুল্লাহর বিধান ও গায়রুল্লাহর আইন বিজয়ী হয়েছে এবং বিজয়ী হয়ে আছে।

গ. যারা আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর আইনকে পরাজিত করে গায়রুল্লাহর দ্বীন, গায়রুল্লাহর বিধান ও গায়রুল্লাহর আইনকে বিজয়ী করেছে তারা কাফের।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ {نساء : ٧٦}

ঘ. যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ও আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে এবং গায়রুল্লাহর দ্বীনের পক্ষে, গায়রুল্লাহর বিধানের পক্ষে ও গায়রুল্লাহর আইনের পক্ষে লড়াই করে তারা কাফের। আর তারা জন্মগতভাবে মুসলমান হয়ে থাকলে এ পর্যায়ে এসে তারা কয়েক কারণে মুরতাদ। কারণগুলো যথাক্রমে: আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত না করে গায়রুল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করা, আল্লাহর আইনের প্রতিরোধ করা, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা, আল্লাহর আইনকে দেশ-সমাজ-পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে অচল মনে করা, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা ইত্যাদি কারণে তারা মুরতাদ।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾

ঙ. আল্লাহর দ্বীন, বিধান ও আইন পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এবং গায়রুল্লাহর দ্বীন, বিধান ও আইন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত গায়রুল্লাহর দ্বীন, বিধান ও আইনের পক্ষের লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয।

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ {سورة الأنفال : ٣٩}

কথিত প্রোপাগাণ্ডাকারীরা বলছে-

চ. পাকিস্তানে আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে রাষ্ট্রপক্ষ তা করতে দেবে না। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে গেলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপক্ষ গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে মুসলমানদের জিহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾

ছ. আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হলে বিশ্বের সকল কুফরী শক্তি গায়রুল্লাহর বিধানের পক্ষে পাকিস্তান সরকারকে সহযোগিতা করবে।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾

উল্লিখিত কথাগুলোর মধ্যে কোন কোনটির সঙ্গে শায়খে মুহতারামের দ্বিমত আছে? কোন কোনটি কথা অবাস্তব বলে শায়খে মুহতারাম প্রত্যাখ্যান করবেন?

একটি সংশয়

একটি সংশয়ের কথা এখানে বলে রাখি যে সংশয় শায়খে মুহতারামের হয়ত হবে না, কিন্তু শায়খে মুহতারামের পক্ষ থেকে কারো মনে এ সংশয় জাগতে পারে যে, জিহাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, জিহাদ হবে কাফেরদের বিরুদ্ধে। আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপক্ষে যারা আছে তারা সবাই মুসলমান। তাহলে জিহাদ কার বিরুদ্ধে হবে? মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াই তো জিহাদ নয়। এটাতো আত্মকলহ। ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ।

প্রথম নিবেদন

এ বিষয়ে কথিত প্রোপাগাণ্ডাকারীদের পক্ষ থেকে প্রথম সাদামাটা নিবেদন হচ্ছে, একটি ভূখণ্ডে আল্লাহর বিধান পরাজিত অবস্থায় আছে, তাকে বিজয়ী করতে হবে। আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার পথ হচ্ছে জিহাদ। কথিত প্রোপাগাণ্ডাকারীরা জিহাদ শুরু করেছে ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার পথে বাধা দিচ্ছে। তারা গুলি চালাচ্ছে ঐ শক্তির বুকে যারা মুজাহিদদের শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করতে এসেছে।

এখন একটু ইনসাফ করে বলুন, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার পক্ষে লড়াইয়ে রত মুজাহিদের দায়িত্বে কি এ কথা আসে যে, তারা গুলি চালানোর সময় যাচাই করে দেখবে তার প্রতিপক্ষ চৌধুরী সাহেব না কি পাটওয়ারী সাহেব? রামকানাই বাবু না কি হরিশ চন্দ্র ঘোষ? ডেভিড মেকার না কি হেইডেন বেকার? তার কাছে তো আল্লাহর দেয়া মূলনীতি সর্বক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় আছে-

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾

দ্বিতীয় নিবেদন

এ বিষয়ে দ্বিতীয় নিবেদন হচ্ছে, যারা একটি ভূখণ্ডের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এবং সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী হয়ে, কোটি কোটি মুসলমানের পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে তাদেরকে পরিচালনার জন্য আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ না করে গায়রুল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করেছে তারা তাদের এ গ্রহণ বর্জন অনুষ্ঠানেই মুরতাদ হয়ে গেছে, যদি তারা এর আগে মুসলমান থেকে থাকে।

এরপর কোটি কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে যখন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জোর চাপ, দাবি, আবেদন, নিবেদন চলছিল, আর নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী তা গ্রহণ না করে গায়রুল্লাহর দ্বীন দিয়ে দেশ পরিচালনা করে যাচ্ছিল, তখন প্রতিদিন ও প্রতিবারই তাদের কুফরীর পুনরাবৃত্তি ঘটছিল, ইরতিদাদের পুনরাবৃত্তি ঘটছিল।

এরপর যখন আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চলছিল আর রাষ্ট্রপক্ষ সে আন্দোলনকে দমন করছিল, তখন প্রতিদিন প্রতিবার দমনের

সাথে সাথে তাদের কুফরীর পুনরাবৃত্তি ঘটছিল। তাদের ইরতিদাদের পুনরাবৃত্তি ঘটছিল।

এরপর যখন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পথের মুজাহিদরা অস্ত্র পরিচালনা শুরু করবে তখন যারা যারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান করবে এবং যে কোনভাবে যে কোন স্তরে জিহাদের বিরুদ্ধে তাগুতের পক্ষে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে তারা তখন মুরতাদ হতে থাকবে, যদি এর আগে তারা মুসলমান থেকে থাকে।

অতএব সংশয়ের কোন কারণ নেই

তাই পাঠক নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে মুজাহিদদের প্রতিটি বুলেট ইনশা-আল্লাহ কাফের, মুরতাদ, মুলহিদ ও যিন্দীকদের বুককেই ভেদ করে যাবে। এ জিহাদ মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের জিহাদ হবে না। এ জিহাদ আত্মকলহের জিহাদ হবে না। এ জিহাদ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের জিহাদ। শত শত খোদা ও শত শত খোদার পূজারীদের বিরুদ্ধে এক আল্লাহর বান্দাদের জিহাদ।

কুফর শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন জিহাদ। তাই প্রোপাগাণ্ডাকারীরা বলেছে, জিহাদ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। প্রোপাগাণ্ডাকারীদের এ দাবিকে সত্য বলে মানতে আমাদের সমস্যা কোথায়? সত্যকে সত্য বলে মানতে তো কোন সমস্যা থাকার কথা নয়।

বাকি উপায়গুলোর তালিকা

যাই হোক, এরপরও বলা হচ্ছে, কুফর শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বহু উপায় আছে। আল্লাহর নির্দেশিত উপায় ও পন্থাকে উপেক্ষা করে বহুজন বহু উপায় আবিষ্কার করেছে। প্রত্যেক উদ্ভাবক নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটিকে কুফর শিরক মূলোৎপাটনের পথ ও পন্থা হিসাবে দাবি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বাতলানো পদ্ধতিটিকে বাম হাতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছে। তাই এ পর্যায়ে সে উপায়গুলোর একটি তালিকাও আমাদের সামনে থাকা চাই। আল্লাহর নির্দেশিত পন্থার বাইরের পন্থাগুলো মোটামুটি এই-

ক. বর্তমান পৃথিবী যেহেতু গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তাই আমাদের দ্বীন ও ইসলাম সম্পর্কীয় যেকোন দাবি বা সমস্যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাধানের চেষ্টা করা সবচাইতে বেশি নিরাপদ ও ফলপ্রসূ হবে।

খ. গণতন্ত্রের আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের উন্মুক্ত সুযোগ রাখা হয়েছে। আদালতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তাই আমরা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য যা করতে চাই তা আদালতের সামনে উত্থাপন করতে পারি।

গ. গণতান্ত্রিক প্রত্যেকটি দেশে সবার জন্য বাকস্বাধীনতা রয়েছে। অতীতে ইসলামী খেলাফত চলাকালে ইসলামী দেশগুলোতেও এ স্বাধীনতা ছিল না। অতএব গণতন্ত্রের বাকস্বাধীনতার এ সুযোগ নিয়ে আমরা ইসলাম ও মুসলমানের যেকোন চাহিদাকে সামনে নিয়ে আসতে পারি এবং তা আদায় করে নিতে পারি।

ঘ. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সুবাদে সব ধর্মের সব কথাই এখন বলা যায়। আমরা আমাদের ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে যে কোন কথা বলতে পারি, যে কোন কাজ করতে পারি। সংবিধানের সে ধারাগুলো অনুসরণ করে আমরা এ পরিবেশে থেকেও অনেক কিছু করতে পারি। শুধু ধারাগুলোর যথাযথ জ্ঞান, উপলব্ধি ও কাজে লাগানোর পদ্ধতিগুলো শেখা দরকার।

ঙ. দাওয়াতের পথ এখন একেবারেই উন্মুক্ত। দাওয়াতের মাধ্যমে যেভাবে একটি পাথরকে গলিয়ে ফেলা যায় অস্ত্রের মাধ্যমে সেভাবে গলানো যায় না। অস্ত্রের মাধ্যমে সাময়িক ও বাহ্যিক বিজয় অর্জিত হয়, কিন্তু মানুষের মনকে জয় করা যায় না। তাই দাওয়াতের সর্বোচ্চ মাত্রা এখন ব্যবহার করা চাই।

চ. বর্তমানে আধ্যাত্মিকতার প্রতি মানুষের অনেক ঝোঁক। এ বিভাগটা আমাদের দখলে নিয়ে আসা দরকার। যাদের দখলে রয়েছে তারা এর উপযুক্ত নয়। আমাদের দখলে আসলে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তাই প্রচলিত ধারায় পীর মুরিদের আরো ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার।

ছ. মানুষদের মন জয় করার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে সেবা। অমুসলিমরা এই সেবার মাধ্যমে পুরো পৃথিবী দখল করে চলেছে। আমরা কঠোর পথগুলো পরিহার করে সেবার পথে এগুতে পারি। এতে করে মানুষ এমনি ইসলামের প্রতি ধাবিত হতে থাকবে।

জ. পৃথিবীর প্রধান কুফরী শক্তিগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, তাদেরকে না ক্ষেপিয়ে সুযোগে সুযোগে আমরা আমাদের স্বার্থগুলো আদায় করে নিতে পারি। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ যে পরিমাণ আদায় করা সম্ভব অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়।

ঝ. পৃথিবীর চলমান বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হবে। ক্ষমতা এখন কুফরের হাতে। তাদের শক্তির তুলনায় আমাদের কাছে কিছুই নেই। আমরা খালি হাতে কী করতে পারব? তাই আত্মঘাতি কোন পথেই এগুনো যাবে না। আত্মঘাতি কোন সিদ্ধান্তই নেয়া যাবে না। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থেই আমাদেরকে অস্ত্রের পথ ছেড়ে সম্প্রীতির পথে আসতে হবে।

ঞ. পৃথিবীর যাদেরকে আমরা কাফের বা বাতেল শক্তি বলছি তাদের এভাবে কাফের বা বাতেল বলে বলে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলে আমাদের ক্ষতিই হবে। বাতিলের সঙ্গে একাত্নতার উপকারিতার উদাহরণ দিতে গিয়ে অনেকে এভাবেও বলেছেন যে, জামাতের বাইরে থেকে লোকমা দিলে যেমন কোন ফায়দা নেই তেমনি বাতেলের সঙ্গ ত্যাগ করে বাহির থেকে শুধু ভুল ধরলে কোন কাজে আসবে না। তাদের সোহবতে আসতে হবে, তাদের সোহবত নিতে হবে। তাহলে কিছুটা হলেও আশা করা যাবে। সঙ্গ ত্যাগ করে ভালো কিছুর আশা করার কোন মানে হয় না।

ট. গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ও মানবরচিত বিধানের মালিক পক্ষকে ইসলামের পক্ষে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তাদেরকে যদি আল্লাহর বিধানের উপকারিতা বোঝানো যায় তাহলে তাদের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা যত সহজ হবে, আমাদের জন্য তত সহজ হবে না।

এভাবে অসংখ্য পথ ও পন্থা আমাদের সামনে হাতছানি দিয়ে চলেছে। সব পথ ও পন্থা একটি বিন্দুতে অভিন্ন একটি ধারা গ্রহণ করে চলেছে। আর তা হচ্ছে, যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে দেয়া এবং ঝুঁকিপূর্ণ কোন পথে পা না বাড়ানো। সঙ্গে সঙ্গে সেসব পথের পথিকগণ তাদের অভিজ্ঞতা, উপকারিতার বিশাল তালিকাও আমাদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন যার সামনে আল্লাহর বিধান, জিহাদের বিধান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

উপায়গুলোর স্বরূপ

আগের শিরোনামে উল্লিখিত পথ ও পন্থাগুলোর স্বরূপ কুরআন হাদীসসহ শরীয়তের কিতাবাদিতে খুব স্পষ্টভাবে এসেছে। আমরা আগের শিরোনামের ক্রমানুসারে শরীয়তের বিধানের আলোকে তার স্বরূপ তুলে ধরছি। বিবেচনা করা পাঠকের দায়িত্ব। স্বরূপ হচ্ছে এই-

ক. ঈমানকে বিক্রয় করতে হবে

(...গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাধানের চেষ্টা করা...)

গণতন্ত্রের আবিষ্কারক, প্রচারক, নিয়ন্ত্রক ও ধারক বাহক সবাই কাফের। তাই নিরাপত্তার বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে ফলপ্রসূ হওয়ার ক্ষেত্রে তাই হবে যা গণতন্ত্র চাইবে। ফলাফল ইসলামের দিকে না গিয়ে গণতন্ত্রের দিকেই যাবে।

﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ {سورة البقرة: ١٢٠}

"ইহুদী ও খ্রীস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। আপনি বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।" -সূরা বাকারা ১২০

ফায়দা: প্রথম উপায়ের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে ১. অমুসলিমের ধর্মের অনুসরণ ব্যতীত তারা মুসলমানদের কোন অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হবে না। তারা আমাদের দাবির উপর ততটুকু সম্মত হবে যতটুকু পরিমাণ আমরা তাদের ধর্মকে গ্রহণ করব। ২. আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের বাইরে অন্য হেদায়াতের শরণাপন্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। ৩. সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইলম এসেছে তাকে একমাত্র অনুসরণীয় মনে না করে গণতন্ত্র ও মানবরচিত মনষ্কামনার অনুসরণ করলে আল্লাহর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

খ. তাগূতকে বিচারক বানাতে হবে

(...আদালতের সামনে উত্থাপন...)

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, বাকস্বাধীনতা এবং এর মাধ্যমে অধিকার আদায় এসবই হচ্ছে অনেক পরের বিষয়। এসবের আগের কথা হচ্ছে, সে আদালতে যাওয়ার বিধান কী? এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য কী? আদালত হিসাবে কুফরের আদালতকে নির্বাচন করার বিধান কী? বিচারক হিসাবে অমুসলিমকে এবং মানবরচিত আইনকে মান্য করার বিধান কী? সে বিষয়টিই আগে দেখতে হবে। কারণ আমরা মুসলমান। আমরা যা করছি তা ইসলামের অনুসরণের জন্যই করছি।

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ {سورة النساء: ٦٠-٦١}

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। অথচ শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদেরক দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে।" -সূরা নিসা ৬০-৬১

ফায়দা: এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। ১. গায়রুল্লাহর বিধানে পরিচালিত আদালত হচ্ছে তাগুতের আদালত। ২. গায়রুল্লাহর আদালতকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ রয়েছে। ৩. গায়রুল্লাহর আদালতের শরণাপন্ন হওয়া হচ্ছে চূড়ান্ত

ভ্রষ্টতা অর্থাৎ কুফর। ৪. এ কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিরা এ কুফরী করার সময় নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করে। ৫. এ কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর বিধানকে বিচারক মানতে বলা হলে তারা কৌশলে সটকে পড়তে চায়। এ বিধানকে তারা বিচারক হিসাবে মানতে রাজি হয় না। ৬. এগুলোর প্রত্যেকটি কোন না কোন কাফের বা মুনাফিকের গুণ।

গ. নিষ্ফল আমলের প্রতিযোগিতা করতে হবে

(...গণতন্ত্রের বাকস্বাধীনতার সুযোগ নেয়া...)

উম্মত ঈমান কুফরের ব্যবধান কোন আমল দিয়ে দূর করতে চায়? ঈমানের শূন্যতা কেমন দামি আমল দিয়ে পূরণ করতে চায়? কুফরকে ঈমানের সঙ্গে তুলনা করার মত অধঃপতন ঘটে গেছে। শুধু এখানেই থামেনি। কুফরকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়ার মত আস্পর্ধাও হয়ে গেছে। এরপর তাদের ঈমানের কোন সমস্যা হচ্ছে না। এমন ঢালাই করা ঈমান তো কুরআনে হাদীসে চোখে পড়ে না। কুরআনে তো বলা হয়েছে ঈমান বিহীন কোন আমলের কোন মূল্য নেই। আর ঈমানের সঙ্গে কোন আমলের কোন তুলনা চলে না।

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ {سورة النور ٣٩-٤٠}

"এবং (অন্যদিকে) যারা কুফুরি অবলম্বন করেছে, তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন তার কাছে পৌঁছে, তখন বুঝতে পারে তা কিছুই নয়। সেখানে সে পায় আল্লাহকে। আল্লাহ তার হিসাব পরিপূর্ণরূপে চুকিয়ে দেন। আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহীতা। অথবা (তাদের কার্যাবলী) যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার। যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, তার উপর আরেক তরঙ্গ, তার উপর মেঘরাশি। স্তরের উপর স্তর বিন্যস্ত আঁধারপুঞ্জ। কেউ যখন

নিজ হাত বের করে, তাও দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসীবে কোন আলো নেই।" -সূরা নূর ৩৯-৪০

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ {سورة التوبة: ١٩}

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর রাস্তায়, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়াত করেন না।" -সূরা তাওবা ১৯

ফায়েদা: কুরআনের আয়াতদু'টিতে কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্ট। ১. ঈমান বিহীন আমলের কোন ধর্তব্য নেই। ২. কাফেরের ভালো কাজগুলোর উদাহরণ হচ্ছে মরীচিকার মত, পিপাসায় কাতর ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে ধোঁকা খায়। ৩. কাফেরের আমল হচ্ছে তিন স্তর বিশিষ্ট সাগরের গভীরের অন্ধকারের মত। ৪. খাদেমুল হারামাইন হওয়া আর মুমিন হওয়া এক কথা নয়। ৫. মুজাহিদ হওয়া আর খাদেমুল হারামাইন হওয়া এক কথা নয়। ৬. খাদেমুল হারামাইন হলেই মুমিন হওয়া যায় না। ৭. মুমিন পরিচয় দিতে হলে ঈমান লাগবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে।

ঘ. ইসলাম আর একমাত্র ধর্ম থাকবে না

(...সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ধারাগুলো কাজে লাগানো...)

সব ধর্মের উন্নতি ও স্বাধীনতার মাঝে মুসলমানরা খুশি হওয়ার মত কী রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে? সব ধর্মের স্বাধীনতা দেয়ার পর মুসলমানরাও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার বিষয়ে স্বাধীনতা পাবে। এই খুশি? কিন্তু এ খুশি কতক্ষণের? ইসলামের দাওয়াতের প্রথম বাক্যে থাকবে হিন্দু মুশরিকদের অসারতার বয়ান। দ্বিতীয় বাক্যে থাকবে ইহুদী খ্রিস্টানদের অপদার্থতার বয়ান। তৃতীয় বাক্যে থাকবে ইসলামের

অনুসারীরা ব্যতীত বাকী সবাই জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা। গণতান্ত্রিকরা জাহান্নামী, ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা জাহান্নামী, ইসলাম ব্যতীত সব ধর্মের অনুসারীরা জাহান্নামী, ধর্মের দাওয়াত দেয়ার জন্য যারা সুযোগ করে দিয়েছে তারা জাহান্নামী।

এমন কোন মোহনা নেই যেখানে ঈমান আর কুফরের মিলন হতে পারে। এমন কোন অঙ্গন নেই যেখানে ঈমান ও কুফরের অনুশীলন হতে পারে। এমন কোন মঞ্চ নেই যেখানে ঈমান কুফরের সম্প্রীতির প্রদর্শনী হতে পারে।

ইসলাম ও মুসলমান যখন তার দাওয়াতে এ কথাগুলো বলতে থাকবে তখন তাদের জন্য বরাদ্দকৃত স্বাধীনতার পরিধি ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। এক সময় কণ্ঠনালীসহ বন্ধ করে দেয়া হবে। আর যে দাওয়াতে এ কথাগুলো বলা হবে না সে দাওয়াত কোন দাওয়াতই নয়। সেগুলো হচ্ছে কিছু সোনালী রূপালী কথা। ধর্মবিলাসীদের কিছু বিলাসী উক্তি। কুরআনের আয়াত কী বলে দেখুন-

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ {سورة آل عمران: ١٩}

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। যে কেউই আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" -সূরা আল ইমরান ১৯

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ {سورة آل عمران: ٨٥}

"যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" -সূরা আল ইমরান ৮৫

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ {سورة الكافرون ١-٦}

"বলুন, হে কাফেরেরা, আমি এবাদত করি না, তোমরা যার এবাদত কর তার। এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি। এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।" -সূরা কাফিরূন ১-৬

ফায়েদা: আয়াতগুলোতে যে কথাগুলোর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তা যথাক্রমে এই। ১. আল্লাহর দরবারে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম ধর্ম নয়। ২. যারাই ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেনি তারাই আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহকারী। ৩. তারাই আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কাফের। ৪. ইসলাম ব্যতীত যে যাই গ্রহণ করবে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। ৫. ইসলাম ব্যতীত যে যাই গ্রহণ করবে সেই পরকালে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৬. ঈমান কুফরের যৌথ কোন মহড়া নেই, কোন মিলন মোহনা নেই, কোন সম্প্রীতির সুযোগ নেই।

দাওয়াত হতে হবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাষায়-

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ {سورة مريم: ٤١-٤٥}

"আর কিতাবে স্মরণ করুন ইবরাহীমকে, নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। যখন তিনি তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, হে আমার বাবা!

আপনি কেন এমন কিছুর উপাসনা করেন যা শোনে না এবং দেখতে পায় না এবং কোন বিপদ থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারে না। হে আমার বাবা! আমার কাছে এমন ইলম এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার ব্বাবা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না, নিশ্চয় শয়তান রহমানের অবাধ্য। হে আমার বাবা! আমি আশংকা করছি যে, রহমানের পক্ষ থেকে আপনাকে কোন শাস্তি ঘিরে ধরবে, তখন আপনি শয়তানের বন্ধুতে রূপান্তরিত হবেন। -সূরা মারয়াম ৪১-৪৫

ঙ. বিজয়ের পথ অস্বীকার করতে হবে

(...দাওয়াতের বর্তমান প্রচলিত সর্বোচ্চ মাত্রা ব্যবহার করা...)

দাওয়াত ও জিহাদকে আলাদা করেই আমরা আমাদের যত বিপদ টেনে এনেছি। যে কাজের শুরু দাওয়াত দিয়ে তারই সমাপ্তি জিহাদ দিয়ে। কিন্তু দু'টিকে আলাদা করে আমরা অনেকগুলো অযথা প্রশ্ন ও তার উত্তরের পেছনে মেধা ব্যয় করে চলেছি।

সবচাইতে বড় সমস্যা করেছি দাওয়াত ও জিহাদকে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিয়ে। এরপর দ্বিতীয় কাজটা আমাদের দায়িত্বে নিয়েছি। আর তা হল জিহাদের চাইতে দাওয়াতের ফায়দা কত বেশি তা বলতে থাকা এবং আয়াত, হাদীস ও সীরাতের বিপরীত কথা বলতে থাকা। কুরআন থেকে জিহাদের ফায়দা সরাসরি দেখে নিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ-

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ {سورة النصر: ١-٣}

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।" -সূরা নাসর ১-৩

ফায়েদা: এ সূরায় আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কথা এই: ১. বড় ছোট সব আমলের সমাপ্তি হবে তাওবা ইস্তেগফার দিয়ে। এর কোন বিকল্প নেই। ২. বিজয় নির্ভর করছে আল্লাহর সাহায্যের উপর। ৩. আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এর সম্মিলিত ব্যবহার হচ্ছে জিহাদের ময়দানে কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের ক্ষেত্রে। ৪. তাফসীরবিদগণ এ বিজয় দ্বারা বিশেষভাবে মক্কা বিজয় বলে দাবি করেছেন। ৫. জিহাদে মুসলমানদের বিজয়ের পরে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে দলে দলে। এছাড়া সাধারণত একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে।

চ. গায়রুল্লাহর পরিভাষা গ্রহণ করতে হবে

(...প্রচলিত ধারায় পীর মুরিদের আরো ব্যাপক প্রসার ঘটানো...)

সাময়িক প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বীনী কাজের জন্য যেসব উপায় উপকরণের আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোকে তার সাময়িক অবস্থার সঙ্গে সীমাবদ্ধ রাখাই বেশি নিরাপদ। আপন গণ্ডি অতিক্রম করে আবিষ্কারগুলো যখন শারীয়তের বিভিন্ন ফরয ওয়াজিব বিধান ও শরয়ী পরিভাষার সঙ্গে টক্কর দিয়ে বসে তখন সেসব উপায় উপকরণ যা এক সময় দ্বীনের স্বপক্ষে কাজ করেছে তা দ্বীনের বিপক্ষে কাজ করতে থাকে। দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। মূর্তি পূজার ইতিহাস দেখুন এবং কুরআনের এ আয়াতটি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ {سورة يوسف: ٤٠}

"তাকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, তা তো কতিপয় নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নাম তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা রেখে দিয়েছ, আথচ আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কোন দলিল প্রমাণ নাযিল করেননি। আইন বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই।

তিনি এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই হচ্ছে সঠিক সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" -সূরা ইউসুফ ৪০

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ {سورة النجم: ١٩-٢٣}

তোমরা কি লাত ও উয্যা (এর স্বরূপ) সম্বন্ধে চিন্তা করেছ? তৃতীয় আরেকটি সম্বন্ধে যার নাম মানাত? তবে কি তোমাদের থাকবে পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? তাহলে তো এটা বড় অন্যায় বণ্টন!। (এদের স্বরূপ আর কিছু নয় যে,) এগুলো কতক নাম মাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখেছ। আল্লাহ এর স্বপক্ষে কোন দলিল নাযিল করেননি। প্রকৃতপক্ষে তারা (অর্থাৎ কাফেররা) কেবল ধারণা ও মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এসে গেছে পথ-নির্দেশ।" -সূরা নাজ্ম ১৯-২৩

ফায়েদা: আয়াতগুলোর কয়েকটি বিষয় বুঝে নিলে আমরা আমাদের আবিষ্কারগুলোর মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন যথাযথভাবে করতে পারব, ইনশা-আল্লাহ। ১. গায়রুল্লাহকে আল্লাহর আসনে বসানোর ক্ষেত্রে উত্তরসূরি ও পূর্বসূরি সমান শরীক। ২. গায়রুল্লাহকে দেয়া শক্তিবাচক পদবিগুলো মানুষেরই দেয়া। ৩. আল্লাহর সঙ্গে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। ৪. আল্লাহর বিধানের কোন বিকল্প চিন্তা করার সুযোগ নেই। ৫. এ সত্য সত্য হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই তা গ্রহণ করবে না। ৫. মানব থেকে মহামানব, মহামানব থেকে অতিমানব, অতিমানব থেকে মাবূদ ও মূর্তি সবই দলিল থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে। ৬. আল্লাহর হেদায়াতকে পাশে রেখেই ভুলের প্রাসাদ তৈরি করা হয় শুধু ধারণার উপর নির্ভর করে।

ছ. আহকামুদ দাওয়া উপেক্ষা করতে হবে

...(কঠোর পথগুলো পরিহার করে সেবার পথে এগুতে হবে...)

নরম আচরণ, সেবা, মন জয় ইত্যাদি সম্পর্কে এর আগে অন্য প্রসঙ্গে কিছু কথা এসেছে। এখানে আরেকটু কারগুজারী সংযোজন করা যায়। কারগুজারী হচ্ছে, আম্বিয়া কেরাম তাঁদের নবুয়ত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত যে সকল সুন্দর গুণাবলীর মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিতি লাভ করেছিলেন তার অন্যতম ছিল সেবা ও পরের উপকার করা। এ ক্ষেত্রে আমাদের আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবার সেরা। এ বিষয়ক ঘটনাবলী সীরাতের কিতাবে ভরপুর রয়েছে।

কিন্তু চল্লিশ বছর যাবত যাদের মন জয় করা হয়েছে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মানুষগুলো কী আচরণ করেছিল? যা করেছিল তা সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবে লেখা আছে। আমরা কি মন জয় করার আরো ভালো কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাই? আমাদের কাছে কি মন জয় করার এমন কোন পদ্ধতিও আছে যা আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে ছিল না? কুরআনের আয়াতগুলো একটু দেখুন-

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ {سورة نوح: ٥-١٢}

"তারপর আমি প্রকাশ্যেও তাদের সাথে কথা বলেছি এবং গোপনে-গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি। আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন।" -সূরা নূহ ৮-১২

ফায়েদা: কুরআনের এ অংশটির মূল বক্তব্যগুলো মোটামুটি এই: ১. কঠোর শব্দের ব্যবহার এবং কঠোর আচরণ ছাড়া উম্মতের মাঝে নবীর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। ২. মন জয় করার অস্বাভাবিক সে দীর্ঘকাল কেটে

যাওয়ার পর কঠোর ব্যবহার করতে হয়েছে। ৩. আন্তরিকতা প্রকাশের কোন পর্ব নবী বাদ দেননি। ৪. নবী উম্মতকে আখেরাতের পুরষ্কারের কথা শুনিয়েছেন। শত অপরাধের পরও ক্ষমার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। ৫. পার্থিব জীবনের সুযোগ সুবিধাগুলোর কথা খুলে বলেছেন। ধন-সম্পদ, সন্তান, বাগ বাগিচা, নদীনালা সব নেয়ামতের আশ্বাস দিয়েছেন।

জ. দ্বীনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে

(...প্রধান কুফরী শক্তিগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়া...)

এ উপায়ের উদ্ভাবকরা কুরআনের এ আয়াতগুলো ভুলে গেছে বা ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে।

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ {سورة طه: ١٣١}

"তুমি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না, যা আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেনীকে মজা লোটার জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রবের রিয্‌ক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী।" -সূরা ত্বহা ২০

﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى﴾ {سورة عبس: ٥-٧}

"আর যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করছিল। তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ। অথচ সে নিজেকে না শোধরালে তোমার উপর কোন দায়িত্ব আসে না।" -সূরা আবাসা ৫-৭

﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ {سورة العنكبوت: ٣٩-٤١}

"আমি কারূন, ফির'আওন ও হামানকে ধ্বংস করেছিলাম। মূসা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা দেশে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু তারা তো (আমার উপর) জিততে পরেনি। আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে ধৃত করি। তাদের কেউ তো এমন, যার বিরুদ্ধে পাঠাই পাথর বর্ষণকারী ঝড়-ঝঞ্ঝা, কেউ ছিল এমন যাকে আক্রান্ত করে মহানাদ, কেউ ছিল এমন, যাকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেই এবং কেউ ছিল এমন, যাকে করি নিমজ্জিত। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল। যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়। আর নিশ্চয় ঘরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল মাকড়সার ঘরই হয়ে থাকে। আহ! তারা যদি জানত।" -সূরা আনকাবূত ৩৯-৪১

ফায়েদাঃ আয়াতগুলোতে আমাদের চলমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। ১. দ্বীনের দাঈদের জন্য দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি লক্ষ রাখার কোন সুযোগ নেই। ২. দ্বীনী কাজে এসব প্রভাব প্রতিপত্তির কোন প্রভাব নেই। ৩. প্রভাব প্রতিপত্তিহীনদের উপর প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারীদের কোন প্রাধান্য নেই। ৪. কারুন, ফেরাউন, নমরূদের মত ক্ষমতাসীন ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারীরাও হেরে গেছে। ৫. সব মোটা ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য খুব সহজ ব্যবস্থা মুসলমানদের মাবুদের কাছে আছে। ৬. আল্লাহর কোন বাহিনী একটি মাকড়সার জালের সঙ্গে নতজানু হয়ে সমঝোতার প্রস্তাব দিবে তা হতেই পারে না। এটা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মানহানীকর আত্মঘাতি পদক্ষেপ।

﴿وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ {سورة الأعراف: ١٢٠-١٢٨}

"আর এ ঘটনা যাদুকরদেরকে সিজদায় ফেলে দিল। তারা বলে উঠল, আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। ফির'আউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোন চক্রান্ত। তোমরা শহরে এই চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে পার। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব, তারপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে ছাড়ব। তারা বলল, (মৃত্যুর পর) আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। তুমি কি রুষ্ট হচ্ছ কেবল আমাদের এ কাজের দরুনই যে, আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা তাতে ঈমান এনেছি? হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবর ঢেলে দাও এবং (তোমার) তাবেদাররূপে আমাদের মৃত্যু দান কর। ফির'আউনের কওমের নেতৃবর্গ (ফির'আউনকে) বলল, আপনি কি মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দিবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে পারে? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, আর তাদের উপর তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছেই। মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য্য ধারণ কর । বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দার মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন, আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে।" -সূরা আ'রাফ ১২০-১২৮

ফায়েদা : এ আয়াতগুলো থেকে আমরা কী পেলাম? ১. সত্য বুঝে আসার পর তা প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে কোন শক্তিই আর বাধা হতে পারেনি। ২. সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন ও পরাশক্তির পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রের

অপবাদ এসেছে, সবচাইতে ভয়ংকর শাস্তির ধমকি এসেছে, কিন্তু নবী ও উম্মত কারো পক্ষ থেকে পরাশক্তির সঙ্গে সমঝোতার কোন সুর পাওয়া যায়নি। কোন কম্প্রমাইজ হয়নি। ৩. গোষ্ঠীসহ নারী পুরুষ সবাইকে হত্যা করা ও দাস দাসী বানানোর হুমকী দেয়া হয়েছে, কিন্তু এক আখেরাতে সফলতার উদ্ধৃতি দিয়ে সব বাম হাতে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ৪. চাটুকারদের পক্ষ থেকে বহু উস্কানি দেয়া হয়েছে, কিন্তু এক আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে তাগুতের সঙ্গে সমঝোতার সকল রশিকে ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। ৫. তাগুতকে কোলে টেনে নেয়া ও তাগুতের কোলে আশ্রয় নেয়া কোনটিরই বৈধ কোন ব্যবস্থা নেই।

﴿لست عليهم بمصيطر﴾ {سورة الغاشية: ٢٢}

﴿قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل". ثم قرأ: {فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾ {تفسير ابن كثير: ٣٨٨/٨}

"তুমি তো তাদের উপর বল প্রয়োগকারী (দারোগা) নও।

ইমাম আহমদ রহ. .... জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা পর্যন্ত। যখন তারা তা বলে ফেলবে তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ তারা আমার কাছ থেকে বাঁচিয়ে ফেলবে, শুধু নির্দিষ্ট হক ব্যতীত এবং তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহ তাআলার কাছে। এরপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন **فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر**।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর

ফায়েদা: এ আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে: ১. দাঈর দায়িত্ব সত্যের আহবান পৌঁছে দেয়া। ২. যেকোনভাবেই হোক তাকে মুসলমান বানাতেই হবে এমন কোন দায়িত্ব দাঈর উপর নেই। ৩. দাওয়াত গ্রহণ

না করলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ হবে। ৪. জিহাদ হচ্ছে বহুমুখী সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

ঝ. কুরআনের তাযকীরকে ভুলে যেতে হবে

(...অস্ত্রের পথ ছেড়ে সম্প্রীতির পথে আসতে হবে...)

এ বাস্তবতা পৃথিবীর শুরু থেকে আজো পর্যন্ত একই মাত্রায় রয়েছে। সত্য দ্বীনের শত্রু দুনিয়ার বিচারে কখনোই দুর্বল ছিল না। সর্বকালে সকল শক্তিই আল্লাহর সাহায্যের সামনে হেরে গেছে। প্রত্যেক পরবর্তী যুগের মানুষই মনে করে তারা আগের লোকদের চাইতে বেশি শক্তিশালী। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সব রকমের শক্তিশালীই আল্লাহর সাহয্যের সামনে হেরে গেছে। কুরআনের আয়াতগুলো দেখুন-

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ {سورة القصص: ٧٨}

"সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছিলাম। সে কি এতটুকুও জানত না যে, আল্লাহ তার আগে এমন বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিলেন, যারা শক্তিতে তার অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং জনসংখ্যায়ও বেশি ছিল? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করা হয় না।" -সূরা কসাস ৭৮

ফায়েদা: আয়াতের কয়েকটি স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে এই: ১. নিজের অস্বাভাবিক যোগ্যতার দাবিদারদেরকেও বিনাশ করে দেয়া হয়েছে। ২. বর্তমানের চাইতে বেশি শক্তিশালীকেও বিনাশ করে দেয়া হয়েছে। ৩. বর্তমানের চাইতে বেশি লোকবলের অধিকারীকেও বিনাশ করে দেয়া হয়েছে। ৪. শক্তিধর অপরাধীদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ

وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ {سورة التوبة: ٦٩}

"(হে মুনাফিকগণ!) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, (তোমরা) তাদেরই মত। তারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল এবং ধনে-জনে তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। তারা তাদের ভাগের মজা লুটে নিয়েছে, তারপর তোমরাও তোমাদের ভাগের মজা লুটছ, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের ভাগের মজা লুটেছিল এবং তোমরাও বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়েছিলে, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিল। তারাই এমন লোক, যাদের কর্ম দুনিয়া আখিরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তারাই এমন লোক, যারা (ব্যবসায়) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" -সূরা তাওবা ৬৯

ফায়েদা: আয়াতে বলা হয়েছে: ১. বর্তমানের চাইতে অতীতের কাফেররা শক্তিতে বড় ছিল। ২. অতীতের কাফেররা সম্পদের দিক থেকে বর্তমানের চাইতে বেশি শক্তিশালী ছিল। ৩. সন্তান ও বংশধরদের বিবেচনায় বর্তমানের চাইতে অতীতের কাফেররা বেশি শক্তির অধিকারী ছিল। ৪. অতীত ও বর্তমানে সকল কাফেরের ভোগের মাত্রা একই রকম। ৫. অতীত ও বর্তমানের সকল কাফেরের অপদার্থতা সমান মাত্রায় ছিল। ৬. দুনিয়া আখেরাতে সবার পরিণতি বরাবর। অতএব যিম্মাদারীর বিবেচনায় অতীত থেকে বর্তমানকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই।

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ {سورة الروم: ٩}

"তারা কি ভূমিতে চলাফেরা করেনি, তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা শক্তিতে ছিল তাদের চেয়ে প্রচণ্ডতর এবং তারা জমি চাষ করত এবং আবাদ করত তাদের আবাদ অপেক্ষা বেশি। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে

এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।" -সূরা রূম ৩০

ফায়েদা: আয়াতে বলা হয়েছে: ১. আমরা ইতিহাস পড়লেই অতীত ও বর্তমানের শক্তির তুলনা করতে পারব এবং বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারব। ২. কুফরের শক্তিতে বর্তমানের চাইতে অতীত অগ্রগামী ছিল। ৩. পৃথিবীকে আবাদ করা এবং পৃথিবীকে জয় করার ক্ষেত্রে বর্তমানের চাইতে অতীত অগ্রগামী ছিল। ৪. সরাসরি নবী রাসূলের হাতে দলিল প্রমাণ দেখে দেখেও তারা তা অস্বীকার করেছে।

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ {سورة فاطر: ٤٤}

"তারা কি পৃথিবীতে কখনও সফর করেনি, তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল, যদিও তারা এদের অপেক্ষা বেশি শক্তিমান ছিল? আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন বস্তু তাকে ব্যর্থ করতে পারে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" -সূরা ফাতির ৪৪

ফায়েদা: আয়াতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে: ১. অতীতে কুফরী শক্তি কেমন ছিল তা জানার জন্য ইতিহাস জানতে হবে, ইতিহাস দেখতে হবে। ২. অতীতে কুফরী শক্তি বর্তমানের চাইতে বেশি বলবান ছিল। ৩. অতীতের বেশি শক্তিমান কুফর শিরক আল্লাহর পক্ষের শক্তিকে কখনো পরাজিত করতে পারেনি।

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ {سورة غافر: ٢١}

"তারা কি পৃথিবীতে কখনও সফর করেনি, তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল, যদিও তারা

এদের অপেক্ষা বেশি শক্তিমান এবং যমিনের বুকে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী ছিল? তখন তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকাড়াও করেছেন এবং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না"। -সূরা গাফের ২১

ফায়েদাঃ আয়াতে বলা হয়েছেঃ ১. বর্তমানের চাইতে বেশি শক্তি নিয়েও কুফরী শক্তি কীভাবে বিনাশ হয়ে গেছে? ইতিহাস পড়লেই তা জানা যাবে। ২. অতীতের অধিক শক্তিশালী কুফরও আল্লাহর পক্ষের শক্তির সামনে ধরা খেয়ে গেছে। ৩. আল্লাহর পক্ষের শক্তি ব্যতীত কোন মহাশক্তি পরাশক্তিই কাউকে সাহায্য করতে পারেনি।

﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ {سورة الزخرف: ٨}

"অতঃপর যারা এদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আর সেই পূর্ববর্তীদের অবস্থা তো গত হয়েছে।" -সূরা যুখরুফ ৮

ফায়েদাঃ কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছেঃ ১. বর্তমানের চাইতে প্রবল প্রতিপত্তির অধিকারীদেরকে বিনাশ করে দেয়া হয়েছে। ২. এ বিষয়ক উদাহরণের কোন অভাব নেই।

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ {سورة محمد: ١٣}

"এমন কত জনপদ ছিল, যা তারা তোমাকে তোমার যে জনপদ থেকে বের করে দিয়েছে তা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল. আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না।" -সূরা মুহাম্মাদ ১৩

ফায়েদাঃ কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছেঃ ১. বর্তমানের শক্তিশালী কুফরী দেশের তুলনায় বেশি শক্তিশালী যেসব কুফরের দেশকে বিনাশ করে দেয়া হয়েছে তার সংখ্যা অনেক। ২. কোন বন্ধুদেশই আল্লাহর শক্তির প্রতিরোধ করতে পারেনি। প্রতিরোধ করার সাহস করেনি।

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ {سورة ق: ٣٦}

"আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদের) আগে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যারা শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল ছিল। তারা নগর-নগরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তাদের কি পালানোর কোন জায়গা ছিল?" -সূরা কাফ ৩৬

ফায়েদা: কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে: ১. বর্তমানের চাইতে বেশি শক্তিধর প্রভাবশালী অতীতের যেসব কুফরী শক্তিকে, কুফরী গোষ্ঠীকে বিনাশ করে দেয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা অনেক। ২. সেসব কুফরী শক্তি শহর বন্দর চষে বেড়িয়ে ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছে। ৩. সেসব কুফরী শক্তির পালানোর মত কোন জায়গা ছিল না। আল্লাহর পক্ষের শক্তির সামনে তাদের প্রভাব তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

ঞ. আল্লাহর দুশমনকে বন্ধু বানাতে হবে

(...বাতিলের সোহবত নিতে হবে, দিতে হবে...)

বাতিলের সঙ্গ দিয়ে, বাতিলের সংস্রব গ্রহণ করে, কিছু কিছু বিষয়ে বাতিলের অনুসরণ করে এবং কুফর শিরক ও হারাম বিষয়ে বাতিলকে মৌন সমর্থন করে বাতিলকে শুদ্ধ করার কোন পদ্ধতি কুরআনে হাদীসে দেয়া হয়নি। যে শক্তি মূর্তিকে সিজদা করছে, মানবরচিত আইনকে সিজদা করছে সে শক্তির সঙ্গ দিয়ে মূর্তিকে সিজদা দেয়ার মধ্যে কি ভুল হচ্ছে সে ভুল ধরে দেয়ার জন্য লোকমা দেয়ার দায়িত্ব মুসলমানের উপর নয়। মুসলমানের দায়িত্ব মূর্তির ঘর ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা এবং মূর্তির ঘর থেকে সিজদাকারীকে বের করে নিয়ে আসা। কুরআনের আয়াত দেখুন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ........﴾ {سورة الممتحنة: ١-٤}

'হে মুমিনগণ ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে কর ও যা কিছু প্রকাশ্যে কর আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল। তোমাদেরকে বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। তাদের কামনা এটাই যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও। কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন। তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপসনা করছ তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকিদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ....।" -সূরা মুমতাহিনা ১-৪

ফায়েদাঃ উপরোক্ত কয়েকটি আয়াতে যে কথাগুলো খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে এই: ১. মুমিনের জন্য আল্লাহর দুশমন ও মুমিনের দুশমন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি ও কোন ক্ষেত্র নেই। ২. আল্লাহ ও মুমিনদের দুশমন কাফেরদের

প্রতি ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রকাশের সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি ও ক্ষেত্র নেই। ৩. যারা কুরআন ও ইসলাম ধর্মকে নিজেদের জীবনে ধারণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি ও ক্ষেত্র নেই। ৪. দুনিয়ার যত বড় স্বার্থই জড়িত থাকুক না কেন আল্লাহর দুশমন ও মুমিনদের দুশমন কাফেরদের সঙ্গে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি রাখার সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি ও ক্ষেত্র নেই। ৫. অমুসলিমদের সঙ্গে যেকোন রকমের ভালোবাসা ও সম্প্রীতি ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। ৬. কুফরী শক্তি কখনো আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা ছাড়বে না। ৭. কুফরী শক্তি সর্বদা মুমিনদেরকে হাতে মুখে কষ্ট দিতে চাইবে অথবা চাইবে মুমিনরা যেন তাদের মত কাফের হয়ে যায়। ৮. কুফরী শক্তির সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের দোহাই দিয়েও ভালোবাসা ও সম্প্রীতির কোন সুযোগ নেই। ৯. মুসলমানদের আদি পিতা এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে এর পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ১০. ঈমান গ্রহণ না করলে কুফরী শক্তির সঙ্গে শত্রুতা, বিদ্বেষ চলতেই থাকবে। কুফরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি ও ক্ষেত্র নেই।

ট. দ্বীনের মহিমাকে কুরবান করতে হবে, পানির গায়ে ফুল আঁকতে হবে

(...কাফেরদের মাধ্যমে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা...)

যখন কোন কুফরী শক্তি ক্ষমতার মসনদ দখল করে নেয়। কুফরী মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার শপথ করে। সে শপথের উপর বহাল থেকে যুগের পর যুগ তা বাস্তবায়ন করে যেতে থাকে। ইসলামের সকল আইনকে অকার্যকর করার জন্য সকল আয়োজন করে রাখে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে কোন পর্বে ইসলামের আইন প্রবেশের সকল ছিদ্র বন্ধ করে রাখে। ইসলামের আইনকে সামনে নিয়ে আসার জন্য যারা চেষ্টা প্রচেষ্টা করছে বলে সন্দেহ হয় তাদেরকে নির্মূল করার জন্য সকল শক্তি ব্যয় করে থাকে।

-এমন ক্ষমতাসীন কুফরী শক্তিকে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে, ঈমানের উপর আসতে না বলে, ঈমানের উপর আসার ক্ষেত্রে অস্বীকৃতির উপর তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে তাকে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা এবং কুরআনের আইন বাস্তবায়নের উপকারিতা তাকে বুঝিয়ে ইসলামের আইন বাস্তবায়ন হবে এমন আশায় বসে থাকার কোন নমুনা অতীত ও বর্তমানের কোন আসমানী ধর্মে নেই।

অতীত ও বর্তমানের সকল আসমানী ধর্মে ক্ষমতাসীন কুফরী শক্তিকে দাওয়াত দেয়ার কয়েকটি নমুনা কুরআন ও হাদীস থেকে দেখুন-

﴿أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ {سورة النمل: ٣١}

"তোমরা আমার অবাধ্যতা করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে তোমরা আমার কাছে এসে হাজির হও।" -সূরা নামল ৩১

ফায়েদা: ক্ষমতাসীন কুফরী শক্তির বিষয়ে করণীয় যথাক্রমে: ১. অবাধ্যতা করবে না বলে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা। ২. আত্মসমর্পণ করে চলে আসার আদেশ জারি করা। ৩. আত্মসমর্পণ করে আসতে না চাইলে জোর করে বেঁধে নিয়ে আসা।

﴿بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد! فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ..﴾ **{صحيح البخاري، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره{إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده}**

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়াতের অনুসরণ করবে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের আহ্বানে আহ্বান করছি। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে নিরাপদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করবেন। আর যদি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে তোমার অনুগামী প্রজাদের বোঝাও তোমাকে বহন করতে হবে।" -সহীহ বুখারী।

ফায়েদা: হাদীসে উদ্ধৃত কয়েকটি স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে যথাক্রমে: ১. শান্তির কামনা শুধুমাত্র হেদায়াতের অনুসারীর জন্য হবে। ২. ক্ষমতাসীন কুফরী শক্তিকে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ৩. ইসলাম গ্রহণ না করলে তার কি পরিণতি ভোগ করতে হবে তাও স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। ৪. ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে,

এছাড়া নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ৫. ক্ষমতাসীন কুফরী শক্তি দাওয়াত গ্রহণ করলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে, না করলে বহু গুণ শাস্তি পাবে।

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ {سورة البقرة: ٢٥٨}

"তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করেছ, যাকে আল্লাহ রাজত্ব দান করার কারণে সে নিজ রবের (অস্তিত্ব) সম্পর্কে ইবরাহীমের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়? যখন ইবরাহীম বলল, আমার রব তিনিই, যিনি জীবনও দান করেন এবং মৃত্যুও! তখন সে বলতে লাগল, আমিও জীবন দেই এবং মৃত্যু ঘটাই! ইবরাহীম বলল, আচ্ছা! আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি তা পশ্চিম থেকে উদিত কর তো! এ কথায় সে কাফির নিরুত্তর হয়ে গেল। আর আল্লাহ (এরূপ) জালিমদেরকে হিদায়াত করেন না।" -সূরা বাকারা ২৫৮

ফায়েদা: আয়াতে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয় যথাক্রমে: ১. তাগুতী রাজত্বের অধিকারী হওয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি কারণ। ২. ক্ষমতাসীন কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সত্যের চ্যালেঞ্জ হবে প্রকাশ্যে। ৩. ক্ষমতাসীন কুফরী শক্তির অজ্ঞতামূলক হঠকারিতা তার সামনেই ধরিয়ে দিতে হবে এবং মুখের উপর ছুড়ে মারতে হবে। ৫. ক্ষমতাসীনকে তার বোকামী বুঝতে দিতে হবে।

জরুরী টীকা : ২১

“

-এই প্রোপাগাণ্ডা একেবারেই ভুল....

”

জরুরী টীকা-২১

-এই প্রোপাগাণ্ডা একেবারেই ভুল....

এ প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা আমরা বিশ নম্বর টীকায় দেখে এসেছি যে, **পাকিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই**। শায়খে মুহতারাম এ প্রোপাগাণ্ডাকে শতভাগ ভুল বলছেন। এ ভুলের কিছু কারণ শায়খে মুহতারামের আলোচ্য বক্তব্যেও এসেছে। এছাড়া আরো অন্যান্য বক্তব্য ও লিখনীতেও কিছু কারণের আভাস পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এ প্রোপাগাণ্ডা ভুল হওয়ার দলিল হিসাবে যে কারণগুলো কাজে আসতে পারে তা মোটামুটি এই-

ভুলের কারণগুলোর তালিকা

ক). পাকিস্তানের মানবরচিত গণতান্ত্রিক সংবিধানে মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রাখা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক আইনের পক্ষ থেকে সে আপিলের উপর বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। অতএব পাকিস্তান আইনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।

খ). পাকিস্তানের ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অনুসারী মালিকপক্ষ সকল ধর্মের সঙ্গে মুসলমানদেরকেও ইসলাম ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছে। অতএব পাকিস্তান আইনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।

গ). মানব রচিত গণতান্ত্রিক আইন বাস্তাবায়নের উপর শপথ করলেও প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী তাদের শপথ বাক্যে নিজেদেরকে মুসলমান

বলে দাবি করেছে। অতএব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।

ঘ). পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতা, আইন বাস্তবায়ক, আইনের প্রহরী অমুসলিম হলেও তাদের শপথ বাক্যের শুরুতে বিসমিল্লাহ'র উল্লেখ রয়েছে। অতএব পাকিস্তান আইনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।

ঙ). পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতা, আইনের বাস্তবায়ক ও আইনের প্রহরী অমুসলিম হলেও তাদের শপথনামার শেষে এ কথাটি রয়েছে (آمین) اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے 'আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করুন। আমীন'। অতএব পাকিস্তান আইনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।

চ). পাকিস্তিানের গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতা, আইনের বাস্তবায়ক ও আইনের প্রহরী অমুসলিম হলেও তাদের শপথনামার মাঝে এ কথাটি রয়েছে کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے 'আমি ইসলামী চিন্তা চেতনাকে বহাল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি'। অতএব পাকিস্তান আইনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।

ছ). পাকিস্তানের ইসলামী আইনের জন্য অস্ত্র ধারণের পদ্ধতি গ্রহণ করলে সে অস্ত্র ধারণ করতে হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ মানেই হচ্ছে নিজের জন্য চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী জাহান্নামকে ওয়াজিব করা। আয়াতে এসেছে

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ {سورة النساء: ٩٣}

"যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে জেনে শুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি গযব নাযিল করবেন ও তাকে লা'নত করবেন। আর আল্লাহ তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" -সূরা নিসা ৯৩

অতএব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল।

জ). পাকিস্তান সরকার ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে অনেক কাজ করেছে। সরকার যখন শরয়ী আইন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে তখন সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়ার মানে হচ্ছে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করা। অতএব ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একবারেই ভুল।

ভুলগুলোর বিশ্লেষণ

শায়খে মুহতারাম প্রোপাগাণ্ডাকারীদের প্রোপাগাণ্ডাকে যেসব কারণে ভুল বলেছেন সে কারণগুলোর উপর ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পর্যালোচনা এসে গেছে। এরপরও কারণগুলোর উপর খুব সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলে যাওয়া মুনাসিব হবে বলে মনে করছি। এ ক্ষেত্রে ধারা পরম্পরা রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

ক). প্রথম কারণ সম্পর্কে আমাদের কথা হচ্ছে; **এক.** গণতান্ত্রিক সংবিধানে আপিল করার সুযোগ থাকলে আপিলের সিদ্ধান্ত ও রায় গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ীই হবে। শরীয়তের আলোকে হবে না। তাই অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্তকে একেবারে ভুল বলার আগে আরেকটু ভাবতে হবে। **দুই.** গণতান্ত্রিক আইন শরীয়তের অনুসারীদেরকে আশ্বাস দেয়ার কোন অধিকার রাখে না। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসারী মুসলমান গণতান্ত্রিক আশ্বাসের প্রত্যাশা করার কোন বৈধতা নেই। এ প্রত্যাশার সম্ভাব্য কোন পদ্ধতি নেই। অতএব অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্তকে একেবারেই ভুল বলার আগে আরো ভাবতে হবে।

খ). দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে বলা যায়; **এক.** যে সরকার ও যে দেশ ইসলাম ধর্মের সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মকেও স্বাধীনতা প্রদান করে, রাষ্ট্র পরিচালনায় অমুসলিমদেরকে শরিক করে, সর্বোপরি সকল ধর্মকে সমান মূল্যায়ন করে সে সরকার ও দেশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অস্ত্র ধারণ করা একেবারে ভুল হওয়ার কথা নয়। **দুই.** যে সরকারের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে দেশে শতভাগ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করা সে সরকার যদি মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয় তাহলে এ দাতার বিরুদ্ধে মুসলমানরা অস্ত্রধারণ করা একেবারে ভুল হওয়ার কথা নয়।

গ). তৃতীয় কারণ সম্পর্কে বলা যায়, গণতান্ত্রিক আইন বাস্তবায়ন করার শপথ করলে একজন মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন বাস্তবায়নের উপর শপথ করে যে রাষ্ট্রপক্ষ মুরতাদ হয়ে গেছে সে রাষ্ট্রপক্ষের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অস্ত্রধারণ করা ভুল হওয়ার কথা নয়।

ঘ). চতুর্থ কারণ সম্পর্কে বলা যায়; **এক.** একটি কুফরী আইনের শুরুতে বিসমিল্লাহ'র উল্লেখ কুফরের অপরাধকে আরো বাড়িয়ে দেয়, কুফরের মাত্রা কমায় না। **দুই.** আর যে দেশে আইন প্রণেতা, আইন বাস্তবায়ক, আইনের প্রহরী জন্মসূত্রে কাফের হয়েও বিসমিল্লাহ'র উল্লেখসহ শপথ করতে পারে তখন একজন মুরতাদ ও নতুন কাফের বিসমিল্লাহ দিয়ে তার শপথ শুরু করতে সমস্যা কী? আর যে সরকার মুসলমানদের বিসমিল্লাহকে মুসলিম অমুসলিম সবার সম্পদ বানিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের অস্ত্রধারণ কেন ভুল হবে?

ঙ). পঞ্চম কারণ সম্পর্কে বলা যায়; **এক.** যে দোয়া মুসলিম অমুসলিম সবাই করতে পারে সে দোয়া দিয়ে কোন ব্যক্তি মুসলমান প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয়। সে দোয়া দিয়ে কোন সংবিধান ইসলামী সংবিধান হিসাবে প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয়। সে দোয়া দিয়ে একটি সরকার ইসলামী সরকার প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এমন সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অস্ত্রধারণ কেন ভুল হবে? **দুই.** আর যদি প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য আলাদা আলাদা শপথনামার ব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে শপথনামার সে বাক্যগুলো সামনে আসা দরকার। যাতে সাধারণ মানুষ ধোঁকায় না পড়ে যায়। **তিন.** আর যাদি এসব বাক্য অর্থহীন হয়ে থাকে তাহলে এ দাবি করতে কোন সমস্যা নেই যে, এসব বাক্য শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সংযোজন করা হয়েছে। অতএব এমন সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অস্ত্রধারণ কেন ভুল হবে?

চ). ষষ্ঠ কারণ সম্পর্কে বলা যায়, ইসলামী 'নযরিয়া'র দু'টি ভাগ রয়েছে। একটি হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানের সকল শাখা প্রশাখা। আরেকটি ভাগ হচ্ছে ইসলামী শরীয়াহ তথা ইসলামী আইন কানূন। পাকিস্তান তার জন্ম থেকে আজো পর্যন্ত ইসলামী শরীয়া তথা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠাকে রোধ করার জন্য সকল প্রচেষ্টাই করেছে।

আর ঈমান ও ঈমানের শাখা প্রশাখা সম্পর্কে পাকিস্তান সংবিধানে শতভাগ এখতিয়ার দেয়া আছে। যে কোন ব্যক্তি যে কোন আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে পূর্ণ অধিকারের সাথে পাকিস্তানে বসবাস করতে পারবে। শুধু এতটুকুই নয়; বরং কুফর শিরকের আকীদাসহ যে কোন আকীদা পোষণকারী দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা, আইন প্রণয়ন করা এবং আইনের প্রহরী হিসাবে কাজ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। পাকিস্তান সংবিধানে এ অধিকার দেয়া আছে।

এমতাবস্থায় ইসলামী নযরিয়া'র তৃতীয় এমন কোন্ ক্ষেত্র রয়েছে যা বহাল রাখার জন্য সাংবিধানিকভাবে শপথ নেয়া হয়? আর যদি ইসলামী নযরিয়ার তৃতীয় আর কোন ক্ষেত্র না থেকে থাকে তাহলে এ ধোঁকাবাজ সংবিধান ও সংবিধানের মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অস্ত্রধারণ করলে কেন তা ভুল হবে?

ছ). সপ্তম কারণ সম্পর্কে বলার বিষয় হচ্ছে, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা বাধা দেয় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে এবং তাদেরকে হত্যা করলে মুসলমানদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত ওয়াজিব না হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নাম ওয়াজিব হবে কেন? পাকিস্তানের সংবিধান এবং সংবিধানের মালিক পক্ষ সত্তর/পঁচাত্তর বছর যাবত শরীয়া বাস্তবায়ন করেনি এবং শরীয়া বাস্তবায়নের পথে বরাবর বাধা দিয়েই চলেছে। এ সত্য অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আর আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ঘোষণা করছেন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾

{سورة الأنفال: ٣٦}

"যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাঁধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে। অতঃপর তা তাদের আফসোসের কারণ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে (আখিরাতে) জাহান্নামে একত্র করা হবে।" -সূরা আনফাল ৩৬

অতএব আমরা দাবি করতে পারি যে, কোন দেশের এমন মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা একেবারে ভুল হওয়ার কথা নয়।

জ). অষ্টম কারণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে সরকার সত্তর/পঁচাত্তর বছর যাবত তার দেশে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে পারেনি, এমনকি শরীয়া বাস্তবায়নের ঘোষণাটুকুও দিতে পারেনি সে সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অস্ত্রধারণ করা একেবারে ভুল হওয়ার কথা নয়। বরং পাকিস্তানের ইতিহাস বলে, একটি ইসলামী ভূখণ্ডের স্বপ্নদ্রষ্টা উম্মতের রাহবার ওলামায়ে কেরাম তাঁদের জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য হা-হুতাশ করে গেছেন, আর দেশের মালিক পক্ষ তা বরাবর প্রত্যাখ্যান করে গেছে। তাই শরীয়া বাস্তবায়নের পথে তারা কখনো অগ্রসর হয়েছে বা হচ্ছে এমন দাবি করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এমন সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত কেন ভুল হবে?

এ পর্যায়ে এসে আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে, যেসব কারণে শরয়ী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্তকে ভুল বলা হয়েছে সেসব কারণ যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এমন একটি দেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের কার্যকারী উপায়গুলো কী?

বাকি উপায়গুলোর বিশ্লেষণ

শরীয়া বাস্তবায়ন যখন মুসলমানদের উপর অবধারিত একটি ফরয দায়িত্ব। আর ইসলামের ইতিহাস বলে এ ফরয দায়িত্ব কখনো অস্ত্রধারণ ছাড়া আদায় হয়নি। এখন বলা হচ্ছে অস্ত্রধারণের এ সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল। তাহলে এ প্রশ্ন একেবারেই স্বাভাবিক যে, শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্রধারণের পদ্ধতি ব্যতীত বাকি পদ্ধতিগুলো কী?

শায়খে মুহতারামের বিভিন্ন আলোচনা ও বক্তব্যে সে উপায়গুলোর কিছু কিছু উঠে এসেছে। শায়খে মুহতারামের আলোচনাকে পুঁজি করে এবং তাঁর বাতলানো পদ্ধতিগুলোকে সামনে রেখে আরো বহুজন বহু পদ্ধতির কথা বলেছেন। শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্রবিহীন জিহাদের সে পদ্ধতিগুলো নিয়ে সামান্য আলোচনা হওয়া দরকার। কোন রকমের বিন্যাস ছাড়াই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাসহ সে কারণগুলো তুলে ধরছি।

এক. আদালতের শরণাপন্ন হওয়া

ইসলামী হুকুমত ও শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানরা আদালতে যাবে। ইসলামী হুকুমতের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করবে। আদালত যেন ইসলামী হুকুমত করার অনুমতি দেয় বা আদেশ করে। মুসলমানরা এ মামলা দায়ের করবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে, মানবরচিত আইন প্রণয়নকারীদের বিরুদ্ধে, দেশের মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে। এ মামলা দায়ের করবে গণতন্ত্র প্রয়োগকারীর আদালতে, মানবরচিত আইন বাস্তবায়নকারীর দরবারে।

মানবরচিত আইনের আদালত যা সিদ্ধান্ত দেবে তার বিপরীত কোন কিছু করা যাবে না। মানব রচিত আদালত যেভাবে যা করতে বলবে তাই সেভাবে করতে হবে। এর বিপরীত কিছু করতে গেলেই আইন হাতে তুলে নেয়া হয়ে যাবে। **আইন হাতে তুলে নেয়া যাবে না। আল্লাহর আইন মানুষ হাতে তুলে নিয়েছে তাতে কোন অপরাধ হয়নি। মানুষের আইন মানুষ হাতে তুলে নিলে অপরাধ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, মানুষের আইন আল্লাহর আইনের হাতে তুলে দিলেও অপরাধ হয়ে যাবে।**

আর সে মানবরচিত আইন আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ইসলামী আইন ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। আসমানী ধর্মের ইতিহাসে এর কোন নযীর নেই। ইসলামের ইতিহাসে তো এর প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলামী আইন ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হবে শরীয়াহ আইনে, মানব রচিত আইনে নয়। শরীয়াহ আইন যে আদালতের চালিকা শক্তি নয় সে আদালত শরীয়াহ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার রাখে না। মুসলমানরা সে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার কোন বৈধতা নেই।

দুই. রাজপথে আন্দোলন করা

মুসলমান রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে হেঁটে তাদের আবেদনগুলো ও প্রার্থনাগুলো বলে যেতে থাকবে উচ্চ স্বরে, নিম্ন স্বরে ও নিঃশব্দে। তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে দেশের ও মানবরচিত আইনের মালিক পক্ষ জানতে পারবে মুসলমানরা ইসলামী আইনের জন্য আন্দোলন করছে। মালিক পক্ষ তাদের সংবিধানের মূলনীতি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সকল রীতিনীতিকে বহাল রেখে দাবির যতটুকু যেভাবে রক্ষা করা সম্ভব ততটুকু সেভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরীয়ার দাবি অনুযায়ী দাবি রক্ষা না করলে মুসলমানদের কিছুই করার থাকবে না। সর্বোচ্চ এক দিনের জায়গায় দশ দিন মিছিল করা যাবে। এক লক্ষের জমায়েতের জায়গায় এক কোটির জমায়েত করা যাবে। একই দাবির কথা সকালে একবার বিকালে একবার বারের পর বার উচ্চারণ করতে থাকতে পারবে। এভাবে শুধু উচ্চারণ করতেই থাকবে।

চিরাচরিত এ বাক্যগুলো আওড়াতে থাকতে পারবে: 'এ্যাকশান এ্যাকশান ডাইরেক্ট এ্যাকশান', 'বদর যুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার', 'রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়', 'প্রধানমন্ত্রীর গালে গালে জুতা মারো তালে তালে', 'শায়খুল হাদীসের বাংলায় নাস্তিকের ঠাঁই নাই', 'আমরা সবাই রাসূল সেনা ভয় করি না বুলেট বোমা', 'বিশ্বের মুসলিম এক হও লড়াই কর', 'হৈ হৈ রৈ রৈ হাসিনা/খালেদা গেল কই' এ সব বলা যাবে। আর কিছু করা যাবে না।

এ কথাগুলো বলার পর তা মানতে বাধ্য করার কোন ব্যবস্থা মুসলমানদের কাছে নেই। বাধ্য করার ব্যবস্থা করতে গেলেই আইন হাতে তুলে নেয়া হয়ে যাবে। অস্ত্র হাতে নেয়ার অপরাধ করে ফেলতে হবে। আর তা সম্ভব নয়। কারণ এ কথাগুলো যারা বলবে তারা অস্ত্র হাতে নেয়া অবৈধ, যাদের বিরুদ্ধে বলবে তাদের হাতে অস্ত্র থাকা জরুরী।

এভাবে 'ইসলামী আন্দোলন' করা যাবে, কিন্তু 'ইসলামী শাসন' করা যাবে না। কারণ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' আর 'গণপ্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র' সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিষয়। একটির অধিকারভুক্ত এলাকায় আরেকটি করা যাবে না। একটি হচ্ছে মানবরচিত তন্ত্র, আরেকটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত তন্ত্র। মানবরচিত তন্ত্রের অধিকারভুক্ত এলাকায় আল্লাহর তন্ত্র বাস্তবায়নের আন্দোলন ও আবদার-আবেদন কার্যকারী হতে পারে না। গণতন্ত্রের দেশে আন্দোলন, লড়াই, সংগ্রাম এসবই হচ্ছে আবদার ও আবেদনের সমার্থবোধক।

আর যদি আন্দোলন, লড়াই ও সংগ্রাম ইত্যাদি আবদার ও আবেদনের সমার্থবোধক না হয় তাহলে তা চলে যাবে অস্ত্রধারণের দিকে যা শায়খে মুহতারামের দৃষ্টিতে একেবারেই ভুল। আর বলাবাহুল্য, অস্ত্রধারণ না করে মানবরচিত আইনের প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে আবেদন নিবেদন করে ইসলামী হুকুমত ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কোন পদ্ধতি শরীয়তের কোন কিতাবে নেই।

তিন. সরকারের কাছে আবেদন করা, স্মারকলিপি দেয়া

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়াহ বাস্তবায়নের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, আন্দোলন ও সংগ্রামে না গিয়ে মানব রচিত আইনের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক পক্ষের বরাবরে আবেদন ও স্মারকলিপি পাঠাতে থাকা। বিধানদাতাদের যার সঙ্গে মুসলমানদের যার ভালো সম্পর্ক সে তাকে ফোনে আবেদন নিবেদন করতে থাকা। বিধানদাতাদের দরবারে অসংখ্য পরিমাণ টেলিগ্রাম বার্তা পাঠাতে থাকা। পত্রিকার বিজ্ঞাপন এরিয়ায় আকুল আবেদন লিখে বিধানদাতাদের দৃষ্টিগোচর ও কর্ণগোচর করার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

এ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে আবেদন নিবেদনের সহীহ ও কপটতামুক্ত তরিকা। আন্দোলন সংগ্রাম হচ্ছে আবেদনের কপট পদ্ধতি এবং জিহাদ ও অস্ত্রধারণ পদ্ধতির বিকৃত রূপ।

যাই হোক, গণতান্ত্রিক বিধানদাতাদের দরবারে আবেদন নিবেদন করার ক্ষেত্রে এবং স্মারকলিপি পেশ করার ক্ষেত্রে বিধানদাতাদের প্রতি শতভাগ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই করতে হয়। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার গায়ে সামান্য রকমের আঁচড় না লাগে মতই আবেদন নিবেদন করতে হয়। ইসলামীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবেদন পত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের সকল শিরক কুফরের নীতিমালাকে কুর্নিশ করতে হয়। বিধানদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যত ধরনের কৌশল গ্রহণ করার দরকার সবই করতে হয়। যত ধরনের মেকাপ করা দরকার সবই করতে হয়। প্রয়োজনে একজন মুসলমান নিজেকে একজন খাঁটি গণতান্ত্রিক ও খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে প্রমাণ করতে হয়। অবশেষে ইসলামী তন্ত্রের বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে কুফরী তন্ত্রের ধারক বাহক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এমনকি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীরা এ কথার স্বীকৃতি দিতে হয় যে, আমাদের এ আন্দোলন কোন ধর্মভিত্তিক আন্দোলন নয়।

বলাবাহুল্য, শরীয়তের কোন কিতাবে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

চার. ক্ষমতাসীনদের পেছনে দাওয়াতের মেহনত করা

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আরেকটি আলোচিত পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের পেছনে দাওয়াতের মেহনত করা। অর্থাৎ মুসলমানরা মানবরচিত আইনের মালিক পক্ষ বিধানদাতাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি

উদ্বুদ্ধ করা যে, আপনারা ইসলামী আইনকে আইন হিসাবে গ্রহণ করুন এবং ইসলামী শরীয়াকে বাস্তবায়ন করুন। এসব বিধানদাতাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেয়ার আগেই ইসলামী আইন বাস্তবায়নের দাওয়াত দিতে হবে। বরং অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় এসব বিধানদাতাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়াই যাবে না। কারণ এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

এসব বিধানদাতাদেরকে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে যিনি দাওয়াত দেবেন তিনি কয়েকটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। **এক.** তিনি যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুফর মনে করেন তা প্রকাশ পেতে পারবে না। **দুই.** তিনি যে গণতন্ত্রকে কুফর মনে করেন তা প্রকাশ পেতে পারবে না। **তিন.** তিনি যে একমাত্র ইসলাম ধর্মকেই ধর্ম মনে করেন তা প্রকাশ পেতে পারবে না। **চার.** মানুষ যে মানুষের দেয়া বিধান অনুযায়ী চলা বৈধ নয়; বরং মানুষ একমাত্র আল্লাহর বিধন অনুযায়ীই চলতে হবে -এ বিশ্বাস প্রকাশ পেতে পারবে না। **পাঁচ.** তিনি যে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মকে ঘৃণা করেন তা প্রকাশ পেতে পারবে না। **ছয়.** তিনি যে ধর্মের জন্য প্রয়োজনে অস্ত্রধারণকে পছন্দ করেন তা প্রকাশ পেতে পারবে না। **সাত.** শুধুমাত্র ঈমানদার মুসলমান চির সুখের জান্নাতে যাবে, এ ছাড়া সকল ধর্মের অনুসারী চির কষ্টের জাহান্নামে যাবে -এ বিশ্বাস প্রকাশ পেতে পারবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আরেকটি তথ্য হচ্ছে, এ দাওয়াতের কোন মেয়াদ নেই। দাওয়াতদানকারী দাওয়াত দিতেই থাকবে। বিধানদাতাদের কুফরী, কুফরী আইন প্রণয়ন, কুফর প্রতিষ্ঠা ও কুফরের প্রয়োগ আপন গতিতে চলতে থাকবে, আর মুসলমান মানব রচিত আইনের বিধানদাতাদেরকে ইসলামী আইন প্রয়োগের জন্য দাওয়াত দিতেই থাকবে। উভয়ের সঙ্গে উভয়ের কখনো কোন সংঘর্ষ হবে না। সংঘর্ষ হলেই তা চলে যাবে অস্ত্রধারণের দিকে যা শায়খে মুহতারামের দৃষ্টিতে একেবারেই ভুল।

উল্লেখ্য, সীরাতে ও ইসলামের ইতিহাসে এর কোন উদাহরণ নেই। শরীয়তের কোন কিতাবে এর কোন বৈধতা নেই।

পাঁচ. সরকারী জামাতে শরিক হয়ে লোকমা দেয়া

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়াহ প্রয়োগের জন্য কেউ কেউ পদ্ধতি দিয়েছেন, মানবরচিত আইনের বিধানদাতাদের দলে শরিক

হয়ে যাওয়া। যৌক্তিকতা হিসাবে বলা হচ্ছে, নামাযের জামাতের বাইরে থেকে লোকমা দিলে লোকমা সহীহ হয় না এবং নামাযও সহীহ হয় না। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মদ্রোহিতার পতাকাবাহীদেরকে সঠিক পথে আনতে হলে তাদের জামাতে শরিক হতে হবে। তাদের ইমামের পেছনে ইক্তিদা করতে হবে। ইমামুল কুফরের পেছনে ইক্তিদা করে পরে লোকমা দিয়ে দিয়ে ইমামকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে। আর এভাবে এক দিন দেশে ইসলামী হুকুমত ও শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

এ পদ্ধতিতে একজন মুসলমান কতকাল কুফরের দলভুক্ত হয়ে ইমামুল কুফরের ইক্তিদা করতে থাকবে? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, অনন্তকাল। কারণ ইমামুল কুফর লোকমা গ্রহণ না করলে জোরপূর্বক তাকে তা গ্রহণ করানো যাবে না। জোরপূর্বক গ্রহণ করাতে গেলে সংঘর্ষ হবে, অস্ত্রধারণ করতে হবে। অস্ত্রধারণ করতে গেলে তা একেবারেই ভুল হয়ে যাবে।

আর কাফের ইমামের মুসলমান মুক্তাদী লোকমা দিতে গিয়ে সেসব ভুলেরই লোকমা দেবেন যেগুলোতে ইমাম বিগড়ে যাবে না। যেসব ভুল ধরতে গেলে কাফের ইমাম বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সেসব ভুল ধরা থেকে মুসলমান মুক্তাদী শতভাগ বেঁচে থাকতে হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সকল কাফেরের সম্মিলিত কুফর হচ্ছে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী না চলে এবং না চালিয়ে নিজেদের বিধান অনুযায়ী চলা ও চালানো। আল্লাহর বিধানকে বিচারক না বানিয়ে মানবরচিত বিধানকে বিচারক বানানো। আর সর্ব কালের সকল নবীর সম্মিলিত দাওয়াত ছিল মানুষদেরকে মানবরচিত বিধান থেকে বের করে এনে আল্লাহর বিধানের অনুসারী বানানো। অর্থাৎ মানবরচিত বিধানকে প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা। এখন কর্ণধারগণ বলছেন, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর বিধান প্রয়োগের জন্য কার্যকারী পদ্ধতি হচ্ছে, মানবরচিত আইনের বিধানদাতাদের ইক্তিদা করতে হবে। আর এ ইক্তিদা করে যেতে হবে অনন্তকাল পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ইতিহাসে এর কোন উদাহরণ নেই। দ্বীন ও শরীয়তের কিতাবাদিতে এর কোন বৈধতা নেই।

ছয়. ছদ্ম পরিচয়ে ক্ষমতা দখল করে ফেলা

ইসলামী হুকুমত ও শরীয়াহ বাস্তবায়নের আরেকটি পদ্ধতির অনুশীলন চলছে খুবই সন্তর্পণে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ধারকবাহকদের ফাঁকি দিয়ে। এ পদ্ধতির অনুশীলন করে চলেছে প্রচলিত ধারার ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো। পৃথিবীর প্রায় দেশেই এ পদ্ধতির অনুশীলন চলছে। তবে বাংলাদেশে এর ছড়াছড়ি একটু বেশি।

এ পদ্ধতির ধারক বাহকদের থিওরি হচ্ছে, তারা কুফরী শক্তির সঙ্গে কুফর কুফর খেলবে। মানবরচিত সংবিধানের বিধানদাতারা জানবে তারা এ সংবিধানকে শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ করে। গণতান্ত্রিকরা জানবে তারা গণতন্ত্রের খাঁটি মুরিদ। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের বাস্তবায়করা জানবে তারা মুখলিস ধর্মনিরপেক্ষ। জাতীয়তাবাদের হর্তাকর্তারা জানবে তারা জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার জন্য জান কুরবান দিতে প্রস্তুত। সমাজতান্ত্রিকরা জানবে তারা সোসালিস্ট হিসাবে সবার আগে।

এ পদ্ধতির অনুশীলনকারীরা তাদের কথায় কাজে ও লিখনীতে মানবরচিত সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে থাকে। জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার ফযীলত তারা কুরআন হাদীস দিয়ে প্রমাণ করতে থাকে। গানে গজলে বক্তৃতায় তার বন্দনা গাইতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা এ দাবিও করার চেষ্টা করে যে, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এসবই মানুষ ইসলাম থেকে নিয়েছে। ইসলামের মূল শিক্ষাই এগুলো। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন খণ্ডচিত্র তুলে ধরে ধরে তারা তাদের শ্রোতা ও পাঠকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে থাকে যে, এ মতবাদগুলোর মূল ফর্মুলা ইসলাম থেকেই নেয়া হয়েছে।

মানবরচিত আইনে পরিচালিত দেশের মালিক পক্ষ, সে দেশের নির্বাচন কমিশন, সে দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি, সে দেশের আইন শৃংখলা বাহিনী, সে দেশের আইন ও বিচার বিভাগসহ সর্বস্তরের জনগণকে তারা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, সে দেশের আইন ও সংবিধানের কোন বিন্দু বিসর্গের সঙ্গেও তাদের কোন দ্বিমত নেই। সর্বোচ্চ এতটুকু হতে পারে যে, সংবিধান ও আইনের কোন বিন্দু বুঝে না আসলে মানবরচিত আইন

ও সংবিধানের নির্দেশিত পথেই তারা তাদের আবেদন ও নিবেদন করবে। যা বুঝে আসেনি তা বোঝার চেষ্টা করবে। মানবরচিত আইন ও সংবিধানের সঙ্গে কোন ধরনের কোন বেয়াদবি হবে না।

তারা তাদের নির্বাচনি ইশতিহারে ইসলামের নামও উচ্চারণ করবে না। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও শরীয়াহ প্রয়োগ বিষয়ক কোন নাম গন্ধও তাতে থাকবে না। নির্বাচনের প্রচার পত্রে এমন কিছু বুলি ও বাক্য তারা আওড়াবে যা সচরাচর সবাই আওড়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, প্রথাগত রীতিনীতি, সাম্প্রদায়িক পূজা আর্চনা ইত্যাদিতে তারা সমানে সমানে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকে। জাতীয় ও সাম্প্রদায়িকভাবে চলে আসা নির্দিষ্ট দিন, নির্দিষ্ট ব্যক্তির মূর্তি, নির্দিষ্ট বস্তুর মূর্তি, নির্দিষ্ট এলাকা ও বিভিন্ন বস্তু ও শব্দের প্রতি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে থাকে না।

মোটকথা, সকল বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যবহার করে সর্বস্তরের সবাইকে এ কথা বোঝানো হবে যে, আমরা মানবরচিত আইনের বিপরীত কিছুই করব না এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা বা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা জাতীয় কোন কিছুই আমাদের লক্ষ উদ্দেশ্যের মধ্যে নেই। দেশের লক্ষ উদ্দেশ্য ও মূলনীতির বাইরে কোন পদক্ষেপই আমরা গ্রহণ করব না।

শুধু মনের সুপ্ত কোন এক মণিকোঠায় ঈমান ও ইসলামকে লুকিয়ে রাখবে যা কখনো কেউ দেখবে না। সময়ে সময়ে ঈমানটুকু কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তা নিজেও ভুলে যাবে।

আর এসব কিছুর বিনিময়ে ইসলামী দলগুলো মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনে নিবন্ধিত হতে পারবে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, রাজপথে আত্মপ্রদর্শনের অনুমতি পাবে, আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে বন্দি হলে কারাগারে রাজবন্দি হিসাবে ডিভিশন পাবে। এক সময় সংসদ সদস্য হয়ে সংসদ ভবনে প্রবেশ করবে, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিজেদের হাতে চলে আসবে, নিজেরাই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে সংসদীয় নিয়মে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করবে, দুই তৃতীয়াংশ আসন হাতে থাকবে, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার সবই নিজেরা নির্বাচন করবে।

সংসদীয় অধিবেশন ডেকে দেশের নব্বই/পঁচানব্বই ভাগ গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদীদেরকে অবাক করে দিয়ে, নির্বাচন কমিশনকে অবাক করে দিয়ে, সাবেক সকল ক্ষমতাসীনকে অবাক করে দিয়ে, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আইন শৃংখলা বাহিনীকে অবাক করে দিয়ে, আদালতপাড়াকে অবাক করে দিয়ে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট নিয়ে হঠাৎ করে ঘোষণা এসে যাবে 'আজ থেকে এ দেশ শতভাগ ইসলামী শরীয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে, ইসলামী শরীয়তের বিপরীত সকল কার্যক্রম বিলুপ্ত করা হল এবং অকার্যকর ঘোষণা করা হল'।

তখন পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য এ অঘটনের দিকে পুরো বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকবে না।

প্রচলিত ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের কথা ও দাবিতে সত্যবাদি হয়ে থাকে তাহলে ঘটনাগুলো এভাবে ঘটবে। আর যদি এমন স্বপ্ন না দেখে থাকে তাহলে তারা মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, প্রতারক।

স্বপ্নভঙ্গ

এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। নিশ্চিত ভেঙ্গে যাবে। কারণ এটি একটি দিবাস্বপ্ন। কারণ এটি একটি শিশুর স্বপ্ন। কারণ এটি দুধবিহীন রাবার চোষা নবজাতকের স্বপ্ন। কারণ এটি আত্মভোলা মানুষের স্বপ্ন। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা কখনো ঘটেনি। কারণ শরীয়তের কিতাবে এর কোন বৈধতা নেই।

এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অনেকে মনে কষ্ট পাবে। আবার অনেকেই কোন কষ্টই পাবে না। কর্ণধারদের তুলনায় সাধারণ কর্মীরা একটু বেশি কষ্ট পাবে। কর্ণধারদের অনেকেই কষ্ট পাবে না। কারণ তারা যে স্বপ্ন কর্মীদেরকে দেখায় নিজেরা সে স্বপ্ন দেখে না। আর যারা স্বপ্ন দেখে না তারা স্বপ্ন ভঙ্গের কষ্টেও ভোগে না। কর্ণধারদের অনেকের মুখ থেকে কখনো কখনো মুখ ফসকে এমন কথা বের হয়ে গেছে যা শুনে আমরা বুঝে ফেলেছি যে, তারা এসব অলীক স্বপ্ন দেখে না। তবে কেন তারা এসব অভিনয় করে চলেছে তা বোঝার মত মেধা এখনো আমাদের হয়নি। অথবা বলা যায়, সে বাস্তবতা উচ্চারণের সৎ সাহস এখনো আমাদের হয়নি।

দু'একজন হাবাগোবা নেতা ও কর্মীদের যারা এসব অলীক স্বপ্ন দেখে তাদের জন্য বলছি, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার জাল যারা বুনেছে সে জেলে ও শিকারী ঐ মাছের চাইতে অনেক বেশি চালাক যে মাছ ভাবছে, জেলের জালে ঢুকে জালের মধ্যে নিজেকে পেঁচিয়ে হেচকা টান মেরে জেলেকে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে এতটা বোকা হওয়ার অনুমতি দেননি, এতটা অজ্ঞ থাকার অনুমতি দেননি। মুহাম্মদে আরাবীর উম্মত এতটা বোকা হলে চলে না।

আর বোকা বা চালাক হওয়ার প্রয়োজন ছিল না যদি আমরা এসব বিষয়ে নিজেদেরকে শরীয়তের সিদ্ধান্তের উপর ন্যাস্ত করে দিতাম। নিজেদের আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং লাভ ও ক্ষতির বিচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতাম।

সাত. দোয়া কান্নাকাটি করা

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও শরীয়াহ বাস্তবায়নের সর্বশেষ পদ্ধতি হচ্ছে দোয়া কান্নাকাটি করা এবং দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা। তবে মনে রাখতে হবে এ দোয়া কান্নাকাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো দোয়া কান্নাকাটি নয়, মুজাহিদের দোয়া কান্নাকাটি নয়, সালাফে সালেহীনের দোয়া কান্নাকাটি নয়।

এ দোয়া কান্নাকাটি হচ্ছে, অর্পিত ফরয দায়িত্বকে প্রত্যাখ্যান করে দোয়া কান্নাকাটি করা। ফরয দায়িত্বকে প্রত্যাখ্যান করে যারা দোয়া কান্নাকাটির কথা বলে থাকে তারা এমন কথাও বলে থাকে যে, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটে। উদাহরণ দেখিয়ে দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, যারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে তারা এখন ঠিকমত ইবাদতটুকুও করতে পারছে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ দোয়া কান্নাকাটির বৈধতা কতটুকু? এ দোয়া কান্নাকাটির অতীত উদাহরণ কী?

একটি সারসংক্ষেপ

এভাবে আরো বহু রকমের উপায় ও পদ্ধতি প্রতিদিন আবিষ্কার হয়েই চলেছে। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কুফরী শক্তিকে পদানত করার জন্য যে পদ্ধতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন এবং যে পদ্ধতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সে

পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার কারণে উম্মত এখন উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। উপায়ের পর উপায় আবিষ্কার করে চলেছে, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান নেই। এ উম্মত যত দিন তাদের রাসূলের নির্দেশিত পথে আসবে না তত দিন এভাবে ঘুরতেই থাকবে যেভাবে বনী ইসরাঈল তাদের নবীর দির্দেশিত পথে না চলে ঘুরতেই থেকেছে-

﴿يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ {سورة المائدة: ٢١-٢٦}

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে প্রবেশ কর এবং নিজেদের পশ্চাদ্দিকে ফিরে যেও না; তাহলে তোমরা উল্টে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যাবে, আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের যায়, তবে অবশ্যই আমরা সেখানে প্রবেশ করব। যারা আল্লাহকে ভয় করত, তাদের মধ্যে দুইজন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বলল, তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে (নগরের) দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রেখ, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। তারা বলতে লাগল, হে মূসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে (সেই দেশে) অবস্থানরত থাকবে,

ততক্ষণ আমরা কিছুতেই প্রবেশ করব না। আর (তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে) তুমি ও তোমার রব্ব চলে যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই বসে থাকব। মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজ সত্তা এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারও উপর আমার কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং আপনি আমাদের ও ঐ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন। আল্লাহ বললেন, তবে সে ভূমি তাদের জন্য চল্লিশ বছর কাল নিষিদ্ধ করে দেয়া হল। (এ সময়) তারা যমীনে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে। সুতরাং (হে মূসা) তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।" -সূরা মায়েদা ২১-২৬

'একেবারেই' শব্দের বিশ্লেষণ

শায়খে মুহতারাম বলেছেন, এটা 'একেবারেই' ভুল। অর্থাৎ পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্রধারণের পদ্ধতি একেবারেই ভুল। তার মানে হচ্ছে অস্ত্রধারণের কোন বৈধ পদ্ধতি এ ক্ষেত্র নেই। যখন অস্ত্রধারণের কোন পদ্ধতিই বৈধতা পাবে না তখন বলতেই হবে যে, উপরে উল্লিখিত সাতটি পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সে পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে কোন কোনটির কথা শায়খে মুহতারাম নিজেই বলেছেন।

আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে, যে পদ্ধতিগুলোর কোন উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে নেই এবং যে পদ্ধতিগুলোর বৈধতা শরীয়তের কিতাবাদিতে নেই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য সে উপায়গুলোকে কেন গ্রহণ করা হবে। আর যে পদ্ধতির হুকুম কুরআনে রয়েছে, হাদীসে রয়েছে, ফিকহের কিতাবে রয়েছে, বিশ্বের বরেণ্য মুফতীগণের ফাতওয়ার মাঝে রয়েছে সে পদ্ধতি কেন ভুল হিসাবে চিহ্নিত হল? এবং একেবারেই ভুল হিসাবে কেন ভূষিত হল?

এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে, অস্ত্রধারণ হবে কাফেরের বিরুদ্ধে দারুল হারবে। পাকিস্তান হচ্ছে দারুল ইসলাম এবং অস্ত্রধারণ করলে তা করতে হবে মুসলমাদের বিরুদ্ধে। তাই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের এ সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল এবং এ প্রোপাগাণ্ডা একেবারেই মিথ্যা।

এ বিষয়ে আমাদের নিবেদন হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয় যেমনটি শায়খে মুহতারাম বলছেন। বিষয়টি একটু খুলে বললেই পাঠকের জন্য সুবিধা হবে।

প্রোপাগাণ্ডা শতভাগ সঠিক; কারণ

পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়ন করতে হলে মুসলমানরা অস্ত্র হাতে নেয়া ব্যতীত আর কোন পথ নেই -এই সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক এবং দলিলভিত্তিক।

এ বিষয়ে প্রথমে সংক্ষিপ্ত নিবেদন হচ্ছে, যে শক্তির কারণে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং যে অপশক্তির কারণে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা যায় না সে শক্তি ও অপশক্তির ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে, মুসলমানরা সে শক্তিকে ইসলামের সকল বিধি বিধান মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা সে আহ্বানে সাড়া দিলে তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে। আর যদি সাড়া না দেয় তাহলে তাদেরকে এ আহ্বান প্রত্যাখ্যানের অপরাধে কর দিয়ে হীনতার সাথে মুসসলমানদের অধীনে বসবাস করতে প্রস্তাব করা হবে। যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে তাই করা হবে। আর যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এবং বিজয় লাভ করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকবে।

দ্বীন ও শরীয়াহ বাস্তবায়নের পথে যেই বাধা হবে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। সে বাধা লাল মিয়া দিয়েছে না কি কালা মিয়া দিয়েছে তা আলাদা করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর নয়। দ্বীন ও শরীয়াহ বাস্তবায়নের পথে বাধাদানকারী জন্মসূত্রে জন্মনিবন্ধন পত্রে ও জাতীয় পরিচয় পত্রে কী পরিচয়ে পরিচিত, গুলি চালানোর আগে তা জানা মুসলমানের দায়িত্ব নয়। সে তাহাজ্জুদগুজার নাকি মসজিদে হারামের নির্মাতা, সে জমজমের সাকী না কি কাবার প্রহরী তা জানা মুসলমানের দায়িত্ব নয়। দ্বীন ও শরীয়াহ বাস্তবায়নের পথে যে বাধা দেবে মুসলমান তার বুকে বুলেট চালিয়ে দেবে। এটা তার ফরয দায়িত্ব। শরীয়তের পক্ষ থেকে তার উপর এটাই হুকুম।

এবার একটু বিস্তারিত

পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়ন করতে হলে মুসলমানরা অস্ত্র হাতে নেয়া ব্যতীত আর কোন পথ নেই -এই সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক এবং দলিলভিত্তিক। এ দাবির পক্ষে আমাদের কিঞ্চিত বিস্তারিত বক্তব্য হচ্ছে এই-

মুসলমানরা দ্বীন ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করবে কাফেরদের বিরুদ্ধে। কাফেরদের ক্ষমতায় পরিচালিত দারুল হারবকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করার জন্য মুসলমানরা জিহাদ করবে। পাকিস্তানের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারীরা হচ্ছে কাফের, তাই মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারীরা মুরতাদ হওয়ার কারণে দেশটি দারুল হারব। তাই এ দেশকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করার জন্য মুসলমানরা জিহাদ করবে, অস্ত্রধারণ করবে।

পাকিস্তানের শাসকবর্গ কাফের-মুরতাদ

পাকিস্তানের শাসকবর্গ তথা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদ, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও সংসদ সদস্যরা যারা গণতন্ত্র ও মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠা করার শপথ গ্রহণ করেছে তারা কাফের ও মুরতাদ। কারণ এরা সবাই আইন প্রণয়ন ও আইন অনুমোদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তবে সংসদ সদস্যদের কেউ যদি গণতন্ত্র ও মানবরচিত বিধানের বিরোধিতার জন্য এবং কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে গিয়ে থাকে তাহলে তাদের বিষয়টি তাহকীকের মুহতাজ।

এ আইন প্রণয়ন বিভাগটি মানব জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে মানব রচিত আইন দিয়ে পরিচালিত করে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল প্রদত্ত আইনের শরণাপন্ন হয় না। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আইনকে এড়িয়ে গায়রুল্লাহর আইনকে গ্রহণ করে। তাদের সামনে আল্লাহর আইন ও গায়রুল্লাহর আইন দু'টি থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আইনকে গ্রহণ না করে গায়রুল্লাহর আইনকে গ্রহণ করে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের যেখানে যেখানে আল্লাহর বিধানের আলোকে সিদ্ধান্ত দেয়া রয়েছে সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করে মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনকে গ্রহণ করে। সে আইন দেশের সবাইকে মানতে বাধ্য করে। মানবরচিত গণতান্ত্রিক এ আইনের বিপরীত করলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন করে।

আর যারা এমন করে তারা কাফের ও মুরতাদ। তাদের এ কাজ কবীরা গুনাহের তরকে আমল নয়; এ কাজ ইনকারে আমল ও আদমে তাসলীম। তাদের সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা শরয়ী আইনকে গ্রহণ করবে না। তাদের এ আমল হুবহু ইবলীসের এ বক্তব্য قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ 'আমি সিজদা করব না'।

কুরআনের আয়াত ও তার তাফসীর দেখুন-

﴿وقوله: {**أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون**} ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليساق. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله [صلى الله عليه وسلم] فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال الله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون} أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن

وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هلال بن فياض، حدثنا أبو عبيدة الناجي قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله، فحكم الجاهلية﴾ {تفسير ابن كثير: ١٣١/٣}

"আল্লাহর বাণী **أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم**

يوقنون আল্লাহ তাআলা সেসব লোকের অবস্থানকে অস্বীকার করছেন যারা আল্লাহ তাআলার সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান থেকে বের হয়ে গেছে যে বিধানে সকল কল্যাণ রয়েছে এবং সকল অকল্যাণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে সে বিধান থেকে বের হয়ে অন্যান্য বিভিন্ন মত, মনষ্কামনা ও বিভিন্ন পরিভাষার অনুগামী হয়ে পড়েছে যা মানুষ রচনা করেছে, যেগুলোতে আল্লাহর বিধানকে ভিত্তি বানানো হয়নি। যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা এসব ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা দিয়ে তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করত যা তারা নিজেদের মতামত ও মনষ্কামনার ভিত্তিতে তৈরি করত।

এরকমভাবে যেমন তাতারীরা তাদের রাজপরিবারের শাসননীতি দিয়ে শাসন করে যা তাদের আদি পুরুষ চেঙ্গিস খান থেকে নেয়া হয়েছে। যে চেঙ্গিস খান তাদের জন্য 'ইয়াসাক' (নামের একটি সংবিধান) তৈরি করেছিল। আর 'ইয়াসাক' হচ্ছে একটি রচনা যা বিভিন্ন বিধিবিধানের সমষ্টি যে বিধানগুলো সে বিভিন্ন শরীয়ত থেকে গ্রহণ করেছে। যেমন ইহুদী ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি থেকে। এর মাঝে বহু বিধান ছিল এমন যা শুধু নিজস্ব মতামত ও মনষ্কামনা থেকে গৃহীত। এ বিধানসমগ্র পরবর্তীতে তার বংশধরদের মাঝে অনসৃত শরীয়ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের উপর তাদের এ বিধানসমগ্রকে প্রাধান্য দিত।

তাদের মধ্যে যারা এ কাজ করবে তারা কাফের, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের দিকে ফিরে আসবে না এবং ছোট বড় অল্প বেশি সর্ব ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিচার করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব।

তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ أفحكم الجاهلية يبغون তবে কি তারা অজ্ঞানতার যুগের মীমাংসা কামনা করে? অর্থাৎ তারা চায় ও ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখ হয়ে যায় ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে হবে? আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও হুকুম বেশী ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারে না। ঈমানদার ও পূর্ণ বিশ্বাসীগণ খুব ভাল করেই জানে যে, এ আহকামুল হাকিমীন, আরহামুর রাহিমীনের চেয়ে বেশী উত্তম, স্বচ্ছ, সহজ ও পবিত্র আহকাম, মাসায়েল এবং কাওয়ায়েদ আর কারও হতে পারে না। মা তার ছেলের প্রতি যতটা দয়া পরবশ হতে পারে তার চেয়েও বেশী তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের উপর মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিরাট শক্তি এবং ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারী।

ইবনে আবী হাতেম তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বহির্ভূত ফয়সালা করে, ওটাকে জাহেলিয়াতের হুকুম বলা হবে!" -তাফসীরে ইবনে কাসীর

পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের মত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নির্বাহী শক্তি বুঝে শুনে ইচ্ছাকৃত এ কাজগুলো করে থাকে। এ কুফরী তারা বাধ্য হয়েও করে না, অজ্ঞতার কারণেও করে না। এ কুফরের উপর তাদের গর্ব আছে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গন থেকে ইসলামের কর্তৃত্বকে বিলুপ্ত করে সে স্থলে মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারার উপর তাদের তৃপ্তি আছে। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি মানুষের দাবি প্রত্যাখ্যান করার নযীরও পাকিস্তানে আছে। ক্ষেত্র বিশেষ তাদের এমন বক্তব্যও আছে যার সারমর্ম হচ্ছে, ইসলামী নীতি হচ্ছে পশ্চাদপদ নীতি, এ নীতির উপর চললে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। এগুতে হলে মানবরচিত গণতান্ত্রিক নীতিতেই এগুতে হবে।

বিশ্বের কুফরী শক্তির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অঙ্গীকার আছে, সে অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন আছে। পাকিস্তানের সর্বাত্মক সহযোগিতায় একটি সর্বস্বীকৃত দারুল ইসলাম কাফেরদের হাতে চলে যাওয়ার উদাহরণও এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের কুফরী সংগঠনের অন্যতম সদস্য হিসাবে পাকিস্তানের গর্ব আছে। বিশ্বের সকল কুফরী শক্তির সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসার প্রকাশ্য ঘোষণা আছে।

অতএব এ নির্বাহী শক্তি কাফের ও মুরতাদ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। তাদের পক্ষে ওযর দাঁড় করানোর কোন সুযোগ নেই।

পাকিস্তান দারুল হারব

ইসলামী শরীয়তের কিতাবাদিতে দারুল হারবের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে সে সংজ্ঞা হিসাবে বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মত পাকিস্তানও একটি দারুল হারব। দারুল হারবের সংজ্ঞা দেখুন এবং পাকিস্তানসহ বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিন-

﴿دَارُ الْحَرْبِ هِيَ: كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الْكُفْرِ ظَاهِرَةً﴾

}يراجع: بدائع الصنائع ٧ / ١٣٠ - ١٣١، ابن عابدين ٣ / ٢٥٣، المبسوط ١٠ / ١١٤، كشاف القناع ٣ / ٤٣، الإنصاف ٤ / ١٢١، المدونة ٢ / ٢٢{.

'দারুল হারব হচ্ছে প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড যেখানে কুফরী আইন প্রচলিত'।

দারুল হারবের এ সংজ্ঞা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য। পাকিস্তানের সংবিধান ও আইন হচ্ছে গায়রুল্লাহর আইন ও সংবিধান, মানবরচিত আইন ও সংবিধান। পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি বিভাগ গায়রুল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইনে পরিচালিত। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব হিসাবে ফাতওয়া দেয়ার পর এবং এ ভূখণ্ডটি দারুল হারব হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের কোথাও কখনো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, শরয়ী আইন বাস্তবায়ন হয়নি, শরীয়াহ অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হওয়ার ঘোষণা আসেনি। এরই বিপরীত গণতান্ত্রিক

মানবরচিত আইনে এ দেশগুলো পরিচালিত হওয়ার ঘোষণা এসেছে, গণতান্ত্রিক মানবরচিত আইনে তা পরিচালিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ সত্যগুলোকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, যে দেশের নির্বাহী শক্তি কাফের ও মুরতাদ এবং যে দেশটি দারুল হারব সে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হচ্ছে অস্ত্রধারণের মাধ্যমে জিহাদ করা। এ ভূখণ্ড এবং এ রকমের সকল ভূখণ্ডে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথই হচ্ছে অস্ত্রধারণ। কুরআন, হাদীস, ফিকহ এবং সর্বকালের ফাতওয়ার কিতাবাদি মন্থন করলে অস্ত্রধারণের মাধ্যমে জিহাদ ব্যতীত আর কোন পন্থা খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

আর যে দেশগুলোতে শতকরা আশি/নব্বই/পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান বসবাস করে সে দেশগুলোতে মুসলমানরা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না করে কোন কাফের নির্বাহী শক্তির অধীনে দারুল হারবে বসবাস করা অবৈধ। তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন হুঁশিয়ারী এসেছে। তাদের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে সে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। আর ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হলে কুফরী শক্তিকে পরাজিত করতে হবে, যা কখনো অস্ত্রধারণ ছাড়া সম্ভব নয়।

তাই দলিলের আলোকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই দাবি করা যায় যে, পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্রধারণের কোন বিকল্প নেই। আর এ প্রোপাগাণ্ডা শতভাগ সঠিক ও নির্ভুল।

হাকিমিয়্যাহ, দারুল হারব ও জিহাদের ফরযিয়াতের আলোচনা এখানে প্রসঙ্গক্রমে আসার কারণে বিস্তারিত দলিল উল্লেখ করা হয়নি। এগুলোর প্রত্যেকটির উপর আলাদা আলাদা রচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা সেসব গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

জরুরী টীকা : ২২

এবং মিথ্যা।

জরুরী টীকা-২২

এবং মিথ্যা।

পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্রধারণ করতে হবে -এ প্রোপাগাণ্ডা মিথ্যা নয়। তা মিথ্যা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ প্রোপাগাণ্ডাকে মিথ্যা বলতে হলে ইসলামী শরীয়তের কিতাবগুলোতে বিবৃত দারুল হারবের সংজ্ঞা, মুরতাদের সংজ্ঞা ও জিহাদের নীতিমালাকে মিথ্যা বলতে হবে। বিষয়গুলো মাঠে ময়দানে বক্তৃতার বিষয় নয়। একান্ত ইলমী বিষয়। যাঁরাই এ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন, কোন সিদ্ধান্ত দেবেন তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে দলিলের আলোকে কথা বলা। পাঠকের সামনে দলিলগুলো তুলে ধরা। দলিলভিত্তিক যেসব প্রশ্ন পাঠকের মনে জেগে আছে সেগুলোর সমাধান করা।

আমাদের বড়দের সিদ্ধান্তগুলো দলিলভিত্তিক হবে এটাই স্বাভাবিক। তাদের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সে দলিল আমাদের জানা থাকাও জরুরী নয়। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তের বিপরীতে যখন ভিন্ন রায় ও মতামত সামনে আসে এবং সে মতামত দলিল প্রমাণসহ হয় তখন দ্বিতীয় রায় ও অভিমতকে শুধু ঠেলা ধাক্কা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সে মতের পক্ষে উপস্থাপিত দলিলগুলোর সঠিক সমাধান দিয়ে সামনে বাড়তে হয়।

বড়রা যত বড়ই হোন না কেন তারা ছোটদের কিছু দুর্বলতার কথা মনে রাখতে হবে। ব্যাপক প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন সিদ্ধান্ত,

অভিমত ও রায় যখন ছোটদের সামনে আসে এবং সে রায় যদি দলিলে মোড়ানো থাকে তখন সে দলিলের তৃপ্তিদায়ক জবাব তাদের সামনে আসার আগ পর্যন্ত তারা প্রচলিত ব্যাপক সিদ্ধান্তের উপর চলতে থাকলেও স্থিরতা লাভ করতে পারে না।

আমাদের ধারণামতে এ দুর্বলতা কোন অপরাধ নয়।

বিষয়টি যখন এতদূর গড়ায় যে, প্রচলিত ব্যাপক সিদ্ধান্তের পক্ষের দলিল তাদের সামনে না থাকে, আর বিপরীত সিদ্ধান্ত ও মতের পক্ষের দলিল তাদের সামনে থাকে -এমন অবস্থায় তারা শুধু অস্থিরতাই ভোগ করে না; বরং দলিলবিহীন সিদ্ধান্তের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সেসব সিদ্ধান্তের প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরি হতে থাকে। এসব পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ ও পন্থা হচ্ছে দলিলগুলো সামনে নিয়ে আসা।

উম্মতের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যদের সামনে দলিল উপস্থাপন করলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে -এ ভয়ে দলিলকে লুকিয়ে রাখার যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে সে নীতির উপর আবার একটু দৃষ্টি বোলানো দরকার। উম্মতের কোন কোন স্তরের সামনে দলিল উপস্থাপন করা যাবে, আর কোন কোন স্তরের সামনে দলিল উপস্থাপন করা যাবে না তার একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা সামনে এসে গেলে সবার জন্য সুবিধা হত।

মিথ্যার সংজ্ঞা

শায়খে মুহতারাম বলেছেন, অস্ত্রধারণের প্রোপাগাণ্ডা মিথ্যা। আমাদের নিবেদন হচ্ছে, অস্ত্রধারণের এ বিষয়টি সমাজের মাস্তানদের রামদা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি নয়। এ অস্ত্রধারণ মানে হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ঈমানের সাতাত্তর শাখার একটি শাখা। বিশেষ কোন ভূখণ্ডে বিশেষ অবস্থার উপর যদি কেউ এ জিহাদকে ফরয বলে দাবি করে তাহলে সে দাবিকে মিথ্যা বলার আগে অবশ্যই এ বিষয়ক দলিল প্রমাণগুলো ঘেঁটে দেখা জরুরী। ঘেঁটে দেখা হয়ে থাকলে সেসব দলিল প্রমাণ বিপরীত দাবিদারদের সামনে তুলে ধরা উচিত।

একটি দেশে ইসলামী হুকুমত ও শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত জিহাদ ব্যতীত হাজার রকমের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন প্রচেষ্টায় ইতিবাচক কোন ফল আসেনি। ইসলামী হুকুমত

প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শরয়ী আইন বাস্তবায়িত হয়নি। এত কিছুর পরও যদি কেউ দাবি করে যে, এ ভূখণ্ডে জিহাদ ব্যতীত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, তাহলে এ দাবিকে মিথ্যা বলার আগে কি একটু ভাবার প্রয়োজন ছিল না? এটি কি শুধুই একটি প্রোপাগাণ্ডা, না কি এর কোন হাকীকত আছে।

মিথ্যা কাকে বলে? মিথ্যা বলা হয় যে কথাটি সত্য নয়। যে কথাটি বাস্তব বিবর্জিত। যে দাবির কোন সত্যতা নেই। যে দাবির পক্ষে কোন দলিল নেই। এরই বিপরীত কোন একটি দাবির পক্ষে দলিল থাকলে সে দাবিকে মিথ্যা বলা যায় না। দলিলের দুর্বলতা থাকলে বলা যাবে, এ দাবির পক্ষে দলিল দুর্বল। দাবির পক্ষে দলিলের বক্তব্য সুস্পষ্ট না হলে বলা যাবে, এ দলিল দিয়ে এ দাবি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না। আর যদি দাবি প্রমাণ করার জন্য দলিলের মাঝে বিকৃত করা হয়েছে বলে সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে তাও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া চাই। একটি ইলমী বিষয়ে ও দ্বীনী বিষয়ে আলোচনার টেবিলে প্রতিপক্ষকে মিথ্যুক বলা তার দাবিকে মিথ্যা বলা কতটা ভদ্রোচিত বিষয়?

আর যদি বলতে চান, ইতিকাদ ও বিশ্বাসের বিপরীত হওয়ার কারণে এ দাবিকে মিথ্যা বলা হয়েছে, তাহলে হয়ত তা হতেও পারে। অর্থাৎ বক্তা যে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে সে বিশ্বাসের বিপরীত যে কোন বিশ্বাসকে বক্তা মিথ্যা বলতে পারেন। এমন একটা সুযোগ আছে। পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্তকে যদি এ হিসাবে শায়খে মুহতারাম মিথ্যা বলে থাকেন তাহলে এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে দলিলভিত্তিক আলোচনা করার অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। না হয় তা ইলমের নীতিমালাকে উপেক্ষা করা হয়ে যাবে।

মিথ্যার সংজ্ঞা ও প্রোপাগাণ্ডা

মিথ্যার যে সংজ্ঞা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র আমরা জানি ও দেখেছি সে হিসাবে অস্ত্রধারণের প্রোপাগাণ্ডার সঙ্গে মিথ্যার সংজ্ঞার কোন মিল নেই। এ প্রোপাগাণ্ডাকারী ব্যক্তিরা কিছু ভবঘুরে মানুষ নয়, সমাজের ধিকৃত ও চতুর্থ শ্রেণীর কোন মানুষ নয়। আঙ্গুলের মাথায় গোনা যায় এমন কিছু মানুষ নয়। তারা সমাজের মহান ব্যক্তিদের কাতারেরই মানুষ। ওলামায়ে কেরামের প্রথম সারিরই ব্যক্তিবর্গ।

তাঁরা ইলম, প্রজ্ঞা, আমানত, দুনিয়াবিমুখতা, অভিজ্ঞতা, সমকাল সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ওলামায়ে কেরামের মহান কাফেলারই একটি অংশ। তাঁদের অতিরিক্ত গুণ হচ্ছে, তাঁরা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যান না। স্রোতের বিপরীত কথা বলেন। সাহসী উচ্চারণে পিছপা হন না। বিশ্বের কুফরী শক্তি ও দেশীয় ক্ষমতাসীনদের শক্তিতে ঘাবড়ে যান না। মানুষের শক্তির প্রভাবে আল্লাহর শক্তির কথা ভুলে যান না। আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

তাই এ মানুষগুলোকে মিথ্যুক বলা এবং তাদের দলিলভিত্তিক একটি দাবিকে মিথ্যা বলা খুবই ভয়ংকর। এ প্রোপাগাণ্ডাকে মিথ্যা বলার ফলাফল অনেক ভয়ংকর। ভয়ংকর হওয়ার সে কারণটিও এখন পাঠককে বলব, ইনশা-আল্লাহ।

এ প্রোপাগাণ্ডাকে মিথ্যা বলার ফলাফল ভয়ংকর

যখন দলিলের আলোকে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন এ সিদ্ধান্তকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করলে এর আঘাত সম্বোধিত সিদ্ধান্তদাতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। দলিলের আলোকে সিদ্ধান্ত দেয়ার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও নির্দেশনাকে তুলে ধরা। তাই একে প্রত্যাখ্যান করা বা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার অর্থ হচ্ছে শরীয়ত ওয়ালাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।

এ কারণে আমরা যখন ফিকহের কিতাবাদিতে মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামের অভিমতগুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করি এবং এক জনের অভিমতের বিপরীতে আরেক জনের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করি তখন খুব স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিপক্ষের মতের জবাব দিতে হয়। কিন্তু ফিকহের কোন কিতাবে কখনো দলিলভিত্তিক ইখতেলাফ ও মতভেদ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে 'মিথ্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। বিপরীত মতকে কেউ কখনো মিথ্যা বলেনি এবং সে মতের পক্ষের ব্যক্তিকে মিথ্যুক বলেনি।

এছাড়া সত্য মিথ্যা হচ্ছে খবর ও বর্ণনা বিষয়ক বক্তব্যের বিশেষণ, ইনশা ও উদ্ভাবন বিষয়ক বক্তব্যের জন্য এ বিশেষণ ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যর্থতা দেখে এবং পাকিস্তানের মালিক পক্ষের

শরীয়াহ বিরোধী অবস্থান দেখে যদি দলিল প্রমাণের আলোকে এ তাগুতের বিরুদ্ধে কেউ জিহাদের সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে এ সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটি ইজতিহাদ। এ ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের উপর দলিলভিত্তিক পর্যালোচনা হতে পারে, এটা মিথ্যা হতে পারে না। একে মিথ্যা বলা যায় না।

মুলহিদ যিন্দীকদের কেউ কখনো আয়াত হাদীসের তাহরীফ ও বিকৃতি করলে এবং তারা তাদের সে তাহরীফের ভিত্তিতে উদ্ভট কোন দাবি করলে এমন ক্ষেত্রে কখনো তাদেরকে মিথ্যাবাদি এবং তাদের দাবিকে মিথ্যা দাবি বলে বিশেষিত করার উদাহরণ আছে। কাফের মুশরিকদের উদ্ভট দাবির ক্ষেত্রে মিথ্যা শব্দের ব্যপক ব্যবহার রয়েছে। নাস্তিক মুরতাদদের বিভিন্ন উদ্ভট দাবির ক্ষেত্রে মিথ্যা শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

কিন্তু একটি অনৈসলামিক শাসন ক্ষমতার অধিকারী তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া দানকারীদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার উদাহরণ একেবারেই অস্বাভাবিক। আর এ কাফেলাটি এমন এক কাফেলা যাদের কর্মকাণ্ড চোখের সামনে রয়েছে। তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা বিজয় লাভ করেছে তারা এ ঘরেরই মানুষ। তাদের সফল কার্যক্রমগুলো এ আঙ্গিনায়ই প্রদর্শিত। এত শত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের উপস্থিতিতে একটি চাক্ষুষ বিষয়কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার বিষয়টি কোনভাবেই ছোট করে দেখা যায় না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

জরুরী টীকা : ২৩

ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য আলহামদু লিল্লাহ প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে।

জরুরী টীকা-২৩

ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য আলহামদু লিল্লাহ প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে।

এ দাবিটি শায়খে মুহতারাম করে চলেছেন, আর আমরা দেখে চলেছি, শায়খ নিজেও দেখে চলেছেন যে, এর বাস্তবায়ন কখনো হয়নি। শায়খে মুহতারাম ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য যে পথটিকে প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতি বলে দাবি করছেন তা আসলে পদ্ধতি কি না? যদি পদ্ধতি হয়ে থাকে তাহলে তার কোন নযীর ইসলামের ইতিহাসে আছে কি না এবং তার কোন হুকুম ও আদেশ শরীয়তের কিতাবাদিতে দেয়া আছে কি না?

একটি শক্তি যে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে এবং যুগের পর যুগ সে অবস্থানে অটল থেকেছে। কুরআন সুন্নাহর মুখে তালা লাগিয়ে দিয়ে পৌনে এক শতাব্দীকাল যাবত মানবরচিত আইন প্রয়োগ করে চলেছে, মুসলমানদেরকে তা মানতে বাধ্য করে আসছে। কোটি কোটি মুসলমানের দাবি আবেদন সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করে আসছে, সে শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং শক্তিপ্রদর্শন ব্যতীত আর কোন পদ্ধতি থাকার কল্পনা করা যায় কীভাবে?

যাই হোক, শায়খে মুহতারাম বলছেন অস্ত্রধারণ ছাড়াই পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি আছে এবং তা প্রকাশ্যভাবে

আছে। আমরা বলতে চাই অস্ত্রধারণ ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। কারণ-

কোন পথ ও পদ্ধতিই নেই

মুসলমানরা তাগুতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও জিহাদ ব্যতীত পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এবং শরীয়াহ প্রয়োগের জন্য আর কোন পথ ও পদ্ধতি নেই। এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের এ শক্ত দাবির পক্ষে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সে কারণগুলো আবারও ভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখ করছি। কারণগুলো হচ্ছে এই-

এক. পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত বাকি সব উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে গেছে। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই অস্ত্রধারণই এর জন্য সর্বশেষ উপায়।

দুই. ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হিসাবে ফাতওয়া হওয়ার পর ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কখনো দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়নি। আর দারুল হারবের শাসকবর্গের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছার পর এবং কর দিতে অস্বীকৃতির পর অস্ত্রধারণ ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না। তাই অস্ত্রধারণই এর শেষ উপায়। বরং আমরা বলব, মুসলিম শাসক যখন মুরতাদ হয়ে যায় বা অমুসলিম যখন মুসলিম দেশ দখল করে নেয়, তখন দাওয়াত ও করের প্রসঙ্গ নেই। বরং দাওয়াত ব্যতীতই তদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম রয়েছে।

তিন. পাকিস্তানের শাসকবর্গ হয়ত জন্মসূত্রে কাফের হবে, নয়ত ইলামী আইন গ্রহণ না করে মানবরচিত জাহেলী আইন গ্রহণ করা, প্রয়োগ করা ও বাধ্য করার কারণে মুরতাদ হবে। সর্বাবস্থায় মুসলমানদের উপর ফরয দায়িত্ব হচ্ছে এমন শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। তাই অস্ত্রধারণই পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য সর্বশেষ উপায়।

চার. কোন ভূখণ্ডে কুফরীর ফাউন্ডেশনগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার না করে কখনো সে ভূখণ্ডে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইসলামী আইন প্রয়োগ করা যায় না। আর অস্ত্রধারণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই অস্ত্রধারণই পাকিস্তানের মুসলমানদের সর্বশেষ উপায়।

পাঁচ. মুরতাদ ও কাফের শাসকবর্গ যারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও শরয়ী আইনকে পছন্দ করে না, শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কাছে আবেদন নিবেদন করার কোন বৈধতা নেই। তাই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণই সর্বশেষ উপায়।

ছয়. একটি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করা হয়েছে তাদের হাতে দেশটি ন্যস্ত করার পর যখন তারা কুফরী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশটিকে দারুল কুফর বানিয়ে দিয়েছে তখন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। তাই মুসলমানদের শেষ উপায় হচ্ছে অস্ত্রধারণ।

সাত. একটি দেশের শাসকবর্গ যখন বার বার ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে মানবরচিত কুফরী আইনকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে, শরীয়াহ প্রয়োগের দাবিকে অস্বীকার করে কুফরী আইনের প্রয়োগকেই জারি রেখেছে তখন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত মুসলমানদের আর কোন উপায় থাকে না। তাই মুসলমানদের এখন সর্বশেষ উপায় হচ্ছে অস্ত্রধারণ।

আট. শাসকবর্গ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাকে রোধ করার জন্য এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়ন রোধ করার জন্য অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে, সে অস্ত্র তারা সময়ে সময়ে ব্যবহার করে দেখিয়েছে, প্রয়োজনে ব্যবহার করার ধমকও দিয়ে রেখেছে। সুতরাং মুসলমানরা অস্ত্রধারণ না করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। অস্ত্রধারণই মুসলমানদের শেষ উপায়।

নয়. এ দেশ কাফেরদেরকে, আল্লাহর দুশমনদেরকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে একটি ইসলামী হুকুমত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। যে দেশে আল্লাহর আইন প্রয়োগ হত, কুরআন ও সুন্নাহ ছিল সকল আইনের উৎস, একমাত্র শরীয়াহ ছিল যে দেশের আইন। সে দেশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যারা আল্লাহর দুশমনদেরকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ছাড়া মুসলমানদের আর কোন উপায় নেই। এমন শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণই মুসলমানদের শেষ উপায়।

দশ. যে দেশের শাসকবর্গ বিশ্বব্যাপী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জিহাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব কুফরী শক্তিকে সার্বিক সহযোগিতার মুচলেকা দিয়ে রেখেছে, বিশ্ব কুফরী শক্তিকে সহযোগিতা করে চলেছে, সে

সহযোগিতার পুরস্কার গ্রহণ করে চলেছে, সে সহযোগিতায় প্রতিযোগিতা করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অস্ত্রধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অস্ত্রধারণই মুসলমানদের শেষ উপায়। আর কোন উপায় নেই।

আছে বললে বিপদ কমবে না, বাড়বে

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য যারা বলবেন, অস্ত্রধারণ ছাড়াও আরো বহু উপায় আছে তারা যদিও জিহাদের ও অস্ত্রধারণের কষ্ট ও বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বলছেন, কিন্তু তাঁরা চিন্তা করে দেখেননি এবং অঙ্ক মিলিয়ে দেখেননি যে, এ দাবি করলে বিপদ কোন অংশেই কমবে না। কষ্ট কোনভাবেই কমবে না। বরং বিপদ ও কষ্ট অনেক বেড়ে যাবে।

যখন বলা হবে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ছাড়াও আরো পদ্ধতি আছে। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেকগুলো প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে। সে প্রশ্নগুলো হচ্ছে যথাক্রমে: সে পদ্ধতিটি কী? সে পদ্ধতিটি কুরআনে হাদীসে ও ফিকহের কিতাবে আছে কি না? সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসে তার কোন উদাহরণ আছে কি না? বিগত সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত সে পদ্ধতিতে চেষ্টা করা হয়েছে কি না? চেষ্টা করা হয়ে থাকলে ইসলামী হুকুমত কেন হয়নি? এবং চেষ্টা না করে থাকলে কেন চেষ্টা করা হয়নি? আজ অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্তের পর কেন সে পদ্ধতির দোহাই দেয়া হচ্ছে? তাগুতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ছাড়া ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার অন্তত একটি উদাহরণ এর জন্য আদর্শ হিসাবে সামনে রাখা হোক।

যাঁরা দাবি করছেন, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতি আছে, যে পথ ও পদ্ধতি থাকা অবস্থায় অস্ত্রধারণের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে, এ পথ ও পদ্ধতির একটি বিস্তারিত নকশা উম্মতের সামনে থাকা দরকার। যার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি পর্বের কর্ম ও কর্মপন্থা সবিস্তারে বর্ণিত হবে। যা দেখে অনুসারীরা আশ্বস্ত হতে পারবে।

উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, অমুকের কারণে কাজটি হয়নি। অমুক অমুক বিভাগের অসহযোগিতার কারণে কাজটি করা যায়নি। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগের কারণে কাজটি হয়নি।

শরীয়ত কর্তৃক অর্পিত কোন ফরয দায়িত্বের বেলায় এ ধরনের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের নীতি ধারা হচ্ছে, দলিলের আলোকে ফরয হওয়া সাব্যস্ত হবে। ফরয তার আপন পাওয়ারে পালিত হবে। ফলাফল নিয়ে ঠাণ্ডা গরম কোন প্রকার কোন বক্তব্যের প্রয়োজন নেই। ফরয আদায়ে কোথাও ত্রুটি হলে তা শুধরানোর চেষ্টা করা হবে। ব্যক্তিবিশেষের উপর বা দলবিশেষের উপর দোষ চাপিয়ে ফরয দায়িত্ব থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ফরয থেকে নিস্তার পেতে হলে তা ফরয না হওয়া সাব্যস্ত হতে হবে। এ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই।

অপবাদের তালিকা বড় হবে

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্রধারণের পথ ছেড়ে অন্য যে প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতির কথা শায়খে মুহতারাম বলছেন সে পথই যদি পথ হয় তাহলে অপবাদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাবে। এখন যাদের উপর কিছু দোষ চাপিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার ফরয দায়িত্ব থেকে আমরা নিস্তার পেয়ে যাচ্ছি এভাবে নিস্তার পাওয়া খুব সহজে হবে না। এখানে অপবাদের সংখ্যা বাড়বে, সাথে সাথে অপবাদে অভিযুক্তদের সংখ্যাও বাড়বে ভয়াবহ পরিমাণে।

এ প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতির বয়স এখন কত? পাকিস্তান সংবিধানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার যে প্রকাশ্য পথ রাখা হয়েছে বলে শায়খে মুহতারাম দাবি করেছেন সে পথ ও পদ্ধতি সংবিধানের কত বছর বয়স থেকে সংবিধানে স্থান পেয়েছে?

যদি কথা এই হয় যে, সংবিধানের জন্মলগ্ন থেকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য এ পথটি সংবিধানে আছে, তাহলে অপবাদের এ তীর আরো অনেক পেছনে গিয়ে আরো বড় বড় পাহাড়ের গায়ে গিয়ে বিদ্ধ হবে। আমরা যারা আমাদের সামনে উপস্থিত কিছু হাবাগোবা মানুষদেরকে অবহেলার দায়ে দায়ী করে, অজ্ঞতার দায়ে দায়ী করে এবং মূর্খতার দায়ে দায়ী করে একটি ফরয দায়িত্বের আলোচনা শেষ করে দিচ্ছি তারা বুঝতে হবে যে কথা এখানেই শেষ নয়।

আমরা যারা আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরামের গায়ে কোন দাগ পড়তে দেই না, ইলমী সমালোচনাকেও বৈধ মনে করি না, তারাই কিন্তু প্রকারান্তরে আকাবির ওলামায়ে কেরামের পুরো কাফেলার উপর এ

বদনাম লেপে দিচ্ছে যে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সংবিধানের এ প্রকাশ্য পথ ও পন্থাটিকে তারা কেউ কাজে লাগাননি।

আর যদি কথা এই হয় যে, আকাবির ওলামায়ে কেরামের যামানায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার এ প্রকাশ্য পন্থাটি সংবিধানে সংযোজিত হয়নি; বরং ইদানিং তা সংবিধানে স্থান পেয়েছে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে সংবিধানে এ প্রকাশ্য পথ ও পদ্ধতিটি সংযোজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাকিস্তান নামক দেশটির অস্তিত্বের বৈধতা কী দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কোন অনুচ্ছেদ না থাকা অবস্থায়ও আকাবির ওলামায়ে কেরাম পাকিস্তান নামক দেশটিকে কীভাবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তার বৈধতা কী ছিল? তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য যে পথ ও পদ্ধতিটি আকাবির ওলামায়ে কেরামের যামানায় পাকিস্তান সংবিধানে সংযোজিত হয়নি তা কোন অলৌকিক শক্তিতে আসাগির ওলামায়ে কেরামের যামানায় এসে সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে? না কি এর মাঝে ভিন্ন কোন মতলব লুকিয়ে আছে?

আমার মনে হচ্ছে, এসবই আমাদের আবেগ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতানির্ভর কথা। কুরআন কিতাবের সঙ্গে এসব কথার কোন সম্পর্ক নেই। ফিকহের মূলনীতির সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। এসব কথার কোন ফিকহী তাকয়ীফ নেই। যারফলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমাদের কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন।

অপরাধের তালিকা বড় হবে

যদি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্রধারণ ব্যতীত অন্য কোন পথ ও পন্থার কথা বলা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অপরাধের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। কেউ যদি অপরাধের মাত্রা কমানোর জন্য জিহাদের পথ ছেড়ে অন্য পথ গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাকে তাহলে এ সিদ্ধান্ত ভুল হবে এবং অপরাধের মাত্রা কোন অংশেই কমানো যাবে না।

প্রতিটি ফরয দায়িত্ব যেহেতু ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত সেহেতু প্রত্যেকে তার ফরয দায়িত্ব আদায় না করার জবাব সে নিজেই দিতে

হবে। আর পথ ও পন্থা যখন সহজ হয়ে আসবে তখন ওযরের পরিধিও কমে আসবে। জিহাদের প্রশ্ন আসলেই সাধারণত আমীর, শক্তি ও ভূখণ্ড ইত্যাদি ওযর দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

এখন যদি এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, জিহাদ ছাড়া আরো অনেক সহজ পথেই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তাহলে একটি দেশে এত দীর্ঘ মেয়াদে এবং এত বড় বড় ব্যক্তিবর্গের পদচারণার মাঝেও যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং যুগের পর যুগ কুফরী আইনের অনুসরণ করে এত বড় একটি জনগোষ্ঠী তাদের জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে এ দায় দায়িত্ব কার উপর যাবে। কে কার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে। অপরাধ আখের সবার ঘাড়ে আসবে। সলফের উপরও আসবে খলফের উপরও আসবে। বড়র উপরও আসবে ছোটর উপরও আসবে। দলের উপরও আসবে ব্যক্তির উপরও আসবে। সজাগের উপরও আসবে গাফেলের উপরও আসবে। তুলনামূলক সজাগ ও সচেতনের বোঝা একটু বেশি ভারি হবে।

জরুরী টীকা : ২৪

“

শর্ত হচ্ছে আমরা আমাদের অনুভূতিহীনতা এবং বেখবরী অবস্থা থেকে উঠে আসতে হবে এবং এ ধারাটিকে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

জরুরী টীকা-২৪

শর্ত হচ্ছে আমরা আমাদের অনুভূতিহীনতা এবং বেখবরী অবস্থা থেকে উঠে আসতে হবে এবং এ ধারাটিকে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা এর আগেও বার বার বলে এসেছি যে, একটি মানবরচিত গণতান্ত্রিক পূর্ণাঙ্গ কুফরী সংবিধানের একটিমাত্র ধারা কাজে লাগানোর প্রতি সবাই গুরুত্ব দিলে এবং ধারাটি সম্পর্কে নিজেদের বেখবরী কাটিয়ে উঠলে একটি দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে -এমন দাবি মানতে ও বুঝতে আমাদের আরো সময় লাগবে। আমাদের মত ভাসা ভাসা মেধা ও অগভীর মেধার অধিকারীরা তা বুঝে উঠা সম্ভব হবে না।

আর যে গভীর মেধার অধিকারীগণ অনুধাবন করতে পারবেন তাদেরকে বেখবরের অপবাদে অভিযুক্ত করা কতটুকু উচিৎ হবে। সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেবেন না তা হতে পারে না। তাও শুধুমাত্র একটি ধারার প্রতি যে ধারার প্রতি খেয়াল করলেই দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

তাহলে হয়ত বলতে হবে সে দেশে গুরুত্বপূর্ণ গভীর জ্ঞানের কোন দ্বীনদার মানুষ নেই। অথবা বলতে হবে বিষয়টি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে এ সব কথার শেষ

কথা হচ্ছে, এ সব বিষয়ে আমরা ফিকহের ভাষা ব্যবহার করছি না। শরীয়তের সিদ্ধান্তমূলক ভাষা ব্যবহার করছি না।

এটি ইসলামী শরীয়াহ স্বীকৃত কোন শর্ত নয়

শায়খে মুহতারাম ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন, মুসলমানরা তাদের বেখবরী থেকে উঠে আসা এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া -এ দু'টি বিষয়কে। কিন্তু এসব শর্ত কুরআন কিতাব কর্তৃক প্রদত্ত কোন শর্ত নয়। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে এসব শর্তের কোন সম্পর্ক নেই। ফরয দায়িত্ব আদায় করা না করার ক্ষেত্রে এসব শর্তের কোন প্রভাব নেই।

পাঠকদের কেউ বলতে পারেন, শায়খে মুহতারাম এখানে শর্ত শব্দটিকে কিতাবের শর্তের অর্থে ব্যবহার করেননি। যদি বিষয়টি এমন হয়ে থাকে তাহলে এ বিষয়ে আমার নিবেদন হচ্ছে; **এক.** শরীয়তের কোন মাসআলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে কর্ণধার তো অবশ্যই এমনকি সাধারণ অনুসারীরাও ফিকহের ভাষাই ব্যবহার করতে হবে। একান্ত শরয়ী বিষয়ে বক্তব্যের ভাষা ও রসালো সাহিত্যের ভাষা মূল বিষয়কে তার গন্তব্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

দুই. শায়খে মুহতারাম তাঁর শর্ত শব্দটিকে যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন পাঠক কিন্তু শব্দটিকে হালকাভাবে নেয়নি এবং নিচ্ছে না। তাই পাঠকের অনুধাবন শক্তির প্রতি খেয়াল রাখাও কর্ণধারগণের দায়িত্বে পরে। পাঠকদের একটি বড় অংশ বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নিচ্ছে যে, গাফলত আর গুরুত্বহীনতা ছাড়া ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না হওয়ার পেছনে আর কোন কারণ নেই।

আরো এক ধাপ এগিয়ে আরেকটি পক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, গাফলত ও গুরুত্বহীনতা না কাটলে বা না কাটাতে পারলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়ন করা ফরয হবে না। অথবা বলছে, মুসলমানদের এখন ফরয দায়িত্ব হচ্ছে গাফলত ও গুরুত্বহীনতা কাটানোর পেছনে মেহনত করা। যুগের পর যুগ কর্ণধারগণ বা সচেতন ও সজাগ ব্যক্তিবর্গ সে কাজ করে যাবেন বা করে যেতে বলবেন। দায়িত্ব এখানেই শেষ। ফরয এখানেই থেমে যাবে।

যারা উঠে এসেছে তারাও পারেনি

কিন্তু ইতিহাস বলে, যে যুগটি শুধুমাত্র সচেতন ও সজাগদের যুগই ছিল সে যুগে ও সে সময়েও সজাগ ও সচেতন মানুষরা কাজটি করতে পারেননি। পাকিস্তান সংবিধানের বিশেষ ধারাটি সম্পর্কে শুধুই গাফলত ও গুরুত্বহীনতাকে যাঁরা দায়ী করছেন তারা দু'টি কথার একটি স্বীকার করতেই হবে। তৃতীয় কোন পথ এখানে খোলা নেই।

যে কথাটি আমরা বার বার বলে আসছি। হয়ত বলতে হবে, পাকিস্তানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে পাক ভূমি এক সঙ্গে ছয়/সাত জন সচেতন ও সজাগ মানুষ জন্ম দিতে পারেনি। অথবা এমন ছয়/সাত জন মানুষ পাকিস্তানের কিসমতে জোটেনি যাঁরা একমাত্র দ্বীনের স্বার্থে একমতের উপর আসতে পারেন।

অথবা বলতে হবে, এমন সচেতন মানুষ পাকিস্তানে জন্ম হয়ে থাকলে তাদের দৃষ্টিতে সংবিধানের সে কথিত ধারাটি কোন গুরুত্ব পায়নি। কথিত সে ধারাটি এমন কোন কার্যকারীতা, গুণ বা বিশেষত্বের অধিকারী ছিল না যা সমকালের সচেতন ও সজাগ মানুষদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারে।

অথবা কথাটিকে আরো সত্য করে বলতে চাইলে বলা যায় যে, সে কথিত ধারাটি সচেতন ও সজাগ মানুষদের সময়কালে কখনো একদম ছিল না, আবার কখনো ছিল। কিন্তু সেই 'ছিল' ও 'ছিল না'র মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। সে কথিত ধারাটি ছিল হাতির বহিঃবিভাগের দাঁতদু'টির মত। যা আছে বললেও সঠিক হবে এবং নেই বললেও সঠিক হবে।

কথিত সে ধারা সম্পর্কে আমার এ মন্তব্য যদি কারো কাছে খারাপ লাগে তাহলে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে যে, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মহামনীষীগণ এ ধারা সম্পর্কে অচেতন বা ঘুমন্ত ছিলেন। এখন এসে আমরা সজাগ ও সচেতন হওয়ার চেষ্টা করছি। কোনটি তুলনামূলক সহজ ও সহনীয় তা পাঠক ভেবে দেখবেন।

কুরআন সুন্নাহ এভাবে কথা বলে না

কুরআন সুন্নাহ এভাবে কথা বলে না। এখানে কয়েকটি পর্ব। অর্থাৎ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও শরয়ী আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি কয়েকটি

পর্বে বিন্যস্ত। যথাক্রমে: এর প্রতিষ্ঠা ফরয। এর পরিচালনা ফরযে কেফায়াহ, এর সমর্থন, আনুগত্য, প্রয়োজন অনুযায়ী সহযোগিতা ফরযে আইন। বিলুপ্ত ইসলামী হুকুমত পুনরুদ্ধার করা ফরয। পুনরুদ্ধার হওয়ার আগ পর্যন্ত সবার উপর ফরয। কিছু লোক মিলে বিলুপ্ত ইসলামী হুকুমত পুনরুদ্ধার করে ফেলতে পারলে অন্যদের উপর এ ফরয বাকি থাকবে না। এভাবে বিভিন্ন পর্বে এর ভাগ রয়েছে।

শর্ত হিসাবে ভূখণ্ডের অবস্থার বিশ্লেষন, ভূখণ্ডের অধিবাসীদের অবস্থার বিশ্লেষণ, ভূখণ্ডের পরিচালকদের অবস্থার বিশ্লেষণ, আমীর, শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচ্য হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে কুরআন হাদীসের ভাষা হচ্ছে এই-

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ {سورة النساء: ١٠٥}

"নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য-সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী হয়ো না।" -সূরা নিসা ১০৫

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ {سورة النساء: ٦٥}

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" -সূরা নিসা ৬৫

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ {سورة الأنفال: ٣٨-٣٩}

"তুমি বলে দাও, কাফেরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা (কুফর) শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।" -সূরা আনফাল ৩৮-৩৯

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ {سورة محمد: ٤}

"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।" -সূরা মুহাম্মদ ৪

মুসলমানরা, ওলামায়ে কেরাম, দ্বীনদার কাফেলা তাদের গাফলত থেকে উঠে আসার শর্ত, মানবরচিত সংবিধানের কথিত কোন এক বিশেষ ধারা সম্পর্কে অবগতির শর্ত, অনুভূতিহীনতা দূর করার শর্ত -ইত্যাদি কুরআন-হাদীস ও ফিকহের ভাষা নয়। এ ধরনের শব্দ ও ভাষা থেকে শ্রোতারা বোঝা সম্ভব নয় যে, তাদের করণীয় ফরয দায়িত্বগুলো কী। কোন বিষয়গুলো তারা ছাড়তে হবে এবং কোন বিষয়গুলো তারা গ্রহণ করতে হবে। গাফলত, বেখবরী ও অনভূতিহীনতা ইত্যাদি শব্দ থেকে ওলামায়ে

কেরামই তাঁদের দায়িত্ব স্পষ্ট করে বুঝে নিতে পারছেন না। সাধারণ মানুষ তাদের দায়িত্ব বুঝে নেবে কীভাবে?

শায়খে মুহতারাম হয়ত ফিকহের ভাষায় কোথাও এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেনও। কিন্তু যে মজলিসের বক্তব্য নিয়ে আমরা এখন পর্যালোচনা করে চলেছি সে মজলিসটি এমন একটি মজলিস যার বার্তা দেশের আনাচে কানাচে এমনকি বহিঃবিশ্বেও খুব সহজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া খুব স্বাভাবিক। এমনিভাবে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। বিশেষত তাগুত রাষ্ট্রযন্ত্রই এ কথাগুলোকে তাদের স্বার্থে খুব বেশি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় কথাগুলোর উপর পর্যালোচনা না করেও কোন উপায় নেই। তাই কথাগুলো শরীয়তের পরিভাষায় সামনে এলেই বেশি নিরাপদ হত।

কথা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ভাষায় হতে হবে

ঈমান, ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ, হারাম, কুফর ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের শব্দ ও পরিভাষা, হাদীসের শব্দ ও পরিভাষা, ফিকহের শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। মুসলমানের প্রতিটি অবস্থার ফিকহী তাকয়ীফ লাগবে। প্রতিটি অবস্থার ফিকহী সিদ্ধান্ত লাগবে। সে শব্দ ও পরিভাষাগুলোকে সচরাচর ব্যবহারে নিয়ে আসতে হবে। এতে করে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ইসলামের উৎসমূলের সঙ্গে দূরত্ব কমে আসবে।

যে কোন কারণেই হোক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমরা শরীয়তের উৎসমূলের সঙ্গে অনেক বেশি দূরত্ব সৃষ্টি করে ফেলেছি। শরীয়তের পরিভাষাগুলোকে প্রায় ভুলতে বসেছি। পরিভাষাগুলোর প্রয়োগক্ষেত্রগুলো হারিয়ে ফেলেছি।

পরিস্থিতি এখন এতদূর গড়িয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষার আলোকে কথা বললে শ্রোতারা অবাক হয়ে যায়। ফিকহের কিতাবের উদ্ধৃতি দিলে শ্রোতা হতবাক হয়ে যায়। কুরআনের আয়াত পড়ে শোনালে সন্দেহ করতে শুরু করে। হাদীসের উদ্ধৃতি দিলে ভিন্ন গ্রহের মানুষ মনে করতে থাকে। সবচাইতে উপাদেয় ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, যদি প্রথাগত কথা বলা হয়। সাধারণভাবে সাধারণের কাছে যা গৃহীত তাকেই সহীহ শুদ্ধ ভাবতে পছন্দ করে থাকে।

এমতাবস্থায় কর্ণধারগণের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, তাঁরা যেন শরীয়তের ভাষায় সিদ্ধান্তমূলক শব্দে ও পরিভাষায় কথা বলেন। সর্ব সাধারণের করণীয় ও বর্জনীয় বুঝে নিতে যেন সহযোগিতা করেন। ফিকহী পরিভাষায় সিদ্ধান্ত, দলিল, ইস্তিদলাল ও প্রয়োগ ক্ষেত্র বিশ্লেষণসহ কথা বললে পাঠক ও শ্রোতাদের কোন স্তরই পথ হারানোর কথা নয়। প্রত্যেক স্তর তার যোগ্যতার আওতায় যতটুকু আসে ততটুকু বুঝে নিতে পারবে।

সাধারণ মানুষ দলিলের পেঁচে পড়লে গোমরা হয়ে যাবে এমন ওযরে উম্মতকে আমরা যে পরিমাণ দলিলবিদ্বেষী বানিয়ে তুলেছি তার কি কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। দলিলের প্রতি বিদ্বেষের কারণে উম্মত যে পরিমাণ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে তা থেকে তাদেরকে ফেরানোর কোন পথ কি খোলা আছে। থেকে থাকলে সে পথে চলার অনুশীলন করা আমাদের জন্য কত পরিমাণ জরুরী! বিষয়গুলো আমাদের দৃষ্টিতে আসা দরকার।

জরুরী টীকা : ২৫

“

আমি সতের বছর শরয়ী আদালতের ....

”

জরুরী টীকা-২৫

আমি সতের বছর শরয়ী আদালতের ....

* যিনি একটি দেশকে দারুল ইসলাম মনে করেন তিনি সে দেশের মূল বিচার বিভাগ তাগুতী ও কুফরী আদালত নিয়ে চিন্তা না করে, তাগুতী ও কুফরী আদালতকে আপন অবস্থায় বহাল তবিয়তে চলতে দিয়ে নিজে গুটি কয়েক মানুষ নিয়ে শরয়ী বেঞ্চ নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। শরীয়তের পরিভাষায় একে কী বলা হয়? ইসলামের ইতিহাসে এর অস্তিত্ব ও প্রয়োগ পদ্ধতি কী ছিল? মানবরচিত কুফরী আইনের দেশে শরীয়া বেঞ্চের ধারণা কোন মূলনীতির আলোকে এসছে? এর ফিকহী তাকয়ীফ কী? এ বেঞ্চ একটি দেশকে দারুল হারব হিসাবে প্রমাণ করবে? না কি দারুল ইসলাম হিসাবে প্রমাণ করবে?

মূলত দ্বীন ও শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। এতে দেশের কোটি কোটি মুসলমানের দ্বীনী সমস্যার সমাধান হয়নি। দেশের মূলধারা শরীয়া ভিত্তিক হয়নি।

শরয়ী আদালত কাদের জন্য?

শায়খে মুহতারাম যে শরয়ী আদালতে বিচারপতি হিসাবে সতের বছর দায়িত্ব পালন করেছেন সে শরয়ী আদালত কাদের জন্য বানানো হয়েছে? যারা শরয়ীভাবে বিচার চাইবে তাদের জন্য? না কি সকল মুসলমানের জন্য? একটি দারুল ইসলামে যখন আদালত কায়েম করা হয় তখন

বিষয়টি এমন হয় না যে, মুসলমানরা চাইলে শরীয়া বেঞ্চের কাছে বিচার চাইবে, আর চাইলে গায়রে শরয়ী বেঞ্চের কাছে বিচার চাইবে। একটি দারুল ইসলামের আমীরুল মুমিনীন মুসলমানদেরকে ইসলামী আইন মানতে বাধ্য করতে পারবেন না। বাদির সুবিধা হলে সে শরয়ী আদালতে মামলা দায়ের করবে, সুবিধা হলে গায়রে শরয়ী আদালতে মামলা দায়ের করবে। বিবাদী সুবিধা হলে শরয়ী আদালতের বিচার মানবে, সুবিধা হলে গায়রে শরয়ী আদালতের বিচার মানবে। এসব তামাশা তো একটি দারুল ইসলামে হতে পারে না।

কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে কোন একটি আইন শরীয়ত বিরোধী মনে হলে সে তার বিরুদ্ধে আপিল করবে। কারো কাছে শরীয়ত বিরোধী মনে না হলে, বা মনে হয়েও কেউ আপিল না করলে এ বিষয়ে আদালতের ও বিচার বিভাগের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আদালাতের দায়িত্ব হচ্ছে, গণতান্ত্রিক কুফরী পদ্ধতিতে শত শত আইন করে যাওয়া, আর নিরীহ জনগণকে বলে রাখা যে, কোন আইন শরীয়ত বিরোধী মনে হলে আমাদের কাছে আসবে। আমরা গণতান্ত্রিক নিয়মে তার উপর গবেষণা করব।

দারুল ইসলামের এমন কোন কাঠামো দ্বীন ও শরীয়তের কিতাবে নেই। তাহলে শায়খে মুহতারাম যে শরয়ী আদালতের বিচারপতি ছিলেন সে শরয়ী আদালত কাদের জন্য এবং তা কেন?

আর যদি বলতে চান যে, শরীয়া বেঞ্চ হচ্ছে পুরা বিচার বিভাগের উপর নযরদারির জন্য তাহলে এ দাবির বিষয়ে আমাদের কথা আছে। সংবিধানের তফসীলে আমরা দেখেছি, পাকিস্তানের শরয়ী আদালত পাকিস্তানের গায়রে শরয়ী আদালতের উপর নযরদারীর কোন অধিকার রাখে না। এরই বিপরীত গায়রে শরয়ী আদালত শরীয়া বেঞ্চের সবকিছুর উপর তদারকি করার এবং উপদেশ ও নির্দেশনা দেয়ার অধিকার রাখে। এমনকি গায়রে শরয়ী বেঞ্চের মাধ্যমে আপিল করে শরীয়া বেঞ্চের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে বিলুপ্ত করতেও আমরা দেখেছি।

তাই এ কথা সহীহ নয় যে, শরীয়া আদালত দেশের কেন্দ্রীয় আদালতের উপর নযরদারী করে। সুতরাং সে প্রশ্নটিই থেকে যায় যে, এ শরীয়া আদালত কাদের জন্য? একই সঙ্গে প্রশ্ন আসবে কেন্দ্রীয় আদালত কাদের

জন্য? শায়খে মুহতারাম শরীয়া বেঞ্চ নামক একটি ক্ষুদ্র আদালতে সতের বছর দায়িত্ব পালন করে কেন্দ্রীয় আদালতের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিষয়গুলো আমাদের কাছে খুবই এলোমেলো মনে হচ্ছে। সংবিধানের বক্তব্য, শায়খের বক্তব্য, বিচার বিভাগে শরীয়াকে প্রবেশ করতে না দেয়া, মানব রচিত আইনের প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগে শায়খে মুহতারামের অংশগ্রহণ -এসবের পরস্পরে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় আদালত কাদের জন্য?

শরীয়ার ক্ষুদ্র বেঞ্চের বাইরে দেশের বৃহৎ আদালত কাদের জন্য? আমরা জানি দেশের মুসলমানরা সেখানে বিচারপ্রার্থী হয়, মানবরচিত কুফরী আইনে সেসব বিচার করা হয়, সেখানে বৃটিশ আইনের উদ্ধৃতি চলে, আমেরিকান আইনের উদ্ধৃতি চলে, ফ্রান্সের আইনের উদ্ধৃতি চলে। কিন্তু শরীয়াহ আইনের উদ্ধৃতি চলে না।

যারা শরীয়া বেঞ্চের শরণাপন্ন না হয়ে কুফরী আইনের শরণাপন্ন হয় তাদের বিষয়ে শায়খে মুহতারামের ফয়সালা কী? যারা গায়রে শরয়ী ও তাগুতের আদালতে বিচারপ্রার্থী হয় তাদের সম্পর্কে শায়খের ফয়সালা কী? শায়খে মুহতারাম তাঁর তাওযীহুল কুরআনে সূরা নিসার ৬০ নম্বর আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে কথাটি এভাবে বলেছেন-

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ {سورة النساء: ٦٠}

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" -সূরা নিসা ৬০

(۴۲) یہاں سے ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اصل میں دل سے تو یہودی تھے، مگر مسلمانوں کو دکھانے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جس معاملے میں ان کو توقع ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کا فیصلہ کریں گے، ان کا مقدمہ تو آپ کے پاس لے جاتے، لیکن جس مسئلے میں ان کو خیال ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کا خلاف ہو گا، وہ مقدمہ آپ کے بجائے کسی یہودی سردار کے پاس لے جاتے جسے اس آیت میں "طاغوت" کہا گیا ہے۔ منافقین کی طرف سے ایسے کئی واقعات پیش آئے تھے جو متعدد روایات میں منقول ہیں۔ "طاغوت" کے لفظی معنی ہیں "نہایت سرکش" لیکن یہ لفظ شیطان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر باطل کے لئے بھی۔ یہاں اس سے مراد وہ حاکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر یا ان کے خلاف فیصلہ کرے۔ آیت نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کسی اور قانون کو ترجیح دے تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ (توضیح القرآن ۱/۲۷۴)

"৪২. এ স্থলে সেই সকল মুনাফিকের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যারা মনে-প্রাণে ইয়াহুদী ছিল, কিন্তু মুসলিমদেরকে দেখানোর জন্য নিজেদেরকে মুসলিমরূপে জাহির করত। তাদের অবস্থা ছিল এ রকম- যে বিষয়ে তাদের মনে হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুকূলে রায় দেবেন, সে বিষয়ের মোকদ্দমা তাঁর কাছেই পেশ করত, কিন্তু যে বিষয়ে তাঁর রায় তাদের প্রতিকূলে যাবে বলে মনে করত, সে বিষয়ের মোকদ্দমা তাঁর পরিবর্তে কোন ইয়াহুদী নেতার কাছে নিয়ে

যেত, যাকে আয়াতে 'তাগূত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের তরফ থেকে এরূপ বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। 'তাগূত' -এর শাব্দিক অর্থ 'ঘোর অবাধ্য'। কিন্তু এ শব্দটি শয়তানের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং বাতিল ও মিথ্যার জন্যও। এস্থলে শব্দটি দ্বারা এমন বিচারক ও শাসককে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলী থেকে বিমুখ হয়ে অথবা সেগুলোর বিপরীতে ফয়সালা করে। আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিধানাবলীর উপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে মুসলিম থাকতে পারে না। তাওযীহুল কুরআন ১/২৭৪

এ বক্তব্যের ফলাফল হিসাবে আমরা বলতে পারি, পাকিস্তানের বিচার বিভাগ হচ্ছে তাগুত। পাকিস্তানের আইন পরিষদ হচ্ছে তাগুত। পাকিস্তানের শাসকবর্গ হচ্ছে তাগুত। আর এ তাগুতের কাছে যারা বিচারপ্রার্থী হবে তারা কাফের হয়ে যাবে।

পাকিস্তানে এমন ভয়ংকর বিচার বিভাগ কাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। শায়খে মুহতারাম সতের বছর যাবত যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার মাধ্যমে এ বিভাগের বিষয়ে কী চিন্তা ফিকির করেছেন। সে ভয়ংকর তাগুতের যে কুফরের সয়লাব প্রতিদিন পাকিস্তানকে ভাসিয়ে চলেছে সে বিষয়ে শরীয়া বেঞ্চ কী কী অবদান রেখেছে।

এ প্রসঙ্গে শায়খে মুহতারাম দুইশত মাসআলার কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে তিনি ইসলামী শরীয়ার আলোকে সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছেন। এ দুইশত মাসআলা প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে আলোচনা করব, ইনশা-আল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে যে কথাটি বলে রাখতে চাই তা হচ্ছে, আমরা দেখতে চাই- শরীয়াহ বেঞ্চ তাগুতের আদালতকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে এবং একটি শতভাগ কুফরী আইন প্রণয়ন বিভাগ ও কুফরী আইন প্রয়োগ বিভাগকে শরীয়তের শিকলে কতটুকু বাঁধতে পেরেছে?

আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি, তাগুতের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও আইন প্রয়োগ বিভাগকে তার অবস্থান থেকে এক বিন্দু পরিমাণও সরানো যায়নি। শরীয়া বেঞ্চ তার পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারেনি। শরীয়া বেঞ্চ

তার নিজস্ব এমন কোন শক্তি তৈরি করতে পারেনি যা দিয়ে পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে আশ্বস্ত করা যায়। এমনকি শরীয়া বেঞ্চ যেসব কারনামার ফিরিস্তি দিয়ে থাকে তার অধিকাংশই প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আলোর মুখ দেখেনি। ছোট্ট ছোট্ট অজুহাতে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মারপ্যাঁচে সেসব আটকে যায়। অবশেষে শরীয়া বেঞ্চ মানবরচিত কুফরী আদালতেরই আজ্ঞাবহ হয়ে যায়। দেশের কোটি কোটি মানুষ সে মানবরচিত কুফরী আইনেরই শরণাপন্ন হয়। যা থেকে ফেরানোর মত কোন শক্তি সামর্থ্য শরীয়া বেঞ্চ সংরক্ষণ করে না।

অনেক দিনের জিজ্ঞাসা

তাই একটি প্রশ্ন করতে গিয়েও করতে পারি না। হিম্মতে কুলায় না। আজ সে প্রশ্নটি করে ফেলি। শায়খে মুহতারাম পাকিস্তানের মানবরচিত কুফরী সংবিধানের নিয়ন্ত্রনাধীন শরীয়া বেঞ্চ শিরোনামের একটি বিভাগের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং নিজের মূল্যবান জীবনের সতেরটি বছর সেখানে কাটিয়ে নিজের যিম্মাদারীর বোঝা হালকা করেছেন? না কি বোঝা ভারি করেছেন? তাঁর অধীনে পরিচালিত শরীয়া বেঞ্চ মানবরচিত কুফরী আইনে পরিচালিত কেন্দ্রীয় আদালতকে প্রভাবিত করতে পেরেছে? না কি সে আদালতের প্রভাবে শরীয়া বেঞ্চ প্রভাবিত হয়েছে? এ বিষয়গুলোর প্রতি একজন মুসলমান ও একজন তালিবুল ইলমের কৌতূহলকে বেয়াদবি মনে না করে কৌতূহল দূর করার ব্যবস্থা করলেই মুনাসিব হবে।

একটি দারুল ইসলামে শরয়ী আদালত ও শরয়ী বেঞ্চের ফর্মুলা কাদের উদ্ভাবন?

এর পেছনটাও একটু খতিয়ে দেখা দরকার। ইতিহাসের কোন পর্ব থেকে এ তামাশা শুরু হয়েছে তা বের করতে পারলে বিষয়টি সম্পর্কে জটিল কিছু বলা যেত। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের ইতিহাস মন্থন করলে দেখা যায়, এ দু'টি ধর্মের আবিষ্কারকরা তাদের মতবাদের ব্যাপক সমাদৃতির জন্য যে কৌশলগুলো গ্রহণ করেছে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, প্রত্যেক ধর্মের জন্য কিছু **'স্পেশাল অফার'**।

এর আগেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মদু'টি অন্যান্য ধর্মের সেসব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যায় না

যেসব বিষয়ের কারণে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতি ধারার উপর কোন আঁচড় লাগে না। যেমন একটি গণতান্ত্রিক দেশে 'ইসলামী আন্দোলন' করা যায়, কিন্তু 'ইসলামী শাসন' করা যায় না। আর সে কারণেই গণতন্ত্রের দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র অবৈধ।

ঠিক এ নীতি ধারার আলোকেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম তার শাসিত ভূখণ্ডের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তাদের ঝোঁক ও দুর্বলতাগুলোকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে থাকে। আর সে ভিত্তিতে তারা 'স্পেশাল অফারে'র আয়োজন করে থাকে। যেহেতু গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতিতে এ উদারতা আছে যে, অন্যান্য ধর্মের যে বিষয়গুলো গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতি ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, গণতন্ত্র বাস্তবায়নের পথে বাধা নয় সে বিষয়গুলোকে তারা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে থাকে। শুধু অনুমতিই দেয় না; বরং সে বিষয়গুলোকে স্পেশাল অফার হিসাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকে। এরফলে মতবাদদু'টি ধার্মিকদের কাছে আরো বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে, আরো বেশি সমাদৃতি লাভ করে।

এ নীতি ধারার আলোকেই মতবাদদু'টি মুসলমানদের ঈদ উদ্‌যাপন, হিন্দুদের পূজা উদ্‌যাপন থেকে শুরু করে সকল জাতি উপজাতির সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলোকে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রচার করে থাকে। এতে সকল ধর্মের অনুসারীরা মতবাদদু'টির প্রতি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মতবাদদু'টিকে তাদের ধর্মের জন্য আশীর্বাদ মনে করে থাকে। তারা কখনো অনুভব করতে পারে না যে, এরই মাধ্যমে সকল ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে শুধুমাত্র দু'টি ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম।

ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগুলো যেহেতু কোন ধর্মই নয় সেহেতু তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মের উপর থাকুক বা নতুন ধর্ম গ্রহণ করুক তাতে তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা তো বুঝতে হবে যে, অন্য কোন ধর্মের নিয়ন্ত্রণে ইসলামের অনুসরণ করার সম্ভাব্য কোন ব্যবস্থা নেই। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ইসলামকে যে গণ্ডির মধ্যে আটকে দেবে মুসলমানরা সে গণ্ডির মধ্যে ধর্মের অনুশীলন করবে এবং এর বাইরে ধর্মের নামও উচ্চারণ করবে না -এর নাম ইসলাম ধর্ম নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা তা করে চলেছে।

32

মুসলমানদেরকে যখন স্পেশাল অফার হিসাবে মুসলিম পার্সনাল ল' দেয়া হল তখন মুসলমান খুব খুশি হয়ে গেল। শুধু খুশি হয়নি; বরং এ প্রাপ্তি তাদের অনেক ত্যাগের ফসল -এমনটি ভাবতেই তারা পছন্দ করতে লাগল। মুসলমান ভাবার চেষ্টা করছে না যে, মুসলমানরা যেখানে পার্সনাল ল'র উপর চলতে হবে সে দেশটি কাদের। সে দেশে মুসলমানদের বসবাসের বৈধতা কী? তারা ভাবার চেষ্টা করেনি যে, এ পার্সনাল ল' ইসলামের সকল বিধিবিধানের শতকরা কতভাগ অনুশীলন করার অনুমতি দেবে। যতভাগ ইসলামী ল'র উপর চলার অনুমতি দেবে ততটুকুর উপর চললে সে ইসলাম ইসলাম হবে কি না? সে মুসলমান মুসলমান হবে কি না? তা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ হয়নি।

আসলে মুসলমান এখন শুধু কুফরের করুণা নিয়ে বাঁচতে চায়। খড়কুটা জড়িয়ে ধরে কোন রকম ভেসে থাকতে চায়। কোন একটা অবলম্বন বের করে শুধু এবং শুধুই বেঁচে থাকতে চায়। তাই এ প্রাপ্তিগুলোও আজ খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে প্রাপ্তিগুলোর অনুমতি দ্বীন ও শরীয়তের কিতাবাদিতে দেয়া হয়েনি।

সে একই ধারায় একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও দেশের আইন আদালত বিচার শতভাগ মানবরচিত কুফরী আইনের উপর থাকা সত্ত্বেও মুসলমান এ নিয়ে মহাখুশি যে, তাদেরকে শরীয়া বেঞ্চ তৈরি করার অনুমাতি দেয়া হয়েছে। মুসলমানরা তাদের ইসলামের কথা বলার জন্য একটি উইনডো খোলা রাখা হয়েছে। মুসলমানদের খুশিতে আর ধরে না। فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأَبْصَارِ।

এটি বৃটিশ শাসিত দারুল ইসলাম

বৃটিশ সরকার মুসলমানদেরকে এ সুযোগটি দিয়েছিল। পার্সনাল ল', শরীয়া বেঞ্চ, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা -এসবই বৃটিশ সরকার দিয়েছিল। বৃটিশ সরকারের সমস্যা ছিল শুধুমাত্র সেসব লোকদেরকে নিয়ে যারা অস্ত্রধারণ করার কথা বলেছিল এবং যারা অস্ত্রধারণ করেছিল।

বৃটিশের শরীয়া আদালত মুসলমানদের জন্য এতটাই উন্মুক্ত ছিল যে, হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা গায়রে মুকাল্লিদদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

করতে পারত। দেওবন্দীরা বেরেলভীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারত। লা মাযহাবীরা দেওবন্দী ও বেরেলভীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারত। আবার শরীয়তের কিতাবের আলোকে সেসব মামলার নিষ্পত্তিও হত।

বৃটিশ সরকারের এতসব ভালো ভালো অবদানের কারণে বৃটিশ ভারত ছিল দারুল ইসলাম। গায়রে মুকাল্লিদদের রাহবার মাওলানা সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন বটালবী ও অহমদ রেজা খান বেরেলভীপ্রমুখ এমন ফাতওয়া দিয়েছিলেন।

আমরা তাদের বিরোধিতা করেছি। কারণ আমাদের কুরআন, আমাদের হাদীস, আমাদের ফিকহ এবং আমাদের সলফ বলেছেন, এতকিছু থাকার পরও তা দারুল হারব। কুফরী শক্তির করুণায় দ্বীনের কিছু বিধিবিধান পালন করতে পারলে এর দ্বারা একটি ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হতে পারে না। দারুল ইসলাম হতে হলে দেশটি ইসলামী আইনের অধীনে পরিচালিত হতে হয়। আইন প্রণয়নের উৎস কুরআন ও হাদীস হতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিবেচনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে হয়।

সুতরাং যাদের দৃষ্টিতে বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম ছিল তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলো দারুল ইসলাম হতে কোন বাধা নেই। আর যারা বৃটিশ ভারতকে দারুল হারব বলে বর্তমান পাকিস্তান বাংলাদেশের মত বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোকে দারুল ইসলাম বলতে চাইবেন তারা অবশ্যই এ দুয়ের মাঝে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে তা দেখিয়ে দেবেন।

আর এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে কি নেই তা বোঝার জন্য সব চাইতে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, তৎকালীন বৃটিশ আইন, বর্তমান বৃটিশ আইন, আমেরিকা-ফ্রান্সের আইন এবং বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশগুলোর আইনকে সামনে রেখে পার্থক্যগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা। এতে করে সিদ্ধান্তে পৌছা আশা করি আমাদের জন্য সহজ হবে। মিল অমিলের তালিকা আলাদা তৈরি করতে পারলে আরো সহজ হবে।

জরুরী টীকা : ২৬

“

যৌথ বেঞ্চ এবং সুপ্রিম কোর্টের শরয়ী ডেভেলপমেন্ট বেঞ্চে....

”

জরুরী টীকা-২৬

যৌথ বেঞ্চ এবং সুপ্রিম কোর্টের শরয়ী ডেভেলপমেন্ট বেঞ্চে....

**একটি দারুল ইসলামে আলাদা শরয়ী বেঞ্চের ধারণা শতভাগ ভুল। আলাদা শরয়ী বেঞ্চের অর্থই হচ্ছে, শরয়ী বেঞ্চের বাইরে মূল বেঞ্চ গায়রে শরয়ী ও তাগুতী-কুফরী। যে দেশের আদালতের মূল বেঞ্চ হচ্ছে তাগুতী ও কুফরী সে দেশের নাম কী? আমাদের রাহবারগণ মাসআলার এ অংশে প্রবেশ করার কোন আগ্রহ দেখান না। এর রহস্য স্পষ্ট নয়। একটি ক্ষুদ্র বেঞ্চ নিয়ে এতটা আগ্রহের কারণও বোধগম্য নয়।*

শরয়ী ডেভেলপমেন্ট বেঞ্চের ধারণা ইহুদী-খ্রিস্টানদের থেকে এসেছে

বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিষয়টি বার বার বলেই চলেছি। শায়খে মুহতারাম কথাটি বিভিন্নভাবে বলেই চলেছেন, তাই আমরা কোনভাবেই বিরত থাকতে পারছি না। পৃথিবীর ইতিহাস মন্থন করলে দেখা যায়, মুসলমানরাও পৃথিবীর বৃহৎ অংশ এক সঙ্গে শাসন করেছে, আবার কুফরী শক্তিও পৃথিবীর বৃহৎ অংশ এক সঙ্গে শাসন করেছে। এ দু'টি শাসনের মাঝে কিছু মৌলিক ব্যবধান রয়েছে।

কুফরী শাসনের ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ইহজাগতিক ভোগ এবং ইহজাগতিক আধিপত্য বিস্তারের স্বাদ। সে কারণে যে যে পদক্ষেপ নিলে ইহজাগতিক এ উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে ক্ষমতাসীন শাসক

সেসবই করে থাকে। তার শাসনাধীন অপরাপর জাতি গোষ্ঠীগুলোকে প্রয়োজনে কচুকাটা করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করে, আবার প্রয়োজনে তাদের আচার অনুষ্ঠান ও পূজা আর্চনাকে গলার মালা হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। সব কিছুর বিনিময়ে তারা শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চায়। ধর্ম নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কোন পক্ষেরই জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে তাদের কোন পেরেশানী নেই।

তাদের এ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ এভাবেও ঘটে যে, প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের লোকেরা যতটুকু সুযোগ সুবিধা পেলে ক্ষমতাসীনের আনুগত্য করবে ক্ষমতাসীন সে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা দিয়ে হলেও নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। কারণ সেখানে উদ্দেশ্যই হচ্ছে ক্ষমতা চালিয়ে যাওয়া। একই কারণে অধীনস্ত জাতি ধর্মগুলো তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুপাতে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

দূর অতীতের নমরূদ ফিরআ'উন থেকে শুরু করে কায়সার কিসরা হয়ে উপনিবেশিক বৃটিশ ও আমেরিকা রাশিয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষমতার অধিকারীর মাঝেই এ প্রবণতা দেখা গিয়েছে। তারা তাদের বিস্তৃত আধিপত্যের ভূমিতে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীকে তাদের চাহিদা ও রুচি মাফিক চলার অনুমতি দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট কোন নীতি ধারার অনুসরণ করেনি। যে জাতিকে যতটুকু দিয়ে বুঝ দেয়া গেছে ততটুকু দিয়েই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাসীনরা সেসব জাতি গোষ্ঠীর পরকালীন উন্নতির কোন পথ তাদেরকে দেখানোর প্রয়োজন বোধ করে না।

এরই বিপরীত ইসলাম যখন বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর উপর শাসন করেছে তখন তারা শরীয়ত কর্তৃক বাতলানো একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার উপর চলার চেষ্টা করেছে। সে ক্ষেত্রে শরীয়ত যে মৌলিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখেছে তা হচ্ছে, এক. অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে ইসলামের সত্যতা ও বড়ত্বকে তুলে ধরা। দুই. ইসলামের এ সত্য ও বড়ত্বের পথে এগিয়ে আসার জন্য জাতি গোষ্ঠীগুলোর সামনে ইসলামের দরজাকে উন্মুক্ত করে দেয়া।

এ দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অমুসলিমদেরকে পরিচালনা করার জন্য মুসলিম শাসককে ইসলাম কিছু নীতিমালা দিয়েছে, যে নীতিমালার

বিপরীত কিছু করার অধিকার কোন শাসকের নেই। কোন শাসক এর বিপরীত কিছু করার অর্থই হচ্ছে, সে ইসলামের মূল উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার চিন্তায় ব্যস্ত আছে।

ইসলামের এ নীতিমালার কারণে ইসলামী শাসনের অধীনস্ত জাতি গোষ্ঠীগুলো এক. মুসলমানদের সামনে হীনতার সাথে জীবন যাপন করা জরুরী। দুই. তারা কখনো মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। তিন. আবার ইসলামের নির্ধারিত নীতিমালার বাইরে চলার কোন অধিকারও কোন জাতি গোষ্ঠীর জন্য রাখা হয়নি।

ইসলামী শাসন ও অনৈসলামিক শাসনের মাঝে এ মৌলিক ব্যবধানগুলোর কারণে অনৈসলামিক শাসনে পার্সনাল ল' এর একটি ধারণা তৈরি হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী শাসনে পার্সনাল ল' শিরনামে কোন ল' রাখা হয়নি। এমনিভাবে কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর শক্তি সামর্থ্য হিসাবে আইনের কোন তারতম্য রাখা হয়নি। অধিকারের কোন তারতম্য রাখা হয়নি।

তাই দাবি করা যায় যে, কোন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে শরীয়াহ বেঞ্চ ও শরয়ী আদালতের ধারণা দু'টি মতবাদের আবিষ্কারকদের মাথা থেকেই এসেছে। আর তা এসেছে তাদের মতবাদকে সকল জাতি গোষ্ঠীর কাছে সমাদৃত করার জন্য। ইসলামের মৌলিক নীতি ধারার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, কোন মুসলমান কোন কারণে দারুল হারবে অবস্থান করলে তার চলার জন্য তো ইসলাম কিছু নীতিমালা দিয়েছে। সেগুলোকে আমরা ইসলামকর্তৃক প্রদত্ত মুসলিম পার্সনাল ল' বলতে পারি। সে হিসাবে মুসলিম পার্সনাল ল'কে ভিত্তিহীন বলা যায় না।

এ বিষয়ে আমার সংক্ষিপ্ত নিবেদন হচ্ছে, দারুল হারবে মুসলমানদের অবস্থানকালে ইসলাম যে নীতিমালা দিয়ে থাকে সেসব নীতিমালার মৌলিক দু'টি নীতি হচ্ছে ১. দারুল হারবে মুসলমানদের অবস্থানের বৈধতা সম্পর্কে শরীয়তের সিদ্ধান্ত এবং বৈধতার কারণগুলোর বিশ্লেষণ। ২. দারুল হারবে অবস্থানকারী মুসলমানদের উপর অর্পিত কাফেরদের বিরুদ্ধে করণীয় দায়িত্বসমূহ।

আমরা বর্তমানে যাকে মুসলিম পার্সনাল ল' বলে থাকি এবং যাঁরা এর জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে থাকেন তাঁদের আলোচনার মাঝে এ দু'টি নীতি

ও ধারার কোন উল্লেখ থাকে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষ এ দু'টি নীতি নিয়ে আলোচনাকে শুধু অপ্রাসঙ্গিকই মনে করা হয় না; বরং অবৈধ মনে করা হয়। এমতাবস্থায় দারুল হারবে অবস্থানকালে মুসলমানদের জন্য শরীয়তের কিতাবাদিতে যে নীতিমালা দেয়া হয়েছে তাকে বর্তমান ধারণা অনুযায়ী মুসলিম পার্সনাল ল' বলা অন্যায়।

দারুল ইসলামে শরয়ী-গায়রে শরয়ী দুই বেঞ্চের ধারণা কুফর

বিচার আদালতের জন্য ইসলাম ধর্মে ধর্মভিত্তিক আলাদা বেঞ্চের ধারণা নেই, বিষয়টি শুধু এতটুকুই নয়; বরং এটি একটি কুফরী ধ্যান ধারণা। একটি দারুল ইসলামে ইসলামের খলিফা ও আমীরুল মুমিনীন তার দেশের জনগণকে দুই ধারার যেকোন ধারায় মামলা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা রাখবেন -এর অর্থ হচ্ছে, দারুল ইসলামের শাসক একমাত্র ইসলাম ও শরীয়তকেই বিচার ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেনি। আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূলের বিধানকে একমাত্র বিধান হিসাবে মেনে নেয়নি।

যে দেশের নির্বাহী শক্তি তার দেশের জনগণের জন্য শরীয়া আইন ও মানবরচিত আইন উভয়ের ব্যবস্থা রাখবে সে নির্বাহী শক্তি মূলত কাফের ও মুরতাদ। নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে এমন রাষ্ট্রপরিচালক মুসলমান থাকা সম্ভব নয়।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ {سورة النساء: ٦٥}

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" - সূরা নিসা ৬৫

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ {سورة البقرة ٨٥}

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কেয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" -সূরা বাকারা ৮৫

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ {سورة الأنعام: ١٣٦}

"স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যে শষ্য উৎপাদন করেছেন ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, এ ব্যক্তিরা তারই এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে এবং নিজেদের খেয়াল খুশি মত বলে, এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্য, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের দেবতাদের জন্য। অতঃপর যা তাদের দেবতাদের জন্য রাখা তা কখনো আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছে না। যদিও আল্লাহর জন্য যা রাখা তা তাদের দেবতাদের কাছে গিয়েই পৌঁছে; কত নিকৃষ্ট তাদের এ বিচার।" -সূরা আনআম ১৩৬

باب قول الله تعالى {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون}

- ﴿حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك! فرفع يده فإذا فيها

آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد! فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة﴾ {البخارى : ١٣٣٠/٣}

"আল্লাহ তাআলার বাণী **يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون** অধ্যায়।

"... আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, তাদের এক নারী ও এক পুরষ যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, রজমের বিষয়ে তোমরা তাওরাতের মাঝে কী বিধান পাও? তারা বলল, আমরা তাদেরকে আপমান করে দেই এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। তাতে রজমের বিধান রয়েছে। তখন তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তাওরাত খুলল। খোলার পর তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়েছে এবং তার আগে ও পরে পড়েছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমার হাত সরাও। সে তার হাত সরাল। তখন দেখা গেল সেখানে রজমের আয়াত রয়েছে। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সঠিক বলেছে। তাওরাতে রজমের আয়াত রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে রজম করা হল। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, আমি দেখেছি, পুরুষ লোকটি ঝুঁকে ঝুঁকে মহিলাটিকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।" -সহীহ বুখারী।

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ

لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ {سورة المائدة: ٤١}

"হে রাসূল, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং যারা ইহুদী; মিথ্যা বলার জন্য তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।" -সূরা মায়েদা ৪১

﴿حدثنا يحي بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحي أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه و سلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟) قالوا: نعم! فدعا رجلا من علمائهم فقال: (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟) قال: لا! ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللّهُمَّ إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه) فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون

في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه} [٥ / المائدة / ٤١] يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [٥ / المائدة / ٤٤] {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [٥ / المائدة / ٤٥] {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [٥ / المائدة / ٤٧] في الكفار كلها﴾ {مسلم :رقم الحديث: ١٧٠٠- ١٢٢/٥}

"... বারা ইবনে আযিব রা. বলেন, এক ইহুদীর চেহারায় কালি মেখে বেত্রাঘাত করতে করতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এমনই পেয়েছ? তারা বলল, জি হাঁ। তখন তিনি তাদের দু'জন আলেমকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি মূসার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এটাই পাও? তারা বলল, না। যদি তুমি এ কসম না দিতে তাহলে আমরা তোমাকে বলতাম না। আমরা যিনার শাস্তি রজমই পাই। কিন্তু আমাদের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের মাঝে যখন এ অপরাধ বেড়ে গেল তখন আমরা মান্যগণ্যদেরকে ধরতে পারলে ছেড়ে দিতাম এবং দুর্বলদেরকে ধরতে পারলে শাস্তি দিতাম। এরপর আমরা পরামর্শ করলাম যে, চল আমরা কোন একটা সিদ্ধান্তের উপর একমত হয়ে যাই, যা আমরা সবল দুর্বল সবার উপর প্রয়োগ করতে পারব। তখন আমরা চেহারায় চুনকালী মাখা এবং বেত্রাঘাতের উপর একমত হয়েছি। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তোমার যে বিধানকে এরা দাফন করে ফেলেছিল সে বিধানকে আমিই সর্ব প্রথম যিন্দা করেছি। এরপর তার ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং তাকে রজম করা হল। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন يا أيها الرسول لا يحزنك الذين

يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه। তারা বলে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। সে যদি কালি মাখানো ও বেত্রাঘাতের আদেশ দেয় তাহলে তা গ্রহণ কর, আর যদি রজমের আদেশ করে তাহলে তাকে বর্জন কর। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [٥ / المائدة / ٤٤] {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [٥ / المائدة / ٤٥] {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [٥ / المائدة / ٤٧] নাযিল করেন যার সব কাফেরদের ব্যাপারে। -সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ।

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতা?

আর ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে, যে ধর্মে শুধুমাত্র একটি ধর্মের নীতিমালার উপর চলতে হয় না। মানুষকে যে দিন এ কথার উপর আনা যাবে এবং এ বিশ্বাসের উপর স্থির করা যাবে যে, পরকালে সফলতার জন্য পৃথিবীতে প্রচলিত হাজার হাজার ধর্মের যে কোন একটির অনুসরণ করাই যথেষ্ট, যে দিন এ কথার উপর আনা যাবে যে, কোন ধর্ম কোন ধর্মকে ঘৃণা করবে না; বরং প্রত্যেক ধর্ম অপর সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে, অপর ধর্মের বিশ্বাসগুলোকে শ্রদ্ধা করবে বিশ্বাসের এ স্তরে আসার পরই ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করবে।

কিন্তু ইসলাম বলে, এ বিশ্বাসটাই কুফর। এ বিশ্বাস থেকে বের হয়ে আসার আগে কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না এবং পরকালে সফলতা লাভ করতে পারে না। কারণ ইসলাম ব্যতীত অন্যসব ধর্ম ধর্মই নয়। এগুলো মানুষের বানানো কিছু মিথ্যা কথা, কাজ ও বিশ্বাস।

অতএব যে দেশ

অতএব যে দেশের মালিক পক্ষ এ কথা মনে করে যে, বিচার ব্যবস্থা দুই রকম চলতে পারে। মানবরচিত আইনেও চলতে পারে এবং শরয়ী আইনেও চলতে পারে সে দেশের মালিক পক্ষ মুসলমান নয়। বিচার ব্যবস্থার এ দুই নীতির কারণেই সে মুরতাদ হয়ে যাবে। শরীয়া বেঞ্চ শিরোনামে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেও সে মুসলমান হতে পারবে না।

এ পর্যায়ে আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কেউ যদি মনে করে থাকে যে, পাকিস্তানের শরীয়া বেঞ্চ বিচার বিভাগের শুধুই একটি শাখা নয়; বরং এটি পাকিস্তানের পুরো বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রক। শরীয়া বেঞ্চ পাকিস্তানের উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালত পর্যন্ত বিচার বিভাগের প্রতিটি শাখা প্রশাখাকে শরীয়া আইনের আলোকে পরিচালিত করে থাকে। যদি কেউ এমন ভেবে থাকে তাহলে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে। পাকিস্তান শরীয়া বেঞ্চের শিরোনাম যাই হোক, তার হাকীকতটা এরকম নয়। পাকিস্তান সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ তুলে ধরে ধরে বিষয়টি আমরা বার বার স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। কথাগুলো এখানে আবার উল্লেখ করতে চাই না।

জরুরী টীকা : ২৭

“

... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।

”

জরুরী টীকা-২৭

... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।

**দুইশত জুযঈ-শাখাগত মাসআলার তালিকা তৈরি না করে কুল্লী মাসআলা-মূলনীতি পরিবর্তনের সুপারিশ করে দিলে কোন মাসআলাই বাদ পড়ার সুযোগ ছিল না। মূলনীতিতে হাত দেয়ার মাঝে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সে দিক থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নেয়ার অসুবিধা অনেক। যার কিছু কিছু লোমহর্ষকও।*

মূলনীতিতে হাত না দিয়ে শাখাগত মাসআলার তালিকা তৈরি করার মৌলিক সমস্যা দু'টি। এক. মানবরচিত আইনের বিশাল সমুদ্র থেকে ইসলামী শরীয়া বিরোধী আইনগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে উপড়ে ফেলে দেয়া একটি অসম্ভব বিষয়। বিশেষত যখন মানবরচিত আইনের স্রোতের মুখে বাঁধ দেয়া হয়নি। দুই. শরীয়া বিরোধী আইন প্রণয়ন হচ্ছে কুফর। সে কুফরীর উপর আঘাত না করার অর্থ হচ্ছে তাকে যেভাবে আছে সেভাবে চলতে দেয়া। আর মূল কুফরী নীতিকে আপন অবস্থায় চলতে দিয়ে বা আঘাত না করে তার শাখাগত সম্পাদনা করে কুফরের ইসলামাইজেশন একটি অসম্ভব বিষয়। আর এ সত্যটি আমরা পাকিস্তানের দীর্ঘ জীবনে দেখেছি।

দুইশত মাসআলার তালিকা

দুইশত মাসআলার তালিকা আমরা এখনো পাইনি। পেলে কথা বলতে আরেকটু সুবিধা হত। এ কাজটিকে শায়খে মুহতারামের একটি বিশাল অবদান হিসাবে স্বীকার করার পর আমরা যে নিবেদনগুলো করতে চাই তা হচ্ছে:

এক. কুরআন হাদীস বিরোধী দুইশত আইন যারা তৈরি করেছে তারা তা জেনে শুনে করেছে? নাকি তাদের অজান্তে তা হয়েছে?

দুই. কুরআন হাদীস বিরোধী দুইশত আইন প্রণয়নের পর থেকে সেগুলোর প্রায়োগিক বয়স কত যুগ? এ দীর্ঘকাল পর্যন্তই কি এসব আইন প্রণয়নকারীরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিল যে, এগুলো কুরআন হাদীস বিরোধী?

তিন. যে আইন প্রণয়ন বিভাগের তিনশত সদস্যের কেউ জানে না যে, তাদের তৈরিকৃত আইনের দুইশত আইন কুরআন হাদীস বিরোধী সে আইন প্রণয়ন পরিষদ মুসলমানদের সমন্বয়ে তৈরি পরিষদ? না কি অমুসলিমদের সমন্বয়ে তৈরি পরিষদ?

চার. যদি আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্যরা জেনে শুনে কুরআন হাদীস বিরোধী দুইশত অইন প্রণয়ন করে থাকে এবং সে আইনগুলো প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদন করে থাকে তাহলে এ সদস্যরা মুসলমান না কি কাফের?

পাঁচ. কুরআন হাদীস বিরোধী আইনগুলো যত যুগ যাবত অনুমোদিত হয়ে হয়ে প্রয়োগ হয়েছে তত যুগের সকল অনুমোদকারীদের ঈমান কুফরের হুকুম একই হবে? না কি ভিন্ন হবে? যদি ভিন্ন হয়ে থাকে তাহলে কেন?

ছয়. আর যদি কুরআন হাদীস বিরোধী আইনগুলোর সব অনুমোদনকারীদের হুকুম একই হয়ে থাকে তাহলে এত যুগ যাবত দেশটি কাদের অধীনে পরিচালিত হয়েছে? এবং সে কারণে তাদের অধীনে পরিচালিত দেশটি দারুল ইসলাম ছিল? না কি দারুল হারব ছিল?

এসব বিষয়ে কথা বলার দায়িত্ব কার? আমাদের এ নিবেদনগুলো বিবেচনায় নেয়া হবে বলে আশা করছি।

যে মাসআলাগুলো তালিকায় আসার সুযোগ পায়নি

একটি দেশের সংবিধান ও আইন তৈরির মূল ভিত্তি যখন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম হয় তখন তার হাতে গোনা কিছু আইনকে শরীয়ত বিরোধী বলার অর্থ হচ্ছে বাকি অসংখ্য আইনকে শরীয়ত সমর্থিত মনে করা। অথবা আরো সহজ ভাষায় বলা যায়, হাতে গোনা কিছু আইন ব্যতীত বাকি আইনগুলো কমপক্ষে শরীয়তবিরোধী নয়। অথচ একটি সংবিধান ও আইনের মূল উৎস যখন শরীয়ত না হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে হয় তখন তার সকল আইনই শরীয়ত বিরোধী হয়।

এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত যদি শরীয়তের কোন সিদ্ধান্তের হুবহুও হয় তবু তাদের সে সিদ্ধান্তটি শরীয়ত বিরোধী বলেই বিবেচিত হবে এবং তা কোন প্রকার সমর্থন পাওয়ার অধিকার রাখে না। কারণ শরীয়তের মত সিদ্ধান্তটি শরীয়ত থেকে নেয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই যখন তখন এ সিদ্ধান্ত শরীয়ত বিরোধী সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা বা তার প্রসংশা করার অর্থই হচ্ছে, শরীয়তকে আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটকে আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া। আর যেহেতু গণতন্ত্রই এ আইনের মূল উৎস, শরীয়ত নয় সে কারণে শরীয়ত বিরোধী যে সিদ্ধান্তগুলো তালিকার একেবারে শুরুতে থাকার কথা ছিল সেগুলো তালিকাতে স্থানই পায়নি। সে সিদ্ধান্তগুলো শরীয়া বেঞ্চের অগোচরে আপন গতিতে চলছেই। উদাহরণস্বরূপ সে ধরনের কয়েকটি বিষয় এখানে তুলে ধরছি:

১. দারুল ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান নারী হতে পারে না। (শায়খে মুহতারাম যথাক্রমে: কেন্দ্রীয় শরীয়াহ আদালত ১৯৮০-১৯৮২, শরীয়াহ আপিল বেঞ্চ ১৯৮২-২০০২ বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বেনজির ভুট্টোর সময়কাল যথাক্রমে: ১৯৮৬-১৯৯০ এবং ১৯৯৩-১৯৯৬।) শায়খে মুহতারাম শরীয়া বেঞ্চে বিচারপতি থাকা কালেই একজন মহিলা বেনজির ভুট্টো রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দীর্ঘ সময়ব্যাপী দায়িত্ব পালন করে গেছে।

এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী এ অবস্থানের বিরুদ্ধে শরীয়া বেঞ্চের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আপত্তি, রায় ও প্রায়োগিক পদক্ষেপ

গ্রহণ করা হয়েছে এমন কোন আলামত আমাদের কাছে নেই। অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: *... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

২. দারুল ইসলামের বিচারপতি অমুসলিম হতে পারে না। পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে যেকোন পর্যায়ের যেকোন বিচারপতি অমুসলিম হতে পারবে। পাকিস্তান আইনে এর বৈধতা দেয়া আছে এবং যুগের পর যুগ তা চলে আসছে। শায়খে মুহতারাম শরীয়া বেঞ্চের বিচারপতি থাকা অবস্থায়, তার আগে এবং তার পরেও এ আইন বহাল তবিয়তে চলে আসছে। শরীয়া বেঞ্চের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি, রায় ও প্রায়োগিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: *... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

বরং বিপরীত কারগুজারী আমাদের কাছে আছে। বহু অমুসলিম পাকিস্তানের বিচারের চেয়ারে বসে মুসলমানদের বিচার করেছে। হিন্দু নারী পাকিস্তানের বিচারের চেয়ারে বসে মুসলামনদের বিচার করেছে এবং করছে।

৩. দারুল ইসলামের শরয়ী সিদ্ধান্ত গায়রে শরয়ী আদালতের কাছে জবাবদিহী করতে পারে না।

একটি দারুল ইসলামে বিচারপতি তার প্রদত্ত রায়ের বিষয়ে শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। ভুল করলে তা কুরআন হাদীসের কষ্টিপাথরেই মাপা হবে। অপর কোন সিদ্ধান্তের বিপরীত হলেও কুরআন হাদীসের আলোকেই তা নিরূপণ করা হবে।

কুরআনে হাদীসে হুকুম এভাবেই এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ {سورة النساء: ٥٩}

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলূল আম্র' তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" -সূরা নিসা ৫৯

কিন্তু পাকিস্তান সংবিধানে শরীয়া বেঞ্চকে মানবরচিত আইনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয়েছে। পাকিস্তান আইনকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, শরীয়া বিভাগের যিম্মাদারগণ তাদের রায় ও সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে হলে গায়রে শরয়ী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। মানব রচিত আইনে পরিচালিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আদালতকে এড়িয়ে শরীয়া বেঞ্চ কোন কিছুই করার অধিকার রাখে না।

শরীয়া আদালত তার জন্ম থেকে এ ধারার উপরই চলে আসছে। শায়খে মুহতারাম বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় আদালত এ ধারার উপরই চলেছে, পরবর্তিতেও এভাবেই চলেছে। শরীয়া বেঞ্চের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি, রায় বা প্রায়োগিক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: *... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

৪. দারুল ইসলামে বিচারপতির কুরআন সুন্নাহভিত্তিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

একটি ইসলামভিত্তিক দেশের বিচার বিভাগে বিচারপতি যখন কুরআন হাদীসের দলিল দিয়ে কোন একটি সিদ্ধান্ত দেবেন তখন তা প্রয়োগ না হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিচারপতির সিদ্ধান্ত সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। ১. মানসূস আলাইহি। ২. মুজতাহাদ ফীহি। প্রথম প্রকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের বিপরীতে কোন রায় দেয়ারও সুযোগ নেই এবং তা প্রয়োগ না করারও কোন সুযোগ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের বিপরীতে সমপর্যায়ের শক্তিশালী বা তার চাইতে বেশি শক্তিশালী ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় দেয়া যায় এবং দ্বিতীয় রায়ের ভিত্তিতে প্রথম রায় প্রয়োগ না করে দ্বিতীয় রায় প্রয়োগ করা যায়। সর্বাবস্থায় এসকল সিদ্ধান্ত শরয়ী উসূলের আলোকেই হতে হবে।

পাকিস্তান বিচার বিভাগের ইতিহাসে দেখা গেছে, কুরআন হাদীসের সরাসরি দলিলের আলোকে গৃহীত শরীয়া বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করতে দেয়া হয়নি। এসব কিছু ঘটেছে শায়খে মুহতারাম বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা অবস্থায়। যেসব আইনের ভিত্তিতে শরীয়তের অকাট্য সিদ্ধান্তকে অকার্যকর করে দেয়া যায় সেসব আইনের বিরুদ্ধে শরীয়া বেঞ্চ কোন আপত্তি করেনি, কোন রায় দেয়নি এবং প্রায়োগিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: *... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকুক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

৫. দারুল ইসলামে শরয়ী আদালতের বাইরে কোন আদালতের অস্তিত্বের বৈধতা নেই।

ইসলাম শাসিত একটি দারুল ইসলামের বিচার বিভাগ ও আদালত হবে শতভাগ শরীয়া ভিত্তিক। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত আইনের বাইরে কোন আইন ও বিচারের কোন অস্তিত্ব দারুল ইসলামে

থাকা সম্ভব নয়। এর কোন বৈধতা নেই। বরং পূর্বে বলা হয়েছে যে, শরীয়া আইনের সঙ্গে অন্য কোন আইনকে বিচারিক ক্ষমতা দেয়া কুফর।

পাকিস্তান সংবিধানে ও পাকিস্তান আইনে শরয়ী আইনের বাইরে মানবরচিত আইনকে বিচারিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। শুধু বিচারিক ক্ষমতা দেয়া হয়নি; বরং দেশের শতকরা নিরানব্বই ভাগ বিচার সে আইনের অধীনেই সম্পন্ন হচ্ছে এবং বিচারের মূল দায়িত্ব ও ক্ষমতা শরীয়াকে না দিয়ে মানবরচিত আইনকে দেয়া হয়েছে।

শায়খে মুহতারাম বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সময়ে এ সকল প্রক্রিয়া চালু ছিল, তার আগেও চালু ছিল, এখনও সেভাবেই বহাল আছে। কিন্তু শরীয়া বেঞ্চের পক্ষ থেকে এ কুফরী আদালতে বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করা হয়নি, কোন রায় দেয়া হয়নি এবং প্রায়োগিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: ... *দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

৬. দারুল ইসলামের মজলিসে শূরার সদস্য অমুসলিম হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

মুসলমানদের মজলিসে শূরা কাফের দ্বারা গঠিত হয় না। মুসলমানরা কাফেরদেরকে নিয়ে পরামর্শ করতে পারে না। মুসলমানদের একটি দেশ অমুসলিমের পরামর্শে চলতে পারে না। মুসলমানদের আইন ও নীতি ধারা তৈরির ক্ষেত্রে অমুসলিমের মতামত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মুসলমানদের একটি দেশে অমুসলিম নির্বাহী ক্ষমতার অংশীদার হতে পারে না।

পাকিস্তান-সংবিধান ও আইনে এসব কিছুরই উপস্থিতি আছে। অমুসলিম মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার আইন আছে। অমুসলিম নির্বাহী ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার আইন আছে। অমুসলিম মুসলমানদের জন্য আইন ও নীতিধারা তৈরি করতে পারবে বলে আইন আছে। এ আইনগুলো পাকিস্তান সংবিধানে ও আইনে যুগ যুগ ধরেই আছে।

শায়খে মুহতারাম যখন বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তখনও এসব আইন ছিল। এর আগেও ছিল। এখনো বহাল আছে। শরীয়া বেঞ্চের পক্ষ থেকে এ আইনের উপর কোন আপত্তি করা হয়নি। এর বিরুদ্ধে কোন রায় দেয়া হয়নি। এ আইনের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: *... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকুক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

৭. দারুল ইসলামের বিচারপতির সিদ্ধান্তের বিপরীতে রাষ্ট্রপ্রধান নিজ ক্ষমতাবলে কোন অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে না।

দারুল ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামী আদালতের বিচারপতির সামনে আসামী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বিচারপতি শরীয়তের আলোকে যে ফয়সালা দেবে তা সাধারণ জনগণ যেমন মানতে বাধ্য রাষ্ট্রপতিও মানতে বাধ্য। উম্মতের কোন অপরাধ খোদ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ক্ষমা করার অধিকার রাখতেন না।

বিপরীত বক্তব্য এভাবে এসেছে যে, নবীর কলিজার টুকরা ফাতেমাও যদি চুরি করে নবী তার হাত কেটে দিতে বাধ্য। নবীজীর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপর এতবড় চারিত্রিক অপবাদ দেয়া হয়েছে যারফলে নবীজীর উপর এক ভয়ংকর তুফান বয়ে গেছে। কিন্তু নবী হিসাবে ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিজে থেকে কিছু করার বা বলার অধিকার তাঁর হাতে ছিল না।

কিন্তু পাকিস্তান-সংবিধান ও আইনে রাষ্ট্রপ্রধানকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে চাইলে কোন প্রকার যুক্তি ও দলিল প্রমাণ ছাড়াই নিজ ক্ষমতাবলে বিচার বিভাগের যেকোন সিদ্ধান্তকে উল্টে দিতে পারবে। যে কোন অপরাধকে ক্ষমা করে দিতে পারবে। যে কোন শাস্তিকে মাওকূফ করে দিতে পারবে। বলা যায়, এ আইনের মাধ্যমে পাকিস্তান তার প্রেসিডেন্টকে বিধানদাতার আসনে আসীন করেছে। সে যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতা রাখে।

প্যাকিস্তান সংবিধানে ও আইনে এ আইন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর প্রয়োগ চলছে। শায়খে মুহতারাম যখন বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তখনও এ আইন বলবৎ ছিল, এর আগেও ছিল, এর পরেও আছে। শরীয়ত বিরোধী এ জঘন্য আইনের বিরুদ্ধে শরীয়া বেঞ্চের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আপত্তি করা হয়নি, কোন রায় দেয়া হয়নি এবং কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: *... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকূক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

৮. বিচারপ্রার্থীর প্রাপ্য রাষ্ট্রপ্রধান আসামীর পক্ষ নিয়ে ক্ষমা করতে পারে না।
শরীয়া আদালতে, কুরআনে ও হাদীসে রাষ্ট্রপ্রধানকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে চাইলে বিচারপ্রার্থীর প্রাপ্য আদায় করে দেয়ার জন্য বিবাদীকে বাধ্য না করে তাকে ক্ষমা করে দেবে। বান্দার হক বান্দাকে আদায় করে দিতেই হবে। খোদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও বান্দার হক ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন।

কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কেসাস অথবা দিয়াত আসবে। আর এ কেসাস ও দিয়াত হচ্ছে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের অধিকার ও তাদের প্রাপ্য। হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে, না কি তার কাছ থেকে দিয়াত নেয়া হবে তা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এখতিয়ার। অন্য কেউ চাইলে এ হত্যাকারীর কেসাসও মাফ করতে পারবে না, অথবা চাইলে তার দিয়াতও মাফ করতে পারবে না, অথবা চাইলে দিয়াতের পরিমাণ কমাতেও পারবে না। এটা একান্তই অভিভাবকের অধিকার। বিষয়গুলো শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এসব বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

কিন্তু পাকিস্তান-সংবিধান ও পাকিস্তান আইন সে দেশের প্রেসিডেন্টকে এ অধিকার দিয়ে রেখেছে যে, প্রেসিডেন্ট চাইলে আদালতের বিচার উল্টে দিয়ে কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ছাড়া নিজ ক্ষমতাবলে খুনের আসামীকে

ক্ষমা করে দেবে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের সকল ইচ্ছা ও এখতিয়ারকে উপেক্ষা করে খুনের দায় ক্ষমা করে দেবে। এক্ষেত্রে মূল বিচারপ্রার্থীকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই। এসব ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট খুনিকে প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার শক্তি রাখে।

পাকিস্তান সংবিধানে ও আইনে এ আইন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর প্রয়োগ চলছে। শায়খে মুহতারাম যখন শরীয়া বেঞ্চে বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তখনও এ আইন বলবৎ ছিল, এর আগেও ছিল, এর পরেও আছে। প্রেসিডেন্ট খুনের আসামীকে প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার শক্তি নিয়ে রাজত্ব করে যাচ্ছে। শরীয়ত বিরোধী এ জঘন্য আইনের বিরুদ্ধে শরীয়া বেঞ্চের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আপত্তি করা হয়নি, কোন রায় দেয়া হয়নি এবং কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অথবা আপত্তিও করা হয়েছে এবং পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে, কিন্তু আইন বদলানো হয়নি। আইন বদলানো হলে আমরা তা দেখতাম এবং তার ফল ভোগ করতাম। কারণ শায়খে মুহতারামের দাবি হচ্ছে: *... দু'শরও বেশি আইন ইসলামের আলোকে নিয়ে আসার জন্য হুকুক-সুপারিশ জারি করেছি এবং সে আলোকে আইন বদলানো হয়েছে।*

এ ধরনের আরো অসংখ্য আইন রয়েছে যেগুলোর বিষয়ে শায়খে মুহতারাম বা শায়খে মুহাতারামের শরীয়া বেঞ্চ কখনো কিছু করতে পারেনি। এ ধরনের অসংখ্যা আইনের বিরুদ্ধে সংবিধানের কথিত সে ধারা কোন কাজে আসেনি। এসব আইনের বিরুদ্ধে সে কথিত ধারাটা কোন কাজে আসবে বলে কেউ কখনো চিন্তা করেছে বলেও মনে হয় না। শরীয়ত বিরোধী এ আইনগুলো শরীয়া ভিত্তিক সংশোধনের তালিকায় না আসার কারণ কী?

সুযোগ না পাওয়ার কারণ

পাকিস্তান-সংবিধান ও আইনের শরীয়ত বিরোধী এ ধারাগুলো শরীয়া ভিত্তিক সংশোধনের তালিকায় না আসার কারণ খুব স্পষ্ট। কারণ দেশটি দারুল ইসলাম নয়। দেশ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। এ বিষয়গুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধানে স্থান পেয়েছে। যার উপর কুরআন সুন্নাহ দিয়ে আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই।

একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এ মতবাদের মালিকপক্ষ ধর্মীয় আবেগ নির্ভর আবেদন নিবেদনগুলোর ততটুকুই গ্রাহ্য করবে যতটুকুতে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের গায়ে কোন প্রকার আঁচড় না লাগবে। ধর্মের অনুসারীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে কথা বলতে দেবে যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের অনুসারীরা গণতন্ত্রের ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের বাতলে দেয়া গণ্ডিকে অতিক্রম করবে না।

ধর্মের অনুসারীরা যখনই তাদের বাতলানো গণ্ডি অতিক্রম করার মত আস্পর্ধা দেখাবে, ঔদ্ধত্য দেখাবে তখনই এ বেয়াদবির দায়ে ধার্মিকদের ঘাড় মটকে দেয়া হবে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে ঘাড় মটকে দেয়ার মত সকল ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের মালিক পক্ষের কাছে আছে।

শরীয়া বেঞ্চের বিচারপতিগণ পাকিস্তানের গণতন্ত্র সম্পর্কে ভালো করেই অবগত আছেন। শায়খে মুহতারাম দামাত বারাকাতুহুম গণতন্ত্রের হাকীকত সম্পর্কেও জানেন এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্র সম্পর্কেও জানেন। শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. ও যাফর আহমদ ওসমানী রহ. সহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা মহামনীষীগণ একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই একটি ভূখণ্ড তৈরি করেও যে গণতন্ত্রের জোয়ারের সামনে টিকতে পারেননি এবং এক মুহূর্তের জন্যও পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি -সে কথা শায়খে মুহতারাম জানেন।

শায়খে মুহতারাম এ কথাও জানেন যে, পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমতের স্বপ্নদ্রষ্টাগণ আজীবন এর জন্য কান্নাকাটি করে গেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের জোয়ারের সামনে ধর্মীয় আবেগ টিকেনি। টিকার কথা নয়।

আর এসব কথা জানার কারণেই শায়খে মুহতারাম অথবা পাকিস্তান শরীয়া বেঞ্চ কখনো পাকিস্তানের শরীয়ত বিরোধী এমন কোন আইন নিয়ে মাথা ঘামাননি যা পাকিস্তান গণতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাঁরা পাকিস্তানের এমন কোন আইন নিয়ে নাড়াচাড়া দেননি যা পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে আঘাত করতে পারে। পাকিস্তানের এমন কোন আইনে তাঁরা হাত দেয়ার চেষ্টা করেননি যেখানে হাত দিলে পাকিস্তান পরিচালনার মূলনীতি ধারাই উল্টে যেতে পারে।

এ বিষয়ে আপাতত কথা আর লম্বা করতে চাই না।

বদলানোর হাকীকত

বদলানো আইনগুলোর তালিকা আমরা পাইনি। কিন্তু পাকিস্তানের চলমান সংবিধান ও আইন থেকে আমরা যা পাই তার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, শায়খে মুহতারাম যেসব আইন বদলানোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার কিছু বাস্তবায়িত হয়নি, আর কিছু গণতান্ত্রিক ধারার কোন সমস্যা করেনি বলে বদলানো হয়েছে। এমন কিছু ক্ষেত্রে বদলানো হয়েছে যে বদলানোর দ্বারা গণতান্ত্রিক সংবিধানের কোথাও কোন আঁচড় লাগেনি।

মোটকথা, শায়খে মুহতারাম শরীয়ত বিরোধী যে দুইশত আইন বদলানোর কথা বলেছেন সে দুইশত মাসআলা কয়েক ভাগে বিভক্ত হতে পারে। এক. দুইশত মাসআলার একটি বড় অংশই এমন যা বাস্তব ময়দানে প্রয়োগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি। দুই. একটি বড় অংশ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের বিভিন্ন মার প্যাঁচে খারিজ করে দেয়া হয়েছে। তিন. একটি বড় অংশ রয়েছে এমন যার সঙ্গে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের কোন সংঘর্ষ নেই। চার. একটি অংশ রয়েছে এমন যেগুলোর সামান্য আ-কার ই-কার ঠিক করে শরীয়ত সম্মত করা যায়, আবার সামান্য পরিবর্তন করলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ সম্মত হয়ে যায়। অথবা বলা যায়, যেগুলো বদলানোর ক্ষেত্রে কুরআন হাদীস তথা শরীয়তের উদ্ধৃতি দিতে হয় না; বরং গণতন্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়েই বদলানো যায়।

যাইহোক, মৌলিক দু'টি কুফরী তন্ত্র তথা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এ দু'টি মতবাদের বিরুদ্ধে শরীয়া বেঞ্চ ও শায়খে মুহতারাম কোন আপত্তি করেননি, এর বিরুদ্ধে কোন রায় দেননি, এর বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। অতএব গুরুত্বপূর্ণ আর কোথাও এ বেঞ্চ হাত দেবে এমনটি আশা করা যায় না।

জরুরী টীকা : ২৮

“

...কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের দ্বীনী মহলগুলোর পক্ষ থেকে এ ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য কোন আবেদন পেশ করা হয়নি।

”

জরুরী টীকা-২৮

...কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের দ্বীনী মহলগুলোর পক্ষ থেকে এ ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য কোন আবেদন পেশ করা হয়নি।

** দ্বীনী মহল যদি দলিল প্রমাণের আলোকে তাদের মূল দায়িত্ব বুঝে নেয়ার কারণে এ ধারাটি কাজে না লাগিয়ে থাকে তা হলে তাদের কোন প্রকার দোষ দেয়ার কোন সুযোগ নেই। আর যদি দলিলের আলোকে না করে থাকে তা হলে আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, তাদেরকে দলিলের আলোকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ আবেদন করা মুসলমানদের শরয়ী দায়িত্ব। ব্যক্তিকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু দলিলকে এড়িয়ে যাওয়ার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি।*

দলিলকে কেউ না মানলে, নির্ধারিত ফরয দায়িত্বকে কেউ এড়িয়ে গেলে, শরীয়তের নির্ধারিত বিধানকে কেউ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করলে তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা আছে। দাওয়াত একবার দিতে হয়, তালীম একবার দিতে হয়, তাযকীর দু'চার বার করা যায়। এর পরই শরয়ী আইনে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একই বিষয়ে একই ব্যক্তিকে শত বার হাজার বার দাওয়াত, তালীম, তাযকীর করা শরীয়া আইনের আওতায় আসে না।

কিন্তু আমরা শরীয়তের কোন বিষয়কেই শরয়ী মানদণ্ডে মাপতে পছন্দ করি না। যারফলে আবেগ ও অনুযোগের সুরে শরয়ী বিধানগুলো বলে থাকি। অথবা বলা যায়, শরয়ী মাপকাঠিতে বিষয়গুলোর শরয়ী সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। অথবা বলা যায়, আমাদের কাছে বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা স্পষ্ট করে বলতে আমরা আগ্রহ বোধ করি না। কেন আগ্রহ বোধ করি না তা প্রত্যেকে নিজের অবস্থা ও কারণ ভালো বলতে পারবেন।

এটি আবেদনের বিষয় নয়

শায়খে মুহতারাম যে আফসোস করছেন এবং অনুযোগ করে বলেছেন, দ্বীনী মহলগুলোর পক্ষ থেকে কথিত সে ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য আবেদন করা হয়নি -এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এটি অবেদনের কোন বিষয় নয়। এ বিষয়টিকে এর আগেও আমরা বিশ্লেষণ করেছি। এখানেও আরো দু'য়েকটি কথা বলি।

এক. এ কথিত ধারাটি যদি বাস্তবিকই অর্থবহ কোন ধারা হয়ে থাকে তাহলে তা কারো কোন আবেদনের অপেক্ষায় থাকার কোন সুযোগ নেই। শরীয়ত বিরোধী আইনগুলো প্রয়োগ করে যারা অপরাধটি করে যাচ্ছে তাদের শাস্তি হবে আগে। শরীয়তের বিধান প্রথমে তাদেরকেই গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে।

দুই. ক্ষমতাসীনের দাপটে ও জনগণের সহযোগিতায় প্রতিদিন দ্বীন ও শরীয়তের শত শত ও হাজার হাজার বিধানকে জবাই করা হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের আইনকে জবাই করে করে প্রতিদিন আল্লাহদ্রোহিতার উৎসব করা হচ্ছে। এমন একটি বিষয়ে শুধু 'আফসোস' শব্দের ব্যবহার খুবই বেমানান। আর 'আফসোস' শব্দ ব্যবহার পর্যন্ত ক্ষান্ত করে দায়িত্ব আদায়ের কোন সুযোগ নেই। দ্বীন ও শরীয়ত এতটা অসহায় নয়।

তিন. শায়খে মুহতারাম এ বিষয়ে দ্বীনী মহলকে দায়ী করেছেন। দ্বীনী মহল একটি অস্পষ্ট পরিভাষা। সংবিধানের কথিত সে ধারাটির কারণে যদি বাস্তবেই মুসলমানদের উপর কোন দায়িত্ব বর্তায় তাহলে তা ফিকহের পরিভাষা অনুযায়ী প্রত্যেক আকেল, বালেগ, মুসলমানের উপরই বর্তাবে। এ দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পেতে হলে পাগল, শিশু বা

অমুসলিম হতে হবে। এছাড়া এসব দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

কথাগুলো আসলে কাকে বলা হচ্ছে?

আর যদি দায়িত্বটি কোন বিভাগভিত্তিক দায়িত্বশীলের হয়ে থাকে তাহলে সে বিভাগের নাম দ্বীনী মহল নয়। সুনির্দিষ্ট সে বিভাগ ও দায়িত্বশীলের কথা বলতে হবে। যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের দায়িত্ব বুঝে নিতে পারে। এমন কোন শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত নয় যার দ্বারা সবাই নিজের ব্যাপারে বুঝে নেবে যে, এ দায়িত্ব আমার নয়। অপর দিকে নিজেকে বাদ দিয়ে আর বাকি সবাইকে দায়ী করে যাবে। সকল দায়দায়িত্ব অপরের উপর চাপিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে।

এ জাতীয় শব্দ ও পরিভাষার কারণে অজুহাত অন্বেষীদেরকে প্রায়ই একটি কথা বলতে শোনা যায়। যখনই কোন ফরয দায়িত্বের প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তাদের সহজ সরল একটি জবাব থাকে 'বড়রা তো কিছু বলছেন না, আমরা কী করতে পারি?' এ সহজ সরল বিনয়ের (?) মাধ্যমে যে প্রতারণা ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জোয়ার চলছে তা আমরা বুঝেও বোঝার চেষ্টা করছি না।

একটি বড় প্রতারক গোষ্ঠী মূলত নিজেদেরকেই সবচাইতে বড় মনে করে। নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে মানুষ বলেও মনে করে না। কিন্তু দায়িত্বের প্রশ্ন আসলে প্রতারণার খেলায় মেতে উঠে এবং এক বায়বীয় বড়'র ভয় দেখিয়ে কাজের লোকদেরকে ঘাবড়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

এর জন্য সাত কোটি-ষোল কোটির প্রয়োজন নেই

বস্তুত কথিত সেই ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য সাত কোটি ও ষোল কোটি কোন কোটিরই প্রয়োজন নেই। দ্বীনের প্রত্যেকটি শাখা তথা ঈমান থেকে শুরু করে মুআমালা মুআশারা পর্যন্ত আমলের প্রতিটি অঙ্গনের বিষয়ে দাওয়াত বা ই'লাম, তালীম, তাযকীর ও শাসন এ চারটির বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু এগুলোর কোনটিই অস্বীকারকারীর জন্য নয়।

যে অপশক্তি কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করে চলেছে, যে কুফরী শক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক আইন

প্রয়োগ করে চলেছে, যে মুরতাদ শ্রেণি প্রায় শতাব্দীকাল যাবত শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার দাবিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শ করে আসছে, যে যিন্দীক ও মুলহিদ শ্রেণি এত প্রকারের কুফরের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে চলেছে

-তাদের ক্ষেত্রে দাওয়াত ও ইসলামের কোন পর্ব বাকি নেই। তালীম ও তাযকীর তাদের জন্য নয়। তারা ইসলামের শাসক হওয়ারও উপযুক্ত নয়, ইসলামী আইনে শাসিত হওয়ারও উপযুক্ত নয়। তারা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধাদানকারী, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে অবতীর্ণ হারবী।

তাদের কাছে কোন মুসলমান আবেদন নিবেদন করতে পারে না। তাদের কাছে কেন মুসলমানরা অভিযোগ অনুযোগ করবে? তাদের কাছে কেন মুসলমান নালিশ করবে? তারা তো আল্লাহর দুশমন। তারা মুসলমানের দুশমন।

জানি না শায়খে মুহতারাম কেন মুসলমানদেরকে বার বার সে কুফরের দরজায় ভিক্ষার জন্য পাঠাতে চান। মুসলমানদেরকে অপমানিত হওয়ার এ পথ দেখিয়ে দিয়ে মুসলমানের কী লাভ?! যে আবেদনের জন্য শায়খে মুহতারামের এত আফসোস সে আবেদনের আর কি অবশিষ্ট রয়ে গেছে যার অভাবে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের (?) উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দেশ তার সংবিধান ও আইন বিভাগকে শরীয়ার আলোকে সাজাতে পারছে না। এ কথাগুলো শুনে শুনে আমরা আর হজম করতে পারছি না। এবার আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করুন।

জরুরী টীকা : ২৯

“

আমি হাত জোড় করে বলেছি, অনুরোধ করেছি যে, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে এ ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য আবেদন করুন।

”

জরুরী টীকা-২৯

আমি হাত জোড় করে বলেছি, অনুরোধ করেছি যে, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে এ ধারাটিকে কাজে লাগানোর জন্য আবেদন করুন।

***এ বিষয়গুলো অর্থাৎ হাতজোড় করা, জনগণের কাছে হাতজোড় করা, আবেদন করতে বলা, হাতজোড়ের পর দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে মনে করা -এসবের কোন ক্ষেত্রেই শায়খে মুহতারাম তাঁর ইলমী যোগ্যতা ও ইলমী উসূলকে কাজে লাগাননি। যে উসূল ও মূলনীতির আলোকে তিনি তাঁর ইলমী জীবন কাটিয়েছেন, রচনা করেছেন, গবেষণা করেছেন, খুঁটিনাটি সকল মাসআলায় যেভাবে দলিলের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করেছেন সেসবের কোন কিছুই তিনি দ্বীনের একটি মৌলিক মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যবহার করেননি। ইলমী উসূলের আলোকে একটি কথাও বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। আমরা ভক্তবৃন্দ এবং আজীবনের মুস্তাফীদের জামাত এজন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়েছি।**

হাতজোড় অপাত্রে হয়েছে

হাতজোড় যে যথাস্থানে হয়নি তার প্রমাণ হচ্ছে, এ হাত জোড়ে কেউ সাড়া দেয়নি। মহাসমাবেশে যখন শ্রোতাদেরকে কোন কথা বলা হয় তখন প্রত্যেকে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, এখানে লক্ষ লক্ষ

মানুষ রয়েছে। এটা নিয়ে আমি মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এছাড়া 'বড়রা আছেন বড়রা করবেন, আমাদের মত ছোটরা এসব নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই' এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রতারণা তো আছেই। এ জন্য শরীয়ত কর্তৃক অর্পিত কোন দায়িত্ব এভাবে দেয়া যায় না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তা হাতজোড় করে দেয়া যায় না। আমরা একটু আগে বলে এসেছি দাওয়াত বা ই'লাম, তালীম, তাযকীর ও শাসন ইত্যাদি হাতজোড় করে দেয়ার বিষয় নয়। মুসলমানকে দেয়ার ক্ষেত্রেও নয় এবং কাফেরকে দেয়ার ক্ষেত্রেও নয়।

দ্বীনের অত্যাবশ্যক পালনীয় বিষয়গুলোকে যখন হাতজোড় করে করে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার প্রথা চালু হবে, অথবা বলা যায়, যখন থেকে চালু হয়েছে তখন থেকে দ্বীনের পক্ষ থেকে হাতজোড়কারীদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের হয়ে গেছে। আর দ্বীনকে দ্বীনের শত্রুদের সামনে অপমানিত করার দায়ে মুসলমানরা অপমানিত হয়েই চলেছে। সর্বত্র অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়ে চলেছে। এবং যে অপমানের ধারাবাহিকতার কোন শেষ দৃষ্টিসীমার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

কেবলার ভুল হয়ে গেছে

আমরা কেবলা হারিয়ে ফেলেছি। আর কেবলার বিপরীতে আমাদের লাখো কোটি সিজদা অর্থহীন প্রণামে পরিণত হচ্ছে। মাসআলা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়নের, আর সমাধান নেয়ার চেষ্টা করছি আবু জাহালের 'দারুন নাদওয়া' থেকে! 'হুকমুল জাহিলিয়্যাহ' এবং একটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান ও আইনের মাঝে কী ব্যবধান? কতটুকু মিল, আর কতটুকু অমিল?

আবু জাহাল কর্তৃক পরিচালিত দারুন নাদওয়ার 'হুকমুল জাহিলিয়্যাহ'র মাঝে এমন বহু আইন কানূন ছিল যার সঙ্গে ইসলামী আইনের কোন সংঘর্ষ নেই। শুধু সংঘর্ষ নেই এতটুকুই নয়; বরং একই বিধান দারুন নাদওয়ার আইনেও আছে আবার ইসলামের আইনেও আছে। এরপরও কেন আবু জাহালের দারুন নাদওয়ার আইন জাহেলী আইন? আল্লাহ প্রদত্ত কিছু বিধানের বিপরীত করার উপর এত বড় ধমক আল্লাহ কেন দিয়েছেন? একটি বিধানমালা জাহেলী বিধান হওয়ার জন্য শতকরা

কতভাগ তাতে কুরআন ও হাদীসের বিরোধিতা থাকতে হবে? এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কি বলছেন-

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ {سورة المائدة: ٤٩-٥٠}

"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" -সূরা মায়েদা ৪৯-৫০

আমাদের কেবলাই আগে ঠিক করতে হবে। আমরা বুঝতে চেষ্টাই করছি না যে, بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله থেকে বিমুখ হওয়াই একটি সংবিধান ও আইন জাহেলী আইন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান শুধুমাত্র بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله থেকেই বিমুখ হয় না। বরং দু'চারটি আইন ছাড়া বাকি সবই আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীত হয়ে থাকে। পাকিস্তানের অবস্থা এ থেকে এক বিন্দুও ব্যতিক্রম নয়।

গণতন্ত্রের কাছে ইসলামের কোন আবেদন নেই

অতএব গণতন্ত্রের কাছে ইসলামের কোন আবেদন নেই। মানবরচিত আইনের কাছে ইসলামের কোন নিবেদন নেই। জাহেলী তন্ত্রের কাছে ইসলামের কোন অভিযোগ নেই। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের কাছে ইসলাম ধর্মের চাওয়ার কিছু নেই। কুফরী তন্ত্রের কাছে ঈমানের কোন সমাধান নেই। আবু জাহালের দারুন নাদওয়ার কাছে মুসলমানদের কোন দাবি নেই।

'জাবাবেরা' আর 'তাওয়াগীত' এর ব্যবধান আমরা ভুলে গেছি। জালেম বাদশা আর কাফের বাদশাহর ব্যবধান আমাদের মাথায় নেই। বার বারই আমরা জলেম বাদশাহর বিধানগুলোকে কাফের বাদশাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তালগোল পাকিয়ে ফেলছি। সলফের বিভিন্ন উক্তিকে অপপ্রয়োগ করে প্রতারণা করছি অথবা প্রতারিত হচ্ছি। অথচ জালেম শাসক আর কাফের শাসকের মাঝে ব্যবধান খুবই স্পষ্ট।

দূর অতীত, অতীত ও বর্তমান

মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণ এবং মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত জঘন্যতম অপরাধ সালাফের সময়ে (৬০০ হিজরির পূর্ব পর্যন্ত) বিদ্যমান ছিল না। তখন সর্বোচ্চ যা ঘটত তা হল, শাসক ও বিচারকগণ প্রবৃত্তির তাড়নায় শরয়ী বিধান প্রয়োগে শিথিলতা প্রদর্শন করত এবং অনেক সময় শরীয়া পরিপন্থী ফয়সালা করত। এ কারণে সালাফে সালেহীন তাদেরকে জঘন্য অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তাদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ প্রদান করতেন। তবে তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকতেন।

কিন্তু সুযোগসন্ধানী কিছু দরবারি ব্যক্তি সালাফের এই সঠিক কর্মপন্থাটির অপপ্রয়োগ করে এখান থেকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে দলিল সংগ্রহের অপচেষ্টা করে। তারা ঢালাওভাবে বলে দেয়, যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে না, সালাফগণ তাদেরকে কাফের বলেননি। তাই বর্তমান শাসকদেরকে আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচারকার্য ও রাষ্ট্রপরিচালনা না করার কারণে কাফের আখ্যায়িত করা ঠিক নয়।

অথচ তারা ভুলে যায়, উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তারা বুঝতে পারে না যে, নিষিদ্ধ করা ও প্রয়োগে শিথিলতা এক ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ইসলামী আইনকে সামগ্রিকভাবে রহিত ও মওকুফ করা, তার বিরুদ্ধে আইন করা; আর কোন শাসক বা বিচারকের জন্য ব্যক্তিস্বার্থে বিচারকার্যে ত্রুটি করার মধ্যকার বিশাল এই পার্থক্য– তাদের কে বোঝাবে?

মুসলমানদের রাষ্ট্রে শরীয়ত প্রত্যাখান করে স্বরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত নিকৃষ্টতম কাজ ইসলামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শুধু একবারই ঘটেছিল; তাতারদের শাসনামলে ৬০০ হিজরির পর।

মুসলামনদের বিরুদ্ধে এক প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবের পর এক পর্যায়ে তাতাররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং কুরআনের কিছু বিধানের সঙ্গে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কিছু বিধান এবং নিজেদের চিন্তাপ্রসূত কিছু বিধান মিলিয়ে তৈরিকৃত একটি সংবিধানের তারা অনুসরণ করে। তার নাম দেয় **'ইয়াসাক'**।

এই সংবিধান দ্বারাই তারা বিচার ও রাষ্ট্রপরিচালনা করতে থাকে। ফলে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও মুফাসসির হাফেয ইবনে কাসীর রহ.-সহ অন্যান্য আলেমগণ উপরোক্ত কাজের কারণে তাদেরকে মুরতাদ বলে ফাতওয়া প্রদান করেন। ইসলামের ইতিহাসে সেই প্রথম, আর খেলাফতে উসমানিয়া পতনের পর (১৯২৪ ইং) থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই আপদ মুসলমানদের মাথার উপর চেপে আছে। উভয় সময়কার যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণই এ ব্যাপারে তাদের মতামত ও শরয়ী বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন।

তাই উপরোক্ত বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। যেমনিভাবে মাগরিবের নামায নিজে আদায় না করা আর নামাযকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা বা তিন রাকাত নামাযকে দুই রাকাত বা চার রাকাত করে আদায় করা বাধ্যতামূলক করে আইন জারি করা এবং তা মানতে বাধ্য করা এক ব্যাপার নয়; তেমনিভাবে হুদুদ, কেসাস, পর্দা, মিরাছ ও জিহাদসহ অন্যান্য বিধান নিজে পালন না করা বা এ সকল বিধান প্রয়োগে শিথিলতা করা আর রাষ্ট্রীয়ভাবে তা রহিত করে এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা, লক্ষ-কোটি জনতাকে সে আইন মানতে বাধ্য করা, না মানলে শাস্তি প্রদান করাও এক ব্যাপার নয়। সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে! আমরা যেন উপরোক্ত আলাদা আলাদা বিষয়গুলো একসঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি।

অতএব গণতন্ত্রের এ শক্তি কুফরী শক্তি। মানবরচিত আইনের এসব ধারা উপধারা সব কুফরী ধারা উপধারা। এর কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের কোন আবেদন নিবেদন নেই।

জরুরী টীকা : ৩০

“

কিন্তু আফসোস! আমাদের পক্ষ থেকে কোন আবেদন পেশ করা হয়নি। বেদ্বীনদের পক্ষ থেকে এসেছে, মুলহিদদের পক্ষ থেকে এসেছে এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়েছে।

”

জরুরী টীকা-৩০

কিন্তু আফসোস! আমাদের পক্ষ থেকে কোন আবেদন পেশ করা হয়নি। বেদ্বীনদের পক্ষ থেকে এসেছে, মুলহিদদের পক্ষ থেকে এসেছে এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়েছে

*যে ধারাকে বেদ্বীন ও মুলহিদরা কাজে লাগাতে পারে সে ধারা কুরআন সুন্নাহর পক্ষের কোন ধারা হওয়ার কথা নয়। বেদ্বীন ও মুলহিদদের জন্য খোলা রাস্তা দিয়ে মুসলমান প্রবেশ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। সে রাস্তা বেদ্বীন ও মুলহিদদের রাস্তা। হয়ত সে কারণেই সত্তর বাহাত্তর বছর যাবত কেউ সে দরজায় প্রবেশ করতে চায়নি। বিকল্প পথ খুঁজেছে।

শায়খে মুহতারাম এ নিয়ে আফসোস করছেন। কিন্তু অমাদের মনে হচ্ছে, বেদ্বীন ও মুলহিদদের সে পথে মুসলমানরা পা রাখলে আফসোসের মাত্রা আরো বেড়ে যেত।

যে দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারীরা মুসলমানের ভোট নিয়ে, মুসলমানের কর্ণধার ওলামায়ে কেরামের কষ্টের ফসলকে পুঁজি করে, একটি দারুল ইসলামের স্বপ্ন দেখিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারগুলোতে বদদ্বীন, বেদ্বীন ও কাফের মুরতাদদেরকে বসিয়ে কুফর, শিরক, ইলহাদ, যান্দাকার পথ খুলে দিয়েছে। কাফের মুলহিদ যিন্দীকদের জন্য পথ খুলে দিয়েছে। তাদের খুলে দেয়া সে পথে মুসলমান যেতে পারে না। ইসলামের কোন দাবি সে পথে আদায় হতে পারে না। এ বিষয়ে আফসোসের কোন সুযোগ নেই। আফসোসের জায়গা হচ্ছে, আমরা যে

আমাদের কেবলা হারিয়ে ফেলেছি তা। আমাদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যয় হওয়া উচিত আমাদের কেবলা তালাশের পেছনে।

হুকুম জারির ধরণ ও উদাহরণ

কথিত সে ধারার ভিত্তিতে যে হুকুমগুলো জারি হয়েছে সেসব হুকুমের ধরণ দেখলে এবং সেসব হুকুমের কিছু উদাহরণ সামনে আসলে আমাদের জন্য বুঝতে আরো সহজ হবে যে, এ পথে আদৌ কিছু হওয়ার ছিল কি না। উদাহরণগুলো এ মুহূর্তে আমাদের সামনে নেই। উদাহরণগুলো হাতের নাগালে আসলে আমরা ইনশা-আল্লাহ পাঠকদের সামনে তা তুলে ধরব।

উদাহরণগুলো সামনে আসলে ইনশা-আল্লাহ পাঠক দেখতে পাবেন, হুকুমগুলো এমনভাবেই জারি করা হয়েছে যেভাবে জারি করলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের গায়ে কোন রকম দাগ লাগে না। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এমন এক ধর্ম যে ধর্ম গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের গায়ে আঘাত না করে কোন আবেদনই করতে পারবে না। যারফলে এ আবেদনের প্রেক্ষিতে হুকুম জারি করতে গেলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মকে রক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। আর পাকিস্তানসহ বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক দেশই তার মূলনীতি গণতন্ত্রের গায়ে আঘাত করে কোন ধর্মের কোন দাবি পূরণ করবে না।

ইসলাম তার সকল আবেদন নিবেদন শুরু করবে দু'টি মূলনীতিকে সামনে রেখে। এক. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনিত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম) ও وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে)। দুই. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (বিধান দেয়া একমাত্র আল্লাহর অধিকারভুক্ত। তিনি এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না)। এ দুই মূলনীতিকে উপেক্ষা করে ইসলামের পক্ষে কোন দাবিও হতে পারে না এবং সে দাবি পূরণও হতে পারে না।

জরুরী টীকা : ৩১

সুতরাং সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু পাকিস্তানই এ মর্যাদা লাভ করেছে যে, প্রত্যেক নাগরিককে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে কোন আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তা পরিবর্তন করাতে পারবে।

জরুরী টীকা-৩১

> সুতরাং সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু পাকিস্তানই এ মর্যাদা লাভ করেছে যে, প্রত্যেক নাগরিককে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে কোন আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তা পরিবর্তন করাতে পারবে।

** তাহলে শায়খে মুহতারামের দৃষ্টিতে পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের অন্যসব দেশের হুকুম কী দাঁড়ায়। সেগুলোর বিধান কী? সেগুলো দারুল ইসলাম না কি দারুল হারব। এ বিষয়ে শায়খে মুহতারামের সিদ্ধান্ত কী এবং সেসব দেশের কর্ণধারদের সিদ্ধান্ত কী?*

শেষের কথা

আমরা এখন এ লেখার শেষ প্রান্তে রয়েছি। এ পর্যায়ে আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে, পাকিস্তান সংবিধানের কিছু প্রতারণামূলক অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং অন্তসারশূন্য শক্তিহীন কিছু ধারা উপধারার উপর ভর করে শায়খে মুহতারাম পাকিস্তানকে একটি দারুল ইসলাম হিসাবে বিশ্বের বুকে পরিচিত করাতে চেয়েছেন। আমরা সেসব ধারা উপধারার হাকীকত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অনুচ্ছেদগুলোর প্রতারণা ধরার চেষ্টা করেছি।

এখন অমাদের একটি প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তান সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদ ও ধারা উপধারার কারণে শায়খে মুহতারাম তাঁর দেশটিকে দারুল ইসলাম

ভাবতে পছন্দ করেন সেসব অনুচ্ছেদ ও ধারা উপধারাগুলো বিশ্বের অন্যান্য অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সংবিধানে নেই। কমপক্ষে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্যও তারা তাদের সংবিধানে এসব ধারা রাখেনি। তারা খুব স্পষ্ট ভাষায়ই তাদের সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে একাধিক কুফরী মতবাদকে নির্ধারণ করেছে।

এমতাবস্থায় শায়খে মুহতারামের দৃষ্টিতে সে দেশগুলো দারুল হারব না দারুল ইসলাম? যদি সেগুলো দারুল ইসলাম হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে এবং সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্য কী? আর যদি সেগুলো দারুল হারব হয়ে থাকে তাহলে সেসব দেশের সঙ্গে শায়খে মুহতারামের আচরণ কী? সেসব দেশ ও দেশের মুসলমানদের বিষয়ে শায়খের সিদ্ধান্ত কী?

সিদ্ধান্তে বৈপরীত্য

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেসব কারণে শায়খে মুহতারাম তাঁর দেশটিকে দারুল ইসলাম ভাবতে পছন্দ করেন সেসব কারণ অপরাপর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ক্ষেত্রে না পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তিনি সেগুলোকে দারুল হারব বলতে রাজি নন। সেসব দেশের শাসকবর্গকে মুরতাদ ও অমুসলিম ভাবতে রাজি নন। যারা ধোঁকা দেয়ার জন্যও আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে স্বীকার করেনি তিনি তাদেরকেও মুরতাদ ও অমুসলিম মানতে রাজি নন।

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের অপরাপর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ফাতওয়াদাতাগণ শায়খে মুহতরামের রচনাবলির উদ্ধৃতি দিয়েই তাদের শাসকবর্গকে মুসলমান বলে দাবি করে থাকে। দেশে ঘোষণার সাথে শতভাগ কুফরী আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও সেসব দেশকে তারা দারুল ইসলাম বলে প্রচার করছে। মানব রচিত আইন, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার জোয়ারেও সেখানে দারুল ইসলাম কোন প্রকার ক্ষত বিক্ষত হয় না।

আরো এক ধাপ এগিয়ে, যে দেশগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জন্মগত অমুসলিমরা সেসব দেশের পরিচালক। এমনসব দেশকেও দারুল হারব বলতে শায়খে মুহতারামকে নারাজ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে শায়খের ভাষা বুঝতে আমাদের কোন ভুলও থাকতে পারে। তবে তাঁর একান্ত কাছের দু'টি দেশ বাংলাদেশ ও

ভারত। এ দু'টি দেশের সঙ্গে তাঁর আচার আচরণ এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে যেসব কথা বার্তা সামনে এসেছে সেসব থেকে আমাদের মনে হয়নি যে, তিনি এ দেশদু'টিকে দারুল হারব মনে করেন।

এ দু'টি দেশ যদি তাঁর দৃষ্টিতে দারুল হারব না হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে আর কোন দারুল হারব কি আছে? শায়খে মুহতারাম যদি বাংলাদেশ ও ভারতকে দারুল হারব না বলেন তাহলে পৃথিবীর কোন দেশটিকে তিনি দারুল হারব বলবেন? যে দেশটিকে দারুল হারব বলবেন তার সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যবধান কী?

আর যদি শায়খের দৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোও দারুল হারব না হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো কী? দারুল হারবের বিপরীতে রয়েছে দারুল ইসলাম।

মোটকথা এ বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে। আলোচনার টেবিলে স্থান পাচ্ছে না। আমলী ক্ষেত্রে তারতম্যগুলোকে সামনে রাখা যাচ্ছে না। শায়খে মুহতারাম ইলম ও ফিকহের যে অবস্থানে রয়েছেন সে অবস্থান থেকে আমরা সাধারণ তালিবুল ইলম ও সাধারণ মুসলমানরা আশা করতেই পারি যে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এসে যাবে যে, কোন দেশটি দারুল ইসলাম এবং কোন দেশটি দারুল হারব। কোনটি কেন দারুল ইসলাম এবং কোনটি কেন দারুল হারব। দারুল ইসলামগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে কোন ভিত্তিতে হবে এবং দারুল হারবগুলোর সঙ্গে আমাদের আচরণ কী হবে এবং কোন ভিত্তিতে হবে।

এ বিষয়গুলোকে আর অস্পষ্ট থাকতে দেয়া যায় না।

বিশেষত যখন ইলমের পরিচয়ে পরিচয়দানকারী একটি গোষ্ঠী কুফর-শিরক-ইরতিদাদ-নাস্তিকতাকে আপন অবস্থায় রেখেই পুরো পৃথিবীকে শান্তির একক বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, মুসলমান-কাফেরের পার্থক্য মুছে দিতে চায়, মুসলিম-অমুসলিমের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিতে চায়, ইসলাম ধর্মের জন্য লড়াই করাকে, জিহাদ ও কিতাল করাকে অস্তিত্বহীন, অসার, অবৈধ ও দ্বীনবিমুখতা বলে প্রমাণ করতে চায়।

তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের কর্ণধারগণের অস্পষ্ট বক্তব্য আমাদের জন্য অনেক বড় পেরেশানীর কারণ। দলিলভিত্তিক সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণা

ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। তাই আমাদের অসহায়ত্বগুলো অনুধাবন করার জন্য আমরা আমাদের কর্ণধারগণের মনোযোগ কামনা করছি।

বিশ্বের বিপরীত মত

বিশ্বের অপরাপর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও মুসলিম কর্ণধারগণের একটি অংশের দাবি হচ্ছে, তাদের দেশগুলো দারুল ইসলাম। সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদি মানসিকতার কারণে প্রত্যেক দেশের দায়িত্বশীলগণ সে দেশের নাগরিক হিসাবে এ দাবি করা জরুরী মনে করেন যে, তার দেশটি বিশ্বের অন্য সকল দেশের চাইতে উত্তম এবং অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

মাহমূদ মাদানীর দৃষ্টিতে ভারত পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক দেশ; কারণ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও মুসলমানসহ সকল ধর্মের আনুসারীরা সেখানে সঠিক অর্থে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা অপর ধর্মের আকীদা বিশ্বাস ও ধর্মাচারকে সম্মান করে। পৃথিবীর আর কোন দেশ এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারেনি।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মানুরাগী দেশ। কারণ এ দেশে ধার্মিক লোকেরা মসজিদ-মন্দির-গীর্জায় একসঙ্গে ইবাদত ও পূজা আর্চনা করতে পারে। কেউ কারোটাকে ঘৃণা করে না; বরং এক ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের পূজা অনুষ্ঠানে পাহারা দেয়। মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকরা রাত জেগে পূজামণ্ডপ পাহারা দেয়।

আমেরিকান হুজুর বলেছেন, ধর্মকর্মের জন্য আমেরিকার মত নিরাপদ আর কোন জায়গা নেই। সেখানকার পরিবেশই অন্যরকম। খ্রীস্টান ছেলেরা পর্যন্ত মসজিদে এসে হুজুরের কাছে ধর্মের বই পড়ে। ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। একই মসজিদে বিভিন্ন ধর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা আছে। যারফলে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের ভালো দিকগুলো শিখতে পারে। এরকম ব্যবস্থা আপনি পৃথিবীর কোথাও পাবেন না।

মোটকথা প্রত্যেক দেশের মুসলমানরা তাদের দেশকে ধর্মকর্মের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যসব দেশের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ভাবতেই পছন্দ

করেন। এমতাবস্থায় কোন দেশের মুসলিম নাগরিকই তার দেশকে দারুল হারব মানতে রাজি হবে না। আর সবার এ দাবি শুধু দেশ হিসাবে নয়। সবার দাবি হচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের দেশটি অন্যসব দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকের দেশের শাসকবর্গ ইসলামের প্রতি সবচাইতে বেশি অনুরাগী। প্রত্যেকের দেশের রাষ্ট্রীয় আইন সবচাইতে বেশি ইসলামবান্ধব।

ফলাফল বিশ্লেষণ

সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিভা যখন এভাবে জাগ্রত তখন ফলাফল উদ্ধার করা সত্যি এক কঠিন বিষয়। পাঠক নিশ্চয় অনুভব করতে পারছেন যে, আমরা এখন কোন ফলাফল নিয়ে পেরেশান আছি।

পাকিস্তানের যিম্মাদারের দৃষ্টিতে পাকিস্তান দারুল হারব নয়, পাকিস্তানের শাসকবর্গ মুরতাদ নয়। বাংলাদেশের যিম্মাদারের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ দারুল হারব নয়, শাসকবর্গ মুরতাদ নয়। ভারতের যিম্মাদারদের দৃষ্টিতে শাসকবর্গ কাফের হওয়া সত্ত্বেও দারুল হারব নয়। আমেরিকা রাশিয়ার যিম্মাদারদের দৃষ্টিতে সে দেশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অবস্থায়ও সে দেশ দারুল হারব নয় এবং তাদের যোদ্ধারা ও সমর্থক সহযোগীরা হারবী নয়।

পৃথিবীর কোন একটি দেশের উপরও কোনভাবেই দারুল হারবের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হচ্ছে না। যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে, পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম। পুরো পৃথিবীর কোথাও কোন হারবী নেই। সকল দেশের সকল যিম্মাদারের বক্তব্যের ফলাফল এটাই। যদিও ফলাফলটা একসঙ্গে শুনলে অনেকেই আঁতকে উঠে। আবার অনেকেই আঁতকে উঠে না, শুধু আঁতকে উঠার ভান করে।

পুরো পৃথিবীর কোথাও কোন দারুল হারব নেই কথাটি অনেকে সহজেই সম্ভব মনে করে। আর যারা পুরো পৃথিবীর কোথাও দারুল হারব না থাকার বিষয়টিকে সম্ভব মনে করে তাদের একটি অংশ আছে যারা এর বিপরীত ফলাফলটা মানতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম হওয়াটা তারা মেনে নিতে পারে না।

ইলম ও আমলের অঙ্গনে এ দলটি সবচাইতে বেশি পেরেশানীতে আছে।

দারুল হারব না হওয়া বলাটা তাদের কাছে যত সহজ মনে হয়েছে, দারুল ইসলাম বলাটা তত সহজ মনে হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা কিছু অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কিছু নতুন পরিভাষা আবিষ্কার করে সেসব পরিভাষার আড়ালে দারুল হারবগুলোকে লুকানোর চেষ্টা করেছে।

উল্লেখ্য, দারুল আমান, দারুল মুয়াহাদা ইত্যাদি দারুল হারবেরই কিছু সাময়িক অবস্থার নাম। দার মূলত দু'টিই। দারুল ইসলাম ও দারুল হারব।

যারা আজ পাকিস্তানকে দারুল ইসলাম বলছেন তারা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা ও বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মাঝে কী ব্যবধান। যারা বাংলাদেশকে দারুল ইসলাম বলছেন তাঁরা বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও ভারতের শাসন ব্যবস্থার মাঝে কী ব্যবধান। যারা ভারতকে দারুল ইসলাম বলছেন তারা বুঝিয়ে দিতে হবে ভারতের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আমেরিকা রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থার ব্যবধান কী? যারা আমেরিকা রাশিয়াকে দারুল ইসলাম বলছেন তারা বুঝিয়ে দিতে হবে সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যেসব দেশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা জিহাদ করেছে তাদের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আমেরিকা রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থার কী ব্যবধান?

মুহতারাম ব্যক্তিবর্গ জবাব দিতে হবে, কোন দলিলে এবং কোন গুণে পৃথিবীতে আজ কোন দারুল হারব নেই। পৃথিবীতে কোন হারবী নেই। মুসলমানরা যাদের বুকে বুলেট মারবে এমন কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই। মুসলমানদের হাতে বৈধভাবে নিহত হওয়ার মত কোন কাফের পৃথিবীতে নেই। মুসলমানদের অস্ত্রধারণের কোন বৈধ ক্ষেত্র নেই।

মুহতারাম ব্যক্তিবর্গ এ প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে। নয়তো দলিলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। দলিল ছাড়া দ্বিমত করা যাবে না। খুব বেশি দিন এ সুযোগ দেয়ার সুযোগ নেই। দলিল ছাড়া বিতর্ক করার জন্য খুব বেশি সময় দেয়া যাবে না।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে শুভ বুদ্ধি দান করুন। সহীহ বুঝ দান করুন। সরল সঠিক মত ও পথের উপর আমাদেরকে একমতে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শায়খে মুহতারামের আরেকটি ওয়াহাতি বয়ান

والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

الحمد للہ، پیغام پاکستان کے سلسلہ میں مجھ سے پہلے حضرات مقررین نے بڑی حد سے خیالات کا اظہار فرمایا،اور الحمد للہ یہ پیغام سارے ہی مکاتب فکر اور ہر مسلک کے علماء کا متفقہ بیانیہ ہے اس کی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، میں صرف دو تین نقاط اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، ہم نے بچپن میں نعرہ لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالی کے فضل کرم سے یہ ملک وجود میں آیا، اللہ تعالی نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، آج ستر سال گزرنے کے بعد یہ باتیں ہم آپس میں اور خاص طور سے حکومت کے ذمہ دار حضرات کے سامنے بکثرت کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں، کہ ابھی تک جس مقصد کے لئے یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور اسکی وجہ سے جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں اور حکومت سے کوئی تجویز یا مطالبہ پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بات بہت قوت کے ساتھ اہمیت کے ساتھ دوہراتے ہیں کہ پاکستان جس کام کے لئے قائم ہوا تھا ابھی تک ہے وہ منزل حاصل نہیں ہوئی، اور وہ معاشرہ وجود میں نہیں آسکا جس کا خواب پاکستان بنانے والوں نے دیکھا تھا، اور جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یا اس سے بھی پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، یہ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا۔

ہم جب موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں جیسے مجھ سے پہلے مقرر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ بے حیائی ہے عریانی ہے فحاشی ہے اور جس مقصد کے لئے پاکستان قائم ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور اس کے لئے ہمے جد جہد کی ضرورت ہے، لیکن یہاں میں دو نقطہ خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات واضح ہو چکی قرآن وحدیث کے حوالے سے واضح ہو چکی پیگام پاکستان کے حوالے سے واضح ہو چکی کہ جن غلطیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کا تدارک بندوق کی گولی نہیں ہے، ان کا تدارک در حقیقت خود ہم کرینگے، اور وہ ہماري ذمہ داری ہے اس میں حکومت بھی داخل ہے اس میں علماء کرام بھی داخل ہے اس میں عوام بھی داخل ہے۔

اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم پاکستان کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں کچھ تھوڑا سا ہم آپس میں علماء کرام کی محفل آپس میں بیٹھے ہیں، اس بات کا بھی ذکر ہونا چاہیئے کہ الحمد للہ پاکستان کے اندر پاکستان بننے کے بعد بہت سے کام بہت اچھے بھی ہوئے اور فضا کے اندر بڑی تبدیل بھی آئی، ہم شکوی ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک وتعالی نے جو نعمتیں ہمیں یہاں پاکستان میں عطا فرمائی ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ نہیں کرتے پاکستان کے نتیجے میں اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں کتنے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ان کا ذکر نہیں کرتے ان کا اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے یہ کہا تھا کہ: لئن شكرتم لأزيدنكم.

میں عرض کرتا ہوں کہ ان ساری خرابیوں کے باوجود پہلے آپ حضرات شاید اس عمر کے نہ ہوں گے بیشتر حضرات لیکن میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب کراچی کے اندر شراب خوانہ اس طرح کھولے ہوئے تھے جیسے کہ رسٹورنٹ کھولے ہوئے ہوتے

ہیں۔ اور اس میں آزادی کے ساتھ پورے قانونی تحفظ کے ساتھ شرابیں پی جاتی تھی اور کوئی روکنے والا نہیں تھا الحمد للہ پاکستان بننے کے بعد اور علماء کرام کے جد جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک وتعالی نے اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائی، پینے والے آج بھی پیتے ہیں لیکن چھپ کر پیتے ہیں قانون کے تحفظ کے بغیر پیتے ہیں اگر قانون کے اندر آینگے تو ان کو سب وسزا کا مستوجب ہونگے.

اللہ تعالی نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہمارے بزرگوں کی کوششوں کے جد جہد کے نتیجے میں کہ پاکستان کا آین پاکستان کے آئین سارے دنیا کا دستوروں کا مقابلہ کر کے دیکھ ل جیئے پاکستان کا آئین وہ بات کہتا ہے جو آج دنیا کے کسی ملک نے یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی نہیں کہی، اور وہ یہ کہ سب سے پہلا جملہ ہمارے دستور کا یہ ہے کہ اس کائینات کا بلا شرکت غیرے مالک صرف اللہ تبارک وتعالی ہے، یہ جملہ آپ کو دنیا کے کسی دستور میں نہیں ملے گا، اسلامی ممالک کے دستور میں نہیں ملے گا یہ جملہ آپ کو سعودی عرب کے موجود د ستور اس قسم کا موجود نہیں ہے کہ کہتا ہو کہ اس کائینات کا بلا شرکت غیرے حکمرانی اللہ کی ہے اور یہاں پر جو لوگ حکمران بنتے ہیں وہ حکمران اللہ تبارک وتعالی کی عطا کی ہوئی حدود کے اندر اللہ تبارک وتعالی کی عطا کی ہوئی حدود کے اندر وہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، یہ جملہ آپ کو قرارداد مقاصد کا یہ جملہ یہ دنیا کی کسی دستور میں نہیں، اسی دستور کے اندر یہ جو جملہ موجود ہے کہ پاکستان کا ہر قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہو گا اور قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائیے گا یہ جملہ بھی آپ کو کسی بھی دستور میں نھیں ملے گا سارے عالم اسلام کے چھپن ممالک ان کو کھنگال کر

دیکھئے ان میں سے کسی میں یہ بات یہ قانون نہیں ہے جو اللہ تبارک وتعالی نے اس کو عطاء فرمائی۔

ہمارے دستور کے اندر پہلی بار دنیا کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان کی تعریف اور ختم نبوت کا اقرار کہ اگر ختم نبوت کا اقرار نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور مسلمان نہیں ہو سکتا تو وہ ملک کا سربراہ نہیں ہو سکتا، صدر نہیں بن سکتا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یہ بات دنیا کے کسی اور دستور میں اس وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، جس میں ختم نبوت کو اپنے آین کا اتنا بڑا حصہ بنایا گیا ہو، آپ اس بات کا بھی جائزہ لے کے دیکھئے الحمد للہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب مسجد و محراب سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیے ... اسلامی ممالک موجود ہے کسی ملک میں چلے جائیئے وہاں پر آپ کی تقریریں آپ کی تحریریں اتنی آزادی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے جتنی آزادی کے ساتھ آپ پاکستان میں کرتے ہیں۔

اگر وہاں پر صورت حال یہ ہے کہ بیشتر جگہوں پر تو دینی مدرسہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی تعداد میں دینی مدرسے ہر مکتبہ فکر کے اس ملک میں موجود ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں موجود نہیں ہے، وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ آپ دینی مدرسہ قائم کر سکے۔

آپ جمعہ کے خطاب میں کھل کر دین کی بات اپنے ضمیر کے مطابق جس طرح چاہے بیان کر سکتے ہیں الحمد اللہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جاکر دیکھئے ان عرب ممالک میں شرق اوسط کے ممالک میں وہاں جاکر دیکھئے کہ وہاں پر آپ کو یہ

ملے گا کہ جب تک حکومت کی طرف سے منظور شدہ خطبہ نہیں ہو گا وہ خطبہ نہیں دے سکتا۔

ایک مرتبہ میں تونس میں تھا، اور وہاں میں جامعہ زیتونہ جو مشہور یونیورسیٹی وہ دیکھنے کے لئے گیا تھا، جمعہ کا دن تھا میں نے کہا جو مسجد میں نماز پڑھ لوں، نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں گیا تو امام صاحب کا پورا خطبہ حاکم وقت کی تعریف پر مشتمل تھا. دونو خطبہ اس میں اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا، کہ حاکم وقت نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے سوا کوئی بات موجود نہیں تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کی بھائی! یہ عجیب میں نے خطبہ آج سنا، دنیا میں پہلی بار اس طرح کا کہ اس میں سوائے حاکم وقت کی تعرف کے اور کچھ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آج یہ خطبہ پورے ملک کے اندر ہر خطیب کو بھیجا گیا ہے اور اس کو پابند کیا گیا ہے کہ جب تک یہ خطبہ نہیں دیگا وہ خطیب نہیں رہ سکتا، یہ صورت حال پائی جاتی ہے۔

آپ امارات میں چلے جائے سعودی عرب میں چلے جائے آپ کسی عرب ملک میں چلے جائے وہاں پر خطبہ جب تک کہ سرکاری طور پر منظور نہیں ہونگے اس وقت تک خطبہ نہیں دیا جاسکتا. اللہ تعالی نے ہمے آپ کو یہ آزادی عطا فرمائی، کہ پاکستان کا صدقہ ہے پاکستان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ہمے یہ آزادی عطا فرمائی ہے کہ ہم جو چاہے یہاں پر کم از کم کہ سکتے ہیں، ہم اپنے جذبات کے اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنے دین کی بات سنا سکتے ہیں، ہم فتوی دے سکتے ہیں، ہم فتوی دینے میں آزاد ہیں۔

سعودی عرب میں اگر کوئی شخص، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں میں، اگر وہاں کوئی شخص جس کو با قاعدہ رجسٹرڈ نہیں کیا گیا ہو وہ اگر فتوی دے تو قابل دست اندازی

پولس ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ فتوی کیوں دیا؟ لیکن الحمد للہ ہمے یہاں پر یہ آزادی حاصل ہے، تو اگر ہم کچھ برائیاں دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو اچھائیاں ہیں ان کی قدر تو کرے! ان کا شکر تو ادا کرے! اللہ تبارک و تعالی کے بار گاہ میں شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک وتعالی سے لأزیدنکم کی امید رکھے. ایک نقطہ تو میرے یہ عرض کرنا تھا. لہذا پاکستان کو اب اپنانا اپنا سمجھنا ایک اسلامی ریاست سمجھنا ایک اسلامی ملک سمجھنا اپنا وطن سمجھنا اس کا تحفظ یہ ہمارا ہمارا دینی فریضہ ہے۔

اور میں یہاں پر یہ بات بھی سب کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان بننے سے پہلے علمائے کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اختلاف رائ کوئی بری بات نہیں ہوا کرتی، مسلمانوں کو مستقبل کے لئے پاکستان بننا زیادہ بہتر ہے یا نہ بننا بہتر ہے اور ہندستان کا مشترک رہنا بہتر ہے اس مسئلہ پر اراء ہمارے اہل علم کے مختلف رائے آئی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو حضرت شیخ الاسلام علامہ حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی شروع میں رائ نہیں تھی لیکن ان کا یہ جملہ رکارڈ پر ہے میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے کہ حضرت علامہ شیخ الاسلام علامہ حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد بننے سے پہلے کسی جگہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنائی جائے یا نہیں؟ لیکن جب ایک مرتبہ مسجد بن گئی تو اس کا تحفظ ہر مسلمان کا فریضہ، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، تو اس لئے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اپنا سمجھے، پاکستان کی بھلائی کو اپنی بھلائی، پاکستان کی برائی کو اپنی برائی، پاکستان کے ساتھ محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے۔

دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ بے شک یہاں پر شریعت کا مکمل نفاذ جو مطلوب تھا وہ نہیں ہوا، اور ہم جب حکومتوں سے بات کرتے ہیں تو یہی شکوی کرتے ہیں، لیکن اس شکوے میں جہاں ہم حکمرانوں سے شکوی کرتے ہیں حکومت سے شکوی کرتے ہیں یہ شکوی مجھے خود اپنے آپ سے بھی ہے، یہ شکوی مجھے حضرات علمائے کرام سے بھی ہے، یہ شکوی مجھے دینی سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، یہ شکوی مجھے عوام سے بھی ہے کہ، انہوں نے اسلامی شریعت کے نفاذ کے لئے جو طریق کار اختیار کرنا چاہئے تھا اس کو اختیار نہیں کیا اور اس میں مجرمانہ غفلت کا ہم سب نے مظاہرہ کیا۔

اللہ تعالی نے ہمے آین ایسادیا تھا اس آین کے اندر پر عمل آینی جدجہد اسلامی شریعت کے نفاذ کے لئے کرنے کا راستہ کھلا ہوا تھا، آج بھی کھلا ہوا ہے، ایک آینی راستہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آین خاص طور سے اس آین کی جو اٹھارویں ترمیم ہے اور اس کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانہ میں ترمیم ہوئی تھی، تو اس کے اندر ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو اگر غیر شرعی سمجھے قرآن وسنت کے خلاف سمجھے تو اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرے، وفاقی شرعی عدالت اگر کسی قانون کو قرآن وسنت کے خلاف قرار دے تو ایک معین تاریخ کے بعد وہ قانون خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اپیل اگر جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی شریعت اپیلٹ بینچ میں جاتی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت میں دستور کے مطابق تین علماء ہونے چاہئے، اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ کے اندر دو علماء ہونے چاہئے، جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا وہ درست یا نہیں۔

میں سترہ سال اس وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں بحیثیت جج کام کرتا رہا ہوں، میں نے اپنے ساتھیوں اپنے رفقاء اپنے مذہبی رہنماؤں اپنے سیاسی رہنماؤں کے آگے ہات جوڑے ہیں کہ خدا کے لئے دستور کے اس طریقہ کو اپنا کر آپ قوانین کے خلاف درخواستیں داخل کریں، اور اس کے ذریعہ قوانین کو تبدیل کرائے،۔

میں انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے ہات جوڑے ہیں، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے سامنے بھی، مذہبی رہنماؤں کے سامنے بھی کی آپ درخواستیں لائے، کی آپ کمیٹی بنادیں اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے یہ دیکھے کہ کون سے کون سے قوانین تبدیل کے محتاج ہے، آپ ان قانون کے خلاف درخواست داخل کرے وفاقی شرعی عدالت میں، اور وفاقی شرعی عدالت کے بعد اس کی اگر اپیل ہوگی تو ہمارے پاس سپریم کورٹ اپیلٹ بینچ میں ہوگی، لیکن میں آپ سے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میرا دل دکھا ہوا ہے کہ اس سترہ سال میں ہمارے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہمارے عوام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک درخواست کسی قانون کے خلاف نہیں آئی،۔

ہمارے پاس جو درخاستیں آیں وہ قادیانیوں کے پاس سے آئی، مرزائیوں کی طرف سے آئی، ہمارے پاس درخواستیں ملحدوں اور بھرانت کرانے والے سیکولر لوگوں کے درخاستیں آئی، ہم نے ان درخواستوں کی بنیاد پر کم از کم دوسو قوانین تبدیل کئے، دوسو قوانین میں تبدیلی آئی، اور اس کے ذریعہ دوسو غیر اسلامی قوانین جو ہے وہ ختم کئے گئے، لیکن ہماری طرف سے، ہماری طرف سے یعنی ہماری طرف سے میری مرادیہ

ہے کہ علمائے کرام سیاسی مذہبی جماعتیں ان کی طرف سے ایک درخواست بھی پورے عرصہ میں نہیں آئی۔

جب سود کا مقدمہ چل رہا تھا ہمارے یہاں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا اس کے خلاف یونیٹڈ بینک نے اپیل کی، سپریم کورٹ اپیلٹ بینچ میں ہمارے پاس اپیل آئی، سات سال وہ ہمارے یہاں پڑی رہی کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا، کسی کا مقدمہ اگر ذاتی جائداد کا ہو تو وہ دس مرتبہ وکلا کو کھڑا کر کے اور وہ چیف جسٹس کو آمدہ اس بات پر آمدہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کیس کو جلدی جلدی جلدی سے جلدی فیصلہ کرائے، لیکن سود کا مقدمہ تھا سود کو ملک سے ختم کرنے کا مقدمہ تھا کوئی آواز کہیں سے، میں تو کہتا اس چیف جسٹس کہتا کہ بھائی اتنے دنوں سے یہ مقدمہ پڑا ہوا ہے اس کو لگائیے، اس کو لگا کر اس کو فیصلہ کرائیے، عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام تو جو ہے وہ تو کوئی ہمارے پاس دوسرے مقدمات آتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس خطوط آتے ہیں پیغامات آتے ہیں طریقیں چلتی ہیں کہ اس مقدمہ کو جلدی سے ختم کرائیے، لیکن ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟

میں نے کہا بھائی! بحیثیت مسلمان کے بحیثیت ایک مسلمان کے میں نے کہا بیشک یہاں ایک جج کا حال اٹھایا اس سے پہلے ایک اور...... اٹھار کھا ہے اور وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ تو اس وجہ سے کہتا ہوں **لیکن اختیار میرے پاس نہیں تھا** وہ کہتے ہیں عوام کی طرف سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کہ اس کو ختم کرے اس کو لگایا جائے، آخر کار کسی طرح ایک چیف جسٹس آئے انہوں نے لگا دیا ہم نے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ گیارہ سو صفحات پر مشتمل وہ

فیصلہ دیا جس میں سے ایک بہت بڑا حصہ وہ میرا لکھا ہوا، وہ فیصلہ دیا، اس فیصلہ کے ذریعہ سود کے سارے قوانین کو ختم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا، اور ایک سال کی مہلت حکومت کو دی گئی۔

اب اس ایک سال کے اندر ان کو کیا کرنا تھا، تو انہوں اس کی ریویو داخل کیا تھا، ریویو داخل کیا اس وقت بھی ہم موجود تھے، **جب ریویو سننے کا وقت آیا تو انہوں نے بینچ توڑ دی، مجھے نکال دیا،** اور اس کے نتیجے میں ایک نئی بینچ لا کر کھڑی کی وہ بھی ایک ایسی بینچ تھی اس میں بھی ہمارے کچھ دوست موجود تھے اور انہوں نے اس فیصلہ کو جس میں ربا کو حرام قرار دے کر ملک سے ختم کرنے کا فیصلہ دیا تھا اس فیصلہ کو ..... کر دیا، واپس کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اس پر غور کرے آج پھر وہ سرد کھانے پڑا ہوا ہے۔

لیکن کوئی کوئی علمائے کرام کی طرف سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی مطالبہ آج بھی نہیں ہے کہ وہ مقدمہ پڑا ہوا ہے، خدا کے لئے اس کا فیصلہ کراؤ، اگر نہیں ہے اگر ہمارا کوئی ذاتی مقدمہ ہوتا تو ہم وہاں پر عدالت کے پاس جا کے کھڑے ہوتے اور پوچھا ہوتا کہ اس کو جلدی سے جلدی پورا کراؤ، اب صورت حال یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں دو جج ہونی چاہئے علمائے کرام میں سے اور سپریم کورٹ میں تین جج ہونے چاہئے علمائے کرام میں سے، اب وفاقی شرعی عدالت میں صرف تین کے بجائے ایک ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر دو ہیں اور وہ بھی معطل اس طرح پڑے ہوئے ہے کہ ان کا اجلاس ہی نہیں ہو پاتا، کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لئے کہ عوام تو کہتے ہیں دلچسپی نہیں ہے اس مسئلہ سے اگر ہم یہ طریقہ اختیار کرینگے تو کیا بتائیے ہم پر مطالبہ کرے کہ پاکستان کے اندر اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوئی، لہذا تلوار اٹھاؤ، لہذا بندوق کی گولیاں

چلاؤ، جب آپ اپنے فریضہ ادا نہیں کرینگے آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرینگے، تو اس کا نتیجہ تو یہی سامنے آئے گا۔

تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو عدالتی راستہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو، لیکن ایک راستہ ایسا ہے کہ جو جب کسی کی اپنے کوئی ذاتی مسئلہ سامنے آتا ہے یا کوئی جمہوریت کے نام پر کوئی غلط اقدام حکومت نے کرتی ہے تو سڑکے بلک ہو جاتی ہے، دھرے دئے جاتے ہیں اور مطالبات کئے جاتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں جلسے ہوتے ہیں اور پر امن طریقہ سے پر امن تحریکیں چلتی ہے، لیکن کیا آج تک میں نے آپ نے ہمارے مذہبی جماعتوں نے ہماری سیاسی جماعتوں نے آج تک کوئی تحریک اور کوئی جلسہ جلوس وغیرہ کی تحریک تحریک کی شکل میں نفاذ شریعت کے لئے چلائی؟ اس سوال کا جواب ہم سب کے ذمہ، اور نفاذ شریعت ایک مجمل لفظ ہے، نفاذ شریعت کا نام ایک مجمل لفظ ہے، اگر تحریک چلائی جائے تو اس میں متعین کر کے مطالبات رکھے جائے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار، اس طرح کر کے اس کے مطالبات رکھے جائے، اس کی عملی شکل اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اس مطالبات کو عملا کیسے نافذ کیا جائے گا؟ آپ کے پاس اس کا پورا پروگرام ہونا چاہئے، اور اس طریقہ سے اگر آپ وہ تحریک چلائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں وہ جو ہم جس بات کا ہم رونا روتے ہیں کہ ہم اس منزل تک نہیں پہونچ سکے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس منزل تک نہ پہونچ سکے، اس کے لئے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے بندوق چلانے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے ہم آپ کے اندر جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے، کہ جس جذبہ کے ذریعہ ہم پاکستان کو مانے پاکستان کو مان

کر اس کے اندر پاکستان کو اسلامی ریاست اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لئے اپنے فرائض ادا کرے تو ان شاء اللہ حکومت... حکومت حکمتیں اس بات کو..... آج کل حکومتوں کا رواج یہ معاف کی جئے گا اس صاف گوئی کے اوپر کہ انگریز کے زمانہ سے ایک رجحان حکومتوں کو یہ چل گیاہے کہ جو شخص جتنا ٹکڑا جو تالے کر آئے گا ہو ہم سے مطالبات بنوالے گا جتنا بڑا ٹکڑا جو تالے کر آئے وہ ہم سے مطالبات بنوالے گا، جو آدمی نصیحت کرے وہ اور جا کر خیر خواہی کے ساتھ ان سے بات کرے کہ بھائی یہ کام کرلو تو وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے،وہ محض مسکراہٹوں اور مصافحوں کے نذر ہو جاتی ہیں،

لیکن اگر کوئی آدمی تحریک لے کر کھڑا ہو ، تحریک ختم نبوت میں کیا ہوا؟ سارے مسالک متحد ہو گئے اور انہوں نے تحریک چلائی اور تحریک چلانے کے نتیجہ میں اتنا بڑا اقدام جس کو ساری دنیا کی سیکولر طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ غلط اقدام ہوا،وہ اتنا بڑا اقدام کرنے پر مجبور ہو گئی کون مجبور ہو گیا؟ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم،وہ مرحوم،وہ اس نے... تو اگر ہم صدق دل کے ساتھ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں پاکستان کو اپنا سمجھ کر اپنا وطن سمجھ کر اور اس کے اندر شریعت کا صحیح معنی میں نفاذ چاہتے ہیں تو ہے کچھ کرنا ہو گا۔

صوبائی پیغام پاکستان کانفرنس سندھ

শায়খে মুহতারামের আরেকটি ওয়াযাহাতি বয়ান

"আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

আলহামদু লিল্লাহ! পয়গামে পাকিস্তান উপলক্ষে আমার আগের বক্তাগণও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তুলে ধরেছেন। আলহামদু লিল্লাহ এ পয়গাম সকল মাকতাবায়ে ফিকর এবং সকল চিন্তার মানুষদের সম্মিলিত অভিব্যক্তি। এ কথাগুলোর পুনরায় উল্লেখ করার আর প্রয়োজন নেই।

আমি সংক্ষেপে শুধুমাত্র দু' তিনটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে, পাকিস্তান ইসলামের শিরোনামে জন্ম লাভ করেছে। আমরা শিশুকালে এ শব্দে আওয়াজ তুলেছিলাম 'পাকিস্তানের অর্থ কী? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে এ দেশটি অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা এ দেশকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ভরপুর করে দিয়েছেন। আজ সত্তর বছর অতিক্রম হওয়ার পর আজ আমরা নিজেরা নিজেরা আর বিশেষ করে প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সামনে খুব বেশি পরিমাণে বলে থাকি এবং আমরা সঠিকই বলে থাকি যে, যে উদ্দেশ্যে এ দেশটি অস্তিত্ব লাভ করেছিল আজো পর্যন্ত সে উদ্দেশ্য পুরা হয়নি। আর এ কারণে আমরা যখন হুকুমতের সঙ্গে কথা বলি, হুকুমতের সামনে যখন কোন প্রস্তাব বা দাবি উত্থাপন করার সময় হয় তখন খুবই গুরুত্ব ও শক্তির সাথে এ কথাটি আমরা বার বার বলে থাকি যে, পাকিস্তান যে কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে মনজিল আজো আমাদের অর্জিত হয়নি। সে সমাজ ও পরিবেশ আজো আসতে পারেনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাগণ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর যে স্বপ্ন আল্লামা ইকবাল দেখেছিলেন। অথবা তারও আগে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি সাহেব থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি দেখেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানে একটি আলাদা একটি মুসলিম স্টেটের ধারণা তুলে ধরেছিলেন।

আমরা বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি ফেললে দেখতে পাই, যেমন আমার আগের বক্তা সাহেব খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা, অশ্লীলতা চলছে এবং যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারেনি। তাই এর জন্য আমরা চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া চাই। কিন্তু আমি এখানে বিশেষভাবে দু'টি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং কুরআন হাদীসের আলোকেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে, পয়গামে পাকিস্তানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমরা যে ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করছি সেসব ভুলের সমাধান বন্দুকের গুলি নয়। মূলত সেসব ভুলকে আমরা নিজেরাই শুধরাব এবং তা আমাদের যিম্মাদারী। এর মাঝে হুকুমতও রয়েছে, এর মাঝে ওলামায়ে কেরামও রয়েছেন, এর মাঝে সাধারণ মানুষও রয়েছে।

এ পর্যায়ে আমি যে কথাটি সর্বপ্রথম তুলে ধরতে চাই তা হচ্ছে, আমরা যখন পাকিস্তানের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরছি -আমরা এখানে ওলামায়ে কেরামের মাহফিলে রয়েছি, আমরা নিজেরা নিজেরা বসেছি- এখানে এ বিষয়েও কিছু আলোচনা হওয়া দরকার যে, আলহামদু লিল্লাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর পাকিস্তানের ভেতরে বহু ভালো কাজও হয়েছে এবং পরিবেশের মাঝে বড় ধরনের পরিবর্তনও এসেছে। আমরা অবশ্যই অভিযোগ করি। কিন্তু আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা এ পাকিস্তানে আমাদেরকে যেসকল নেয়ামত দান করেছেন সেসবের আলোচনা আমরা করি না, সেসবের উল্লেখ আমরা করি না। পাকিস্তানের কারণে আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা আমাদেরকে কত প্রকারের নেয়ামত দান করেছেন তা আমরা আলোচনায় আনি না। সেগুলোর জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি না যে আল্লাহ বলেছেন لئن شكرتم لأزيدنكم।

আমি বলতে চাই, এ সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রথমত আপনারা হয়ত অধিকাংশ সে বয়সের হবেন না। কিন্তু আমি সে দৃশ্য দেখেছি যখন করাচির মাঝে শরাবখানাগুলো এমনভাবে খোলা ছিল যেভাবে রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে। সেগুলোতে স্বাধীনতার সাথে এবং আইনগত বৈধতাসহ মদ পান করা হত এবং বাধা দেয়ার মত কেউ ছিল না। আলহামদু লিল্লাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওলামায়ে কেরামের চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে এ মুসিবত থেকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা আমাদেরকে হেফাযত করেছেন। মদ পান করার মত লোক আজো আছে, কিন্তু তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পান করে, আইনগত বৈধতা ছাড়া পান করে, আইনের অধীনে আসলে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ নেয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ নেয়ামত দান করেছেন আমাদের বড়দের চেষ্টা প্রচেষ্টার ফল হিসাবে। পাকিস্তানের আইন, পাকিস্তানের আইনকে পুরো পৃথিবীর সংবিধানের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন, পাকিস্তানের আইন সে কথা বলে যা আজ পৃথিবীর কোন দেশ এমন কি সাউদী আরবও বলে না। আর তা হচ্ছে, আমাদের সংবিধানের সর্বপ্রথম বাক্য হচ্ছে, এ জগতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাবারাক ওয়াতাআলা যার সঙ্গে আর কেউ শরিক

নেই। এ বাক্যটি আপনি পৃথিবীর কোন সংবিধানে পাবেন না। ইসলামী দেশগুলোর সংবিধানে পাবেন না। সাউদী আরবের বর্তমান সংবিধানেও -এ ধরনের সংবিধান সেখানে নেইও- পাবেন না যে, বলা হয়েছে, এ জগতে অন্য কারো অংশিদারিত্ব ব্যতীত শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য।

এখানে যারা শাসকশ্রেণী হবে সেসব শাসক আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলার দেয়া সীমার ভিতরে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা কর্তৃক প্রদত্ত সীমার ভিতরে থেকেই শাসন ক্ষমতা চালানোর অধিকার রাখবে। এ বাক্যটি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এ বাক্যটি এটি পৃথিবীর কোন সংবিধানে নেই। এ সংবিধানের মাঝে এই যে বাক্যটি রয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রতিটি আইন কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কোন আইন বানানো হবে না। এ বাক্যটিও আপনি কোন সংবিধানে পাবেন না। পুরো মুসলিম বিশ্বের ছাপ্পান্নটি দেশ, সেগুলোকে যাচাই করে দেখুন, সেগুলোর কোনটিতে এ কথা এ আইন নেই যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা এ দেশকে দান করেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের সংবিধানেই সর্বপ্রথম মুসলমানের সংজ্ঞা এবং খতমে নবুয়তের স্বীকৃতি যে, যদি খতমে নবুয়তকে স্বীকার না করা হয় তা হলে ব্যক্তি মুসলমান হতে পারবে না। খতমে নবুয়তকে স্বীকার না করলে সে মুসলমান হতে পারবে না। আর যে মুসলমান হতে পারবে না সে দেশের শাসক হতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না, প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। এ কথা পৃথিবীর আর কোন সংবিধানে এত স্পষ্টভাবে নেই। যার মধ্যে খতমে নবুয়তকে নিজেদের আইনের এতবড় অংশ বানানো হয়েছে। আপনি এ বিষয়টিও যাচাই করে দেখুন, আলহামদু লিল্লাহ আমরা নিজেরা নিজেরা বসে আছি এবং সবাই মসজিদ মেহরাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। পাকিস্তানের বাইরে আপনি যে কোন ইসলামী দেশে চলে যান। ... অসংখ্য ইসলামী দেশ রয়েছে। আপনি যে কোন দেশে চলে যান। সেখানে আপনি আপনার বক্তব্য, আপনার লেখালেখি এতটা স্বাধীনতার সাথে করতে পারবেন না। যতটা স্বাধীনতার সাথে আপনি পাকিস্তানে করতে পারেন।

সেখানকার অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার অনুমতিই নেই। সকল বিভাগের যত পরিমাণ মাদরাসা এ

দেশে রয়েছে, পাকিস্তানের মাঝে রয়েছে, পৃথিবীর কোন দেশে এমন নেই। সেখানে অনুমাতি নেই যে, আপনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবেন।

আপনি জুমার খুতবায় নিজের মনের তৃপ্তি অনুযায়ী দ্বীনের কথাগুলো খুলে খুলে বলতে পারেন। আলহামদু লিল্লাহ উপর থেকে আপনার উপর কোন পাবন্দী নেই। কিন্তু গিয়ে দেখুন, সেসব আরব দেশে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গিয়ে দেখুন, আপনি দেখতে পাবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমোদিত খুতবা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে খুতবা পাঠ করা যাবে না।

একবার আমি তিউনিসিয়ায় ছিলাম। সেখানকার 'জামেয়া যাইতূনাহ' যা প্রসিদ্ধ একটি বিশ্ববিদ্যালয় তা দেখতে গিয়েছিলাম। জুমার দিন ছিল। আমি বললাম, মসজিদে নামায পড়ে নেয়া যায়। আমরা নামায পড়তে মসজিদে গেলাম। ইমাম সাহেবের পুরাটা খুতবাই ছিল তৎকালীন শাসকের প্রশংসায় ভরপুর। উভয় খুতবায়। তার মাঝে এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, বর্তমান সরকার এই এই অবদান রেখেছে। এছাড়া আর কোন কথাই ছিল না। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আজ আমি এ এক আশ্চর্যজনক খুতবা শুনলাম। দুনিয়ার মধ্যে এ ধরনের খুতবা প্রথম শুনলাম যার মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তারা আমাকে বলল, আজ এ খুতবাটি সারা দেশের সকল খতিবের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সঙ্গে এ পাবন্দী দেয়া হয়েছে যে, খতীব এ খুতবা না দিলে সে খতিব থাকতে পারবে না। এ অবস্থা বিরাজ করছে।

আপনি ইমারাতে চলে যান, সাউদী আরবে চলে যান, আপনি আরব বিশ্বের যেকোন দেশে চলে যান। সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারীভাবে খুতবা অনুমোদিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে খুতবা দেয়া যাবে না। আল্লাহ আমাকে আপনাকে এ স্বাধীনতা দান করেছেন যে, এটা পাকিস্তানের দান এবং পাকিস্তানের ফযীলত, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা আমাদেরকে এ স্বাধীনতা দান করেছেন যে, আমরা যা চাই তা কমপক্ষে বলতে পারি। আমরা আমাদের আবেগগুলোকে প্রকাশ করতে পারি। আমরা আমাদের দ্বীনের কথাগুলো শোনাতে পারি। আমরা ফাতওয়া দিতে পারি। ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন।

সাউদী আরবে যদি কোন ব্যক্তি, আমি সাউদী আরবের কথা বলছি, সেখানে যদি কোন ব্যক্তি যাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রেজিস্টার্ড করা হয়নি এমন ব্যক্তি যদি ফাতওয়া দেয় তাহলে তাকে গ্রেফতার করার মত পুলিশ রয়েছে, তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে, এ কারণে যে, সে কেন ফাতওয়া দিল? কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ এখানে আমাদের এ স্বাধীনতা রয়েছে। তাই আমরা যদি কিছু সমস্যা দেখেও থাকি তবু এর সাথে সাথে যে ভালো দিকগুলো রয়েছে সেগুলোর তো মূল্যায়ন করা চাই। সেগুলোরতো শোকর আদায় করা চাই। আমরা আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করি এবং শোকর আদায় করার পর আল্লাহ তাআলার কাছে لأَزِيدنكم এর আশা রাখি। এটি একটি কথা যা আমি বলতে চেয়েছি। অতএব এখন পাকিস্তানকে আপন করে নেয়া, নিজের মনে করা, একটি ইসলামী রাষ্ট্র মনে করা, একটি ইসলামী দেশ মনে করা, নিজের দেশ মনে করা এবং তার সংরক্ষণ আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব।

এখানে আমি সবার সামনে এ কথাটিও বলে দিতে চাই যে, এক সময় ছিল যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ওলামায়ে কেরামের মাঝে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছিল। মতপার্থক্য এটি খারাপ কোন বিষয় নয়। মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া বেশি ভালো হবে? না কি না হওয়া এবং হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুক্ত থাকা উত্তম হবে? এ বিষয়ে আমাদের আহলে ইলমের বিভিন্ন মত এসেছে। কিন্তু যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন হযরত শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি শুরুতে যাঁর মত ছিল না, কিন্তু তাঁর এ বাক্য রেকর্ড করা আছে, আমার কাছে তার প্রমাণ রয়েছে যে, হযরত আল্লামা শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, মসজিদ নির্মাণের আগে কোন জায়গায় দ্বিমত করা যায় যে, এখানে মসজিদ বানানো হবে কি হবে না? কিন্তু যখন একবার মসজিদ হয়ে যায় তখন তা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ফরয দায়িত্ব হয়ে যায়। এটা হযরত মাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহির শব্দ। তাই এ বিষয়ে আমার প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা পকিস্তানকে নিজেদের মনে করি, পাকিস্তানের কল্যাণকে নিজেদের কল্যাণ মনে করি, পাকিস্তানের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা মনে করি, আমরা আমাদের মনের মাঝে পাকিস্তানের প্রতি ভালোবাসা আমরা আমাদের মনের মাঝে সৃষ্টি করি।

দ্বিতীয় যে কথাটি আমি বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে শরীয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি যা কাঙ্ক্ষীত ছিল। আর আমরা যখন শাসকবর্গের সঙ্গে কথা বলি তখন আমরা এ অভিযোগই করি। কিন্তু এ অভিযোগ যখন আমরা শাসকবর্গের বিরুদ্ধে করে থাকি, হুকুমতের বিরুদ্ধে করে থাকি তখন এ অভিযোগ আমি আমার বিরুদ্ধেও করি, হযরত ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধেও আমার এ অভিযোগ, ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধেও আমার এ অভিযোগ, সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধেও আমার এ অভিযোগ। তারা শরীয়তের বাস্তবায়নের জন্য যে পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করার দরকার ছিল তারা সে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেনি। আর এ ক্ষেত্রে অপরাধ পর্যায়ের গাফলত ও অবহেলা আমরা সকলেই প্রদর্শন করেছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন আইন দিয়েছিলেন, সে আইনের মধ্যে থেকে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তাবায়নের জন্য আইনগত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খোলা ছিল। আজো পর্যন্ত তা খোলা রয়েছে। একটি আইনগত পদ্ধতি আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি। বহু লোকের জানাই নেই যে, এ আইন বিশেষ করে এ আইনের অষ্টাদশ সংশোধনী জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে যে সংশোধনী এসেছিল সে সংশোধনীতে পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিককে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে যদি কোন আইনকে শরীয়ত বিরোধী মনে করে এবং কুরআন সুন্নাহের বিপরীত মনে করে তাহলে সে ঐ আইনের বিরুদ্ধে বেফাকী শরয়ী আদালতে চ্যালেঞ্জ করবে। বেফাকী শরয়ী আদালত যদি কোন আইনকে কুরআন ও সুন্নাহের বিরোধী বলে সাব্যস্ত করে তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ আইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। এরপর যদি এ রায়ের ব্যাপারে আপিল করা হয় তাহলে সুপ্রিমকোর্টের মাঝেও তা শরীয়াহ এপিলেট বেঞ্চে যায়। আর সংবিধানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেফাকী শরয়ী আদালতে তিনজন আলেম থাকা চাই, আর সুপ্রিমকোর্টের শরীয়াহ এপিলেট বেঞ্চে দুই জন আলেম থাকা চাই। যারা এ সিদ্ধান্ত দেবে যে, বেফাকী শরয়ী আদালত যে রায় দিয়েছে তা সঠিক না কি বেঠিক।

আমি সতের বছর পর্যন্ত এই বেফাকী শরয়ী আদালত এবং সুপ্রিমকোর্টের শরীয়াহ এপিলেট বেঞ্চে জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি

আমার সাথীদেরকে, আমার বন্ধুবান্ধবকে, আমার ধর্মীয় নেতৃবর্গকে, রাজনৈতিক দায়িত্বশীলদের কাছে হাতজোড় করে বলেছি, আল্লাহর ওয়াস্তে সংবিধানের এ ধারাটিকে কাজে লাগিয়ে আপনারা আইনের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করুন এবং এর মাধ্যমে কানূনগুলো পরিবর্তন করিয়ে নিন।

আমি অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে বলছি, আমি হাতজোড় করেছি। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবর্গের কাছেও, ধর্মীয় নেতৃবর্গের কাছেও। আমি বলেছি, আপনারা আবেদনপত্র নিয়ে আসুন। আপনারা কমিটি বানিয়ে দিন এবং কমিটি সিদ্ধান্ত নিক এবং তারা দেখুক যে, কোন কোন আইন পরিবর্তন করা দরকার। আপনারা সেসব আইনের বিরুদ্ধে বেফাকী শরয়ী আদালতে আবেদন দাখিল করুন। আর বেফাকী শরয়ী আদালতের পর যদি আপিল হয় তাহলে আমাদের কাছেই সুপ্রিমকোর্ট এপিলেট বেঞ্চে হবে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে আফসোসের সঙ্গে বলছি, আমার দিল ব্যথিত হয়ে আছে। এই সতের বছরে আমাদের ধর্মীয় নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে, আমাদের সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন একটি আইনের বিরুদ্ধে একটি আবেদনও আসেনি।

আমাদের কাছে আবেদন এসেছে কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে এসেছে, মিরযায়ীদের পক্ষ থেকে এসেছে। আমাদের কাছে আবেদন এসেছে, বিভ্রান্তকারী মুলহিদ সেক্যুলার লোকদের পক্ষ থেকে আবেদন এসেছে। আমরা সেসব আবেদনের প্রেক্ষিতে কমপক্ষে দুইশত কানূন পরিবর্তন করেছি। দুইশত আইনের মাঝে পরিবর্তন এসেছে। আর তার মাধ্যমে দুইশত গায়রে ইসলামী কানূন শেষ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ আমাদের পক্ষ থেকে বলে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওলামায়ে কেরাম, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এ দীর্ঘ মেয়াদে তাদের পক্ষ থেকে একটি আবেদনও আসেনি।

যখন সুদের মামলা চলছিল আমাদের এখানে, বেফাকী শরয়ী আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। ইউনাইটেড ব্যাংক সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। সুপ্রিমকোর্ট এপিলেট বেঞ্চে আমাদের কাছে আপিল এসেছে। সাত বছর পর্যন্ত তা আমাদের এখানে পড়ে থাকল। খবর নেয়ার কেউ ছিল না। যদি

কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তির মামলা হত তাহলে সে দশবার উকিলদেরকে দাঁড় করিয়ে চীফ জাস্টিসকে এ কথার উপর রাজি করাতে চেষ্টা করত যে, তিনি যেন এ কেসটিকে দ্রুত নিষ্পত্তি করে দেন। কিন্তু সুদের মামলা ছিল। দেশকে সুদমুক্ত করার মামলা ছিল। কোন দিক থেকে কোন আওয়াজ! আমি তো বলি এটা, চীফ জাস্টিস বলতেন, এত দিন থেকে এ মামলা পড়ে আছে, মামলাটি নথিভুক্ত করে এর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসুন। সাধারণ মানুষদের তো কোন আগ্রহ নেই। সাধারণ মানুষ অন্যান্য সব মামলা নিয়ে আমাদের কাছে আসে, সেসব বিষয়ে আমাদের কাছে চিঠি পত্র আসতে থাকে, বিভিন্ন খবর আসতে থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতি চলতে থাকে। এ মামলাটি দ্রুত নিষ্পতি করে দিন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কোন পেরেশানী নেই। তাহলে আপনি কেন পেরেশান হচ্ছেন?

আমি বললাম, ভাই! একজন মুসলমান হিসাবে, একজন মুসলমান হিসাবে আমি বললাম, নিঃসন্দেহে এখানে একজন জজের অবস্থা উঠে এসেছে, এর আগে আরেকটি অবস্থাও উঠে এসেছে আর তা হচ্ছে أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله। তাই এ কারণে আমি বলি, কিন্তু এখতিয়ার আমার হাতে ছিল না। তারা বলে, সাধারণের পক্ষ থেকে কোন দাবিই নেই যে এর নিষ্পত্তি করা হোক। অবশেষে একজন চীফ জাস্টিস আসলেন, তিনি মামলাটি নথিভুক্ত করলেন, আমরা ফয়সালা দিলাম এবং সুপ্রিমকোর্টের ইতিহাসে সবচাইতে বড় ফয়সালা এগার শত পৃষ্ঠার একটি ফায়সালা দিয়েছি, যার বড় একটি অংশ আমার লেখা ছিল। সে ফয়সালা দিলাম। সে ফয়সালার মাধ্যমে সুদের সকল আইন খতম করে দেয়ার আদেশ জারি করে দেয়া হয়েছে এবং হুকুমতকে এক বছরের সময় দেয়া হয়েছে।

এখন এ এক বছরের মধ্যে তাদের কী করার ছিল? তারা এর রিভিউ দাখিল করলেন। যখন রিভিউ দাখিল করেছে তখনও আমি ছিলাম। যখন রিভিউ শুনানির সময় এল তখন তারা বেঞ্চ ভেঙ্গে দিল এবং আমাকে বের করে দিল। যারফলে একটি নতুন বেঞ্চ দাঁড় করানো হল। আর তাও এমন এক বেঞ্চ ছিল যেখানে আমাদের কিছু দোস্ত ছিল। আর আমাদের যে ফয়সালা অনুযায়ী সুদ হারাম সিদ্ধান্ত দিয়ে দেশ থেকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল তারা সে ফয়সালাটি ...... খারিজ

করে দিলেন এবং বললেন, এর উপর আবার বিবেচনা করা হোক। মামলাটি এখন আবারও হিমাগারে পড়ে আছে।

কিন্তু কোন ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে, কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আজো পর্যন্ত কোন দাবি নেই যে, সে মামলাটি পড়ে আছে, আল্লাহর ওয়াস্তে এর ফয়সালাটি করে দিন, আর যদি না হয়। যদি আমাদের ব্যক্তিগত কোন মামলা হত তাহলে আমরা সেখানে গিয়ে আদালতের সামনে দাঁড়াতাম এবং জিজ্ঞেস করতাম যে, এ মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করুন। এখন অবস্থা হচ্ছে, বেফাকী শরয়ী আদালতে ওলামায়ে কেরাম থেকে দু'জন জজ হওয়া চাই এবং সুপ্রিমকোর্টে ওলামায়ে কেরাম থেকে তিনজন জজ হওয়া চাই। এখন বেফাকী শরয়ী আদালতে তিন জনের পরিবর্তে মাত্র একজন রয়েছে, আর সুপ্রিমকোর্টের মাঝে দু'জন রয়েছে। আর তাও এমনভাবে অকার্যকর হয়ে আছে যে, তাদের এজলাসও হতে পারে না। কেন হতে পারে না? এ কারণে যে, সাধারণ মানুষ তো বলে যে, এ মাসআলা নিয়ে তাদের কোন মাথা ঘামানি নেই। আমরা যদি এ পদ্ধতি গ্রহণ করি তাহলে বলুন, আমাদের কাছে দাবি করবে যে, পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়িত হয়নি তাই তলোয়ার হাতে নাও, বন্দুকের গুলি চালাও। যখন আপনি আপনার ফরয দায়িত্ব আদায় করবেন না, আপনার দ্বারা যা করার ছিল তা করবেন না, তাহলে তার ফলাফল তো এটাই সামনে আসবে।

তৃতীয়ত আমি এ কথাটি বলতে চাই যে, এটা তো হচ্ছে আদালতি পন্থা যা আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বললাম। কিন্তু একটি রাস্তা এমন আছে যে, যখন কারো নিজস্ব কোন বিষয় সামনে আসে, গণতন্ত্রের শিরোনামে হুকুমত কোন ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, রাস্তাসমূহ ব্লক করে দেয়া হয়, ... দেয়া হয়, বহু দাবি করা হয়, মিছিল বের করা হয়, সমাবেশ হয় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলে। কিন্তু আজো পর্যন্ত কি আমি আপনি, আমাদের ধর্মীয় জামাতগুলো এবং আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কোন আন্দোলন কোন সমাবেশ ও মিছিল কি শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য করেছে? এ প্রশ্নের জবাব আমাদের সবার যিম্মায়।

আর শরীয়তের বাস্তবায়ন একটি সংক্ষিপ্ত অস্পষ্ট শব্দ। শরীয়তের বাস্তবায়ন একটি অস্পষ্ট নাম। যদি আন্দোলন করা হয় তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে দাবিগুলো উত্থাপন করা চাই। এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন

নম্বর, চার এভাবে। এভাবে দাবিগুলো রাখা চাই। যদি কেউ এর বাস্তবমুখী ছক দেখতে চায় এবং জানতে চায় যে, দাবিগুলো আমলী ক্ষেত্রে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে? আপনার কাছে এর পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম থাকা চাই। আর এভাবে যদি আপনি আন্দোলন চালিয়ে যান তাহলে কোন কারণ নেই যে, আমরা আজ এ দেশে যে জন্য কান্নাকাটি করছি সে মনজিল পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না। সে মনজিলে না পৌঁছার কোন কারণ নেই। এর জন্য তলোয়ার হাতে নেয়ার প্রয়োজন নেই, এর জন্য বন্দুক চালানোর প্রয়োজন নেই, এর জন্য অস্ত্র হাতে নেয়ার প্রয়োজন নেই। এর জন্য আমার আপনার মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া দরকার। যে আগ্রহের ভিত্তিতে আমরা পাকিস্তানকে মেনে নেব। পাকিস্তানকে মেনে নিয়ে তার মাঝে পাকিস্তানকে ইসলামী রিয়াসাত এবং ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য নিজের ফরয দায়িত্বগুলো আদায় করি তাহলে ইনশাআল্লাহ হুকুমত। হুকুমতগুলো এ বিষয়টিকে...।

আজকাল হুকুমতগুলোর নিয়ম হচ্ছে, -এভাবে স্পষ্ট করে বলার জন্য মাফ করবেন- ইংরেজদের যামানা থেকে হুকুমতগুলো একটি নিয়ম চলে আসছে যে, যে ব্যক্তি যত শক্তিশালী জুতা নিয়ে আসবে সে আমাদের থেকে তার দাবি পূরণ করিয়ে নিতে পারবে। যত শক্ত জুতা নিয়ে আসবে সে তার দাবি পূরণ করে নিতে পারবে। আর যে নসীহত করবে এবং কল্যাণকামীতার সাথে তার সঙ্গে কথা বলবে যে, ভাই এ কাজটি কর, তাহলে তা হাওয়ায় উড়ে যায়। তা শুধু মুচকি হাসি ও মুসাফাহার মাঝেই বিলিন হয়ে যায়।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি আন্দোলন নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, খতমে নবুয়ত আন্দোলনে কী হয়েছিল? সকল মত ও পথ এক হয়ে গিয়েছিল এবং তারা আন্দোলন চালিয়েছিল এবং আন্দোলনের ফলে এতবড় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে যে পদক্ষেপের ব্যাপারে সারা পৃথিবীর সেক্যুলার শক্তিগুলোর দাবি হচ্ছে, এটি একটি ভুল পদক্ষেপ। কে বাধ্য হয়েছিল? যুলফিকার আলি ভুট্টো মরহুম। সে মরহুম। তিনি ...। অতএব আমরা যদি সত্য দিলের সাথে শরীয়তের বাস্তবায়ন চাই, পাকিস্তানকে নিজের মনে করে, নিজের দেশ মনে করে এবং তার মাঝে শরীয়তের সহীহ অর্থে বাস্তবায়ন চাই তাহলে আমাদেরকে কিছু করতে হবে।”

-প্রাদেশিক পয়গামে পাকিস্তান কনফারেন্স সিন্ধু

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবরচিত আইন, তাগুতের আইন, গায়রুল্লাহর আইন ইত্যাদির গোড়ায় আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না ততক্ষণ পর্যন্ত এসবের সঠিক মূল্যায়ন আমরা করতে পারব না। পৃথিবীর পেটের মধ্যে বসে পৃথিবীর চলার গতি ও ঘোরার গতি অনুভব করা সম্ভব নয়। ফোকাসটা ফেলতে হবে বাহির থেকে, অনেক দূর থেকে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অক্টোপাস থেকে নিজেকে আগে মুক্ত করতে হবে। এরপর বুঝে আসবে এ দু'টি মতবাদ কীভাবে ধর্মের অনুসারীদের সম্মতির ভিত্তিতে তাদেরকে জবাই করে।

ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম এবং মানব জন্মের শুরু থেকে পৃথিবীর বিলুপ্তি পর্যন্ত সবার ধর্ম। ধর্মের নামে প্রচলিত অন্যান্য মতবাদগুলো এরকম নয়। ইসলাম যেমন দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য স্থির করে কাজ করে বিশ্বব্যাপী সফলতা লাভ করেছে, তাকে বিলুপ্ত করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের আগে আবিষ্কার হয়নি। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ইসলামের মূল পাওয়ার ও গতিপথকে যেভাবে উপলব্ধি করেছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের আগে কোন তন্ত্র বিষয়টিকে ঠিক সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি।